গদ্যকার্টুন সমগ্র / আনিসুল হক

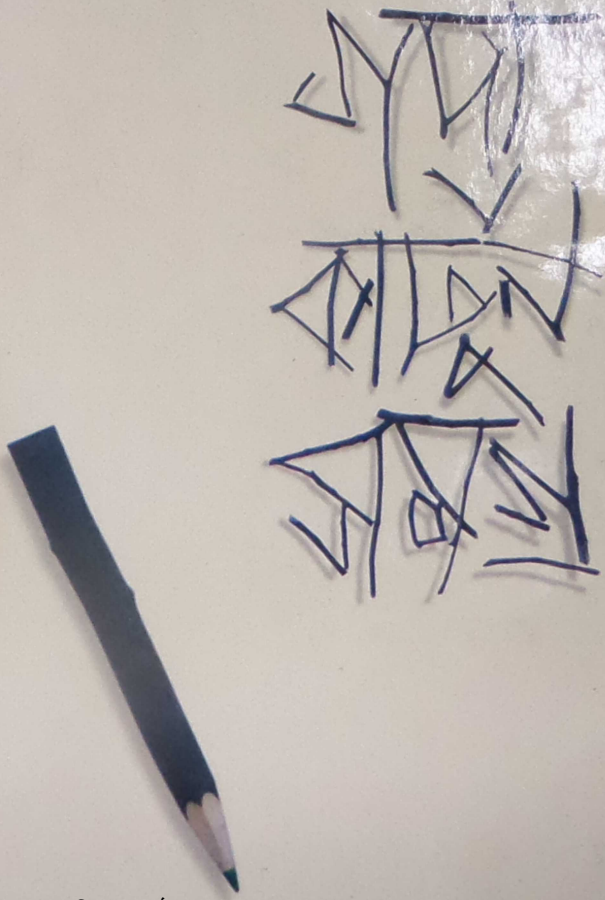

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গদ্যকার্টুন–আনিসুল হকের লেখা বিদ্রূপরচনার নাম। ক্ষমতা তাঁর বিদ্রূপের প্রধান লক্ষ্য, ভন্ডামি তাঁর ব্যঙ্গের প্রধান শিকার।

আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ লিখেছেন, 'তিন ধরনের লেখায় এ পর্যন্ত হাত দিয়েছেন আনিসুল হক এবং আমার ধারণা ঐ তিন ধরনের লেখাতেই তিনি শক্তির প্রমাণ রেখেছেন। তাঁর শক্তি সবচেয়ে বেশি ঝলকে উঠেছে তাঁর রম্যরচনাগুলোয়। এখানে তাঁর কল্পনাশক্তি সবচেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত, চঞ্চল ও সপ্রতিভ। হালকা ডানায় উচ্ছল আনন্দে উড়ে বেড়ানোর অবলীলতা রয়েছে তাঁর এখানে। রম্যতা তাঁর রক্তের সবচেয়ে তপ্ত ও মৌলিক জিনিস।' (ভোরের কাগজ, ৬ মার্চ ১৯৯৮)

গদ্যকার্টুন প্রথম বই হয়ে বেরয় ১৯৯৩ সালে। সে-বইয়ের ভূমিকায় হুমায়ুন আজাদ লিখেছিলেন, 'বাঙলায় ব্যঙ্গবিদ্রূপে ভাঁড়ামো একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার, কম সংখ্যকের হাতেই তা শিল্পকলা হয়ে উঠেছে; আর আধুনিক চেতনাসম্পন্ন লেখকেরা সাধারণত এড়িয়ে গেছেন ব্যঙ্গবিদ্রূপকে।

আনিসুল হক আধুনিক চেতনাসম্পন্ন, তার বিদ্রূপও আধুনিক। সে রাজনীতিক কার্টুনশিল্পী, তার আক্রমণের লক্ষ্য বাঙলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, যা এখন আমাদের প্রধান সামাজিক বিপদ। বাঙলাদেশের প্রতিক্রিয়াশীল রাষ্ট্রতন্ত্র, ও তার সহযোগী সব প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতারকই আনিসুল হকের কার্টুনের বিষয়।..... এ সময়ের সবচেয়ে শাণিত বিদ্রূপের একটি রূপের পরিচয় পাই তার গদ্যকার্টুনে। গদ্যকার্টুন (১৯৯৩), কথাটার্কুন (১৯৯৪), গণতান্ত্রিক ফ্যান্টাসি (১৯৯৫) ও রাজা যায় রানি আসে (১৯৯৬) এই চারটি অধুনাবিরল বই নিয়ে এই গদ্যকার্টুনসমগ্র–১।

এই গ্রন্থ কেবল ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ–রসিকতার যোগান দিয়েই নিঃশেষিত হবে না, এটা একই সঙ্গে তুলে ধরছে এদেশের একটা কাল পর্বকেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গদ্যকার্টুনসমগ্র ১

আনিসুল হক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গদ্যকার্টুনসমগ্র ১

আনিসুল হক

পার্ল পাবলিকেশন্স
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

৬০৭৯৪২
২৭৫
১৩২১৪৯
৮৯১.৪৪৩
আইন
ক-৩
S-2
৪/১২/০০

©
পদ্য পারমিতা

প্রকাশকাল
৬ষ্ঠ ঢাকা বইমেলা ২০০০

প্রচ্ছদ আলোক চিত্রশিল্পী
মিনহাজুর রহমান

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বানান সমন্বয়
সেলিম আলফাজ

এ বইয়ের সকল ঘটনা ও চরিত্র কাল্পনিক।

ISBN–984-495-035-3

পার্ল পাবলিকেশন্স ৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে আলতাফ হোসেন কর্তৃক প্রকাশিত এবং সালমানি প্রিন্টার্স, নয়াবাজার, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
কম্পিউটার কম্পোজ দীপ্তি কম্পিউটারস, ৩৮/২খ বাংলাবাজার, ঢাকা।

মূল্য : ২৭০·০০ টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উৎসর্গ

শাহরিয়ার কবির অগ্রজপ্রতিমেষু

যিনি লেখেন এবং লড়েন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সবিনয় নিবেদন

গদ্যকার্টুন কলাম হিসেবে প্রথম বেরোয় সাপ্তাহিক পূর্বাভাসে। এর ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন মোজাম্মেল বাবু। সেটা এরশাদ-আমলের ঘটনা, হয় ১৯৮৯ সালের শেষে, অথবা ১৯৯০ সালের প্রথমভাগে। আমরা তখন স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনের অংশ হিসেবে সাপ্তাহিক পত্রিকায় কাজ করতাম।

সে-হিসেবে ১০ বছরের মতো সময় ধরে আমি গদ্যকার্টুন বা এ-জাতীয় রচনা লিখে চলেছি। এক দশক কম সময় নয়, এবং সে কারণেই আমার নিজের বয়সটা তেমন পাত্তা দেবার মতো না হওয়া সত্ত্বেও গদ্যকার্টুনসমগ্র বের করার ব্যাপারে আমি সম্মত হয়েছি। নইলে, সমগ্র তো বেরনোর কথা মৃত্যুর পরে, বা মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে। শত্রুর মুখে দিয়ে ছাই, আমি আরো কিছু দিন বেঁচে থাকতে চাই।

পূর্বাভাস ছাড়াও গদ্যকার্টুন জাতীয় কলাম বেরিয়েছে সাপ্তাহিক খবরের কাগজ, কাগজ, যায় যায় দিন, ভোরের কাগজ, চলতিপত্র ও প্রথম আলো পত্রিকায়। আরো দু-একটি পত্রিকায় বিচ্ছিন্নভাবে বেরিয়েছে, সত্যের খাতিরে বলতেই হয়।

গদ্যকার্টুনসমগ্র-এ থাকলো এরশাদ আমল ও বেগম খালেদা জিয়ার আমলে রচিত বিদ্রূপরচনাগুলো। পরিবর্তিত সময়ের কারণে সেগুলো পড়তে হয়তো আগের মতো স্বাদু মনে নাও হতে পারে; কিন্তু এক অর্থে হয়তো এর মূল্য বেড়ে গেল, কেননা ওই সময়ের ইতিহাস একজন বিদ্রূপরচনা-লেখকের চোখ দিয়ে বর্তমান সময়ে দেখতে পাওয়া যাবে।

আজ পুরনো গদ্যকার্টুনগুলোর দিকে তাকালে দেখতে পাই, তখন অনেক বেশি ক্রুদ্ধ ছিলাম, উত্তেজিত ছিলাম। ফলে কারো কারো প্রতি হয়তো একটু বেশি জোরে আঘাত করা হয়ে থাকবে। একবার ভেবেছিলাম, সেই আঘাতটুকু এবার কমিয়ে দেবো, পরে ভাবলাম, থাকুক না, তখনকার রাগ এখন প্রকাশ করেই দেখি, ব্যাপারটা কেমন হয়। এই গদ্যকার্টুনগুলো লেখার বিভিন্ন পর্যায়ে বহু মান্য-গণ্য লেখকেরও উৎসাহ পেয়েছিলাম। সম্পাদকদের মধ্যে সময়ানুক্রমে মোজাম্মেল বাবু, নাঈমুল ইসলাম খান, শফিক রেহমান, বিভুরঞ্জন সরকার ও মতিউর রহমান আমাকে নানাভাবে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

তাজুল হকের কথাও বলতে হয়। 'গদ্যকার্টুন' বই বের করবার কোনো ইচ্ছাই আমার ছিল না। কেননা গদ্য লিখলে কবিতার ক্ষতি হয়— এটা আমি জানতাম। পূর্বাভাস পত্রিকায় গদ্যকার্টুন কলামে লেখকের আসল নামও আমি প্রকাশ করতে চাইনি। কিন্তু তাজুল হক ছিল নাছোড়। শিশির ভট্টাচার্যের কার্টুন ও প্রচ্ছদ দিয়ে সে 'গদ্যকার্টুন' নামের বইটি ১৯৯৩ সালের বইমেলায় এতো সুন্দর করে বের করেছিল যে, কী বলবো— আমার নিয়তি স্থির হয়ে গেলো।

এঁদের সকলকে কৃতজ্ঞতা। আর আসল কৃতজ্ঞতা আমার পাঠকদের। আমি গদ্য-পদ্য যাই লিখিনা কেন, তাঁরা পড়েন এবং কিনে পড়েন।

কেউ কেউ অবশ্য বলেনও যে, আগের মতো হচ্ছে না। আসলে কিছুই আগের মতো হয় না। তবু একথা বললে স্বীকার করেই নেওয়া হয়, আগে আমি ভালোই লিখতাম।

তাহলে এই সেই বই, যা পড়লে আপনি জানতে পারবেন, আগে আমি কেমন লিখতাম। প্রিয় পাঠক, আপনার মঙ্গল হোক, মঙ্গল হোক আমাদের এ-দেশটার।

আনিসুল হক
এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
২১ নভেম্বর ১৯৯৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সূচি

গদ্যকার্টুন বিষয়ে আমার ভাবনা বা একটি আদর্শ রম্যরচনা/৯
গদ্যকার্টুন/১৫
কথাকার্টুন/১০৫
গণতান্ত্রিক ফ্যান্টাসি/১৮১
রাজা যায় রানি আসে/২৬১
ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে/৩৪৫
দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গদ্যকার্টুন বিষয়ে আমার ভাবনা বা একটি আদর্শ রম্যরচনা

অন্যদিন পত্রিকাটি খুব সুন্দর হয়। এর প্রচ্ছদটা সুন্দর হবে,এতে তেমন বাহাদুরি পত্রিকার কর্মীদের নেই, কারণ প্রচ্ছদে যে মুখগুলো ছাপা হয়, তারা সুন্দর হয়েই জন্মেছেন। সমস্ত কৃতিত্ব আল্লাহতা'লার, প্রসাধন সামগ্রী উৎপাদকের এবং রূপচর্চাবিজ্ঞানের। কিন্তু অন্যদিন পত্রিকার ভেতরের মেকআপ-গেটআপ যে সুন্দর হয়, তার কৃতিত্ব কোনো বিউটিশিয়ানের নয়, পত্রিকার সম্পাদকের। রূপঝলমলে এমন একটা পত্রিকায় লিখতে কার না সাধ হয়! আমার মতো সৌন্দর্যপ্রেমিক 'জুবকের' সাধ যে আরেকটু বেশি হবে, তাতো খুবই স্বাভাবিক।

'জুবক' শব্দটার একটা ব্যাখ্যা দিতে হয়। কবি হুমায়ুন আজাদ একবার ঢাকার বাইরে গেছেন কবিতা-টবিতা পড়তে। তার সঙ্গে গেছেন বছর ৩৫-এর এক তরুণ কবি। ক্লাসফেমি হয়ে যাবে বলে আমি এই তরুণ কবির নাম বলবো না। সকালবেলা তরুণটি গেলো হুমায়ুন আজাদের কাছে। বললো, 'স্যার, আপনার কাছে টুথপেস্ট হবে?'

হুমায়ুন আজাদ বললেন, 'টুথপেস্ট দিয়ে কী করবে ? ব্রাশ এনেছো ?'

'না, স্যার।'

'তাহলে কি এরপর জিজ্ঞেস করবে, স্যার, আপনার কাছে ব্রাশ আছে ?'

'সেটা কি ঠিক হবে স্যার ?'

হুমায়ুন আজাদ খেপে গেলেন। বললেন, 'তুমি কখনো সঙ্গম করেছো ?'

তরুণ লজ্জিত ভঙ্গিতে বললো, 'একবার করেছি স্যার।'

'শোনো, তোমাকে যুবক বলা হলে যুবসমাজের অপমান। এখন থেকে তোমার জন্যে যুবক বানান পাল্টে দেয়া হলো। তুমি হচ্ছো একজন জুবক। তোমার মতো জবুথবু লোককে জুবক বলা উচিত, বুঝেছো।'

সুন্দর পত্রিকায় লিখেই যাকে সৌন্দর্য-পিপাসা নিবৃত্ত করতে হয়, তাকেও জুবক বলাই সঙ্গত।

মানুষ অন্তর থেকে যা চায়, তাই পায়। 'অন্যদিন'-এ লেখার সুযোগও আমার জীবনে এসে গেলো। ঈদসংখ্যার জন্যে ওঁরা আমার লেখা চান। আমি বললাম, 'ঠিক আছে লিখবো। কবিতা লিখবো।'

ওরা তাড়াতাড়ি বললেন, 'না না, কবিতা না, গদ্য।'

আমি বললাম, 'ঠিক আছে, গল্প দেবো।'

'না না, গল্প না, গল্প আমাদের অনেক আছে।'

আমি মুশকিলে পড়লাম। ওরা আসলে কী চাইছেন ? মুশকিল আহসান করে চিঠি এলো। 'জনাব আনিসুল হক, অন্যদিন ঈদসংখ্যায় আপনার একটি রম্যরচনা আমাদের অগ্রসর পাঠকের চাহিদা পূরণে সমর্থ হবে বলে মনে করি।'

তাহলে ওঁরা আমার কাছে চান রম্যরচনা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমি বললাম, ঠিক আছে, লিখে দেবো।

আমি লেখালেখির ব্যাপারে কোনোদিন 'না' বলিনি। অনুরোধে আমি জীবনে বহু ঢেঁকি গিলেছি। ঢেঁকি গেলা খুব সহজ। পানি দিয়ে ক্যাপসুল গেলার মতো গিলতে হয়। আমি এ পর্যন্ত অনুরোধে সাড়া দিয়ে রাজনীতিবিদের বক্তৃতা, প্রধান অতিথির বাণী, গায়ে হলুদের গান, ভোট প্রার্থীর লিফলেট, বিতর্কের স্ক্রিপ্ট, মঞ্চ-নাটক, প্যাকেজ নাটক, বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস্টার্স পরীক্ষার্থিনীর থিসিস, ক্লাস টেনের ছাত্রের রচনা-প্রতিযোগিতার রচনা, বিজ্ঞাপনের স্ক্রিপ্ট, ক্যাসেটের জন্যে গান, এমনকি একটা সিনেমার (হোক না তা স্বল্পদৈর্ঘ্য) পাণ্ডুলিপি পর্যন্ত লিখেছি। ছেলেবেলায় একজনের হয়ে প্রেমপত্রও লিখে দিয়েছিলাম, তথাপি হাতের লেখা নিয়ে কোনো বিপদ-আপদ হয়নি। সুতরাং অন্যদিনকে 'না' বলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কিন্তু লিখতে বসে দেখি, সমূহ বিপদ। রম্যরচনা তো এর আগে আমি কখনো লিখিনি। আমি বিভিন্ন পত্রপাত্রিকায় যা লিখি সে-সব বিদ্রূপ-রচনা, ব্যঙ্গ—আমি যার নাম দিয়েছি গদ্যকার্টুন। কিন্তু বিদ্রূপ আর রম্যরচনা তো এক নয়। এক হতে পারে না।

'রম্য' শব্দের অর্থ, অভিধানে—রমণীয়, মনোরম। আর রমণীয় শব্দের অর্থ রম্য, মনোরম। এ যে দেখছি অভেদ্য চক্রে পড়ে গেলাম। রম্য মানে রমণীয় আর রমণীয় মানে রম্য। তাহলে উৎস খোঁজা যাক। রম্য শব্দটি এসছে রম থেকে। রম-এর একটা অর্থ মদন। মদন হলেন প্রেম ও কামের দেবতা। কাজেই রম্যরচনার একটা অর্থ হলো সেই রচনা, যাতে প্রেম ও কাম যুক্ত থাকবে।

প্রেম ও কাম নিয়ে রচনা লিখবো আমি ? তাহলে ইমদাদুল হক মিলন ও আবুল খয়ের মুসলেহউদ্দিন কী লিখবেন ?

আভিধানিক অর্থ বিবেচনা করে বেশি সুবিধা করতে পারলাম না।

অবশেষে সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'পরম রমণীয়' বই নিয়ে বসতে হলো। এই বইয়ে রম্যরচনার একটা সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, "ইংরেজি আর ফরাসিতে যা Belles-letters, তা-ই বাংলায় রম্যরচনা। 'ব্যক্তিগত প্রবন্ধ' বা 'লঘু নিবন্ধ'ও বলেন কেউ কেউ। সৈয়দ মুজতবা আলি বলতেন 'মঞ্জুভাষা'। নাম যা-ই হোক, জিনিসটি কিন্তু নতুন কিছু নয়। সেই কোন্ কালে বাংলা গদ্যকে যিনি সাহিত্যের অঙ্গনে হাজির করেছিলেন, সেই বিদ্যাসাগর মশায়ের হাতেই এর জন্ম। তারপর প্রায় দেড়শ বছর কাটল, এই দীর্ঘ সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আজ অবধি কত রথীমহারথী বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারটিকে পুষ্ট ও পূর্ণ করে গেছেন এবং এখনও যাঁরা করে চলেছেন, তাঁদের প্রায় সকলেরই স্নেহ-প্রশ্রয় পেয়েছে শরৎ-আকাশের লঘুপক্ষ সঞ্চারী নিরুদ্দেশ মেঘের মতো হালকা অথচ রমণীয় এই ঘরানার রচনা।" এই বইয়ে প্রমথ চৌধুরীর 'বর্ষা' প্রবন্ধটিকেও ঠাঁই দেয়া হয়েছে 'রম্যরচনা' বলে। কাজী নজরুল ইসলামের 'আমার সুন্দর'ও এদের কাছে রম্যরচনা।

প্রমথ চৌধুরী 'বর্ষা' প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন পদ্য আর কবিতার পার্থক্য। করেছেন ব্যক্তিগত কথা বলতে বলতে, বেশ হাল্কা চালে। আমিও আমার রচনাটিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রচুর নিজের কথা বলছি, এবং কথার ফাঁকে ফাঁকে 'রম্যরচনা' আর 'বিদ্রূপরচনা'র পার্থক্য খুঁজছি। সুতরাং সম্পাদক মানুন আর না-মানুন, তারা এই রচনাটি ছাপুন আর না-ছাপুন, এটি একটি আদর্শ রম্যরচনা হয়ে উঠছে।

রম্যরচনার সংজ্ঞা খোঁজা থেকে আমরা কিছুক্ষণের জন্য বিরতি দেবো। বাকি অংশ বাংলা খবরের পর। এই ফাঁকে আমরা কতোগুলো পরিভাষা নিয়ে কচলে দিবো। যেমন ধরা যাক উইট (wit)। উইট কী জিনিস ? ইমানুয়েল কান্ট-এর সংজ্ঞা: 'কোনো একটি প্রত্যাশা যখন হঠাৎ করে 'কিছুই না'-তে মিলিয়ে যায়, তখন যে হাসিটার জন্ম হয় তাই হলো উইট।' অবশ্য আরো ভালোভাবে বলা যায়, 'হঠাৎ করে কোনো প্রত্যাশার পূরণ, যেভাবে পূরণ হবে বলে আমরা মোটেও আশা করিনি।' উদাহরণ, 'ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে নিজেকে। আর ইতিহাসবিদরা পুনরাবৃত্তি করে একজন আরেকজনকে।'

গোপাল ভাঁড়কে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার সঙ্গে একটা গাধার তফাৎ কতোদূর ?' গোপাল ভাঁড় তার আর রাজার মধ্যকার দূরত্বটা হাতে মেপে বললো, 'তিনহাত, মহারাজ।' এটা উইট কিনা, আমি অবশ্য জানি না।

হিউমারটা কী বস্তু ? বলা হচ্ছে, উইট সবসময়ই উক্তি; কিন্তু হিউমার উক্তি, ভাব, চলাচল, নীরবতা—যে-কোনো কিছু হতে পারে। যেমন চার্লি চাপলিন তাকালেও মনে হয় হিউমারাস। উইটে সবসময়ই বক্তার ইচ্ছাটা থাকবে রঙ্গ করা; কিন্তু হিউমারে কর্তার ইচ্ছা হয়তো সিরিয়াস কিছু বলা, কিন্তু পাঠক-দর্শক-শ্রোতারা মজা পাচ্ছে।

এখান থেকে এক লাফ দিয়ে যাই কমেডিতে। কমেডি হাস্যরসের উদ্রেক করে এবং হাস্যরসেই শেষ হয়ে যায়। উইট, হিউমার সবই থাকে কমেডিতে। আর স্যাটায়ার ? স্যাটায়ার শেষ হয় না। স্যাটায়ারও রঙ্গ করে, কিন্তু শেষে দেখা যায় এই হাস্যরস হলো অস্ত্র, সে-অস্ত্র আঘাত করতে চাইছে অন্য কোনো বিষয়কে। ওই উপহাস্য বিষয়টি হতে পারে কোনো ব্যক্তি, কোনো শ্রেণী, কোনো প্রতিষ্ঠান, কোনো জাতি। এমনকি লক্ষ্য হতে পারে পুরো মানবগোষ্ঠী, যেমন করেছিলেন সুইফ্‌ট, তার গালিভার্স ট্রাভেলস-এর বুক ফোরে।

এইসব সংজ্ঞা-চর্চা দেখে যে-কেউ আমাকে বেশ শিক্ষিত বলে ভুল করতে পারেন এবং আমার ভুলগুলো ধরিয়ে দিয়ে আমাকে অশিক্ষিত প্রমাণ করার জন্য ভুলক্রমে কেউ কেউ উঠেপড়ে লাগতে পারেন। নিজের খেয়ে, এক পয়সা ব্যাংকঋণ না নিয়ে আমি কেন শত্রু সৃষ্টি করতে যাবো ? সুতরাং বলে রাখি এই উইট-হিউমার সব ম্যাকমিলান প্রকাশিত 'এ গ্লোসারি অফ লিটেরারি টার্মস' (এম.এইচ. আব্রাহামস প্রণীত) থেকে টুকলিফাই করেছি।

ওই নীরস বই থেকে এবার আমরা একটা সরস বইয়ে যাবো। মিলান কুন্ডেরা। আমার সবচেয়ে প্রিয় লেখকদের একজন এখন। কুন্ডেরা তার 'দি আর্ট অফ দি নভেল' বইয়ে ৬৩টা শব্দের অর্থব্যাখ্যা করেছেন (নিজে যা বোঝেন আর কী!)। এর মধ্যে 'কমিক' সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : 'মানুষের মহত্ত্ব সম্পর্কে মধুর বিভ্রান্তি ছড়িয়ে ট্রাজিক আমাদের দেয় সান্ত্বনা। কিন্তু কমিক নিষ্ঠুরতর। কমিক বুঝিয়ে দেয় সবকিছু কতো অর্থহীন। যারা আমাদের দারুণ হাসান, তারাই কমিকের প্রতিভাবান স্রষ্টা নন বরং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তারাই হলেন বড়ো প্রতিভা, যারা কমিকের কোনো নতুন রাজ্য উন্মোচন করেন। ইতিহাসকে সবসময় একটা সিরিয়াস এলাকা হিসেবে গণ্য করা হয়ে আসছে। কিন্তু ইতিহাসে আছে অনাবিষ্কৃত কমিক-সাউড। যেমন যৌনতার আছে কমিক-সাইড।' যৌনতার যে কমিক-সাইড আছে, সেটা বোঝার জন্যে কুন্ডেরার বইগুলো আমরা পড়ে দেখতে পারি। লাফটার সম্পর্কে কুন্ডেরা লিখেছেন, ১৮ শতকে আনন্দ আর কমিক ছিল একই জিনিস। উনিশ শতকে গোগল বললেন, 'আমরা মজার গল্পগুলোকে যতো দীর্ঘসময় ধরে ও যতো মন দিয়ে লক্ষ্য করি, ততোই এগুলো দুঃখের হয়ে পড়ে।' বিশ শতকে এসে আয়োনেস্কো বললেন, 'কমিক আর ভয়াবহের মধ্যের রেখাটি খুবই সরু।' ইউরোপের ইতিহাস থেকে লাফটার (হাস্য) উঠে গেলো। হাস্য ব্যাপারটা আমাদের জীবিত মহৎদের কল্যাণে এদেশ থেকেও যাই যাই করছে। আমাদের দেশে অনেক মহৎ লেখক আছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এরা সবাই চিরজীবী হবেন, মহাকালের র‍্যাঁদা এঁদের ঘষে দিতে পরবে না। এঁরা আজ থেকে আড়াই হাজার বছর পরেও বেঁচে থাকবেন। কারণ এদের কেউ লেখেন সমাজ-বাস্তবতা নিয়ে, কেউ লেখেন ফ্রয়েডিয় দর্শন নিয়ে। এক লেখককে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, আপনার উপন্যাসের সাবজেক্ট কী ? উনি বললেন 'বিমূর্ত।' বিমূর্ততাও উপন্যাসের বিষয় কারো কারো !!!

আমি দিব্য-চোখে দেখতে পাই, ফ্রানৎস কাফকা এদেশে জন্মেছেন এবং তার 'ট্রায়াল' নিয়ে কিংবা 'মেটামরফসিস' নিয়ে লোকে হাসাহাসি করছে। বলছে, ছি ছি, ভাষা এতো সোজা কেন ? এর মধ্যে ইঙ্গিতধর্মিতা কই ? বলছে, সমাজ কই, রাষ্ট্র কই? কোন্ সমাজের ঘটনা—শায়েস্তা খানের আমলের নাকি আয়ুবখানের, বোঝা যাচ্ছে না কেন ? কাফকা তো কুন্ডেরা নন। কাফকা নিজের লেখা বন্ধুকে দিয়ে বলেছিলেন নষ্ট করে ফেলতে। তিনি তে আর কুন্ডেরার মতো জবাব দিতে পারতেন না 'ঔপন্যাসিক ইতিহাসবিদ বা ভবিষৎবিদ নন, তিনি অস্তিত্বের পরিব্রাজক মাত্র।' 'The novelist is neither historian nor prophet : he is an explorer of existence'.

যা হোক, ইউরোপ থেকে হাস্য উঠে গেলো, কিন্তু এতো ভঙ্গ বঙ্গদেশ, তবু রঙ্গ ভরা। ভাবতে ভালো লাগে, আমাদের প্রথম উপন্যাস 'আলালের ঘরের দুলাল', আমাদের ছিলো 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা।' হুতোম (কালীপ্রসন্ন সিংহ) লিখেছেন, "যে সকল মহাত্মারা ছেলেবেলা কলকেতার চীনেবাজারে 'কম স্যার! গুড শপ স্যার! টেক্ টেক্ নটেক্ নটেক, একবার তো সি।' বলে সমস্ত দিন চিৎকার করে থাকেন..." ইত্যাদি। তা পড়ে মনে হয় এ যে আস্ত ঢাকার ফুলবাড়িয়ার বঙ্গবাজার হকার্স-মার্কেট।

এবার আরেকটু জ্ঞানবিদ্যা ফলাতে হচ্ছে। আমি জানি, আমার পাঠক বিরক্ত হতে শুরু করছেন। হাই উঠছে। তবুও জিজ্ঞেস করি, বাংলা উপন্যাসে কী এমন ঘটলো যে বিষণ্নতা এসে ভর করলো তাতে ? দেবেশ রায় 'সময় ও সমকাল' বইয়ে উপন্যাসচিন্তা প্রবন্ধে লিখেছেন: 'বাংলা সাহিত্যর ছোট সীমায় নববাবু, নববিবি, আলাল-দুলাল, নিমচাঁদ, বুড়ো শালিখ, ইত্যাদি অনেকদূর এসেছিল— প্রায় যেন ইয়োরোপীয় পিকারোস্করই নায়ক। কিন্তু এরা টিকতে পারল না। কমলাকান্তে এরা সবাই এক হয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গিয়ে বাংলা কাহিনী থেকে চলে গেল। বোধহয় তাই কমলাকান্তও অনির্দিষ্ট থাকল—উপন্যাস আর রম্যরচনার মাঝখানে।

তারপর থেকে বাংলা উপন্যাসে বিষাদখিন্ন নায়কের চলাফেরা। তার জীবনে চরম হাস্যকর কিছু ঘটে না। কারণ নিজেকে পাছে হাস্যাস্পদ করে ফেলে এ নিয়ে তার সাবধানতার শেষ নেই। এই নায়কের একজন ওপরঅলা আছেন—কখনো জিলার ম্যাজিস্ট্রেট, কখনো কুঠির সাহেব। তার সামনে অপদস্থ হওয়ার চাইতে এ নায়ক মৃত্যুও মেনে নিতে পারে। এ নায়ক নিজেও হাসে না, অন্যকেও হাসায় না; তাকে নিয়েও হাসাহাসি পছন্দ করে না। নাগরিক সমাজ থেকে সরে এসে এ নায়ক আশ্রয় নিয়েছে বর্ণহিন্দু সমাজের নিরাপদ চৌহদ্দিতে।'

অর্থাৎ কিনা লেখক নিজেকে নিয়ে রসিকতা করতে ভয় পেলেন। নিজেকে বেশ দশাসই নায়ক বানিয়ে ফেললেন। শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা!

হয়তো অন্যভাবেও বলা যাবে। আমরা আধুনিক হয়ে পড়লাম। নিখিল নির্বেদ পেয়ে বসলো আমাদের। 'শার্ল বোদলেয়ার : তাঁর কবিতা'র ভূমিকায় বুদ্ধদেব বসু লিখলেন, 'রূপসী ও বিষাদময়ী সমার্থক, এবং যে-নারী চুম্বনযোগ্য তার চোখ অশ্রুতে মলিন।' নারীকে চুম্বনযোগ্য হয়ে ওঠার আশায় চোখ কচলে পানি ফেলতে হলো আর তাকে চুম্বন করবে যে পুরুষ, সে কি দাঁত বের করে রাখবে নাকি! সেও হায়-হায় করতে লাগলো। ব্যস, শুরু হলো বাংলা সাহিত্যে বিষণ্নতার যুগ—আধুনিকতার যুগ।

এই বাংলাদেশে হাসি এখন রোগের নাম। যে হাসে, সে বোকা; যে হাসায়, সে হলো এক সমাজবিরোধী ব্যক্তি, আসরে তার কল্কি জোটে না। বর্ণবাদী সমাজে যেমন হরিজনদের জন্যে থালাবাসনপেয়ালা আলাদা, রেস্তরাঁ থেকে পয়সা দিয়ে চা কিনে তাকে যেমন নিজ পেয়ালায় ঢেলে নিয়ে রাস্তায় বসে খেতে হয়; যারা হাস্য-লাস্য-রঙ্গ-ব্যঙ্গ করেন—তাদের এখন সেই হাল। রম্য-লেখক এখন বাংলাদেশে এক অপরাধীর নাম। অবস্থা এমন যে কোন্‌টা রঙ্গ আর কোন্‌টা ব্যঙ্গ, কোন্‌টা কৌতুক আর কোন্‌টা বিদ্রূপ, তাও আলাদা করার লোক নেই।

অথচ দেখুন রবীন্দ্রনাথকে। এমন মহারসিক আর কে আছে বাংলা সাহিত্যে। দেখুন বঙ্কিমচন্দ্রকে, জনক নিজেই কতো সরস ছিলেন। আর মনে করুন শরৎচন্দ্রকে। মনে করুন নতুনদাকে, মনে করুন মেজদার 'থুতু ফেলা', 'নাকঝাড়া'র চিরকুটগুলোকে—শুধু নাকের পানি চোখের পানি তার সাফল্যের চাবিকাঠি নয়। চরিত্র ও পরিবেশ বর্ণনায় হিউমারাস হওয়ার গুণও শরৎ-সাফল্যের একটা বড়ো কারণ। যাহোক, দেবেশ রায়ের পর্যবেক্ষণ—আমাদের রম্যরচনা হোটেল-বাল্যবিবাহ-বিয়েপাগলবুড়োর বাইরে যেতে পারলো না; আঘাত করতে পারলো না উপনিবেশকে, উপনিবেশবাদীকে, রাষ্ট্রকে; আমরা শেয়ালের ঠ্যাং ছেড়ে ধরলাম তার লাঠিকে—এই পর্যবেক্ষণ কিন্তু নির্ভুল। আবার এর বাইরে যাওয়া কিন্তু সত্যি কঠিন। চিরায়ত কিছুই তো লিখছো না, বিয়ে-দাম্পত্য-ঘরজামাই-মাছের বাজার-যানজট-অফিস-কেরানি-ঘটক-শেয়ার বাজার নিয়ে লেখো না কেন ? এই উপদেশ শুনতে শুনতে আমার দুকান ঝালাপালা হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এসব উপদেশের জবাবে বলতে পারি—তো মশায় আপনি আমাকে লিখতে বলছেন কেন, নিজেই লিখুন না। অবশ্য উপদেশদাতার উপদেশের শেষে যুক্ত থাকে—না, মানে, তোমার মধ্যে একটা সম্ভাবনা দেখেছিলুম কিনা।

কী সম্ভাবনা দেখেছিলেন ? কেন মনে হয়েছিলো এই ছেলেটাকে দিয়ে হতে পারে! ছেলেটাকে সম্ভাবনাময় মনে হতো না, যদি সে রঙ্গব্যঙ্গ করতো মেসজীবন, দাম্পত্য-সমস্যা আর বিয়েপাগলাবুড়ো নিয়ে, লিখতো যেমনটা আপনি এখন ফরমায়েশ দিতে চান। মনে হয়েছিলো, কারণ, এই ছেলেটা লাঠি ছেড়ে দিয়ে সরাসরি শেয়ালের ঠ্যাং ধরেছিলো। প্রবল সামরিক শাসনের দিনে জরুরি অবস্থার মধ্যে শাসকের নাম ধরে বলেছিলো—ও ভণ্ড, তুমি সরে দাঁড়াও, আমাদের কোনো জেনারেল-উদ্ধারকর্তার দরকার নেই; আর আলপিনে আলপিনে অস্থির করে তুলতে চেয়েছিলো সমরশাসকের সুযোগসন্ধানী সহযোগীদের। এখনো ছেলেটা জানে—দালান উঠছে সেও রাজনীতি, দালান ভাঙছে সেও রাজনীতি; বিদ্রূপ যদি করতে হয় শোষণের হাতিয়ার রাষ্ট্রযন্ত্র আর ক্ষমতা আর ক্ষমতাবানদের করাই শ্রেয়। এবং সে জানে, ক্ষমতার চক্র থেকে বেরিয়ে কোনোদিনই মুক্তি পাবে না মানুষ, কিন্তু প্রকৃত প্রগতিশীলের কাজ ক্ষমতাবৈধতাকে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ করে যাওয়া। (শেষের কথাটায় আমি আত্মসাৎ করলাম মিশেল ফুকোর সুর)। সে এও জানে, এসব লেখার কোনো চিরায়ত মূল্য নেই, এসব সময়ের বুদ্বুদমাত্র, ফলে সুকান্তর সান্ত্বনাই সে নিজেকে বারবার জানায়: 'ইতিহাস নেই অমরত্বের লোভ, আজ লিখে রাখি আজকের বিক্ষোভ।'

ক্ষমতা, রাষ্ট্র, শাসক, রাজনীতিকেরা কি সামান্যও আহত হয় একজন সামান্য লেখকের, একটা সামান্য সাপ্তাহিকের কোনো ক্ষুদ্রাকৃতি লেখায় ? এই প্রশ্নের জবাবে আমি একটা গল্প বলবো। একবার এক ঘুমন্ত বাঘের ওপর চড়াও হয় এক বাঁদর। বাঁদরটা বাঁদরামি করে ফেলে, করে ফেলে এক পাশবিক কর্ম। বাঘের শ্লীলতাহানি ঘটায়। বাঘের ঘুম ভেঙে যায়। কী, সামান্য এক বাঁদর কিনা আমার ইজ্জত লুটে নিলো! বাঘ ভীষণ তর্জন-গর্জন করতে করতে ধাওয়া করে বাঁদরটিকে। আত্মরক্ষার্থে বাঁদর পালাতে থাকে। বাঁদর ছুটছে, বাঘও ছুটছে। বাঁদরটা বন ছেড়ে ঢুকে পড়ে জনপদে। বাঘও। বাঁদর উপায় না দেখে একটা অফিসকক্ষে প্রবেশ করে। ভাগ্য ভালো, অফিসার তখন টেবিলে ছিলেন না। বাঁদর টেবিলের অপর পারে শূন্য চেয়ারে বসে পড়ে এবং টেবিলের ওপর পড়ে থাকা সংবাদপত্র তুলে নিয়ে নিজেকে আড়াল করে, ভাবখানা এমন, এক অফিসার সংবাদপত্র পড়ছে। এমন সময় বাঘও ঢুকে পড়ে এই ঘরে। বাঘ জিজ্ঞেস করে, 'ভাই, এখানে কি কোনো বাঁদর ঢুকেছে ?' 'কোন্ বাঁদর ?' বাঁদর গলার স্বর পাল্টে বলে, 'যে বাঁদরটা একটা বাঘের উজ্জত লুটেছে ?'

'সর্বনাশ', বাঘ বলে, 'এই খবর কি সংবাদপত্রে ছাপা হয়ে গেছে ?'

বাঘ সরাসরি ঘর ছেড়ে বেরোয়। এবং দৌড়ুতে দৌড়ুতে বনে ফিরে আসে।

ঈদ সংখ্যা, অন্যদিন, ১৯৯৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গদ্যকার্টুন

প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩
রচনাকাল ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯২ সাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মধ্যলোকে চন্দ্রালোক

এক.

শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর পাইপটি ঠোঁটে চেপে ধরলেন। টোব্যাকো প্যাক খুললেন তামাকের জন্যে। তামাক নেই, শেষ হয়ে গিয়েছে। তিনি বিরক্তি বোধ করলেন। ঠোঁটে পাইপ অথচ তামাক নেই। এই ব্যাপারটি তিনি সহ্য করতে পারেন না। ডাকলেন, 'ওয়েটার'।

ওয়েটারটি ধারেকাছেই ছিলো। স্যার, কিছু কি চাইছেন ?

মুজিব তাঁর পাইপটি টেবিলের ওপর রাখলেন। একটু জোরেই রাখলেন। বোঝা যাচ্ছে, তিনি বেশ রেগে আছেন। বললেন, তামাক ভরে দাও।

স্যার, আজ মঙ্গলবার। আজ তামাক আনা যাবে না। আগামীকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

শেখ মুজিব উত্তেজনায় তাঁর চশমাটা খুলতে চাইলেন। হাত কানের কাছে চলে গেলো। কিন্তু তাঁর চোখে চশমা নেই। এই মধ্যলোকে কারো চোখে চশমা থাকে না। ইহলোকের হিশেবে ষোলো বছর হলো তিনি এ মধ্যলোকে আছেন। কিন্তু তাঁর পুরাতন অভ্যাসটি এখনও যায়নি। স্বভাব যায় না ম'লে কথাটি পৃথিবীর মানুষেরা ঠিকই বলে।

তিনি ওয়েটারটির দিকে তাকালেন। তাঁর মনে হলো কষে একটা চড় মারেন। কিন্তু তিনি মারলেন না। ওয়েটার চিজটি খুবই আজব। অনেকটা রোবট। না পুরুষ, না নারী। একে মেরে কোনো লাভ নেই। রাগ কমাবার জন্যে তিনি মনে মনে তিনবার গালি দিলেন : শাহ আজিজ, শাহ আজিজ, শাহ আজিজ।

তাঁর রাগ অনেকটা কমে গেলো। ইসলামিয়া কলেজে থাকাকালীন তিনি ও শাহ্ আজিজ একই 'বেকার হোস্টেলে' থাকতেন। মুসলিম লীগ করতেন। নির্বাচন উপলক্ষে ঐ বদমাশটার সঙ্গে তাঁকে ফরিদপুর যেতে হয়েছিলো। ফরিদপুরেই শাহ্ আজিজকে তিনি আচ্ছামতো মার দিয়েছিলেন। হাত খুলে ধোলাই। এ মধ্যলোকে রাগ কমাবার জন্যে তিনি 'শাহ আজিজ' বলে গালি দেন। মহৌষধি। হাতে হাতে ফল।

শেখ মুজিব জানেন, অধিকার আদায় করে নিতে হয়, কেউ কাউকে দেয় না। ইসলামিয়া কলেজের কথা এসে পড়ায় তাঁর নানা স্মৃতি মনে এলো। বেকার হোস্টেলের সুপার ছিলেন সাইদুর রহমান। হোস্টেলের ডাইনিং-এ সবার জন্যে এক পেয়ালা তরকারি ছিলো। কিন্তু তাতে তার খাওয়া হয়ে উঠতো না। তিনি জোর করেই দু-পেয়ালা তরকারি নিতেন। ছাত্ররা গিয়ে অভিযোগ জানালো সাইদুর স্যারের কাছে। সাইদুর স্যার পিয়ন দিয়ে ডেকে পাঠালেন তাঁকে। 'তুমি নাকি দু-জনের তরকারি একাই খেয়ে ফেলো ?'

— জি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

: তুমি কি জানো না এটা একটা অপরাধ ? এটা তোমার করা ঠিক না ?

— স্যার, আমি জানি কাজটা ঠিক না। কিন্তু কী করবো। আমার যে এক পেয়ালাতে পোষায় না।

: শোনো। তোমার কথা শুনে আমার আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটনের কথা মনে পড়ে গেলো। তিনিও নিঃসংকোচে তাঁর পিতার কাছে অপরাধ স্বীকার করেছিলেন চেরীগাছ কেটে ফেলে। যাও, তোমার জন্যে দু-পেয়ালাই বরাদ্দ করা হলো। চাহিদা যখন দু-পেয়ালা, তখন ফাইন করেও তো তোমাকে আটকানো যাবে না।

মর্ত্যলোকে তাঁর পাওনা থেকে কেউই তাঁকে বঞ্চিত করতে পারেনি। মধ্যলোকে এসেই তিনি হট্টগোল বাধিয়ে ফেললেন। পাইপ ও টোব্যাকো চাই। তাঁরা যে পল্লিতে আছেন, তার প্রধান একজন দেবদূত। রক্ষীরা তাঁকে ধরে নিয়ে গেলো দেবদূতের সামনে।

: তুমি গোলযোগ করছো কেন ?

— আমার পাইপ আর তামাক দরকার। এক্ষুনি চাই।

: এটা মর্ত্যলোক নয়, মধ্যলোক। এখানে মানুষের সব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না।

— আমারটা পূরণ করতেই হবে।

: ঠিক আছে, তোমাকে পাইপ খেতে দেয়া হবে। এটি আনিয়ে নিতে হবে মর্ত্যলোক থেকে। মধ্যলোকে এ জিনিসটি নেই। কিন্তু একটি শর্তে। তুমি এরপর আর কোনো কিছুর জন্যে গোলযোগ করতে পারবে না। শেখ মুজিব সেদিন রাজি হয়েছিলেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আন্দোলন করে যখন দাবি আদায় একবার করা গেছে, তখন বারবার করা যাবে। শুধু সময় বুঝে ঘিয়ে অগ্নিসংযোগ করলেই হলো।

দুই.

ঘুম থেকে উঠেই জিয়া খবরের কাগজের তৃষ্ণা অনুভব করলেন। মধ্যলোকে সকাল হয় না, রাত্রিও হয় না। তবুও মর্ত্যলোক থেকে আসা মানুষেরা এখানে প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় একবার ঘুমুতে যায়। ঘুমের মধ্যে স্বপ্নও দেখে। আজ জিয়ার ঘুম ভালো হয়নি। নানা ধরনের ছেঁড়াখোড়া স্বপ্ন ঘুম জমতে দেয়নি। এখনও স্বপ্নে দেখা পুতুলের মুখ তাঁর চোখে ভেসে উঠছে। স্বপ্নে ঠিক কী কী দেখেছেন, তিনি মনে করতে পারলেন না। তাঁর মনটা ভারী হয়ে এলো।

খবরের কাগজ পড়ার তৃষ্ণাটা তীব্র হয়ে উঠলো। কিন্তু তাঁকে খবরের কাগজ দেওয়া হয় না। মধ্যলোকে কাউকেই সংবাদপত্র দেওয়ার নিয়ম নেই। নিয়মের প্রশ্ন উঠলেই এসে যায় নিয়ম-ভঙ্গের কথা। একজনকে সংবাদপত্র ঠিকই দেয়া হয়। তিনি শেখ মুজিবুর রহমান। মর্ত্যলোক থেকে যারা আসে তাদেরকে বিভিন্ন পল্লিতে রাখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হয়। দুনিয়ার কারাগারে যেমন রাজবন্দিদের জন্যে আলাদা ডিভিশন দেয়া হয়, মধ্যলোকেও অনেকটা সেরকমই। তবে ভাগ করা হয় দেশ ও কাল অনুযায়ী। সে রীতি অনুসারে বাংলাদেশের বড় বড় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা একই পল্লিতে পাশাপাশি এপার্টমেন্টে থাকেন। নিজেদের মধ্যে সাধারণত কোনো যোগাযোগ হয় না। অধিবাসীরাই প্রয়োজন মনে করে না। কিন্তু জিয়া যান মুজিবের এপার্টমেন্টে। প্রধান কারণ খবরের কাগজ পড়া। এছাড়াও মুজিবের কাছে তাঁর ব্যক্তিগত কিছু ঋণ আছে। '৭২ সালে মুক্তিযুদ্ধের পরে কিছুদিন জিয়া খুব মানসিক অশান্তিতে ছিলেন, সংসারে মন বসাতে পারছিলেন না। কিছুই তাঁর ভালো লাগছিলো না। একাত্তরে যুদ্ধের সময় তিনি অন্য কোনো দিকে ভাবার সময় পাননি। একজন দেশপ্রেমিক যোদ্ধার মতোই লড়ে গেছেন। যুদ্ধ শেষ হতেই তিনি তাঁর নিজের কথা ভাবার অবকাশ পেলেন, নানা প্রশ্ন তাঁর মাথায় উঁকি ঝুঁকি দিতে লাগলো। নানা সন্দেহ। খুবই ব্যক্তিগত সেই সমস্যা। কী করবেন, স্থির করতে পারছিলেন না। শেখ মুজিব ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন। একদিন নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন—পাগল, এতোসব ভাবনার কী আছে ? সংসারে মন বসা। ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে দেশের স্বার্থ অনেক বড়ো।

: গুড মর্নিং, কাগজ দেখতে এলাম।

— সকাল-সন্ধ্যা কিছু নাই, গুডমর্নিং, হা-হা-হা, বসো। তোমারে ওরা পেপারটা দেয় না, না ? শোনো। হাংগার-স্ট্রাইক করলাম। তিন দিনের মাথায় পেপার দিয়ে গেলো। হা-হা-হা।

: একটা টেলিভিশন আনিয়ে নিলে ভালো হতো না।

—না, টেলিভিশনের খবরে তো কিছু থাকে না। আগে দেখাইতো আমারে, পরে দেখাইতো তোমারে, এর পরে অই বেডারে।

: তা ঠিক, তবু টিভি বলে কথা। তাছাড়া আপনি তো রঙিন টেলিভিশন দেখেননি। আমি তো টিভি রঙিন করে এসেছি।

— রঙিন-টঙিন বুঝি না, বাপু। খবর পাওয়াই কথা। দেশের খবর ভালো তো কিছু দেখি না। আর পেপারগুলার অবস্থা কী দেখছো। একটা পেপারও হাতে নিতে ইচ্ছে করে না। সব থার্ডক্লাস।

: এখন তো তবু অনেক কাগজ দেখতে পাচ্ছেন। আপনার সময়ে বলুন কী অবস্থা করে ছেড়েছিলেন পত্র-পত্রিকার। কয়টি কাগজ বেরুতো ?

— আমার সময়টা অন্যরকম ছিলো। ভাইবা দেখো অবস্থাটা, চারিদিকে শত্রু। ঘরে শত্রু, বাইরে শত্রু। পাকিস্তানীরা তো আছেই, তারওপর আমেরিকা, চীন, সৌদি আরব। চুয়াত্তরে আমার মানুষ খাইতে পারতেছে না। আমি তো চাই নাই, দেশের মানুষ না-খাইয়া থাকুক। কও, তুমি কও, তোমার কি মনে হয় আমি দেশের মানুষের কথা ভুইলা গেছিলাম ?

মুজিব আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তাঁর চোখে জল ছলছল করতে লাগলো। জিয়া বিব্রতবোধ করলেন। তাঁর চোখের পাতা কাঁপতে লাগলো। তিনি তাঁর সানগ্লাসটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রয়োজন অনুভব করলেন। তাঁর মনের অভিব্যক্তি যাতে চোখে এসে ধরা না পড়ে, সে কারণে তিনি বদ্ধ ঘরেও সানগ্লাস পরতেন। বিশেষ করে, সিভিল সার্ভেন্টদের সামনে তিনি ধরা পড়তে চাইতেন না। মুজিবের সামনে এলে তিনি সানগ্লাসের প্রয়োজনটা আরো বেশি-বেশি অনুভব করেন। এই মানুষটি খুবই আবেগপ্রবণ। নিজের আবেগ সহজেই অন্যের মধ্যে সংক্রমিত করতে পারেন। বিরল গুণ।

তিন.

কর্নেল তাহের তাঁর এপার্টমেন্ট থেকে সচরাচর বের হন না। তিনিও ৭ নম্বর পল্লিতেই থাকেন। যাঁরা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার, তাঁদেরকে ৭ নম্বর পল্লীতে রাখা হয়েছে। দুটি ভবন পরেই জিয়া থাকেন। তাহের শুনেছেন তাঁর ওয়েটারের কাছে। পাঁচ নম্বর ভবনে থাকেন শেখ মুজিব। ইচ্ছে করলেই দেখা করা যায়। কিন্তু তাহের কারো কাছেই যান না। নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকেন।

একদিন অবশ্য তাঁর সঙ্গে জিয়ার দেখা হয়ে গিয়েছিলো। ঘুম থেকে উঠে তিনি ঘরের বাইরে বেরিয়েছিলেন। ধবল জোছনার মতো আলো চারদিকে। কিন্তু কোনো চাঁদ বা সূর্য দেখা যায় না। এক ধরনের বৃক্ষ আছে, অনেকটা রঙিন ছাতার মতো দেখতে। মর্ত্যলোকের পার্কে কিংবা সমুদ্রের ধারে যে-ধরনের ছাউনি দেখতে পাওয়া যেতো সেরকম। তাহের বিরক্তি বোধ করছিলেন। খুব বেশি সাজানো-গোছানো চারপাশ। একই দৃশ্যের অর্থহীন পুনরাবৃত্তি। তিনি বলে উঠলেন, 'রাবিশ'। ঠিক তক্ষুনি তাঁর সামনে পড়লেন জিয়া। তাহের চোখ তুলে তাকালেন। জিয়াও।

জিয়ার চোখের পাতা কেঁপে উঠলো। অনুভব করলেন তাঁর কালো সানগ্লাসটির প্রয়োজনীয়তা। তাহেরের চোখ এতটুকুন কাঁপলো না। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর আর হাঁটতে ইচ্ছে করলো না। নিজের ডেরায় ফিরে এলেন। আপন মনেই বিড়বিড় করতে লাগলেন : নিঃশঙ্ক চিত্তের বড়ো কোনো সম্পদ আর নেই। সেই সম্পদ আহরণের জন্যে আমি সকলকে ডাক দিয়ে যাই।

তাঁর মনে পড়ে গেলো মর্ত্যলোকের শেষ দিনটির কথা। সেদিন তার ফাঁসি। ভালো ক'রে শেভ করেছেন। অনেকক্ষণ ধরে গোসল করেছেন। আম খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন তিনি। বড় বড় ফজলি আম দেয়া হয়েছে তাঁকে। নিজে হাতে আম ধুয়ে কেটে খেলেন। পাশে সহবন্দি সহযোদ্ধাদের কেউ কেউ কাঁদছিলো। তিনি কাঁদেননি। কাঁদতে ইচ্ছে হয়নি। একাত্তরে যেদিন তাঁর গুলিবিদ্ধ পা'টি কেটে ফেলতে হয় সেদিনও তাঁর কোনো কষ্ট হয়নি। একটি সামরিক আদালতের প্রহসনধর্মী বিচারের রায় অনুযায়ী তাঁর ফাঁসি হচ্ছে। তিনি মার্সি চাইতে পারতেন। কিন্তু চাইবার প্রশ্নই ওঠে না। কার কাছে চাইবেন ? যে জিয়াকে তিনি জেলখানা থেকে উদ্ধার করে এনে ক্ষমতায় বসিয়েছেন, তার কাছে ?

'আমার মৃত্যু একটি বৃহত্তর যুদ্ধের সূচনা মাত্র'—তাহের চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর কণ্ঠ চারদিকের দেয়ালে প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চার.

শেখ মুজিবের মনটা খারাপ। বেশ খারাপ। সংবাদপত্রে বাংলাদেশের ইলেকশনের রেজাল্ট দিয়েছে, আওয়ামী লীগ ভালো করেনি। তাঁর মেয়ে দুটি আসনে হেরে গেছে। তিনি চিন্তিত বোধ করলেন। বাংলার মানুষ কি তার কথা ভুলে যাচ্ছে ? ইতিহাসের কথা ইতিহাসেই লেখা থাকে। মানুষেরা মাঝেমধ্যে তা পাঠ করে। কিন্তু ইতিহাসের কোনো পৃষ্ঠা বর্তমানকে আন্দোলিত করতে পারে না। ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, ইতিহাস থেকে কেউ শিক্ষাগ্রহণ করে না। মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হয় বর্তমান দিয়ে। শেখ মুজিব ব্যাপারটি বুঝতেন। পেছনের দিকে তিনি কখনো হাঁটেননি। মুসলিম লীগ করার সময় মুসলিম লীগ করেছেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের সময়ে আওয়ামী মুসলিম লীগ। আওয়ামী লীগ করবার সময়ে আওয়ামী লীগ। জাতির ভবিষ্যতের স্বপ্ন তাঁর বুকে ছিলো। মুখে ছিলো বর্তমান। কাগমারী সম্মেলনের দিন থেকেই ভাসানীর সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক দূরত্ব তৈরি হতে থাকে।

হাসু দুটি আসনেই হেরেছে—এ নিয়ে তাঁর কোনো দুঃখ নেই। তিনি চিন্তিত আওয়ামী লীগ নিয়ে। আওয়ামী লীগ ও বাংলাদেশের ভাগ্য কি সমান বয়েসী ? তা বোধ হয় নয়। তাহলে তিনি দুঃখ পাচ্ছেন কেন ? তার নিজের দল বলে ? না, আমি এতোটা স্বার্থপর নই— তিনি নিজের সঙ্গেই তর্কে লিপ্ত হলেন। দেশটা যাচ্ছে কোন্ দিকে ? সেই সাম্প্রদায়িকতা, সেই মানুষে মানুষে ভেদাভেদ। ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি। সেই সিআইএ, সেই বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ। সেই পাকিস্তানী লেবাস। সেই ইন্ডিয়া জুজু।

আওয়ামী লীগের অনেক কিছু করার ছিলো দেশের জন্যে, কিছুই করা হলো না। কিছু করার আগেই সবকিছু এলোমেলো হয়ে গেলো। তিনি কখনোই আপোষ করেননি। হাসু কী করেছে ? রাজনৈতিক দাবায় সে খেলতে চেয়েছে ঘোড়া দিয়ে। লোকে তাকে ভুল বুঝেছে। হাসু তার মতোই জেদি হয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ক্যান্টনমেন্ট বিরোধিতা কোনো প্রশ্নেই সে আপোষ করেনি। তবুও লোকে তাঁকে ভুল বুঝেছে। ভুল বুঝেছে, কারণ সে লড়াই করতে চেয়েছে ক্যান্টনমেন্ট থেকে জন্ম নেয়া দুটি দলের বিরুদ্ধে সমান্তরালভাবে। কিন্তু মানুষ তা পছন্দ করেনি। মানুষ চেয়েছে শুধু এরশাদ-বিরোধিতা। হাসিনার জন্যে মুজিবের মনে মায়ার উদ্রেক হলো। বাছা আমার। বাঙালিরা আমার নাম যদি ভুলে যেতে চায়, ভুলে যাক। কিন্তু তবু যেন ওরা সুখে থাকে, দুধে-ভাতে থাকে। ধর্মের নামে, শাস্ত্র-আচারের নামে কেউ যেন ওদের শোষণ করতে না পারে। বাংলার হিন্দু, বাংলার মুসলমান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার খৃস্টান—সবাই যেন সুখে থাকে, ভালো থাকে।

পাঁচ.

জিয়া খুব চিন্তিত। নিজের ভেতরে তাঁর নানা যুদ্ধ চলছে। তিনি কোনোদিন মৌলবাদী ছিলেন না। আজো না। মৌলবাদীদের তিনি সহ্যও করতে পারতেন না। জামাতে ইসলামীকে রাজনীতি করার অধিকার তিনি দিয়েছিলেন—এ-কথা সত্যি। স্বেচ্ছায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দেননি, চাপে পড়ে দিয়েছিলেন, আন্তর্জাতিক চাপ। কূটনৈতিক চাপ। মুক্তিযোদ্ধা সংসদের নেতারা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলো। জামাতকে তারা মাঠে নামতে দেবে না। জিয়া তাঁদেরকে সমর্থন দিয়েছিলেন। সারাদেশে সংঘর্ষ বেঁধে গিয়েছিলো।

জামাতকে তিনি সমর্থন করেন না। কোনো রাজাকারকেই না। কিন্তু শাহ্ আজিজকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়েছিলেন। কারণ লোকটা ঝানু পার্লামেন্টারিয়ান ছিলো। আওয়ামী লীগের ৩৯ জনকে সামলানোর জন্যে তাকে দরকার ছিলো।

তিনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন। একাত্তরের কথা তার বারবার মনে হলো। ২৬ মার্চ যখন শুনলেন ঢাকার খবর, একটা মাত্র ট্রাকে একজন সঙ্গী নিয়ে তিনি বের হয়ে পড়েছিলেন। চট্টগ্রাম বন্দরে জাহাজ থেকে অস্ত্র নামানো হচ্ছিলো। সেখানে পাকিস্তানীদের নিরস্ত্র করেছিলেন; ক্যান্টনমেন্টে এসেও পাকিস্তানী সৈন্যদের নিরস্ত্র করেছিলেন তিনি। ২৭ মার্চ ঝুঁকি নিয়ে গেছেন কালুরঘাট বেতারকেন্দ্রে। স্বাধীনতার ঘোষণা প্রকাশ্য রেডিওতে পাঠ করেছেন। অনেক বড়ো বিপদ মাথায় নিয়েছিলেন সেদিন। স্বাধীনতা-সংগ্রাম ব্যর্থ হয়ে যেতে পারতো। রাজনীতিকরাও আপোষ করতে পারতো। সেক্ষেত্রে তাঁর মৃত্যুদণ্ড ছিলো অবধারিত। ও-সব কিছু করেছেন স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে। অথচ দেশটাকে ধীরে ধীরে আরেকটা পাকিস্তান বানিয়ে ফেলা হচ্ছে। এজন্যে কি তিনি নিজে দায়ী ? তিনি আর এসব ভাবতে চাইলেন না। তাঁর স্ত্রীর মুখ মনে করতে চেষ্টা করলেন। মনে করতে পারলেন না। একদা জাঁদরেল জিয়ার কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হয়ে এলো। তিনি ডুকরে উঠলেন, পুতুল...।

ছয়.

নিমাই বসেছিলো একটা ঝরনার ধারে। খুবই আজব ধরনের ঝরনা। তলা পর্যন্ত সব দেখা যায়। তলায় নানা রঙের পাথর। সব একই মাপের। নিমাই ঝরনার দিকে তাকিয়ে থাকলো—কোনো মাছ দেখা যায় কি-না। না, কোনোরকম মাছ নেই। জল এতো পরিষ্কার যে, সামান্য শেওলার চিহ্নমাত্র নেই। ঝরনার তীরে দাঁড়িয়ে জলের দিকে ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে নিমাই আবিষ্কার করলো, জলে তার ছায়া পড়ছে না। আর সবকিছুরই ছায়া পড়ছে, বিরক্তিকর ছাতামার্কা বৃক্ষগুলোরও, কেবল তার প্রতিবিম্ব ফুটছে না এই জলে। নিমাই চিম্‌টি কাটলো নিজেরই শরীরে। তার দেহ বলতে আসলেই কিছু আছে নাকি সে কেবলই বায়বীয় আত্মা মাত্র ? এ প্রশ্নের কোনো উত্তর সে খুঁজে পেলো না।

: এই নিমাই দা, কী করছেন, খবর-টবর কিছু রাখেন ?

—আরে, নূর হোসেন ভাই, কী ব্যাপার বলুন তো ?

: বঙ্গবন্ধুর ঘর থেকে আসছি, বঙ্গবন্ধু খবরের কাগজ পড়ে শোনালেন, তবে খবর ভালো না, মনটা খুব খারাপ।

—আমাকে বলা যাবে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

: যাবে, কিন্তু শুনে লাভ কী ? দেশের সংসদে আমাদের জন্যে শোক-প্রস্তাব নেয়া হয়েছে, তবে আমাদের নাম পাঠ করার সময় ওদের হয়নি।

কথা বলতে বলতে নূর হোসেন বসলেন জলের ধারে। একটা পাথরের টুকরো নিয়ে ছুড়ে দিলেন ঝরনার জলে। টুং করে শব্দ উঠলো একটা। বললেন: এরকমই হয়, এরকমই তো হবে...।

—আর কিছু ? নিমাই জিজ্ঞাসা করলো।

: হ্যাঁ, আরো ব্যাপার আছে। আমাদের জন্যে মোনাজাত করেছেন মৌলানা সোবহান।

— কোন্ সোবহান, জামাতের ?

: হ্যাঁ, জামাতের। চিন্তা করে দ্যাখো নিমাই, লড়াই করলে যাদের বিরুদ্ধে, তারাই তোমার জন্যে মোনাজাত করে...

নিমাই খুব মন-খারাপ করলো। মোনাজাতে তার কী এসে যায় ? যদি এক মিনিট নীরবতা পালন করতো সকল সদস্য মিলে, তবুও নাহয় কথা ছিলো। কিন্তু সে স্বার্থপর নয়, হতে পারে না। নিজের জন্যে বেশিক্ষণ চিন্তা করা তার পর উচিত নয়—তার মনে হলো। সে তাই জিজ্ঞেস করলো, আচ্ছা নূর হোসেন ভাই, তিন জোটের ঐক্য এখনও আছে তো ?

নূর হোসেন হা-হা-হা করে হেসে উঠলো। পাগলের মতো হাসি। ক্ষমতার বাইরে থাকলে এসব জোট-ফোট থাকে, ক্ষমতায় গেলে কিসের জোট ? কিসের রূপরেখা ? সার্বভৌম সংসদ ?

যাই, ডাক্তার মিলনের সঙ্গে দেখা করে আসি।

প্রায় পাগলের মতো উঠে ছুটে যেতে লাগলো নূর হোসেন।

নিমাই তাকিয়ে রইলো তার গন্তব্যের দিকে। পিঠে এখনো লেখা : 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক।' সেই লেখা যতক্ষণ পর্যন্ত না মিলিয়ে গেলো শূন্যতায়, ততক্ষণ সে তাকিয়ে রইলো সেদিকে।

সাত.

মুজিব বললেন, জিয়া দেশটার কী অবস্থা বানায়া আসলা, দেখছো। এখন দ্যাখো অবস্থাটা, রাজাকার–আলবদরকে ক্ষমতায় শেয়ার দিতে হইতেছে। তোমার বিএনপি এইটা কী করতাছে।

—আমি থাকলে এরকম হতে পারতো না। আমি রাজাকার প্রশ্রয় দিতাম না।

: এইডা তুমি এখন বলতেছো বটে, কিন্তু তুমি কী করলা। আওয়ামী লীগকে ঠেকাইতে গিয়া তুমি সব রাজাকারকে দলে নিলা। শাহ আজিজরে মন্ত্রী বানাইলা, মান্নান-আলীমের মতো রাজাকারকে নিয়া কেবিনেট ফরম করলা। আর সব দেশের শত্রুদের পার্টি করবার পারমিশান দিলা। সবগুলারে তুমিই পুনর্বাসন করছো।

— শুধু আমাকে দোষ দিচ্ছেন কেন ? আপনি কি রাজাকারদের ক্ষমা করে দেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

: দ্যাখো, ক্ষমা করা আর পুনর্বাসন করা এক কথা না। চোর চুরি করছে, তুমি তারে মাফ করতে পারো। কিন্তু তাই বইলা তুমি তোমার বাড়ির দারোয়ান তারে বানাইতে পারো না।

— তবু, আপনি যদি শাস্তি দিয়া দিতেন।

: কী হইতো, ওরা জেলে যাইতো। তোমরা আইসা ছাইড়া দিতা।

— তবু তো শাস্তি পেতো।

: হ্যাঁ, সব দোষ আমার, সব ভুল আমার। যাদের বন্ধু ভাবছি, তারাই আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। অনেকেই আমারে সতর্ক কইরা দিছে, আমারে হত্যার ষড়যন্ত্র চলতাছে। আমি পাত্তা দেই নাই। বিশ্বাস করি নাই। তুমিও তো জানতা—আমারে ওরা মারবার চায়। কি, জানতা না ?

জিয়া জবাব দিলেন না। তার চোখের পাতা কাঁপতে লাগলো। সানগ্লাসটির দরকার আবার তিনি অনুভব করলেন।

— শোনো, একেকবার আমার মনে হয়, যদি আরেকবার '৭২-এর বাংলাদেশে ফিরিয়া যাইতে পারতাম, তাহলে সবকিছু নতুন কইরা করতাম। কতো কিছু করবার ইচ্ছা ছিলো, কিছুই করা হইলো না।

: আমারও ইচ্ছা হয়, নতুন করে সবকিছু করি। রাজাকারদের সুযোগ ক'রে দিয়ে যে ভুল আমি করেছিলাম, নতুন করে ক্ষমতা পেলে তা আমি আর করতাম না।

মধ্যলোকের এই দুজন বাসিন্দা অতঃপর বসে রইলেন চুপচাপ। মর্ত্যলোকের কথা ভেবে তারা খুবই বিচলিত। বাইরে ধবল জোছনার মতো আলো। সেই আলোর কোনো উৎস নেই। এই আলো তাঁদের ভালো লাগছে না। তাঁরা ফিরে যেতে চাইছেন মর্ত্যলোকে। যেখানে রোগ-শোক-ক্ষুধা-দারিদ্র-কাম-প্রলোভন কতো কিছু। যেখানে সূর্য ওঠে, আবার অস্ত যায়, রাত্রের অন্ধকারে ষড়যন্ত্র দানা বাঁধে। রজনীগন্ধা ফোটে। কিন্তু এই দুজন মানবের প্রত্যাশা কিছুতেই পূরণ হবে না। মধ্যলোকে একবার এলে মর্ত্যলোকে কেউ আর ফিরে যেতে পারে না।

১২ এপ্রিল '১৯৯১, পূর্বাভাস

'মাননীয়'র তুলনায় 'মাননীয়া'র শারীরিক নিরাপত্তা কেন বেশি হুমকির মুখে

'মাননীয়া'র শারীরিক নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন। এই হুমকি 'মাননীয়'র শারীরিক নিরাপত্তার হুমকির তুলনায় অনেক বেশি। এর কারণ হিসেবে দায়ী করা হয়েছে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে। সে কারণেই মহান জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হয়েছে একটি বিল, সেই বিল অনুযায়ী 'মাননীয়া'র শারীরিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ বাহিনী গঠিত হবে। আমরা এই বিলের প্রতি জানাচ্ছি আমাদের দু-হাত তোলা পূর্ণ সমর্থন। নিশ্চয়ই 'মাননীয়'র তুলনায় 'মাননীয়া'র শারীরিক নিরাপত্তা বেশি হুমকির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সম্মুখীন। এজন্যে সংসদে উত্থাপিত বিলের প্রস্তাবনায় দায়ী করা হয়েছে কেবল সংসদীয় গণতন্ত্রকে, আর 'মাননীয়া'র পদের গুরুত্বকে; কিন্তু এর বাইরেও নিশ্চয়ই আছে আরো একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান, যা বিপন্ন করে তুলেছে 'মাননীয়া'র শরীরের নিরাপত্তাকে। (শারীরিক নিরাপত্তা' এই টার্মটি ব্যবহৃত হয়েছে সংসদের বিলে, ওই শব্দজোড়ের জন্যে কেউ দয়া করে এই লেখককে দায়ী করবেন না)। আমরা এখন অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করবো, আরো কোন্ কোন্ কারণে 'মাননীয়'র তুলনায় 'মাননীয়া'র শরীরের প্রতি হুমকিটা বেশি।

এক : জ্যামিতি ও প্রবাবিলিটি ফ্যাক্টর

'মাননীয়'র তুলনায় 'মাননীয়া'র শরীরের সারফেস এরিয়া বেশি। ফলে, আল্লাহ না করুন, সমান দূরত্ব থেকে সমানসংখ্যক বুলেট যদি উভয়ের প্রতি বর্ষিত হয় তবে 'মাননীয়া'র শরীরে বিদ্ধ হবার সম্ভাবনাটি 'মাননীয়'র শরীরে বিদ্ধ হবার সম্ভাবনার চেয়ে বেশি।

দুই : রাজাকারতান্ত্রিক কারণ

এখন এ-সমাজে একজন মুক্তিযোদ্ধার তুলনায় একজন রাজাকার অনেক বেশি নিরাপদ। এ-দেশে মুক্তিযোদ্ধা আর শহীদের স্বজন-পরিজনের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা আর রাজাকারকে নেয়া হয় নিরাপত্তা-কারাগারে। 'মাননীয়া' কেবল একজন মুক্তিযোদ্ধার স্ত্রী-ই নন, তিনি একাত্তরে বন্দি ছিলেন ক্যান্টনমেন্টে, অর্থাৎ তিনি নিজেই একজন মহান মুক্তিযোদ্ধা। তাই তাঁর শরীরের প্রতি হুমকি 'মাননীয়'র জীবনের প্রতি হুমকির চেয়ে বেশি হবেই।

তিন : ফ্রয়েডীয় কারণ

কিছু সংখ্যক ব্যক্তি আছে, যারা বিপরীত লিঙ্গকে নিপীড়ন করে আনন্দ পায়। সেক্ষেত্রে একজন পুরুষঘাতক 'মাননীয়'র তুলনায় 'মাননীয়া'র জন্যই বেশি ভয়ঙ্কর। অবশ্য নারীঘাতক হলে অবস্থাটা হবে বিপরীত। এ-ক্ষেত্রে আমরা ইন্দিরাগান্ধী ও রাজীবগান্ধীর হন্তাদের লিঙ্গভিত্তিক পরিচয়ের দিকে তাকাতে পারি। ইন্দিরাগান্ধীর ঘাতক পুরুষ আর আর রাজীবগান্ধীর ঘাতক নারী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলাদেশের পেশাদার ঘাতকেরা পুরুষ না নারী। দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের দু-দুজন রাষ্ট্রপতিকে যারা হত্যা করেছে, তার সবাই পুরুষ। তারা এসেছে এক বিশেষ বাহিনী থেকে, আর ওই বাহিনীতে নারী-সদস্য নেই বললেই চলে। সেক্ষেত্রে, ফ্রয়েডীয় কারণে 'মাননীয়'র তুলনায় 'মাননীয়া'র প্রতিই ঘাতকদের হামলে পড়ার সম্ভাবনা বেশি।

চার : নারীবাদী কারণ

এই সমাজটা একটা পুরুষবাদী সমাজ। এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সবসময়েই নিগৃহীত করে নারীকে, পদে-পদে। ঘরে ও ঘরের বাইরে, ভিড়ের মধ্যে কিংবা নির্জনতায়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কোথাও নিরাপদ নয় একজন নারী। সে-হিসেবে 'মাননীয়া'র শরীর অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ।

পাঁচ : সামাজিক কারণ

এই বাংলাদেশে বিরাজ করছে একটি মধ্যযুগীয় আধাসামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, যেখানে নারীকে মনে করা হয় মানুষের পরেই সবচেয়ে উন্নত জীব। সে ক্ষেত্রে একজন নারী প্রধান হয়ে উঠবে রাষ্ট্রের, তা সহ্য করবে না এই সমাজ, এই পিতৃতন্ত্র, এই ধর্মতন্ত্র। মোল্লাতন্ত্র ফতোয়া দেবে নারী-নেতৃত্ব সমূলে উৎখাতের। সে ক্ষেত্রে 'মাননীয়'র তুলনায় 'মাননীয়া'র শরীর যে অনেক বেশি হুমকিপূর্ণ, তা বলে দেবার দরকার পড়ে না।

ছয় : বিকল্পহীনতার সূত্র

'মাননীয়া'র স্বামী 'মহামান্য'কে হত্যা করা হয়েছিলো। আজ তাঁর বিকল্প হিসেবে উঠে এসেছেন আমাদের আপোষহীন 'মাননীয়া'। কিন্তু 'মাননীয়া'কে যদি (খোদা নাকাস্তা) হারাতে হয়, তবে হিসেব অনুযায়ী তাঁর স্ত্রীকে ক্ষমতাসীন করতে হবে। তা তো আর সম্ভব নয়। সুতরাং 'মাননীয়া'র শরীর লাভ করেছে এক বিকল্পহীন গুরুত্ব। কিন্তু 'মাননীয়'র ক্ষেত্রে সেরকম কোনো সমস্যা নেই।

সাত : গরিব গ্রহের সবচেয়ে রূপসী প্রধানমন্ত্রী

'মাননীয়া'কে বলা হয় 'গরিব গ্রহের সবচেয়ে রূপসী প্রধানমন্ত্রী'। কিন্তু 'মাননীয়'কে তেমন কোনো অভিধা দেয়া হয়নি। 'মাননীয়া'কে হারালে বাংলাদেশ বঞ্চিত হবে এই বিরল খ্যাতি থেকে, কিন্তু 'মাননীয়'কে হারালে তেমন কোনো ক্ষতি হবে না।

আট : অর্থনৈতিক কারণ

'মাননীয়'র তুলনায় 'মাননীয়া'র সঙ্গে মূল্যবান দ্রব্যাদি থাকার সম্ভাবনা বেশি। এমনও তো হতে পারে একটি হীরের আংটি কিংবা হার থাকতে পারে 'মাননীয়া'র গায়ে, যা হরণ করতে পারা ছিনতাইকারীদের জন্যে হবে খুবই লাভজনক। সে ক্ষেত্রে ঢাকার রাজপথের প্রধান প্রশাসক এই ছিনতাইকারীরা হামলে পড়তেই পারে 'মাননীয়া'র ওপর।

নয় : পৌরাণিক কারণ

ভারতীয় পুরাণে দেখা যাচ্ছে, রাবণ হরণ করেছে সীতাকে—রামকে নয়, লক্ষ্মণকে নয়। গ্রিক পুরাণে দেখা যাচ্ছে, অপহৃতা হয়েছেন হেলেন। সুতরাং ...।

মরুভূমিতে স্বপ্নবিদ্ধ

বাদশাহ্‌র এ ব্যাধিটি কখনো ছিলো না। তিনি বালিশে মাথা রাখলেই ঘুমিয়ে পড়তেন। কিন্তু ইদানীং তাঁর ঘুম ঠিকভাবে হচ্ছে না। বিছানায় শুয়ে তিনি ছটফট করেন। শাহী হেকিম তাঁকে পরামর্শ দিয়েছে ১০০ থেকে ১ পর্যন্ত গুনতে। গুনতে গুনতে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তারপর কল্পনা করেন একটি মরু-উদ্যান। সেখানে অনেকগুলি দুম্বা চরে বেড়াচ্ছে। সেই দুম্বাগুলি গুনতে শুরু করেন তিনি। নাহ্‌, ঘুম আর আসে না। ইয়া আল্লাহ্‌, তুমি কী শাস্তি দিলে আমাকে। হয় নিদ্রা আসুক, নয়তো অবসান ঘটুক এ অসহ্য রাত্রির, আমি আর সইতে পারি না।

ভোরের দিকে তিনি ঘুমের ভেতরে সমর্পিত হন। আসসালাতো খায়রুম মিনান্নাউম। ঘুমের চেয়ে নামাজ উত্তম। অতি সত্য কথা। কিন্তু, বিছানা ছাড়ার চেয়ে নিদ্রাও কি কম আরামদায়ক ? তন্দ্রা তাঁকে ছাড়তে চায় না। টুং টুং করে বেল বাজছে। বাদশাহ্‌র ব্যক্তিগত খানসামা তাঁকে ডেকে তুলতে চাইছে। বহুদিনের পুরনো খানসামা। খুবই প্রভুভক্ত। কিন্তু সে ক্রমাগত বেল বাজিয়েই চলেছে। তিনি বিরক্তি বোধ করেন। রিসিভারটি তুলে দেয়া দরকার। তাঁকে জানানো দরকার, তিনি জেগে উঠেছেন।

টুং টুং ক'রে বেল বেজেই চলেছে, অতঃপর দরোজায় ধাক্কা।

বেয়াদব কাহাকা।

হুজুর নামদার, সর্বনাশ হয়েছে, তাড়াতাড়ি উঠুন।

বাদশাহ্‌র পিলে চমকে ওঠে। সর্বনাশ হয়েছে। কিসের সর্বনাশ ? তবে কি ইরাকী বাহিনী প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে ?

তিনি তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন।

দরোজা খুলতেই কয়েকজন বিদেশী সেনার মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্র তাঁর বুক বরাবর উদ্যত হয়।

জনাব, আপনাকে আমরা দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এই রাজ্যে একটি সফল ক্যু সংঘটিত হয়েছে। আপনি আর বাদশাহ্‌ নন। তবে, জেনে খুশি হবেন যে, আপনার আমির অমাত্যেরাই বিপ্লবী মন্ত্রিপরিষদে স্থান পেয়েছে।

বাদশাহ্‌ আগন্তুক সৈনিকদের কোনো কথাই ঠিক বুঝতে পারছিলেন না। তিনি হতভম্ব হয়ে পড়েন। তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে ওঠে। দীর্ঘক্ষণ নীরব থেকে তিনি জিজ্ঞেস করেন, কারা এই অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিয়েছে, জানতে পারি কি ?

নিশ্চয়ই। সৈনিকদের একজন তাঁকে তাদের দেশের নাম বলে। দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ। সেই দেশকে তিনি বলতেন মিসকিন। মিসকিনেরা ঘটালো এই কাণ্ড ? তিনি এদেরকে অনেক সাহায্য দিয়েছেন। অবশ্য এরা সেনাদল পাঠিয়েছিলো পবিত্রস্থানসমূহ রক্ষার আন্তর্জাতিক স্কোয়াডে। কিন্তু, তার বিনিময়ে তিনি প্রতিটি সৈন্যকে বেতন দিয়েছেন। কী অকৃতজ্ঞ এই মানবজাতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

— আমি কি আরেকটি প্রশ্ন করতে পারি ?

: জি জনাব। আপনি পারেন।

— আপনাদের দেশ থাকতে আমার দেশে আপনারা অভ্যুত্থান করছেন কেন ?

: জি জনাব, অভ্যুত্থান আমাদের অভ্যাস। আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে—স্বভাব যায় না ম'লে। আমাদের সৈনিকদের অভ্যাসই হচ্ছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এ কারণে আমরা বারবার আমাদের দেশে সামরিক শাসন জারি করেছি। এদেশে এসেই দেখতে পেয়েছি–গণতন্ত্র নেই। এটি বরদাস্ত করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

— তবু নিজের দেশ রেখে অন্যের দেশে....

জনাব, আমাদের দেশে খুব সহসাই সামরিক শাসন জারি করা এখন সম্ভব নয়, সম্প্রতি যা কাণ্ডকারখানা ঘটে গেছে দেশে, তাতে স্ট্রাটেজিগত কারণেই...

বাদশাহ্ আপন মনে বিড়বিড় করতে থাকেন। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। আর এরা এদেশে এসে তো ক্যু করবেই। এদেরকে এদেশে আনাটাই ভুল হয়ে গেছে।

: জনাব, আপনাকে একটু আমাদের সঙ্গে আসতে হবে। তকলিফ নেবেন না, আশা করি।

— কোথায় যেতে হবে, কয়েদখানায় ?

: জি না, জনাব। বুলিস্তানে যে বালাখানাটি রয়েছে, সেখানেই আপনাকে আটক রাখা হবে। ওটিকেই উপ-কয়েদখানা ঘোষণা করা হয়েছে।

বাদশাহ্ বুলিস্তানের বালাখানায় আনন্দেই আছেন। কোনো টেনশন নেই। তাঁর বিবিরাও তাঁর সঙ্গে।

বাদশাহ্ কাজ না পেয়ে টেলিভিশন অন করলেন। বিপ্লবী সরকারের প্রধান সামরিক প্রশাসক ভাষণ দেবেন। ঘোষিকা এ বার্তাটি দিয়েই মুচকি হাসলো। বদমায়েশ। এতে হাসির কী আছে ?

ভাষণ প্রচারিত হলো ইংরেজিতে। পরে স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করে দেয়া হলো। ভাষণটি নিম্নরূপ :

> বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
>
> প্রিয় নাগরিকবৃন্দ। আস্‌সালামু আলায়কুম।
>
> এদেশে এক ক্রান্তিলগ্নে আল্লাহতালার অসীম করুণায় আমি আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা জানেন, এই রাষ্ট্রকে আল্লাহতালা প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ করে রেখেছে। এদেশে অভাব বলতে, ইনশাল্লাহ, কিছু নেই। কিন্তু এদেশের শাসকগণ বংশপরম্পরায় এদেশকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে। সভ্যতার আলো ঢুকতে দেয়নি। গণতন্ত্র নেই। জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা বলার উপায় নেই। শাসকশ্রেণী ভোগ বিলাসিতা আর দুর্নীতির স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছে। কিন্তু, এই সোনার দেশের এ মলিন মুখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমাদের সহ্য হয়নি। এ দুরবস্থা দেখে আমাদের প্রাণ কেঁদে উঠেছে। হায়, হায়, একী বেহাল এ পবিত্রভূমির। তাই এদেশের জনগণের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে আমরা এদেশের শাসনভার গ্রহণ করেছি। আল্লাহতালা এই দায়িত্ব আমাদের বিশ্বপ্রেমিক বাহিনীর হাতে ন্যস্ত করেছেন। রাস্তায় রাস্তায় নাগরিকবৃন্দ তাই উল্লাস করেছে। প্রাক্তন মন্ত্রিসভার প্রায় সকল সদস্যই বর্তমান মন্ত্রিসভাতে যোগ দিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ।

এক্ষণে মহান আল্লাহতা'লাকে সাক্ষী রেখে একটি কথা আমি বলে রাখতে চাই। এবারের সামরিক শাসন গতানুগতিক সামরিক শাসন নয়। ক্ষমতালিপ্সা কিংবা পররাজ্য লোভ আমাদের সেনাবাহিনীর নেই। রাজনীতি করা সৈনিকের কর্তব্য নয়। দেশ তো চালাবে রাজনীতিবিদেরা। কেবল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করাই সেনাবাহিনীর কাজ। আমি অঙ্গীকার করছি, এদেশে একটি সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম হলেই আমি ও আমার বাহিনী স্বদেশে চলে যাবো। আপনারা যদি সহযোগিতা করেন, তবে এ কাজে মাস ছয়েক সময় দরকার হবে। তবে, ততোদিন পর্যন্ত দেশে সকল ধরনের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম নিষিদ্ধ ঘোষিত হলো। আকারে-ইঙ্গিতেও সামরিক আইনের বিন্দুমাত্র সমালোচনা সহ্য করা হবে না। মিছিল-মিটিং সভা-সমাবেশ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ থাকবে।

এদেশের পরাষ্ট্রনীতি পূর্ববর্তী শাহী আমলের অনুরূপ থাকবে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আসসালাতো খায়রুম মিনান্নাউম। দূর থেকে আজান ভেসে আসছে। বেশ মিষ্টি লাগছে। ঢাকায় এরকম হয় না। ঢাকায় কানের কাছে ১০/১২ টি মাইকে একযোগে আজান হয়। চিৎকারটি কানে লাগে। দেশের কথা এসে পড়ায় সৈনিকটির মন কেমন করে ওঠে। কে জানে কেমন আছে মিনা, তার স্ত্রী! কেমন আছে সাগর ও আকাশ—তার ছোট্ট দুটি ছেলে। সৈনিকটির চোখ আর্দ্র হয়ে ওঠে। সৈনিকের মনে কোনো দুর্বলতা থাকা উচিত নয়। সে দেশের কথা ভুলতে চেষ্টা করে। একটু আগে সে একটি স্বপ্ন দেখছিলো। কী একটা অভ্যুত্থানের স্বপ্ন। সৈনিকটি লজ্জিত হয়। ভারি অন্যায় স্বপ্ন।

মরুভূমিতে দিনের বেলা বেশ গরম। কিন্তু রাতে বেশ কনকনে ঠাণ্ডা। তাঁবুর ভেতরে কম্বলের নিচে শিরশির করে ঠাণ্ডা ঢুকে পড়ে। আচ্ছা, স্বপ্নের ব্যাখ্যা কী ? অবচেতনে মানুষ যা চিন্তা করে, তা-ই কি সে স্বপ্নে দেখে ? নাহ্। সৈনিকটি উঠে বসে।

দৈনিক মার্কিনফাক

এক.

এক ছিলো সওদাগর। সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে তার বাস। সওদাগরের হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া—তবু তার মনে ভারি দুঃখ। তার কোনো সন্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নেই। দিন যায়, বছর যায়—তার মনের দুঃখ আর ঘোচে না। অবশেষে সওদাগর একদিন তার ময়ূরপঙ্খী জাহাজ ভাসিয়ে দিলো অজানার দিকে। সেই জাহাজ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৌঁছলো এক নতুন দেশে। সে নতুন দেশের প্রতিটি গাছে দুটি পাতা। ফলও নেই, ফুলও নেই। একটি মাত্র গাছে রয়েছে একটি মাত্র ফল। সেই ফল পেড়ে এনে সওদাগর বিচিটি খাওয়ালো তার স্ত্রীকে। বড়োই আনন্দের ব্যাপার—সওদাগরপত্নী সন্তান ধারণ করলো। অবশেষে জন্ম হলো দুটি পুত্র সন্তানের।

সেই নতুন দেশটির প্রতি এই দুই ভাইয়ের আজন্ম কৃতজ্ঞতা। বড়ো হয়ে এ দু-ভাই একটি দৈনিক পত্রিকার দায়িত্ব পেলো। জন্মঋণের কারণে তারা পত্রিকাটির নাম রাখলো সেই নতুন দেশের নামানুসারে—দৈনিক মার্কিনফাক।

দুই.

মার্কিনিরা এলো ত্রাণকার্যে সহায়তা করতে। 'দৈনিক মার্কিনফাকে'র উত্তেজনা আর ধরে না। কী আনন্দ, কী আনন্দ।

অতীতে একবার এক মার্কিনি বেহালাবাদক এসেছিলেন এদেশে। পরদিন প্রথম পৃষ্ঠায় 'দৈনিক মার্কিনফাক' ঢাউস সাইজের ছবি ছাপলো—'গতকাল ঢাকার রাজপথে একজন আমেরিকান বেহালাবাদক যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন।'

কিন্তু এবারে খোদ মার্কিন সেনাবাহিনী এসে গেছে এই পোড়ামাটিতে। তারে কোথায় রাখি, কোথায় বসতে দেই। মার্কিনফাকের সম্পাদক-কাম-মালিকের মাথা খারাপ অবস্থা।

রাত্রি দশটায় তিনি নিজে চলে এলেন মার্কিনফাকের অফিসে। ডেকে পাঠালেন নিউজ এডিটরকে। বললেন— মার্কিনিভাইয়েরা আমাদের এখানে এসেছে। দেখবেন, যেন নিউজ ট্রিটমেন্ট তাদের ভালো দেয়া হয়। শোনেন, ব্যানার হেডিং করেন—'মার্কিন টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম শুরু, জনগণের স্বতঃস্ফুর্ত সহযোগিতা।' শোনেন, অন্য যে-কোন গুরুত্বপূর্ণ খবরের চাইতে এই খবরটিকে দ্বিগুণ গুরুত্ব দিতে হবে। হাজার হলেও জন্মঋণ তো। শোধ তো করা যাবে না, তবু যতোটুকু পারা যায়। হা-হা-হা।

: স্যার, কয় কলাম হেডিং করবো ?

— অতীতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হেডিংটি আমাদের পত্রিকায় কয় কলাম করেছিলেন ?

: ৮ কলাম স্যার।

— তাহলে স্ট্রেইট ডাবল করুন। ১৬ কলাম হেডিং করুন, যান।

বেচারা নিউজ এডিটর। ১৬ কলাম হেডিং কীভাবে করা যায়, ভেবে ভেবে একেবারে গলদঘর্ম। মালিকের নির্দেশ। পালন না করলে চাকুরি চলে যায়। ১৬ কলাম হেডিং এক পৃষ্ঠায় করাও তো অসম্ভব। কিন্তু, অসম্ভব হলেই তো চলবে না। মালিকের জন্মঋণ। হুঁ হুঁ হুঁ।

এই কঠিন সমস্যার মুখোমুখি হয়ে নিউজ এডিটরের ঘন ঘন ইউরিনালে যাওয়ার দরকার হলো। কী মুশকিল। মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা। তবে বাথরুমে গিয়েই তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সমস্যার সমাধান বের করে ফেললেন। বাথরুম হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ক্রিয়েটিভ সেন্টার। এখানে অনেক বড়ো বড়ো সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

পরের দিন দৈনিক মার্কিনফাকের পাঠকগণ অবাক হ'য়ে লক্ষ্য করলেন—একই মাপের একটি হেডিং দুই পঙ্‌ক্তিতে সাজিয়ে দেয়া হয়েছে সংবাদপত্রের মাথায়। ৮ কলাম + ৮ কলাম অর্থাৎ ১৬ কলাম: 'ব্যাপক পরিসরে টাস্ক ফোর্সের কার্যক্রম, জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা।'

তিন.

মার্কিনফাকের একটি রিপোর্ট

সী অ্যাঞ্জেল। সাক্ষাৎ সিন্ধু দেবদূত। তাহারা পারে না এমন কোনো কাজ নাই। তাহারা ছন দিয়া ঘর ছাইতে পারে। বাঁশের খুঁটি দিয়া ঘর বাঁধিতে পারে। এঁটেল মাটি দিয়া আঙ্গিনা নিকাইতে পারে। তাহারা ভাত রাঁধিতে পারে, চুল বাঁধিতে পারে। তাহারা ডাঙ্গায় হাঁটিতে পারে, পানিতে সাঁতার কাটিতে পারে। তাহারা যেমন শয্যাগ্রহণ করিতে পারে, তেমনই শয্যাত্যাগও করিতে পারে। তাহারা খাদ্য দিতে পারে, স্যালাইন দিতে পারে। নির্মাণসামগ্রী দিতে পারে। তাহারা বাঁশ দিতে পারে।

চার.

দৈনিক মার্কিনফাকে একটি রিপোর্ট বেরিয়েছে—তার বিষয়: অপারেশন সী অ্যাঞ্জেলে একজন বাঙালি অফিসার রয়েছে। সেই অফিসারের একটি সাক্ষাৎকারও দৈনিক মার্কিনফাকে ছাপা হয়েছে। হঠাৎ একটি রিপোর্ট এলো মার্কিনফাকের সম্পাদকীয় টেবিলে। রিপোর্টের বিষয়: অপারেশন সী অ্যাঞ্জেলে এমন একজন সদস্য আছেন, যিনি সপ্তম নৌবহরের সদস্য ছিলেন। সেই সপ্তম নৌবহর, যা উনিশশত একাত্তর সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্তব্ধ করার জন্যে বঙ্গোপসাগরে পাঠানো হয়েছিলো। দৈনিক মার্কিনফাকের উদ্যোগে তার সাক্ষাৎকারের একটি উদ্যোগ নেয়া হয়। প্রথম প্রশ্ন ছিলো— পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করতে একজন মার্কিনি হয়েও আপনি যেদিন সুদূর পূর্ব পাকিস্তান ফ্রন্টে চলে আসেন, সেদিন আপনার মনের অবস্থা কী ছিলো?

তিনি বলেন, আমরা বিশ্বজাতির একজন সদস্য। বিশ্বের কোথাও কোনো দুর্যোগ-দুর্বিপাক দেখা দিলে আমাদের উপস্থিতি...

এ রিপোর্টটা পাঠ করে মার্কিনফাকের নিউজ এডিটর ঘামতে লাগলেন। এ ধরনের একটা ক্ষতিকর রিপোর্ট তাঁর টেবিল পর্যন্ত এলো কী করে— তিনি ভেবে পেলেন না। তিনি আবার বাথরুমে গেলেন। নিজ হাতে রিপোর্টটি পোড়ালেন। ফ্ল্যাশ টেনে ছাইগুলি কমোডের গহিন অন্ধকার কূপে ভাসিয়ে দিলেন। রুমে এসে ডাকলেন, বেয়ারা। বেয়ারা আসতেই তিনি গর্জে উঠলেন—হারামজাদা, কতোক্ষণ থেকে এক গ্লাস পানি চাচ্ছি, মারবো এক থাপ্পড়।

২৭ মে' ১৯৯১, পূর্বাভাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিবৃতির বিস্তৃতি

স্যারের অশেষ দয়া

সংসদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁর অশেষ দয়া। প্রেসক্লাবে পুলিশ ২১শে জুন কী যেন একটু দুষ্টুমি করেছে, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন তিনি। না দিলেও পারতেন; কিন্তু দিয়েছেন যে, তাই বা কম কী। পুলিশ ছোট্ট মানুষ, কী করতে কী করে ফেলেছে, তাই নিয়ে কি আর গোস্বা করা চলে!

সাংবাদিকেরা কিস্যু বোঝে না! বুঝতে চায় না। মন্ত্রীর বিবৃতিটা রেডিও-টিভি ছাড়া আর কোনো পত্রিকায় আসেনি। তাতে অবশ্য কিছু যায় আসে না। কী বলেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ? বলেছেন ২১শে জুন ওই সময়ে প্রেসক্লাবের সামনে ছিলো অন্ধকার। অন্ধকারে পুলিশ আলাদা করতে পারেনি কে সাংবাদিক, কে মিছিলকারী। তাই একটু পিটিয়েছে আর কী! ও আর এমন কী!

তাতো বটেই! দোষ তো মোটেই পুলিশের নয়, পুলিশের মালিক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরও নয়।

তবে কে দায়ী ?

এই ভরা জুন মাসে পরিষ্কার আকাশে বিকাল পাঁচটা-ছয়টার মধ্যে যদি প্রেসক্লাব এলাকায় অন্ধকার আসে নামে, তবে তার জন্যে কে দায়ী হবেন ? নিশ্চয়ই স্বরাষ্ট্রবাবু নয়। ও নিশ্চয়ই হযরত মিকাইল আলাইহিসসালামের কাণ্ড। তাঁর ওপরেই আল্লা দিয়েছেন মেঘ-বৃষ্টি-রোদের ভার। ওই অসময়ে তিনি যদি অন্ধকার ঢেলে দেন প্রেসক্লাবের সামনে, তবে কারই বা কী করার আছে!

দোসরা দায়িত্ব এসে পড়ে মির্জা আব্বাসের কাঁধে, কারণ তিনিই মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের পিতা, রাস্তায় রাস্তায় আলো জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করবার দায়িত্ব নিশ্চয়ই তাঁর। তবে তাঁকেই বা দোষ দেব কী করে, চারদিকে লোডশেডিং পাওয়ার ফেইলর, এতো জ্বালানি বিভাগের দায়িত্ব। ডাকো পিডিবিকে, কী করে তারা, সন্ধ্যায় প্রেসক্লাবের সামনে আলো জ্বললো না কেন ?

আলো নাহয় না-ই জ্বললো, তাই বলে পুলিশ চোখে দেখলো না কেন ? ডাকো ডা. বি চৌধুরীকে, বলুন তিনি— রাতে যে দেখে না, সে যদি হয় রাতকানা; বিকেলে যে দেখে না, সে তবে কী ? সে কি গোধুলিঅন্ধ ? রাতকানা হয় ভিটামিন 'এ'-এর অভাবে, বিকেল-কানা হয় কি ভিটামিন বি-এর অভাবে ? ভিটামিন 'এ' পাওয়া যায় রঙিন ফলমুল আর সবুজ শাকসবজিতে, ভিটামিন 'বি' পাওয়া যাবে কিসে ? খোসাসমেত শুকনো ফলে ? যেমন নারিকেল ? সবচেয়ে বড় দোষ সাংবাদিকদের নিজেদের। ওদের দেখতে মিছিলকারীদের মতো লাগলো কেন ? ওরা পুলিশের মতন ইউনিফর্ম বানিয়ে নেয় না কেন ? ওরা কি জানে না, ইউনিফর্মই হলো আসল ? মিছিলকারীদের মত দেখতে যারা, তারা তো পিটুনি খাবেই। এখন যে দেশে গণতন্ত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চলছে! এখন তো ভাইসব রাজপথে মিছিল করা যাবে না। স্লোগান দেয়া যাবে না। ওসব করতে হয় স্বৈরাচারের আমলে। গণতন্ত্রের আমলে ওসব করা নিষেধ। কঠোরভাবে নিষেধ। মিছিল করতে দেখলেই পুলিশ পিটুনি দেবে, কাঁদানে গ্যাস ছুড়বে, ছররা বুলেট ছড়িয়ে দেবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন মিছিলকারীদের পেটানো যাবে, অসুবিধা নেই এমনকি মিছিলকারীদের মতো যদি দেখতে হয়, তবে পেটানো যাবে সাংবাদিকদের, শিক্ষকদের, শিশুদের, বৃদ্ধদের, মহিলাদেরও।

চিরস্মরণীয় বিবৃতি

স্বরাষ্টমন্ত্রীর বিবৃতিটি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে বাংলার আকাশে-বাতাসে, আইলে-ফাইলে। ভবিষ্যতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা ওই ফাইল বের করে দেখবেন আর শিখবেন, কী করে বিবৃতি তৈরি করতে হয়। ভবিষ্যতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীরা যে-ধরনের বিবৃতি দেবেন, তার একটি নমুনা :

বিবৃতি ১৯ জুন, ১৯৯৭

গতকাল দুপুর বেলা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের সামনে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে তার জন্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয় দুঃখিত। তবে এ ঘটনা পূর্বপরিকল্পিত ও ইচ্ছাকৃত নয়। গতকাল সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এক বিরাধীদলীয় নেত্রীর বক্তৃতা দেবার কথা ছিলো একটি পরিবেশ-সম্মেলনে। সে উপলক্ষে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে প্রচুর কলাগাছ পোঁতা হয়েছিলো। নেত্রী সেখানে উপস্থিত হলে কলাগাছগুলো বাতাসে নড়তে শুরু করে। পুলিশ সে কলাগাছগুলো নড়াচড়া বন্ধ রাখার সৎ উদ্দেশ্যে সেগুলোকে জড়িয়ে ধরে।

তখন দুপুর বারোটা। ফলে অতিরিক্ত রোদে পুলিশের চোখ ছিলো ঝলসানো। তারা সঠিকভাবে কিছুই দেখতে পাচ্ছিলো না। আর নেত্রী পরে এসেছিলেন সবুজ কলাপাতা রঙের শাড়ি। সম্ভবত পরিবেশ সম্মেলনে আসায় তিনি শাড়ির এ রঙ নির্বাচন করেছিলেন। পুলিশ ভুলবশত ওই নেত্রীকে কলাগাছ ভেবে বসে। তাছাড়া ওই নেত্রী আকার-আকৃতিতেও যে কলাগাছের মতোই দেখতে, তা তো সবাই জানেন। ফলে পুলিশের পক্ষে ভুল করা ছিলো খুবই সঙ্গত। আর তাঁর শাড়ির আঁচল ও দেহবল্লরী দুলছিলো কলাপাতার মতোই। মাথায় চুলও ঢাকা ছিলো সবুজ দোপাট্টায়। ফলে নেত্রীর নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে নড়ন্ত কলাগাছটিকে পুলিশ জড়িয়ে ধরে। এরপর ওই কলাগাছটির নড়াচড়া আরো বেড়ে যায়। তখন একজন পুলিশের পক্ষে সম্ভব হয়নি তাকে শান্ত করা। একে একে অনেকজন পুলিশ তাকে জড়িয়ে ধরে। পরে কলাগাছটি মাটিতে পড়ে গেলে পুলিশ স্থানত্যাগ করে। তখন টের পাওয়া যায় যে, ওই কলাগাছ আসলে কলাগাছ নন, সম্মানিত নেত্রী। সাথে সাথে তাঁকে নিকটস্থ হাসপাতালে সরকারি খরচে নিয়ে যাওয়া হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ ঘটনায় দুঃখিত। আশা করা হচ্ছে ভবিষ্যতে দুপুর বারোটায় সূর্যের তেজ কমিয়ে দেয়া যাবে। তখন আর পুলিশের চোখ ধাঁধিয়ে যাবে না।

২ জুলাই ১৯৯২ কাগজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সংবাদপত্রের নাম

সংবাদপত্র প্রকাশনার অনুমতি (ডিক্লারেশন) পাওয়া খুব সোজা হয়ে গেছে আজকাল। এটি বর্তমান সরকারের গণতান্ত্রিক সদিচ্ছা ও বাকস্বাধীনতা প্রেমেরই নিদর্শন। সরকারকে ধন্যবাদ।

সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ শুধু একটি ব্যাপারেই দেখে থাকেন—প্রকাশিতব্য পত্রিকাটির নামে আগে থেকেই অন্য কোনো পত্রিকা আছে কিনা। অসংখ্য নতুন পত্রিকা বাজারে আসছে। কিন্তু একই নামে দুটো সংবাদপত্র থাকতে পারবে না—এ শর্ত নয়া সম্পাদক—প্রকাশকদের জন্যে খুবই কঠিন শর্ত হিশেবে দেখা দিয়েছে। কারণ সংশ্লিষ্ট উদ্যমী প্রকাশক-সম্পাদকরা এত সৃষ্টিশীল যে নতুন নাম তারা খুঁজে পাচ্ছে না। এমনিতেই বাংলাভাষার শব্দসংখ্যা সীমিত। ফলে নতুন নতুন নাম পাওয়া আসলেই মুশকিল।

এ সমস্যার সমাধানও ইতিমধ্যে বের হয়ে গেছে। যেমন—কেবল 'ই' যুক্ত করে ব্যবধান সৃষ্টি করা হয়েছে দুটি সংবাদপত্রের নামের মধ্যে। একটির নাম 'এ সপ্তাহ' আরেকটির নাম 'এই সপ্তাহ'। বোঝাই যাচ্ছে, সংশ্লিষ্টরা খুবই সূক্ষ্ম অনুভূতির মানুষ। আমার শ্রদ্ধেয় স্যারের মতোই সূক্ষ্ম ও স্পর্শকাতর তাদের এন্টেনা। একদিন স্যারকে টেলিফোন করে বললাম—স্যার, আপনার লেখাটি পড়লাম, ভালোই হয়েছে।

স্যার আহত কণ্ঠে বললেন—ভালো-ই হয়েছে!

আমি তাড়াতাড়ি শুধরে বললাম, ভালো হয়েছে।

সবার অনুভূতি অত সূক্ষ্ম হয় না। সুতরাং অনেকেই আগের পত্রিকার নামের সঙ্গে নতুন পত্রিকার নামের পার্থক্য সৃষ্টি করছেন একটি মোটা ধরনের শব্দ যুক্ত করে। সে শব্দটি হচ্ছে 'আজকের'। আজকের শব্দটি ইদানীং অবশ্য ফ্যাশানেও পরিণত হয়েছে। যেমন আগে থেকেই বাজারে একটি পত্রিকার নাম ছিলো 'ঢাকা'। সুতরাং নতুন পত্রিকার নাম রাখা হয়েছে 'আজকের ঢাকা'। 'আজকের' শব্দটি এক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে 'দৈনিক' শব্দটির বদলে। কিন্তু সাপ্তাহিক কী করে হয় 'আজকের'! যেভাবেই হোক, হয়েছে, যেমন—'আজকের সূর্যোদয়'। নতুন নাম খোঁজার ঝক্কিতে না গিয়ে অনেকেই আবার নিজের নামেই পত্রিকা বের করছেন। এর উদহারণ হচ্ছে দৈনিক 'আল-আজিজ'। আজিজ সাহেব অগত্যা নিজের নামেই ডিক্লারেশন নিয়েছেন।

খুবই মজাদার কিছু নাম রাখা হয়েছে ইদানীং পত্রিকার। যেমন—সাপ্তাহিক 'দেখে নেবো'। যেমন—সাপ্তাহিক 'মায়ের দোয়া'।

বাংলা শব্দভাণ্ডার শেষ করে বিদেশী শব্দভাণ্ডারেও হাত দিয়েছেন কেউ কেউ। যেমন—দৈনিক 'আল আমিন', 'ব্যারিকেড' ইত্যাদি ইত্যাদি।

কোলকাতার 'আনন্দবাজার' পত্রিকার নাম কে-না জানে। অচিরেই ঢাকা থেকে বেরুচ্ছে 'বাংলাবাজার পত্রিকা'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নতুন পত্রিকা প্রকাশে আগ্রহীদের নাম খোঁজার গোরু-খোঁজা হয়রানি বন্ধ করার জন্যে গদ্যকার্টুন নামের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছে। আশা করি এটি অনেকেরই কাজে আসবে।

শোনা যায়, সওদাগরি অফিসের পিয়ন, নিউমার্কেটের মুরগির ব্যাপারী, চোরাচালানী থেকে শুরু করে রাজনীতিবিদ-এমপি-মন্ত্রী-মিনিস্টার প্রত্যেকেই দুতিনটি করে পত্রিকার ডিক্লারেশন বের করছেন। বাকি যারা আছেন, তারাই বা আফসোস করবেন কেন। যে কেউ এই তালিকা থেকে একটি নতুন নাম নিয়ে জেলা প্রশাসক অফিসে হাজির হতে পারেন।

গদ্যকার্টুন প্রস্তাবিত নতুন নামের এ তালিকাটি করা হয়েছে একটি নিয়ম মেনে। নতুন যে-সমস্ত নাম বাজারে ইতিমধ্যে বেশ চালু হয়ে গেছে, সে নামগুলোকে অতি মনোযোগের সঙ্গে বিশ্লেষণ করে এই তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

নতুন পত্রিকার জন্যে নতুন নতুন নাম

১. প্রচলিত পত্রিকার কলামের নাম অনুসারে :

দেশবন্ধুর কলাম 'এই সময়', যায়যায়দিনের কলাম 'দিনের পর দিন', পূর্বাভাসের কলাম 'শাদাকালো', 'চারদিক' নামে ইতিমধ্যে বাজারে নতুন পত্রিকা এসে গেছে। এখন যেসব নতুন নাম রাখা যেতে পারে—সেসব হচ্ছে, 'সম্পাদকীয়','অল্পকথা', 'সময়ের কোলাজ', 'প্রতিক্রিয়া', 'খরগোশের কান' এবং 'গদ্যকার্টুন'।

২. প্রচলিত পত্রিকার নামের রদবদল ঘটিয়ে :

যেমন— আজকের ইত্তেফাক, আজকের সংবাদ, দৈনিক কাগজ, আজকের পূর্বাভাস।

৩. বিনোদন পত্রিকার নাম অনুসরণে :

ইতিমধ্যে আছে—চোখেচোখে। নয়া প্রস্তাব—বুকে বুকে, ঠোঁটে ঠোঁটে, গায়ে গায়ে, হাতে হাতে, পায়ে পায়ে।

৪. ভাগ্নে-ভাগ্নীর নাম অনুসারে

ইতিমধ্যে আছে—ফাল্গুনি (হামিদ), চিত্রা (সুলতানা), (প্রজ্ঞা) লাবণী। নতুন প্রস্তাব—জোসনা (বেদের মেয়ে)

৫. ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির নাম অনুসারে :

ইতিমধ্যে আছে—রূপালী, জনতা, কর্ণফুলী...। প্রস্তাব— দৈনিক সাধারণ বীমা।

৬. নদ-নদীর নাম অনুসারে :

ইতিমধ্যে আছে— পদ্মা, কর্ণফুলী, করতোয়া। প্রস্তাব— শীতলক্ষ্যা, বুড়িগঙ্গা।

৭. সময়ের তারতম্য অনুসারে:

ইতিমধ্যে আছে—দৈনিক ভোর, দৈনিক সকাল। প্রস্তাব—দৈনিক সন্ধ্যা, দৈনিক মাঝরাইত, দৈনিক শেষ রাইত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

৮. বাংলা সিনেমার নাম অনুসারে :

ইতিমধ্যে আছে—ভালোমানুষ, পালাবদল, লড়াই, স্লোগান, বন্ধু। প্রস্তাব—দৈনিক ঘেরাও, সাপ্তাহিক নাচে নাগিন, পাক্ষিক রাজার মেয়ে বেদেনী,দৈনিক রাজধানীর বুকে, অর্ধ-সাপ্তাহিক প্রেম-বিরহ, ত্রৈমাসিক নিষ্পাপ, বার্ষিক রূপের রানী চোরের রাজা।

গদ্যকার্টুন স্পেশাল প্রস্তাবনা

ক. 'যায়যায়দিনে'র অনুকরণে ইতিমধ্যে আছে 'আসে যায় দিন', 'দিনের পর দিন'। নতুন রাখা যেতে পারে—'যায় যায় যৌবন'।

খ. 'চিৎকার' অনুসরণে রাখা যেতে পারে—'শীৎকার'।

গ. 'ঝাণ্ডা' অনুসারে রাখা যায় 'আণ্ডা'।

ঘ. 'মিঠে-কড়া' অনুসারে 'টক-ঝাল-মিষ্টি'।

ঙ. 'সন্দ্বীপ' স্টাইলে 'হেমায়েতপুর'।

চ. ইমদাদুল হক মিলন সম্পাদক হতে রাজি হলে একটি পত্রিকার নাম রাখা যেতে পারে 'মাসিক যুবতী'।

হাতে রক্তের দাগ

সারা গঞ্জে রটে যায় খবরটি, বাতাসেরও আগে আগে। গঞ্জের হাটে এক অদ্ভুত লোক আসবেন, আগামী শনিবার। কে সেই লোক ? এক তামাশাঅলা। কেউ কেউ অবশ্য বলেছে 'ভেলকিঅলা'। অবাক নাকি কেরামতি তাঁর। আস্ত কুমড়ার ভেতর থেকে বের করতে পারেন কবুতর। গেলাস ভর্তি বালি ফুঁদিয়েই বানিয়ে ফেলেন মুড়ি-মুড়কি।

ঘরে ঘরে সবাই কোমর বাঁধে। যেতে হবে, আগামী শনিবার গঞ্জের হাটে। ভেল্কিওয়ালা আসবেন। দেখাবেন নানা কেরামতি।

শনিবার সকাল থেকে গঞ্জের হাটে লোক আর ধরে না। হাটের ধারে একখানা মাঠ। সেই মাঠের এককোণে পাতা হয়েছে তাকিয়া। তার ওপরে শামিয়ানা। লোকে লোকারণ্য মাঠ। উসখুস করছে জমায়েত। দেখতে কেমন তিনি ? কেউ কেউ বলছে, সাড়ে ছয় হাত লম্বা। মানুষ এতো লম্বা হয় ? কী খান তিনি ? শোনা যায়, সুন্দরবনের চাকভাঙা মধু ছাড়া তিনি কিছুই খান না। শুধু মধু খেয়ে কেউ বাঁচে ? হঠাৎ শোঁ শোঁ করে হাওয়া বইতে শুরু করে। ভট ভট ভট ভট আওয়াজে কানে তালা লাগার উপক্রম হয়। চোখের মধ্যে ধূলিকণা লাগতে শুরু করে। মানুষ দুই কানে হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে পালাতে উদ্যত হয়।

ঠিক তক্ষুনি তিনি নামেন। এক অদ্ভুত আকাশযান থেকে তিনি অবতীর্ণ হন।

মানুষ ভাবে, এ না হলে ভেল্কিঅলা কিসের ? আগমনের মধ্যেও চমক থাকা চাই।

এরপর তিনি উঠে পড়েন তাকিয়ায়। চারদিকে অসংখ্য চোখ তার দিকে তাকায়। তাঁদের আশা যেন তেমন পূর্ণ হয় না। মানুষ সবসময়ই অতিলৌকিক ব্যাপার-স্যাপার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পছন্দ করে। কিন্তু ভেলকিঅলার চেহারায়-পোশাকে-আশাকে-আকারে অস্বাভাবিক কিছু না-দেখতে পেয়ে জনতা কিছুটা হতোদ্যম হয়ে পড়ে। তখন তিনি মুখ খোলেন। কী কাণ্ড, তার প্রতিটি শব্দ বহুগুণে বিস্তৃত হয়ে প্রতিটি মানুষের কানে স্পষ্টভাবে প্রবেশ করে। জনতা অবাক হয়ে শুনতে থাকে।

'আপনারা আমাকে কতো ভালোবাসেন। তাই আপনারা আমাকে একনজর দেখার জন্যে এখানে এসেছেন। আপনাদের ভেতরে সাজ-সাজ রব পড়ে গেছে। কোথায় শোক। দেশের কোথাও কোনো শোক নেই। শুধু হাসিঠাট্টা। শুধু রঙ্গতামাশা। কোথায় শোক, কোথায় দিবস। হা-হা-হা।' জনতা কিছুই বুঝতে পারে না। পরস্পরের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়।

'উপরে আল্লাহ সত্য, ইনশাল্লাহ্ কেউই আমার ভেলকিবাজির ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন করতে পারবে না।'

'আমি আমেরিকা গিয়েছিলাম। বিমানবন্দরে ওরা আমার কাছে পাসপোর্ট-ভিসা দেখতে চাইলো। আমি বললাম, 'একটা ডলার দিন'—ওরা একটা ডলার দিলো। আমি ফুঁ দিলাম। কোথায় ডলার ? ডলার পাসপোর্ট হয়ে গেলো। আমেরিকার জাদুরাজ মি. জিম-এর সঙ্গে আমি দেখা করেছি। তিনি আমার প্রতিভায় মুগ্ধ। কী করে শূন্য বাক্স এক পলকে কাগজে কাগজে ভরিয়ে তুলতে হয়, আমি জানি। তিনি আমার কাছে আসবেন, সেই বিদ্যা শিখতে।' জনতা আনন্দে তালি দিয়ে ওঠে।

'স্বপ্নে যদি খেতে হয় বিরিয়ানি খাওয়াই ভালো। অনেকেই এখন স্বপ্নে বিরিয়ানি খাচ্ছেন। যারা বাস্তবে বিরিয়ানি খেতে পারে না তারাই স্বপ্নে খায়। আমার জন্যে বিরিয়ানি কোনো ব্যাপার না।' একথা বলেই তিনি তার কালো স্কার্ফখানি শূন্যে নাড়তে থাকেন। অমনি এক প্যাকেট বিরিয়ানি তাঁর হাতে চলে আসে।

জল চলে আসে জনতার জিভে।

'আমি নতুন নতুন ভেলকি শিখেছি আপনারা যদি একটি ট্রেন থামাতে চান আপনাদের কী করতে হবে ? কমপক্ষে দশজন লোককে রেলপথে যেতে হবে। লাইনের ফিসপ্লেট খুলতে হবে। কারণ আপনারা জাদু জানেন না। কিন্তু, ইনশাল্লাহ, আমি যদি আমার জাদুর কাঠিতে একটা টোকা দেই, সারাদেশের রেল-সড়ক যোগাযোগ বন্ধ থাকবে।'

জনতা ভেলকিঅলার কেরামতির গল্প শুনে শ্রদ্ধায় নত হয়ে আসে।

ভিড়ের মধ্যে একজন চিৎকার করে ওঠে, 'হুজুর খালি কথা বলিচ্ছেন, এলা ভেলকি-টেলকি কিছু দেখান।'

তামাশাঅলার মনোযোগ সেই কথার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তিনি ঘোষণা দেন: 'হ্যাঁ! এবার আমি দেখাবো আমার কেরামতির নমুনা।'

তিনি তার জাদু দেখানোর সরঞ্জাম বের করেন। প্রায় বিশটা বড় বড় কাচের পাত্র। সবগুলিতে টলটল করছে পরিষ্কার পানি। তিনি তাঁর দুই হাত জনতার দিকে উত্তোলিত করেন, উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দেখান। 'দেখেন, আমার দুই হাত দেখেন, ভালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করে দেখেন দাগ আছে ? নেই, নেই। আমার হাতে কোনো রক্তের দাগ নেই।' তাকিয়ার সামনে বসা দুটো শিশু ভেলকিঅলার কাছে চলে যায়। তারা তাঁর দুই হাত নেড়েচেড়ে দেখে। না, রক্তের চিহ্নমাত্র নেই। তিনি আবার বলেন, 'নেই, নেই আমার হাতে রক্তের কোনো দাগ নেই।' অতঃপর তিনি একটি কাচের পাত্রে তার ডান হাত ডোবান। অমনি কি আশ্চর্য, পাত্রের পরিষ্কার পানি মুহূর্তেই লাল হয়ে যায়। আর, তিনি হাসতে থাকেন— হা-হা-হা-হা। তারপর তিনি আবার তার দুই হাত আকাশে তুলে ধরেন। বলেন— দেখেন, দেখেন আমার হাতে কোনো রক্তের দাগ নেই। অতঃপর আরেকটি পাত্রের পানিতে হাত রাখেন। মুহূর্তেই সেই পাত্রটিও লাল হয়ে যায়। তিনি আরো প্রচণ্ডভাবে হাসতে থাকেন— হা-হা-হা-হা। এইভাবে তিনি একটির পর একটি পাত্রে হাত দেন। আর সেই পাত্রের পানি লাল হয়ে পড়ে। তাকে যেন নেশায় পেয়ে যায়। উন্মত্তের মতো তার হাসিতে চারদিক কাঁপতে থাকে। মনে হয়, কোনো জোছনাপ্লাবিত কাশবনে একটি হায়েনা হাসছে।

জনতা অচিরেই সেই স্থান ত্যাগ করে।

তারপর বহুদিন চলে গেছে। সেই গঞ্জের হাট আর বসে না। সেখানে এখন রক্তের গন্ধে ঘোরে কুকুর আর শেয়াল। সাপে আর নেউলে লড়াই করে। জঙ্গলে জঙ্গলে ছেয়ে গেছে জায়গাটা। দিনের বেলাতেও সেখানটায় কেউ কেউ যেতে আর সাহস করে না। শোনা যায়, সেখানে নাকি সদ্য-খোঁড়া বেশকিছু কবর রয়েছে। সেই কবরগুলির মাটি কখনো শুকায় না।

আর মধ্যরাতে,যখন খুব ফরসা জোছনা ওঠে, এক অশরীরী নারীকণ্ঠ মিহি সুরে বিলাপ করে—আয়রে আমার সোনা, আয়রে আমার মনা।

সবিনীগ

(সংস্কৃতি বিকল্প নীতি নির্ধারণী গবেষণা)

এক. 'বাবু-সংস্কৃতির দোষে দুষ্ট কলকাতাকেন্দ্রিক যে শিল্প সংস্কৃতি ও সাহিত্যক আমরা সরল বিশ্বাসে আমাদের ঐতিহ্য হিশেবে গণ্য করছি, বিপুল ঐশ্বর্য সত্ত্বেও তার জন্ম আগাগোড়াই সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে। বাংলা ভাষা থেকে আরবি ফারসি ও উর্দু সরিয়ে সংস্কৃতিপ্রধান বাংলার উত্থান একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের পরাজয়। এই বাবু-সংস্কৃতির ঐশ্বর্যে আমরা এতোই মুগ্ধ হয়ে রয়েছি যে পরাজিতের বেদনাও আমরা আর মনে করতে পারি না।'

: সম্পাদকীয়, প্রতিপক্ষ, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৮৯।

দুই. বরবাদ মর্জার নামে একজন নামজাদা শায়ের এই বেহুঁশ কওমের নিদ ভাঙাইয়া দিয়াছেন। আমরা একিন করি নাই, তিনি করাইয়া দিয়াছেন—রবীন্দ্রনাথ মোছলমান ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন বেদ্বীন। অথচ সাবেক পূর্বপাকিস্তানের

দুনিয়ার পাঠক একত্রও! আমারবই.কম

মোছলমান বেরাদারগণ তাহা বেমালুম ভুলিয়া গিয়াছিলেন। রাওয়ালপিন্ডিকে ঠেকাইতে গিয়া কলিকাতার ফাঁদে পা দিয়াছিলেন। মোছলমানি শব্দ বাদ দিয়া হিন্দুয়ানি শব্দের এশ্‌কে পড়িয়া গিয়াছিলেন। কী বেশরম সাম্প্রদায়িকতা। এই সাম্প্রদায়িকতা চলিতেই থাকিতো, যদি না আমেরিকান এইডস্ পাইয়া, এনজিও খুলিয়া বসিয়া শায়ের মৌলানা মোহাম্মদ বরবাদ মর্জার আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেন—হে মোছলমানগণ, তৎসম শব্দ তোমাদের নহে, উহা ব্রাহ্মণদের; তদ্ভব শব্দ তোমাদের নহে, উহা হিন্দুদের। রবীন্দ্রনাথ তোমাদের কবি নহে, দাঁড়ি থাকিলেই যদি মোছলমান হওয়া যাইতো তবে কার্ল মার্কস হইতে রামছাগল পর্যন্ত সকলেই মোছলমান হইতো।মোছলমানদের খান্দানি গৌরব আসিয়াছে আরব জাহান হইতে। জলজংলার কালোমানুষেরা আরব হইবার গৌরব কী বুঝিবে ?

হযরত মৌলানা বরবাদ মর্জার ছাহেবের পদ-মোবারকে হাজার হাজার কদমবুসি। তিনি ধরাইয়া দিয়াছেন বলিয়াই তো আমরা আমাদের গলতি ঠাওর করিতে পারিতেছি।

এখন আমরা সকল কিছুর খত্‌না করিবো। এই দেশে রবীন্দ্রসঙ্গীত চলিবে না। আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীতের খত্‌না করিবো। আমাদের সঙ্গে বরবাদ মর্জার থাকিবেন, এনজিওগুলো থাকিবে, বুশ আব্বাজান থাকিবেন, গোলাম আযমেরা থাকিবে। আমরা ঘরে ঘরে এবাদতনামা রচনা করিবো। এই দেশে আমাদের তাহজিব তামুদ্দুনকে কায়েম করিয়া ছাড়িবো।

বুর্জোয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অম্যাদের কওমি গজল মুসাবিদা করিয়াছেন। ইহা খুবই শরমিন্দার ব্যাপার। ইহা লোকগীতির সুরে রচনা, ইহাতে বাংলার মাঠ-ঘাটের ছোঁয়া পাওয়া যায়—এইসব মধ্যবিত্ত মেকি বোলচালে, বরবাদ মর্জারের দোয়ায়, ইনশাল্লাহ আমরা থামিবো না। আমরা নয়া কওমি গজল মুসাবিদা করিবো। সেই মতলবে আমাদের কওমি গজলটিকে খত্‌না করিয়া খানিকটা মোছলমান বানানো হইবে। নিম্নে তাহার খসড়া লিখা হইলো। এই লিখাটি পড়িলে নিশ্চয়ই বরবাদ মর্জারেরা খুশিতে ডগমগ হইয়া পড়িবেন।

***কওমী গজল** (বরবাদ মর্জারের প্রস্তাবিত মোছলমানি বঙ্গভাষায় রচিত)*

আমার সোনার বাংলাস্তান আমি তোমাকে মহব্বত করি
চিরদিন তোমার আসমান তোমার হাওয়া
আমার জানে ও আম্মা আমার জানে বাজায় শিংগা
আমার সোনার বাংলাস্তান আমি তোমাকে মহব্বত করি

ও আম্মা ফাগুনে তোর আমস্তানে খোশবুতে বেহুঁশ করে....
মউত হ্যায় হ্যায় রে আম্মা
অঘ্রানে তোর ভরা ভুঁইয়ে আমি কি দেখেছি মধুর হাসি
কীসুরত কী ছায়া গো কী পেয়ার কী দিলেগি গো
কী দোপাট্টা বিছায়েছো বটের মূলে নহরের কূলে কূলে
আম্মা তোর মুখের জবান আমার কানে লাগে শরবতের মতো
আম্মা তোর সুরতখানি মলিন হলে আমি নয়ন পানিতে ভাসি
আমার সোনার বাংলাস্তান আমি তোমাকে মহব্বত করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পাঠকের প্রশ্ন, গদ্যকার্টুনের উত্তর

প্রশ্ন : এরশাদের সংসদের গৃহপালিত বিরোধী নেতা আসম আবদুর রবের খবর কী ?

উত্তর : আসম আবদুর রব হঠাৎ এসেছেন, হঠাৎ গেছেন, তাঁর খবর বলতে পারবো না। খালেদা জিয়ার সংসদের রাশেদ খান মেননের খবর বলতে পারবো, কারণ তিনি সব আমলেই ছিলেন এবং এখনো আছেন।

প্রশ্ন : ম্যাডাম বলেছেন, রক্ত দেবো, কিন্তু গণতন্ত্র দেবো না—কী বুঝলেন ?

উত্তর : তাই বলেছেন নাকি ? কিন্তু আমরা তো রক্ত চাই না, গণতন্ত্র চাই। তিনি যদি গণতন্ত্রই না দিলেন...

প্রশ্ন : হাসিনা এবারে চিকিৎসার জন্যে সিঙ্গাপুর গেছেন, তা নিয়েও কথা উঠছে, জানেন তো ?

উত্তর ঃ হাসিনা এর আগে চিকিৎসার্থে ব্রুনেই গিয়েছিলেন, তবে ফেরার পথে দিল্লি হয়ে ফিরেছিলেন। এবার তিনি কোন্ পথে ফেরেন, আগে দেখে নিই।

প্রশ্ন : আত্মমৈথুনের প্রধান উপকারী বৈশিষ্ট্য কোন্‌টি ?

উত্তর : ব্যাপারটি কী ঘটছে, আপনি স্বচক্ষে দেখতে পারেন।

প্রশ্ন : সমকামিতার প্রধান উপকারী কোন্‌টি ?

উত্তর : প্রেগন্যান্ট হবার ভয় থাকে না।

প্রশ্ন : কাগজে দেখলাম, মিথ্যা শনাক্তকারী মেশিন বেরিয়েছে, কী হবে বলুন তো।

উত্তর : ঐ মেশিন ব্যবহারে অসাধারণ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, বিটিভি'র খবর বলার সময়ে ভুলেও মেশিনটি অন্ করবেন না। জানেন তো, মিথ্যা তিন প্রকার— মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা ও বিটিভি'র খবর।

প্রশ্ন : বিয়ে বলতে আপনি কী বোঝেন ?

উত্তর : এটি একটি কারেন্ট একাউন্ট। যখন ইচ্ছা জমা দিতে পারবেন, যখন ইচ্ছা তুলতেও পারবেন। কিন্তু মোটের উপর আপনি যা হারাবেন, তা হল ইন্টারেস্ট।

প্রশ্ন : সাবেক স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. আজিজুর রহমানের পেথিডিন কেলেংকারীর বিচার সম্পর্কে কিছু জানেন ?

উত্তর : বলেন কি! বিচার হচ্ছে নাকি ? এরশাদ ছাড়া আর কারো বিচারের কি দরকার আছে ? অন্য কেউ তো প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী নয়।

প্রশ্ন : স্বপ্ন ও বাস্তবের পার্থক্য কতটুকু ?

উত্তর : আপোষহীনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর পার্থক্য যতটুকু।

প্রশ্ন : এরশাদের বিরুদ্ধে কোটি কোটি টাকা পাচারের অভিযোগ প্রচার করে এখন অল্প টাকার মামলা করা হচ্ছে কেন ? পচা শামুকে তার পা কেটে কী লাভ ?

উত্তর : এরকমই হয়। মুশতাকের বিরুদ্ধে জিয়া সরকার অভিযোগ এনেছিলেন বঙ্গভবনের থালা-বাসন সরানোর। বড় বড় অপরাধ তো একাকী করা যায় না, সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জড়িত থাকে আরো অনেকেই। কে জানে, কেঁচো খুঁড়তে হয়তো নিজঘর থেকেই বেরিয়ে পড়বে কেউটে সাপ।

প্রশ্ন : কলম হাতে পেয়েছেন বলেই আপনি যা-তা লিখতে পারেন না। দুই হাত কাইটা ফালামু...

উত্তর : টিভি'র আইনজ্ঞ উপস্থাপক বলেছিলেন, কয়েকজন লোক পাঠিয়ে পূর্বাভাস অফিস ভেঙে দেবেন। তিনি যেন কেন দাড়ি রেখেছেন ?

প্রশ্ন : শেখ হাসিনা নাকি ইদানীং তসবিহ হাতে বাইরে যান, ব্যাপার কী ?

উত্তর : 'ধর্মনিরপক্ষতা' ও 'বিসমিল্লাহ' প্রশ্নে ছাড় দিয়ে যে বিল আওয়ামী লীগ সংসদে উত্থাপন করেছে, তাতেই ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে যায়। হাসিনা তাঁর নামের আগে মৌলনা ও আলহাজ্ব ব্যবহার করলেই পারেন।

প্রশ্ন : প্রিয়াংকা সম্পর্কে গদ্যকার্টুনে সচিত্র বিস্তারিত লেখা চাই।

উত্তর ঃ ভাই, আপনার সিরিয়াল দাঁড়ালো ২৮ কোটি ৩৩ লাখ ৭ হাজার ৩১৩। আমাকে ধরলে ব্যাপারটা ৩১৪-এ দাঁড়াবে আর কী।

প্রশ্ন : বাজেট সম্পর্কে আপার প্রতিক্রিয়া কী ?

উত্তর : গত বছরের জুন-জুলাই এর পত্র-পত্রিকাগুলো দেখে নিন। এবার কেবল বিএনপি'র স্থলে জাতীয় পার্টি ও জাতীয় পার্টির স্থলে বিএনপি পড়তে হবে।

প্রশ্ন : খালেদা জিয়া এখন ক্ষমতায়। ছাত্রদের এখন কী করা উচিত ?

উত্তর ঃ ছাত্রদের উচিত অস্ত্রগুলো ট্রাংকে তুলে রেখে পড়তে বসা।

প্রশ্ন : আচ্ছা, একজন ফেমিনিস্ট বা নারীবাদীকে বাহির থেকে চেনার উপায় কী ?

উত্তর : তিনটি উপায়—

ক. এরা পুরুষদের পোশাক পরিধান করে থাকেন।

খ. কোল্ড ড্রিংক খাওয়ার সময় স্ট্র বা গ্লাস ব্যবহার না করে সরাসরি বোতল থেকে খান।

গ. মোটর সাইকেলের পেছনে বসার সময় দুপা দুদিকে দিয়ে বসেন।

প্রশ্ন ঃ আবাহনী-মোহামেডান খেলা দেখেছেন, কী এলোপাতাড়িভাবে ফুটবলে লাথি মারছিলো ওরা!

উত্তর : এটাকে বলে ডেমোক্রেটিক ফুটবল। আমার বল আমি মারবো, যেদিকে খুশি, সেদিকে মারবো।

প্রশ্ন : ইস্ট বেঙ্গলের মতো টীম আবাহনীর কাছে হেরে গেলো কেন ?

উত্তর : ওরা মাঠে এসে দেখে আবাহনীর নীল জার্সি পরা অসংখ্য লোক, রাইফেল হাতে মাঠের চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে। এরপরে ভালোভাবে খেলার সাহস আর কার থাকে, বলুন।

প্রশ্ন : ক্লাব কাপ ফুটবলের ফলাফলে আপনার প্রতিক্রিয়া কি ?

উত্তর : 'জাতীয়তাবাদী শক্তি'র জয় হয়েছে।

প্রশ্ন : 'দুউই হাত কাইটা ফালামু' তহন ব্যাটা কেমনে লিখবি ?

উত্তর : প্রয়োজনে রক্ত দিমু, তয় গণতন্ত্র দিমু না।

১০ জুন ১৯৯১, পূর্বাভাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নির্বাচনী বাণিজ্য

এখন দেশজোড়া প্রধান আলোচ্য বিষয় নির্বাচন। নির্বাচন ছাড়া অন্য কোনো বিষয় এখন পাবলিক খাবে না। এটা বিষয়বুদ্ধিহীন মানুষেরা হয়তো এখনও বুঝতে পারছেন না, কিন্তু বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ঠিকই বুঝে নিয়েছেন। যাঁরা বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ এবং সঠিকসময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারদর্শী, তারা তাদের কর্তব্য স্থির করে ফেলেছেন এবং নিশ্চয়ই কাজে নেমে পড়েছেন। যিনি পারেন, তিনি গোবরেও পদ্মফুল ফোটাতে পারেন, বিয়েবাড়িতে গিয়ে সারতে পারেন বাণিজ্যিক আলোচনা, শবমেহেরের মৃত্যুতে লিখতে পারেন কবিতা উপন্যাস, তৈরি করতে পারেন চলচ্চিত্র, রীমার মৃত্যুকে ব্যবহার করে গুছিয়ে নিতে পারেন আখের।

নির্বাচন হচ্ছে মোক্ষ লাভের মোক্ষম উপায়। নির্বাচনের বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক (আখের গোছানো অর্থে) গুরুত্বকে মনে রেখে কে কী করতে পারেন, কী কী পদক্ষেপ নিতে পারেন, সে সম্পর্কে গদ্যকার্টুন-এর কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা রয়েছে। আশা করি সংশ্লিষ্টরা প্রস্তাবগুলো বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করবেন।

১. সাপ্তাহিক বিচিত্রা একটা নির্বাচনী জনমত জরিপের আয়োজন করতে পারে। এতে আসন্ন নির্বাচনে কারা জয়লাভ করবে তা প্রকাশ করা হবে। 'বিচিত্রা'র ক্যালকুলেশন কখনো ভুল হয় না। নিঃসন্দেহে হওয়া যায় এবারেও হবে না। জনমত সংগঠনে 'বিচিত্রা'র এ গঠনমূলক ভূমিকা নিশ্চয়ই পরবর্তীকালে ক্ষমতাসীনেরা মনে রাখবেন এবং তারা অকৃতজ্ঞ হবেন না।

তবে, 'বিচিত্রা' যদি মনে করে ১৯৮২-তে ২৪ মার্চের পূর্বেই এরশাদের সাক্ষাৎকার নিয়ে তারা যেমন একটি মহান জাতীয় দায়িত্ব পালন করেছিলো, এবারও তেমনটি করা উচিত, তবে তো কথাই নেই। কেবল জ্ঞানীরাই ভবিষ্যত দেখতে পায়।

২. দৈনিক ইনকিলাব এবার একটি বড়ো ভূমিকা রাখতে পারে। নির্বাচনের একদিন/দুদিন আগে তারা বড়ো করে প্রথম পৃষ্ঠায় ছাপতে পারে : 'ভারত বাংলাদেশ আক্রমণ করছে।' এজন্যে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য কিংবা সত্যতার লেশমাত্র দরকার নেই। কেননা, পরের দিন প্রথম পৃষ্ঠায় ভুল স্বীকার করে মাফ চেয়ে নেয়াই যথেষ্ট। এর ফলে দেশজোড়া আতঙ্কের সৃষ্টি হবে এবং তাদের কাম্য ফলাফল নির্বাচনে অর্জিত হবে।

৩. সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টির একটি উদ্যোগ যে কেউ নিতে পারেন। ভারতে একটি নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার এটি একটি পরীক্ষিত মহৌষধ। প্রতিটি নির্বাচনের আগেই ভারতে কোনো-না-কোনো রাজনৈতিক দল পরিকল্পিতভাবে দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়। বাংলাদেশে এ ব্যাপারটি এখনো পরীক্ষিত নয়। কেউ পরীক্ষা করে দেখবেন কি ? ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে গমন থেকে বিরত রাখার এটি একটি মস্ত কৌশল হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

৪. 'ভোটের বাক্সে লাথি মারো, জাতীয় সরকার কায়েম করো' বলে এগিয়ে আসতে পারেন কেউ কেউ। এবারের নির্বাচন বর্জন করার কথা এখনো কেউই বলছে না। সুতরাং বর্জনের ডাক নিয়ে যারাই আসবে, তাদেরকেই বেশ আপোষহীন ব'লে মনে হবে। তারা অন্তত ব্যতিক্রমী বলে চিহ্নিত হবে।

৫. ভারতের সর্বশেষ নির্বাচনে রাজীব গান্ধী তাঁর প্রচারণার জন্যে নিয়োগ করেছিলেন একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থাকে। যদিও তাঁর দল ঐ নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারেনি, কিন্তু সার্ক অঞ্চলের নির্বাচনে বিজ্ঞাপনী সংস্থার ভূমিকা তিনি উদ্বোধন করে গেছেন। বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রচারণায় এডভার্টাইজিং ফার্মগুলো এখনই তৎপর হতে পারে। এজন্যে তাদের যা যা করতে হবে সেগুলোর মধ্যে রয়েছে—

ক. রাজনৈতিক দলগুলোর জন্যে নির্বাচনী মেনিফেস্টো তৈরি করে দেয়া।

খ. নির্বাচনের পরে প্রেস কনফারেন্সে উত্থাপনের জন্যে 'নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে' শীর্ষক বক্তৃতা তৈরি রাখা।

গ. মোটর সাইকেল, জিপ, জর্দার কৌটাসহ আনুসঙ্গিক পূর্ণদৈর্ঘ্য ও কাটা যন্ত্রপাতি এবং এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ সরবরাহের যাবতীয় দায়িত্ব নেয়া।

ঘ. নেত্রীদের শাড়ি, শাড়ির সাথে ম্যাচ-করা গায়ের চাদরসহ অন্যান্য পোশাকের জন্যে শিডিউল তৈরি রাখা।

ঙ. ভিডিও ক্যাসেটগুলোতে বিজ্ঞাপন হিশেবে নির্বাচনী প্রচারণা ঢুকিয়ে দেয়া ও গ্রামে-গঞ্জে ব্যাপক প্রদর্শনীর আয়োজন করা।

চ. একটি গুজব রটনা সেল তৈরি করে গবেষণালব্ধ গুজব সৃষ্টি ও বাজারজাত করা।

৬. তড়িঘড়ি রাজনৈতিক দল গঠন করে নির্বাচনে অংশ নেয়া যেতে পারে। এজন্যে চাঁদা সংগ্রহ করে তা দিয়ে সংসার নির্বাহ করা যাবে। তাছাড়া রেডিও-টিভিতে আত্মপ্রচারের এক মহাসুযোগ তো পাওয়া যাবেই।

৭. এবার নির্বাচনে 'বেহেশতের টিকেট' বিক্রয় করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে একজন বক্তা বলে ফেলেছেন, 'ভোট দিতে ভুল করলে আখেরাত পর্যন্ত তার দায়িত্ব বহন করতে হবে।' কিছুদিনের মধ্যেই একেবারে আল্লাহর সোল এজেন্সি নিয়ে কোনো-না-কোনো পার্টি মাঠে নামবে। তাঁরা বলতে পারেন, 'আমাদের মার্কায় ভোট দিন, বেহেশতের টিকিট হাতে নিন।'

৮. তিন জোটের একটি জোটের খ্যাতি রয়েছে 'কর্মসূচি কোম্পানি লিমিটেড' হিশেবে। ঐ জোটটিও এবার নির্বাচনে অংশ নিয়ে তাদের অতীত ঐতিহ্য থেকে সরে আসছে। ফলে একটি নতুন শূন্যস্থান সৃষ্টি হচ্ছে। আগ্রহী কিছু দল অবিলম্বে এ ফাঁকা জায়গা পূরণ করে কর্মসূচি তৈরি ও সাপ্লাইয়ের জন্যে অবিলম্বে একটি কোম্পানী খুলে বসতে পারেন। একটি বড় দল তার বড়নেত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে আপোষহীনতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এবার নির্বাচনে যাওয়ায় তাদের সে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হলেও হতে পারে। তা যাতে না হয়, সে লক্ষ্যে অবিলম্বে তাঁরা সাহাবুদ্দিনের পদত্যাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দাবি করতে পারেন। অবশ্য তাঁদের আপোষহীন ইমেজের স্বার্থে তাঁরা বারবার এরশাদের বিচার দাবি করেছেন। কিন্তু পতিত মানুষের বিচার দাবির চেয়ে ক্ষমতাসীনের বিরুদ্ধে কথা বলাই গৌরবের নয় কি ?

১০. বেসরকারিভাবে কয়েকজন একত্রিত হয়ে 'নির্বাচনী ফলাফল জরিপ কেন্দ্র' খোলা যেতে পারে। এতে প্রয়োজনীয় চাঁদার বিনিময়ে অগ্রিম ফলাফল অর্ডার-মাফিক তৈরি, প্রকাশ ও প্রচার করা যায়।

১১. ফজলে লোহানী নেই, কিন্তু সিরাজুল মজিদ মামুনেরা আছেন। তাঁরা প্রস্তুতি নিতে পারেন, কিভাবে পাঁচটার ভোট সমাপ্ত হবার আগেই চট্টগ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভোটকেন্দ্রের খবর বিটিভিতে বলে দেয়া যায়।

১২. 'নব্বই-এর গণঅভ্যুত্থান সংগ্রামী সংস্থা' নামের বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান খোলা যেতে পারে। এ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হবে দালাল হালাল করা। এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে নগদ চাঁদার বিনিময়ে এরশাদের সহযোগী দালাল আমলা, এমপি, গণদুশমনদের নির্বাচনে নমিনেশন দেয়া হবে।

১৩. এছাড়া বিজ্ঞাপনে নির্বাচনী ছোঁয়া রাখা যায়। যেমন : আপোষহীন আইসক্রিম, কখনো গলে না। হিমকবরী নারকেল তেল, ভোট প্রার্থীদের মাথা ঠাণ্ডা রাখে। ম্যাজিক টাচ ভ্যানিশিং ইংক, মুহূর্তেই বুড়ো আঙ্গুলের কালির দাগ দূর করে। বাঘ মার্কা জর্দার কৌটা, সর্বদাই নিরাপদ। ছাত্রঐক্য মার্কা তালায় সকলের নির্ভরতা ইত্যাদি।

১৫ জানুয়ারি ১৯৯১, পূর্বাভাস

মেটামরফোসিস–১৯৯২

একদিন সকালে, যথারীতি ঘুম থেকে জেগে সে দেখলো যে, সে পরিণত হয়েছে এক চতুষ্পদ প্রাণীতে। প্রথমে তার মনে হলো সে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নের ভেতরেও সে বহুদিন স্বপ্ন দেখেছে আর তার মনে হয়েছে যে, সে স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নের ভেতরের স্বপ্নটা ভেঙে গেছে। অনেকটা আয়নার ভেতর আয়না দেখবার মতো ব্যাপার। কিন্তু যতই সে ব্যাপারটা দুঃস্বপ্ন বলে সান্ত্বনা নিতে চেষ্টা করুক না কেন, তা মোটেও স্বপ্নটপ্ন নয়। কেননা সে তার কক্ষের সবটাই দেখতে পাচ্ছে চরম বাস্তব হিসেবে; সেই মশারি, সেই ধূলাবালি, ছাদের কোণে মাকড়সার জাল,জানালার পরদা। সে দেখলো তার হাত দুটো পরিণত হয়েছে দুটো পায়ে,পা দুটোও পরিবর্তিত হয়েছে কিছুটা এবং পদতল পরিণত হয়েছে থাবায়, সে থাবায় সংযুক্ত হয়েছে নখ।

সে বুঝলো তার একটি লেজও গজিয়েছে, সে তখনই জিভ বের করলো মুখ থেকে, এবং যা ভেবেছিলো তা-ই, বেড়ে গেছে তার জিভের দৈর্ঘ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সে তখন উঠে দাঁড়ালো বিছানায়, চারপায়ে এবং কী আশ্চর্য, বুকডন দেবার ভঙ্গিমায় আড়মোড়া ভাঙলো সে, যেন সে এরকম জীবনে বহুবছর ধরে অভ্যস্ত। তার মনে হলো শুয়ে পড়া দরকার। সে কাত হয়ে কুণ্ডুলি পাকিয়ে শুয়ে পড়লো ফের, তবে এবার বিছনায় নয়, মেঝেতে। তার ঘুম এলো না। কিন্তু আলস্য তাকে দিতে লাগলো আরাম। সে বেশ নিশ্চিত মনেই চোখ বুজে রইলো পড়ে।

এই নিশ্চিন্ত হবার ব্যাপারটা সে রপ্ত কছে একদিনে নয়, দীর্ঘদিন ধরে। আগে, প্রথম যৌবনে তার মাথা গরম হয়ে যেতো খুব সহজেই। আসলে ঐ বয়েসটাই অন্য রকম। দেশের জন্যে, মানুষের জন্যে সে পারতো ঘরের খেয়ে বনের মেষ তাড়াতে। তার পক্ষে সম্ভব ছিলো তাই অবলীলায় মিছিলে যাওয়া ১৯৬৯-এ। ১৯৭১-এ সে একদিন পাড়ি দিয়েছিলো সীমান্ত, যোগ দিয়েছিলো মুক্তিবাহিনীতে, তিনমাস ট্রেনিং নিয়েছিলো নিষ্ঠার সঙ্গে এবং তারপর দেশে ঢুকেছিলো অস্ত্র হাতে। তখন সবকিছুই ছিলো অন্যরকম। অন্যরকম দিন, অন্যরকম রাত। ঐ সময়ে তার মনে হতো জীবন অর্থহীন নয়; প্রকৃত মানুষ হয়ে বেঁচে থাকা, এমনকি মরে যাওয়াও অর্থপূর্ণ।

দরোজায় ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ। কাজের মেয়ের গলা: ভাইজান, চা হইছে, খাইবেন না ? দরজা খোলেন।

পরে দিস, এখন যা। অনেক কষ্টে সে উচ্চারণ করলো বাক্য দুটো; কিন্তু নিজের গলার স্বর অপরিচিত লাগলো তার নিজের কাছেই। বিয়ে করেনি সে,একাত্তরের আগে অবশ্য সে স্বপ্ন দেখতো একটি মেয়েকে ঘিরে, যুদ্ধশেষে তার দেখা সে পায়নি আর, পরে বধ্যভূমিতে অনেকগুলো হাড়গোড়ের সঙ্গে পাওয়া গিয়েছিলো একজোড়া চুড়ি; আর তার মনে পড়ে গিয়েছিলো সেদিনের কথা, যেদিন মেলা থেকে সে কিনেছিলো ঐ চুড়িজোড়া, আর পরিয়ে দিয়েছিলো মেয়েটির হাতে। না, সে এমন কোনো প্রেমিক নয় যে, কাঙ্ক্ষিতাকে না-পেয়ে কুমার থেকে যাবে আজীবন ; আসলে তার ঘাড়ে চেপে বসেছিলো তার সংসার, ছোট দুটি বোন আর বৃদ্ধপ্রায় মা।

একাত্তর একবারই এসেছিলো জীবনে তার। তার পরে আর কোনেদিন একাত্তর আসেনি এ জীবনে।

তিয়াত্তরে ক্ষমা করে দেয়া হলো শত্রুদের। তখনও তার জীবনে একাত্তর আসেনি। সে বিয়ে দিয়েছে তার দু-বোনের।

পঁচাত্তরে হত্যা করা হলো স্বাধীনতার স্থপতিকে, তাঁর নিষ্পাপ শিশুপুত্রকে, গর্ভবতী পুত্রবধুকে, গৃহবধু স্ত্রীকে, তাঁর পরিজনদের সবাইকে, গণতন্ত্রকে, সমাজতন্ত্রকে, ধর্মনিরপেক্ষতাকে, বাঙালি জাতীয়তাবাদকে; তখনও তার জীবনে আসেনি একাত্তর।

এই উত্তেজিত না-হওয়াটা, এই অবলীলায় মেনে নেয়াটা আমার দেশে পুরোনো অভ্যাস—আবৃত্তি করলো সে। সে আবার তাকালো তার শরীরের দিকে— রোমশ গা, থাবাযুক্ত চার পা, একখানি বাঁকানো লেজ—বেশ একটি আকার পেয়েছে সে।

সে ভাবলো—এটিও স্বপ্ন। আর স্বপ্ন মানেই দুঃস্বপ্ন। একাত্তরের পর কোনোদিন সে আর দেখেনি সুখস্বপ্ন। পঁচাত্তরের পর একবার তার খারাপ লেগেছিলো সামান্য,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যখন একজন রাজাকারকে প্রধানমন্ত্রী করেছিলেন জিয়া। জিয়া ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা। তিনি কেন এমনটা করলেন ? একবার তার মনে দেখা দিয়েছিলো এ প্রশ্ন। কিন্তু তখন তার সময় ছিলো না এ নিয়ে ভাববার। সে তখন ব্যস্ত ছিলো ব্যবসা নিয়ে—এসব জোলো আবেগ তাড়িত করেনি তাকে।

কিন্তু যখন গোলাম প্রবেশ করে বাংলাদেশে, বিভিন্ন জায়গায় সভা করতে শুরু করে গোপনে, তখন অবশ্য তার সহযোদ্ধাদের কেউ কেউ খেপে গিয়েছিলো বেশ। হরতাল, ১৪৪ ধারা, কর্মসূচি-পাল্টা কর্মসূচি বেশ জমেছিলো তখন। সে তখন তামাশা দেখেছে দূরে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সবই ঘটেছিলো ক্ষণিকের জন্যে। দুদিন পরে সব ঠিক। যেখানে যা যে-ভাবে চলা উচিত, চলতে শুরু করেছিলো সে-ভাবেই।

পুরুষ পরিণত হয় নারীতে, কিংবা নারী পুরুষে, সে শুনেছে বটে; কিন্তু একটা মানুষ কি পরিণত হতে পারে কুকুরে, রাতারাতি ? একবার তার মনে হলো, এ নিয়ে ভাবা যেতে পারে কিছুটা। কিন্তু অচিরেই তার মনে হলো, ধ্যুত, এতো ভাবাভাবির কী আছে! যা ঘটা সম্ভব, তাতো ঘটবেই; যা ঘটা সম্ভব নয়, তা ঘটবে না; চিন্তা করে আজ পর্যন্ত কোনো মানুষ কি পেরেছে প্রকৃতির সিদ্ধান্ত পাল্টে দিতে ?

তার ততক্ষণে খুব খিদে পেয়েছে, সে উঠে পড়লো, আবার আড়মোড়া ভাঙলো বুকডনের ঢঙে, দরোজার কাছে গেলো আর পেছনের পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে সামনের দুপায়ে খুলে ফেললো ছিটকিনি।

অতঃপর খাবার এলো তার জন্যে। কাচা মাংস, দুধ, সবাই দেয়া হলো ভাঙা পরিত্যক্ত থালায়। সে নাক ডুবিয়ে জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দে তুলে খেতে শুরু করলো অবলীলায়। খাওয়ার পরে বেশ ঢেকুর উঠলো তার। মনে হলো, পৃথিবীতে সুখী হবার একমাত্র উপায় মেনে নেয়া, অগ্রাহ্য করা সবকিছু, নির্লিপ্ত থাকা সবকিছুতে। সবকিছুই মেনে নেয়া—যদি রাজাকার অধিষ্ঠিত হয় প্রধান পদে, যদি সবচেয়ে ঘৃণ্য গোলামটিকে বসানো হয় আমিরের পদে, তা-ও।

ঠিক তখনই বাসার পাশ দিয়ে একটা মিছিল যেতে লাগলো। সে শুনতে পেলো স্লোগানগুলি : নারায়ে তকবীর,আল্লাহ আকবার, জামায়াতে ইসলামী জিন্দাবাদ। রাজাকারদের বিচার চাই, মুক্তিযোদ্ধা গোলাম আযম জিন্দাবাদ, রাজাকার শেখ মুজিবের বিচার চাই বিচার চাই, রাজাকার কর্নেল তাহেরের বিচার চাই, রাজাকার জিয়াউর রহমানের বিচার চাই...। মিছিলের স্লোগানের আওয়াজ ধীরে ধীরে কমে যেতে লাগলো, শেষে তা গুনগুন গুঞ্জনে পরিণত হলো। ফলে তার ঘুম পেলো ফের। বারবার হাই উঠতে লাগলো। রান্নাঘরে চুলোর পাশে সম্ভবত গরম জায়গা পাওয়া যাবে শোবার, কিন্তু কে কষ্ট করে যাবে ওখানে ?

সে সোফার নিচে ঢুকে শুয়ে পড়লো লেজ গুটিয়ে। কয়েকটা মাছি এসে বসলো তার গায়ে আর নাকেমুখে। তন্দ্রাজড়িত দেহে তার মনে হলো, কুকুর হওয়া খুব খারাপ কিছু নয়। সে তো আর পথের কুকুর নয়—ঘরের কুকুর। মন্দ কী ?

৩০ জানুয়ারি ১৯৯২, খবরের কাগজ

বানানো গল্প

(একদিন একজন ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষ এক বিশাল কাজ করে ফেলেন। তিনি একটি জমিখণ্ডের পতি বনে গেলেন। এই কাহিনীর শুরু তার অল্প কদিন পরে।)

মনুর আম্মা, এন্নো আও। তিনি ডাকলেন তাঁর স্ত্রীকে।

স্ত্রী তাঁকে মনে করতেন একটা বাতাসবিহীন ফুটবল। লোকটা ছোটখাটো। যখন হাঁটে মনে হয় গড়িয়ে যাচ্ছে— ফুটবলের মতো। কিন্তু ফুটো ফুটবল। ল্যাদল্যাদা। পাম্পশূন্য। কিন্তু আজকে তাঁর ভাবগতিক অন্যকরম। মনে হচ্ছে ফুটবলের লিক্‌টা সেরে গেছে। হাঁটছে না, লাফাচ্ছে।

—কী অইছে, ডাহো ক্যান ?

: দূরে থাকলে কমু ক্যামনে, কাছে আহো।

—মরণ, রঙ কইরো না, এই বয়সে রঙ-তামাশা ভালো লাগে না।

: দ্যাহো কী আনছি।

তাঁর স্ত্রী কপট রাগ দেখিয়ে কাছে গেলেন। এমনিতে যাবার কথা নয়। এই ভরসন্ধ্যায় বুড়ো স্বামীর কাছে যাবার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তিনি গেলেন। কৌতূহলে। তাঁর স্বামী বিছানার নিচ থেকে একটা প্যাকেট বের করেছেন। কিসের প্যাকেট—তা দেখা দরকার। কৌতূহল ব্যাপারটি নারীরা কখনো দমন করতে পারে না।

বেগম সাহেবের কান লাল হয়ে গেলো।

লোকটার হলোটা কী, পাগল হয়ে গেলো না তো ?

: কী ভাবো ? ভাবোনের কিছু নাই। অন্য কোনো উদ্দেশ্য নাই। দ্যাহো, প্যাহেটের গায়ে কী লেহা ? 'রাজা'। 'রাজা' শব্দটি আমার খুব পছন্দ। হা-হা-হা। বলতে বলতে তিনি বিছানা থেকে নামলেন। মেঝেতে লাফাতে লাগলেন পিংপং বলের মতো।

ঘটনার আকস্মিকতায় বেগম সাহেবা বাকরুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

: হোনো, 'রাজা' শব্দটা আইছে 'রাজাকার' শব্দডার থনে। হেই কারণে এইডারে আমার এ্যাতো পছন্দ।

বেগম সাহেবা এবার ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন। তিনি যথাসম্ভব মিষ্টি করে হেসে নিজের কাজে চলে গেলেন।

অচিরেই তার লাফঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেলো। বয়স হয়ে গেছে। আর কতো। তিনি মেঝের মধ্যেই বসে পড়লেন। আজ তাঁর জীবনের একটা বিশেষ দিন। আজ তাঁকে সংবর্ধনা দিয়েছে। তিনি কোনোদিনই ভাবেননি জীবনে এতো বড়ো সাফল্য পাবেন। একজন স্কুলশিক্ষক হিসেবে শুরু করেছিলেন জীবন। চক-ডাস্টার নিয়ে ক্লাসে যেতেন। ছাত্ররা তাঁকে মানতে চাইতো না। একদিনের ঘটনা। তিনি উল্টোমুখে ব্লাকবোর্ডে লিখছেন। হঠাৎ ভ্যাঁ ভ্যাঁ রব শুনে পেছনে তাকালেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দেখলেন, একটা ছাগল পরম বিস্ময়ে তাঁর দিকেই তাকিয়ে আছে। ছাত্ররা ক্লাসরুমের মধ্যে ছাগল ছেড়ে দিয়েছে। পরে ঐ স্কুল তিনি ছেড়ে দেন। ছাত্ররা তাঁকে অপমান করেছিলো বলে নয়। তাঁর কোনো অপমানবোধ নেই। মানসম্মান-জ্ঞান থাকলে রাজাকারদের চলে না।

হা-হা-হা। আবার হেসে উঠলেন তিনি। শূন্য ঘরে সেই হাসি ভাঙা কাচের টুকরোর মতো ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু অচিরেই তাঁকে হাসি বন্ধ করতে হলো। দরোজার পরদা ঠেলে একটি মুখ ভেতরের দিকে তাকিয়ে আছে। তার কাজের ছেলে। নতুন এসেছে। ছেলেটার চোখেমুখে একটা কিছু আছে, যা তিনি সহ্য করতে পারেন না। তার দম বন্ধ হয়ে আসে।

ছেলেটি চলে গেলো। তিনি স্বস্তি ফিরে পেলেন। কী যেন ভাবছিলাম ? ও হ্যাঁ, সংবর্ধনা। তাঁকে আজ সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এতো লোক হলো। হওয়াই উচিত। তিনি যে রাজাকার ছিলেন, তাঁর পুরস্কার তিনি সবে পেতে শুরু করেছেন। আনন্দে তাঁর চোখে জল এলো। তিনি তাড়াতাড়ি ওয়ারড্রবটা খুলে তাঁর প্রিয় জিনিসটা বার করলেন। একটা টুপি। জিন্নাহ টুপি। মুসলিম লীগের টিকেটে যখন ইলেকশনে জিতেছিলেন, তখন এই টুপিটি তাঁকে উপহার দেয়া হয়। এই শিরোস্ত্রাণ তিনি শিরোমণি করে রেখেছেন। ১৯৭২-এ যখন রাজাকারগিরির অভিযোগে জেলে যান, তখনও। তার স্ত্রী জেলখানায় তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলোন। তিনি বলেছিলেন— কাইন্দো না,কাইন্দো না, আমি নাই, কিন্তু কায়েদ-এ-আজম জিন্নাহ্‌র টুপি তো তোমার কাছে আছে, সেইটা তুমি মাথায় কইরা রাহো।

হঠাৎ টেলিফোনে রিং বেজে উঠলো। লাল রঙের টেলিফোনে। এই নাম্বারটা সবার কাছে নেই। খুব অল্প কজন লোকের কাছে আছে। তার মানে, যে ডায়াল করেছে, সে তাঁর খুবই আপন।

: হ্যালো।

— কেডা, দুলা ভাই ?

: কেডা, শালায় না ?

— শালা মানে, আমনের একান্ত বাধ্যগত শ্যালক। আরে দুলাভাই, শালা তো আমনের কম না। চাইর জন। কিন্তু কন, আমনের পাশে মুই ছাড়া আর কেডা এ্যামনে বিপুল বিক্রমে খাড়ইছে।

: হেইডা তোমার আপায়ও কয়। আর মুইও তোমারে খুব পছন্দ করি।

— হেইডা মনে হয় দুলাভাই ঠিক না। বামপন্থী রাজনীতি তো দুলাভাই আমনের পছন্দ করার কতা না।

: মনু, মুই কি কইছি মুই বাম-রাজনীতি পছন্দ করি ? মুই তো পছন্দ করি তোমারে। তোমার মতন হইলে মনু মুই সব বামরেই পছন্দ হরতাম।

— দুলাভাই, এদিকে তো খুব খুব সমস্যায় আছি। এলাকার লোকজন আমারে মাইরা ফালাইলো আর কী ? কয়, আমনের পার্টির লোকজন ক্ষমতায় গেছে, এইবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মোগো কামকাজগুলো কাইরা দ্যান। দুলাভাই, ঐ তদ্বিরটা কী হরলেন। ঐ যে পারমিটের লাইসেন্সডা।

: আরে, মোর কোনো ক্ষমতা আছে নাহি ? চার্লি মিয়া যে কইছিলো, বাথরুম উদ্বোধন ছাড়া কোনো কাম থাকবে না, ব্যাটা ঠিকই কইছিলো।

টেলিফোন রেখে তিনি হঠাৎ একটা চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। লোকে যে বলে, তাঁকে পতি বানানো হয়েছে কর্ত্রীর কথামতো ওঠ-বোস করবার জন্যেই, তা কি ঠিক বলে ? অবশ্য কর্ত্রী যদি বলেন, তবে তিনি তাঁর পা-ধোয়া পানি খেতে পারবেন। রাজাকাররা সব পারে। একজন রাজাকার যে বলেছিলো— স্যার বললে আমি রাস্তা ঝাড় দিবো— ঠিকই বলেছিলো।

আসলে আল্লাহ যা করে ভালোর জন্যেই করে। এর আগে তাঁকে যে দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো, তা তিনি ঠিকভাবে পালন করতে পারেননি। প্রথম দিন ঐ বিশাল কক্ষে ঢুকেই ভুল করে ফেলেছিলেন। তখন তাঁর মনে হয়েছিলো, তিনি একটা রামছাগল। কিন্তু তিনি ঠিক ভাবেননি। ওর মধ্যেও মঙ্গল নিহিত ছিলো। ওই পদটিতে ব্যর্থতার পরিচয় না দিলে তিনি কি আজ এতো বড় পদ লাভ করেন ? তাঁর মনটা আবার ভালো হয়ে গেলো। তিনি সেই প্যাকেটটা বের করলেন। একটা কলম দিয়ে 'রাজা' শব্দটার পাশে লিখলেন 'কার'। তারপর হেসে উঠলেন। 'রাজা' আর 'রাজাকার' শব্দ দুটিতে এতো মিল কেন ? মেড ফর ইচ আদার। হা-হা-হা। তাঁর হাসি আবার বন্ধ হয়ে গেলো। কারণ ঐ কাজের ছেলেটি এসেছে। তার জন্যে চা আর বিস্কিট নিয়ে এসেছে।

তিনি ভাবলেন, আজকের এ আনন্দের দিনে এই ছেলেটির সঙ্গেও খাতির জমানো উচিত। একটা বিস্কিট এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন, লও, এউক্কা বিস্কিট খাও।

ছেলেটি নিলো না। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলো।

—লও বিস্কিট খাও।

ছেলেটি এবারো দাঁড়িয়ে থাকলো নীরবে, যেমন ছিলো।

—অই হারামজাদা, বিস্কিট খা।

এবারেও নীরবতা এবং প্রত্যাখ্যান।

তিনি তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। ঠাস করে একটা চড় ছেলেটার গালে মারলেন।

—ক হারামজাদা, কেন তুই বিস্কিট খাইতে আছোস না।

ছেলেটির চোয়াল শক্ত হয়ে গেলো। রক্তচক্ষু তুলে সে তার চোখের দিকে তাকালো। বললো—স্পষ্ট, ঋজু উচ্চারণে : 'কোনো রাজাকারের হাতের জিনিস আমি কখনো খাই না'।

তাঁর মাথা ঘুরতে লাগলো। মনে হলো, প্রচণ্ড একটা চড় তাঁর গালে এসে পড়লো। তিনি মাথা ঠাণ্ডা রাখতে চেষ্টা করলেন।

—হারামজাদা খাবি না। তুই না খাস, আমি কুত্তারে খাওয়ামু।

তিনি ভূতগ্রস্তের মতো বারান্দায় গেলেন। সেখানে তাঁর পোষা কুকুরটি বাঁধা। তিনি এক প্লেট বিস্কিট সেই কুকুরটির মুখের কাছে ধরলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কুকুরটি মুখ ফিরিয়ে নিলো।

ছেলেটিও তাঁর পেছনে পেছনে এসেছে। তাঁর পরাজয়ের এই দৃশ্যটা দেখে সে বললো—

'খাইবো না, কুত্তাডা তো আর বাঙালি না।'

তুমি কে, কে তুমি

সমস্যা শুরুতে ছোটই থাকে, বড় হয় আস্তে আস্তে। আমারটা যেমন। খুবই আয়েশের সঙ্গে এবং অনায়াসে, পড়ছিলাম সৈয়দ মুজতবা আলী। এমন রসিক মানুষ তো আর দেখিনি রে ভাই।

'বঞ্চিত'-এর হ্রস্ব-ইকারের মাথার হ্যাট্‌টা খুলে নিলে কী বিপদ হবে, এই নিয়েও মাথাব্যথা তাঁর। ভদ্রলোক আবার পত্র-পত্রিকায় কলামও লিখতেন। সিনেমার সমালোচনা লিখতেন; রেডিও প্রোগ্রামেরও সমালোচনা, চাচাকাহিনীর রচয়িতা এই চাচাকে বেশ চাচা চাচা মনে হতে লাগলো। কিন্তু তাঁর ওই আকাশবাণীর সমালোচনা পড়তে গিয়েই পড়তে হলো মুশকিলে।

একদিন সৈয়দ মুজতবা আলী আনমনে আকাশবাণী শুনছেন। রবীন্দ্রনাথের নাটক হচ্ছে, তাঁর তো শুনবারই কথা। হঠাৎ হলো কী, নাটকের সংলাপে অভিনেতা বললেন, 'কে তুমি ?' মুজতবা আলী আঁতকে উঠলেন। বলে কী বেটা, 'কে তুমি'। এ নিশ্চয়ই রবীন্দ্রনাথের সংলাপ নয়। খোলা হলো বিশ্বভারতী। কে বলবে মিথ্যে কথা ? সত্যি-সত্যি রবীন্দ্রনাথ তার সংলাপে লেখেননি—'কে তুমি'। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'তুমি কে'। আর আকাশবাণীর মূর্খরা তা বদলিয়ে দিলো। আরে, 'কে তুমি' আর 'তুমি কে'-র পার্থক্য তো, সৈয়দ মুজতবা আলী বলছেন, স্কুলের ছাত্রেরা পর্যন্ত জানে, আর আকাশবাণীর মূর্খরা জানে না।

আমার সমস্যাটার শুরু কিন্তু এখানেই। স্কুলের ছাত্রেরা পর্যন্ত জানে 'কে তুমি' আর 'তুমি কে'-র পার্থক্য! আর আমি জানি না! এখন জানি কী করে ? কেন যে মুজতবা আলী নিজেই পার্থক্যটা লিখে দিলেন না।

ভয়ে-ভয়ে আমি গেলাম পুলক গুপ্তের কাছে। আমি তাঁকে 'চলিষ্ণুবিদ্যাকল্পদ্রুম' বলে মনে করি। ধ্রুপদী সঙ্গীতে রীতিমতো বিশেষজ্ঞ। আমার একটা পদ্যের বই এক পৃষ্ঠা পড়তেই বের করলেন দুটো বানানের ভুল। তাঁর ভুরু কুঁচকে গেলো। যা-তা অবস্থা। পুলকদাকে জানালাম সমস্যাটা। 'কে তুমি আর তুমি কে'-র পার্থক্যটা দাদা যদি একটু শিখিয়ে দিতেন। পুলকদা প্রথমে হলেন গম্ভীর তারপর হেসে ফেললেন, বললেন, কোনো পার্থক্য নেই। এইবার আমি মওকা বুঝে বললাম, আছে দাদা আছে, 'তুমি কে' আর 'কে তুমি'-র পার্থক্য স্কুলের ছাত্রেরা পর্যন্ত জানে, মুজতবাআলী বলেছেন,...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পুলকদার হাসি মিলিয়ে যেতে লাগলো। বললেন, তাহলে যান, স্কুলের ছাত্রদের কাছে যান।

তাঁকে ঠাণ্ডা করবার জন্যে আমাকে আরেকটা গল্প শোনাতে হলো। একবার এক চাকরির ইন্টারভিউয়ে প্রার্থীকে জিজ্ঞেসকরা হলো, বলুন তো, তিনদিন হইতে বৃষ্টি পড়িতেছে, এর ইংরেজি কী। প্রার্থী বললেন, ইট ইজ রেইনিং ফর থ্রি ডেজ। প্রশ্নকর্তা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, এই সোজা ট্রানস্লেশনটা পারলেন না, এর উত্তর তো আমার ক্লাস সিক্সে পড়া ছেলেটিও জানে।

ক্লাস সিক্সে পড়ার সময় আমিও জানতাম স্যার—প্রার্থীর সপ্রতিভ সহাস্য উত্তর।

এবার যাওয়া গেলো আজফার হোসেনের কাছে। ইনি একজন অত্যন্ত প্রতিভাবান লেখক, বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি পড়ান। আজফার ভাই, সমস্যার সমাধান দিন তো। বলুন, 'তুমি কে' আর 'কে তুমি'-র পার্থক্য কী ?

আজফার বললেন, কোনো পার্থক্য নেই, কেবল শব্দের ওলোটপালোট ছাড়া। সেকি আজফার ভাই, আপনি বলছেন কোনো পার্থক্য নেই, আর মুজতবা আলী বলছেন এর পার্থক্য স্কুলের ছাত্ররা পর্যন্ত জানে। এইবার আজফার হোসেন তাঁর শিক্ষকসুলভ বাচনভঙ্গি ফিরে পেলেন। বললেন, সৈয়দ মুজতবা আলী যদি এ-কথা বলে থাকেন, তাহলে আমি বলবো, স্কুলের ছাত্রদের প্রতি তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন অতিরিক্ত। তবে এও সত্যি যে, স্কুল হতে পারে অনেক রকম, যেমন হতে পারে স্কুল অব থট।

আমিও তাঁর সঙ্গে যুক্ত করলাম, আবার ঘরানা বোঝাতেও স্কুল ব্যবহৃত হয়, যেমন অভিনয়ের ক্ষেত্রে 'রেশটিয় স্কুল' কিংবা 'স্তানাসলোভস্কি-র স্কুল'। আজফার ভাই স্কুল ছেড়ে গেলেন বিদ্যালয়ে। বললেন, আবার বিদ্যালয়ও হতে পারে অনেক রকম, যেমন প্রাথমিক বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি।

ছেড়ে দে মা, কেঁদে বাঁচি। কোথায় 'কে তুমি' আর 'তুমি কে,' কোথায় 'স্কুল অব থট'।

এরপর দেখা ডক্টর হুমায়ূন আজাদ-এর সঙ্গে। স্যার, একটা ছোট্ট সমস্যা। 'তুমি কে' আর 'কে তুমি'র পার্থক্য কী স্যার' ? মুজতবা আলী বলেছেন, এ পার্থক্যটা স্কুলের...। শোনো, স্যারের জবাব, ওই মুজতবা আলীরা হচ্ছে এক-একটা রবীন্দ্রজীবী, যাদের পেশাই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে অতি বড় বড় বিষয় খুঁজে বেড়ানো। ওই মুজতবা আলী একটা, আর একটা আছে আবু সয়ীদ আইয়ুব না যেন কি...। শোনো, বাংলা বাক্যের প্রধান সুবিধা হচ্ছে, এর শব্দগুলোকে রদবদল করলে অর্থের তেমন বদল হয় না, তবে প্রথমে যে শব্দটি থাকে তাতে জোর পড়ে বেশি। যেমন 'আমি তোমাকে ভালোবাসি' আর 'তোমাকে আমি ভালোবাসি', একই কথা। তবে বাঙালি যেহেতু নিজেকেই বেশি ভালোবাসে, সে সবসময়ই বলবে 'আমি তোমাকে ভালোবাসি'। এখন তুমি যদি বলো 'কে তুমি', তাহলে জোর দেয়া হবে 'কে'-তে, আর যদি বলো 'তুমি কে', তাহলে জোর পড়বে 'তুমি'তে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমার সমস্যা এতোক্ষণ পর্যন্ত ছোট্টই ছিলো। শুধু জানতে চেয়েছিলাম ততোটুকু, যতোটুকু জানে স্কুলের বাচ্চাকাচ্চারা। এবার সমস্যা গেলো বেড়ে। কারণ, আমি বাসায় ঘরের দরোজা লাগিয়ে বার-বার বলতে লাগলাম 'কে তুমি', 'তুমি কে'। প্রথমবার জোর দিচ্ছি কে-তে। তার মানে, কে আমি ? আমার পেশা কী, পরিচয় কী ? কিন্তু 'তুমি কে'? জোর পড়ছে 'তুমি'তে। 'তুমি' তো 'তুমি', কিন্তু সেই 'তুমি' টা কে ? 'আমি' তো 'আমি'ই, সেই 'আমিটা কে ?

আমি কে ? আমি কার ? আমি কেন ? আমি না থাকলে আমার চারপাশের এসবের অস্তিত্ব আছে কি ? রীতিমতো দার্শনিক সমস্যা। সক্রেটিস হলে বলতেন— নো দাইসেলফ। আমি কে ? আমি আনিসুল হক। আনাল হক, আমিই সত্য। আবার দার্শনিক সমস্যা—সত্য বলতে আসলেই কী বোঝায় ? বীয়িং, রিয়ালিটি, অ্যাবসোলুট সম্বন্ধে অস্তিত্ববাদ কী বলে ? কা তব কান্তা—পৃথিবীতে কে কাহার ?

ছোট্ট সমস্যা এইভাবে বড় সমস্যা হয়ে গেলো। আমি আমার চাকরিসূত্রে পাওয়া আইডেনটিটি কার্ডটা পুড়িয়ে ফেললাম। রাস্তায় কোনোদিন পুলিশে যদি জানতে চায়, 'তুমি কে' আমি জানি না আমি কী জবাব দেবো।

আত্মপরিচয়ের সংকট খুব বড় সংকট রে ভাই।

হাসিনা-খালেদা ওইটা বুঝবে না। ওই সমস্যা ওদের 'বাঙালি' আর 'বাংলাদেশী' সমস্যার চেয়েও বড়। মুসলমান আর বাঙালি মুসলমান সমস্যার চেয়েও। সেই সমস্যায় পড়ে আমার চেহারাটা হয়েছে সক্রেটিসের মতন। এ্যান্ড, সক্রেটিস ওয়াজ এ ভেরি আগলি লুকিং ম্যান।

ব্যাচেলর হিসেবে জন্মিয়া আমি কি পাপ করিয়াছি ?

দাঁতের যন্ত্রণায় কাতর রোগী ডাক্তারকে বলিলো, কতো ভালো হইত, যদি আমরা দাঁত না লইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারিতাম। ডাক্তার হাসিয়া জবাব দিলেন,তা আমরা জন্মাবার সময় তো দাঁত ছাড়াই জন্মাই, নাকি ?

প্রভু, আমার জন্মের জন্যে আমি দায়ী নহি, তবু আমি কি পাতক ? বলো, জন্মই যদি দিলে, তবে কেন বিবাহিত করিয়া পাঠাইলে না ?

এই ঢাকা শহরে আমি যাইবো কোথায়, কাহার তলে লইবো আশ্রয় ? আমি রেলস্টেশনে যাই, উহারা বলে— সরিয়া দাঁড়াও, তুমি ব্যাচেলর; আমি বেলতলায় যাই, তাহারা বলে— আ মরণ, দূর হও, তুমি ব্যাচেলর।

আমি এই দুঃখ কাহারে বলি, কাহাকে জানাই। লোকে শোনে, মুচকি হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়, কিন্তু কেহই বোঝে না।

আমি একজন ব্যাচেলর। গেজেটেড অফিসারগণ আমাকে সার্টিফিকেট দিয়াছেন, আমি চরিত্রবান। ইহার পরেও এই ঢাকা শহরে একখানি ভালোবাসা, স্যরি, একখানি ভালো বাসা আমার ভাগ্যে জুটিল না।

ঠিক জুটিল না বলিলে মিথ্যে বলা হইবে। একদম যে জোটে নাই, তাহা নহে, একখানা জুটিয়াছিল বটে। পত্রিকার 'বাড়ি ভাড়া' বিজ্ঞাপন দেখিয়া টেলিফোন করিলাম। অপর প্রান্তে বামা-কণ্ঠ রিনরিন করিয়া উঠিলো। অস্বীকার করিবো না, মনে রঙ খেলিয়া গেল; মনে মনে আবৃত্তি করিলাম, 'কী জোছনা কণ্ঠস্বরে, আমি জানি টেলিফোনের ওপারে তার ঠোঁট চড়ুই পাখিরমতো কাঁপছে।' সে ডাকিল, এক্ষুনি আইসো। আমি বলিলাম, পরে যাইবো। সে বলিল, এক্ষুনি আইসো প্লিজ। আমি কী করিবো। আমি বোকা-সোকা সহজ মানুষ, যাহার পকেটে বাসে উঠিবার পয়সা নাই, ট্যাক্সি লইয়া বিজ্ঞাপিত ভাড়াবাড়ির ফটকে হাজির হইলাম। বক্ষে তখন দুন্দুভি বাজিতেছে। আমি দরোজায় টোকা দিলাম। রবীন্দ্রনাথ হইলে গাহিতেন: খোলো খোলো দ্বার, রাখিও না আর, বাহিরে আমায়...।

বধির, নিষ্ঠুর দরোজা খুলিল। 'ভেতরে আইসো'। আমি ভিতরে গেলাম। বলিলাম, বাসা দেখিতে আসিয়াছি, আমি কি দেখিতে পারি ? উত্তর আসিল, আগে বইসো, গল্প করি; যদি তোমাকে পছন্দ হয়, তুমি থাকিবে, অসুবিধা হইবে না। টাকা-পয়সা বড়ো ব্যাপার নহে, ভালোবাসাটাই আসল। আমার মাথা ঝিমঝিম করিতে লাগিল। আমি তাহার দিকে সাহস করিয়া তাকাইলাম। আল্লাহর সৃষ্টি লইয়া আমি কোনো মন্তব্য করিবো না। শুধু বলিবো, তিনি মহান, আমার সম্ভ্রম রক্ষা তিনিই করিয়াছেন।

আমি পালাইয়া বাঁচিলাম।

কিন্তু এতদ্ব্যতীত আমি যতো জায়গায় গিয়াছি, ততোবার, আমার বৈবাহিক অবস্থা জানাইতে হইয়াছে। আর এই কৌমার্য কাহাকেও আশ্বস্ত করে নাই, জল দেখিলে জলাতঙ্কগ্রস্তেরা যেইরূপ করে, আমাকে দেখিয়া বাড়িওয়ালা সেইরূপ আচরণ প্রদর্শন করিয়াছে। কতোবার রিহার্সল দিয়া গিয়াছি, বলিবো— আরে ভাই, বিবাহিতরা হইলো রক্তের স্বাদ পাওয়া বাঘ। পৃথিবীর যতো অপকর্ম সকলই বিবাহিতেরাই করিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রেমকাহিনীগুলি কি বিবাহিতদের লইয়াই রচিত হয় নাই ? বলা হয় নাই। সুযোগ পাই নাই। তাহা হইলে এই সমস্যার সমাধান আমি করিবো কী করিয়া ?

আমার বুদ্ধিমান বিবাহিত বন্ধুরা আমাকে পরামর্শ দিয়াছে, বিবাহ করো। উহারা এইরূপই বলিবে আমি জানিতাম। কেননা মানুষ মাত্রই পরশ্রীকাতর। আমার নির্ঝঞ্ঝাট কৌমার্য তাহাদের সহিবে কী করিয়া ?

পাখি ধরিবার ফাঁদ আমি দেখিয়াছি। একটি বন্দি পাখি ফুসলাইয়া মুক্ত পাখিদের ফাঁদে পুরে। বিবাহিতেরা হইল সেই বন্দি পাখি।

উহাদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রণোদনায় আমি টলিবো, এতোটা বোকা আমি নহি। সেক্ষেত্রে প্রভু, তোমার প্রতি আমার একটাই অনুযোগ, অবিবাহিত করিয়াই যদি জন্ম দিলে, তবে আমাকে বাড়িওয়ালা বানাইলে না কেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পুনশ্চ
বাড়িওয়ালাগণ কেন সদাসর্বদা অলঙ্ঘনীয়ভাবে বিবাহিত ভাড়াটিয়া খুঁজিয়া থাকে, তাহা আমার জানা নাই। এই প্রশ্নের উত্তর আমি অনেক খুঁজিয়াছি, কিন্তু কূলকিনারা করিতে পারি নাই। অবশেষে 'দৈনিক রূপালী'র ২৩ জানুয়ারি'৯১ সংখ্যায় সমস্যার একটি উজ্জ্বল সমাধান মিলিল। রূপালী প্রথম পৃষ্ঠায় একখানি খবর ছাপিয়াছে যাহা নিম্নরূপ:

বাড়িওয়ালার বজ্জাতি
খুলনা ব্যুরো : স্বামীকে আটকে রেখে গৃহবধূকে ধর্ষণ করেছে বাড়িওয়ালা হযরত আলী। ঘটনাটি ঘটেছে খুলনা নগরীর টুটপাড়ায় করের বাজারে। ঘটনার বিবরণে জানা যায় মঙ্গলবার ভোররাতে বাড়িওয়ালা হযরত আলী গৃহবধূ আনোয়ারা (২০) স্বামী মনসুরকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে একটি ঘরে তালা মেরে রাখে এবং আনোয়ারাকে ধর্ষণ করে।

৩০ জানুয়ারি '৯১, প্রিয় প্রজন্ম

কত অজানারে

প্রশ্ন : রাত্রিবেলা বিড়ালের চক্ষু জ্বলে কেন ?
উত্তর : দিনের বেলা লোডশেডিংয়ের কারণে জ্বলিতে পারে না বলিয়া।
প্রশ্ন : ট্রাফিক পুলিশের ছাতার রং শাদা হয় কেন ?
উত্তর : উহারা বর্ণবিদ্বেষী বলিয়া।
প্রশ্ন : জন্ডিস হইলে চক্ষু হলুদ হয় কেন ?
উত্তর : চোখে সরিষা ফুল দেখে বলিয়া।
প্রশ্ন : বরফ পানিতে ভাসে কেন ?
উত্তর : ডুবিলে গলিয়া যাইবে এই ভয়ে।
প্রশ্ন : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পদত্যাগ করেন না কেন ?
উত্তর : পদত্যাগ করিলে তিনি হাঁটিবেন কী করিয়া ?
প্রশ্ন : গরুর কাঁধে কুঁজ থাকে কেন ?
উত্তর : জোয়াল ফিট করিবার জন্যে।
প্রশ্ন : মেয়েদের চুল লম্বা কেন ?
উত্তর : করোটিতে উত্তম সার থাকে বলিয়া।
প্রশ্ন : সার্জনেরা অপারেশনকালে মাস্ক পরেন কেন ?
উত্তর : রোগী যেন তাহাকে চিনিয়া ফেলিতে না পারে।
প্রশ্ন : মায়ের চাইতে মাসির প্রতি দরদ বেশি হয় কেন ?
উত্তর : মাসতুতো বোন থাকে বলিয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রশ্ন : এরশাদের চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র—বলা হয় কেন ?
উত্তর : এক ফুলে হাজার প্রজাপতি বসে—এইরূপ পবিত্রতা বুঝাইতে।
প্রশ্ন : নদীর সহিত নারীর তুলনা দেওয়া হয় কেন ?
উত্তর : নদীর পানি কখনো অপবিত্র হয় না, নারীও তদ্রূপ বলিয়া।
প্রশ্ন : সাবান পানিতে গলিয়া যায় কেন ?
উত্তর : যথেষ্ট শক্ত করিয়া বানানো হয় না বিধায়।
প্রশ্ন : লৌহমানবী বলিতে কী বুঝ ?
উত্তর : যে মানবী চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়।
প্রশ্ন : ইকোনা বলপেনের পশ্চাদভাগের ছিদ্র বন্ধ করা হয় না কেন ?
উত্তর : পরিষ্কার কাপড় মসিলিপ্ত করিয়া স্মৃতিটুকুন ধরিয়া রাখিতে।
প্রশ্ন : ফল মাটিতে পড়ে কেন ?
উত্তর : মাথায় পড়িলে নিউটন আহত হইতেন বলিয়া।
প্রশ্ন : ঘরের টবে একটি গাছ রাখিলে তাহা জানালার দিকে মাথা বাড়াইয়া দেয় কেন ?
উত্তর : ফিল্ডিং মারিতে।
প্রশ্ন : বেগম জিয়া প্রতি বৃহস্পতিবারে সুগন্ধায় গণসাক্ষাৎ দেন কেন ?
উত্তর : জনগণের কাছে হাঁটিয়া যাইতে তিনি কষ্ট পান বলিয়া।
প্রশ্ন : রেললাইনের দুইটি পাতের মধ্যে ফাঁক রাখা হয় কেন ?
উত্তর : কন্ট্রাক্টর পয়সা মারে বলিয়া।
প্রশ্ন : অস্তগামী সূর্য লাল হয় কেন ?
উত্তর : পাকিয়া যায় বলিয়া।
প্রশ্ন : বিএনপি সরকার সন্ত্রাস দমন করিতেছে কেন ?
উত্তর : সন্ত্রাস দমন বিল পাস করিবার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে।
প্রশ্ন : চলন্ত বাস হইতে নামিয়া লোকে সম্মুখ দিকে দৌড়ায় কেন ?
উত্তর : মাথার পেছনের দিকে চক্ষু নাই বলিয়া।
প্রশ্ন : তেল ও জল একত্রে মিশে না কেন ?
উত্তর : তেলের নাক উঁচু বলিয়া।

৩১ আগস্ট '৯২ কাগজ

ঢাকাই পদ্যের ইজমগুলি

'ইজম' শব্দের অর্থ আঞ্চলিকতা। কেউ যদি 'কুমিল্লা সমিতি'র আহ্বায়ক হন, আমরা বলি, উনি ইজম করছেন। তবে কাব্যের 'ইজম' ঠিক আঞ্চলিকতা নয়, তার অতিরিক্ত কিছু। সমকালীন ঢাকাই পদ্যে অনেকগুলি কবিগোষ্ঠী রয়েছে। এদের প্রত্যেকের রয়েছে আলাদা ইজম। আমরা একে একে প্রতিটি ইজম সম্পর্কেই আলোচনা করবো।

ফিউচারিস্ট বা ভবিষ্যৎবাদী :
ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবাই জ্ঞানীর কাজ। ঢাকার ফিউচারিস্টগণের স্লোগান হচ্ছে তা-ই। এঁরা সব কাজ করেন আখের গোছানোর জন্যে। নিজেদের ব্যাংক-বীমা ইত্যাদি জটিল কাব্যিক বিষয়গুলি ঠিক রাখাই এঁদের কাব্যভাবনার প্রধান উৎস। এঁরা যখন প্রেমের কবিতা লেখেন, বুঝতে হবে তা লেখা হয়েছে বসের স্ত্রীকে খুশি করবার জন্যে; যখন বিরহের কবিতা লেখেন, তখন বুঝতে হবে কোনো মন্ত্রী যাচ্ছেন বিদেশ সফরেএবং কবি সক্ষম হননি তার সফরসঙ্গী হতে।

সিম্বলিস্ট বা প্রতীকবাদী :
প্রতীক শব্দের অর্থ—'মার্কা'। ঢাকার বাইরে প্রতীকবাদী কবিরা সবাই 'মার্কাবাদী' অর্থাৎ জিন্দাবাদী। অমুক 'জিন্দাবাদ', তমুক 'মুর্দাবাদ' করাই এঁদের প্রধান লক্ষণ। এঁদের মধ্যে অগ্রসর যাঁরা, তাঁরা আবার নেত্রীর ছবির নিচে নিজের পদ্য জুড়ে দিয়ে পোস্টার বের করেছেন। দেশের পার্লামেন্ট নির্বাচনের সময় এঁদের ব্যস্ততা ছিলো দেখবার মতো।

নার্সিসিস্ট বা স্বপ্রেমবাদী
এই কবিকুলের লক্ষণ নিঃসন্দেহে আত্মপ্রেম। এঁরা নিজেদের পদ্যের প্রশংসা করে নিজেরাই প্রবন্ধ লেখেন এবং নিজেদের সম্পাদিত পত্রিকায় তা প্রকাশ করেন।

ইমেজিস্ট বা চিত্রকল্পবাদী
ইমেজ শব্দটির অর্থ প্রতিচ্ছবি। অর্থাৎ ছায়াছবি। চলচ্চিত্র শব্দটির সঙ্গেও চিত্রকল্প শব্দটির আত্মীয়তা লক্ষণীয়। যে সকল কবি চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্য রচনা করে থাকেন, তাদের চিত্রকল্পবাদী বলা হয়ে থাকে।

নিহিলিস্ট ও নেতিবাদী :
এঁদের নাক উঁচু, ভুরু সর্বদাই কোঁচকানো। কিস্যু হচ্ছে না, কিস্যু হবে না—এই হচ্ছে এঁদের স্লোগন। যতো বড় কবির যতো মানসম্পন্ন কবিতাই এঁদের সামনে ধরা হোক না কেন, এরা বলবে এর মধ্যে কবিতা কোথায়। সাধারণত শাহবাগের চায়ের দোকানে এঁদের দেখতে পাওয়া যায়।

মার্ক্সিস্ট বা মার্কসবাদী
মার্ক্সকে সাহায্য সহযোগিতা করা, তাকে বাঁচিয়ে রাখাই মার্কসবাদী কবিদের বৈশিষ্ট্য। এতোদিন পর্যন্ত কবিরা জগতটাকে বর্ণনা করেছেন, এখন দরকার তাকে আত্মসাৎ করা—এই হচ্ছে মার্কসবাদী কবিদের লক্ষ্য। এজন্যে দুচারটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করা.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাংলা ভাষায় আরবি ফারসি শব্দ ঢুকিয়ে দেয়া, বাবু-সংস্কৃতির বলে রবীন্দ্রনাথকে বর্জন করা ইত্যাদি মার্কসবাদী কবিদের প্রধান কর্তব্য। বিনিময়ে এরা লাভ করেন রুটি-রুজির নিশ্চয়তা অর্থাৎ ডলার।

সুররিয়ালিস্ট বা পরাবাস্তববাদী

স্বয়ংক্রিয় পংক্তিমালা রচনা করার জন্যে এঁরা সাধারণত প্রচুর মাদকদ্রব্য গ্রহণ করেন। শব্দের রঙ দেখা বা সঙ্গীতের গন্ধ শোঁকার জন্যে সাধারণতঃ জলীয়, বায়বীয় সব ধরনের মহৌষধি এঁরা নিজদেহে প্রয়োগ করেন। তবে বর্তমানে এঁদের অনুসারীর সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে।

এক্সিবিশনিস্ট বা প্রদর্শনবাদী

প্রদর্শনবাদীদের দূরদর্শনবাদীও বলা যায়। এঁদের দেখা যায় টিভিতে, এঁদের শোনা যায় রেডিওতে। এদের কাউকে কাউকে সারাক্ষণ দেখা যায় মঞ্চে। এঁদের পাঠক নেই, আছে শ্রোতা, আছে দর্শক।

অপোরচুনিস্ট বা সুবিধাবাদী

বাংলা পদ্যে সোনার সিংহাসনটি এঁদের কাছে পাকা ইজারা দেয়া হয়েছে। সব ধরনের সুবিধার পেছনে পেছনে এঁরা আছেন। ঘন ঘন লেজ নাড়া আর জিভ থেকে লালা ঝরানো এঁদের বৈশিষ্ট্য। এদেরকে দেখা যাবে নজরুল একাডেমীতে, শিল্পকলা জাতীয় অন্য একাডেমীতেও। এঁদের দেখা যাবে বঙ্গভবনে, রঙ্গভবনে। ভোল পাল্টানোই এঁদের স্বভাব, এঁদের সম্পর্কে অতিরিক্ত না বলাই স্বাস্থ্যসম্মত।

যাতীয়তাবাদী

এই যাতীয়তাবাদ হচ্ছে নব্য জাতীয়তাবাদ। 'জ' উচ্চারণ করতে হয় কল্‌ব থেকে বাতাস এনে। এক সমরনায়ক এই উচ্চারণনীতির প্রবক্তা। তাঁর সাম্প্রতিক অনুসারীদের মধ্যে যাঁরা পদ্যচর্চা করছেন, তাঁরাই এই যাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এঁদের সম্পর্কেও বেশি না-বলাটাই নিরাপদ।

উপরে লিখিত প্রধান গোষ্ঠীগুলি ছাড়াও কতোগুলি উপগোষ্ঠী আছে বর্তমান ঢাকাই পদ্যে। যেমন : সন্ত্রাসবাদী, উগ্রতাবাদী, শরীরবাদী (অথবা শরীরবাদিনী), আছেন মহিলাবাদী (মেয়েদের পাতায় লেখেন), পুরুষবিদ্বেষবাদী। সর্বোপরি আছেন কদলীকৈবল্যবাদী।

সবগুলির বর্ণনা দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু একটি নতুন বাদ নিজের নামে প্রবর্তন করবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। সেটি হচ্ছে কলামিস্ট বা স্তাম্ভিকতাবাদী গোষ্ঠীর বাদ বা ইজম— কলামিজম বা স্তাম্ভিকতাবাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আরেকটি নতুন বাদ আস্তে আস্তে আকার পাচ্ছে। সেটি হচ্ছে ম্যাজিক রিয়ালিজম। বাংলাদেশে ম্যাজিক রিয়ালিজমের লক্ষণ হচ্ছে স্বামী বীর্যহীন ও স্ত্রী উর্বরা হলে সেই দম্পতি জাদুকরি বাস্তবতায় সন্তান লাভ করে থাকে। পতিত স্বৈরাচারের সুবিধাবাদী উপাসকবৃন্দ ও যাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী মিলিত হয়ে এই নয়াবাদের পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে।

জানুয়ারি ১৯৯২, মাটি

রেডিমেড ইতিহাস বিতান

(এখানে বিভিন্ন সাইজের ও ফ্যাশনের ইতিহাস রেডিমেড ও অর্ডারমাফিক সরবরাহ করা হয়)

বিভিন্ন রাজনৈতিক পার্টি নগদমূল্যে কিনে নেবে, এই আশায় দেশের স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের কিছু নমুনা কপি প্রদর্শনের জন্য দেয়া হলো।

নমুনা: এক

এ দেশের মানুষ দীর্ঘকাল যাবৎ স্বাধীনতা চাহিয়াছে। কিন্তু পাইবে কী করিয়া ? কারণ দেখা গিয়াছে, তাহারা অতীতে সর্বদাই ভুল মার্কায় ভোট দিয়াছে। ১৯৭০-এও এইরূপ হইল। মূর্খ জনগণ যাহাদের নির্বাচিত করিলো, তাহারা নির্বাচিত হইয়াই আত্মসমর্পণ করিলো। হায়, কী হইবে এখন দেশের ? এই চিন্তায় একজন সৈনিকের ঘুম নাই। কিন্তু তিনিও কোনো উপায় খুঁজিয়া পাইতেছিলেন না। হঠাৎ তাহার তন্দ্রামতো আসিলো। তিনি শুনিতে পাইলেন কে যেন তাহাকে বলিতেছে— এ মুর্খ, স্বাধীনতা ঘোষণা কর। যে কথা সেই কাজ। তিনিই সোজা চট্টগ্রাম বেতারে গিয়া ঘোষণা করিলেন: আমি, আমি মেজর অমুক, আমি আজ হইতে বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করিলাম এবং এই রাষ্ট্রের আমিই প্রেসিডেন্ট। সেদিন ছিলো ২৬শে মার্চ। সেই দিন হইতে জাতি এই দিবসটিকে শ্রদ্ধার সহিত স্বাধীনতা দিবস বলিয়া পালন করিয়া আসিতেছে।

নমুনা: দুই

বাংলাদেশীদের ইতিহাস ঔপনিবেশিক শাসন শোষণ পরাধীনতার ইতিহাস। দুইশত বছর ব্রিটিশরা শাসন করিয়াছে। চব্বিশ বছর শাসন করিয়াছে পাকিস্তানীরা। ইহা তবু একরূপ সহ্য ছিল, এই পরাধীনতা ছিল মেকি পরাধীনতা। প্রকৃত পরাধীনতা শুরু হইলো '৭১ সালে। '৭৫ পর্যন্ত এই দেশ ছিলো ভারতের শাসনাধীন। ১৯৭৫ সালে এদেশের সেনাবাহিনীর কিছু সূর্য সন্তান এই পরাধীন জাতির মুক্তির স্বপ্নে পাগল হইয়া উঠিলেন। তাহারা '৭৫ এর ১৫ আগস্ট বাংলাদেশ বেতারকে রেডিও বাংলাদেশ বানাইয়া এই দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। সেইদিন হইতে জাতি ১৫ই আগস্টকে শ্রদ্ধাভরে স্বাধীনতা দিবস বলিয়া পালন করিয়া আসিতেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নমুনা: তিন

সাচ্চা আযাদী বলিতে কিছু নাই। কৌম 'সার্বভৌম' হইতে পারে না (নাউযুবিল্লাহ)।

সারা জাহানের মুছলমান ভাই বেরাদারগণ এক কৌম (আলহামদুলিল্লাহ)। সারা জাহানের মুছলমানগণ যেদিন একই রাষ্ট্র কায়েম করিতে পারিবে, সেদিন মুছলমানগণ সাচ্চা আযাদী লাভ করিতে পারিবে। তবে, সবকিছু হইবে আল্লাহ্‌তালার মনোনীত জামাত ও জামাতের আমীর-ওমরাহ্‌গণের খায়েশমাফিক।

যাহা হউক, ১৯৪৭ ইশায়ীতে তবু একটা আযাদী পাওয়া গিয়াছিল। ইহাতে একটি বৃহত্তর মুসলিম রাষ্ট্র কায়েম হইয়াছিল।

কিন্তু ইবলিশের চেলারা হিন্দুস্তানের ফেরেকে পড়িয়া সেই সোনার পাকিস্তান ভাঙিয়া দিয়াছে। ইন্নালিল্লাহে... কিন্তু এই কৌম তাহা মানে না। তাই ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট এদেশের আসল আযাদ দিবস।

নমুনা: চার

১৯৫৭ সালে মৌলানা ভাসানী কাগমারী সম্মেলনে বলিলেন, ওয়ালাইকুম আস্ সালাম। ইহার অর্থ যাহারা বুঝিবে না তাহারা সিআইএ'র এজন্ট। ইহার অর্থ কি তিনি পাকিস্তানীদের বলিলেন, আপনাদের উপরও শান্তিবর্ষিত হউক ? না, ইহার অর্থ হইল, পশ্চিম পাকিস্তানের সহিত আর পূর্ব পাকিস্তান একসঙ্গে থাকিতে পারিবে না। ইহাই সর্বাগ্রে স্বাধীনতার ঘোষণা। সম্মেলনের দিবসটিকেই জাতি স্বাধীনতা দিবস মনে করে।

নমুনা: পাঁচ

১৯৭১ সালের ২ মার্চ আ.স.ম. আব্দুর রব প্রথম স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেন। এই পতাকার দরজি ছিলেন গুলিস্তানের অমুক খলিফা। এই পতাকার বাঁশ সরবরাহ করেন অমুক ডেকোরেটর। সুতরাং, ঐ দিনটিই আমাদের স্বাধীনতা দিবস।

নমুনা: ছয়

শত বছরের শত প্রতীক্ষা শেষে
রবীন্দ্রনাথের মতো দৃপ্ত পায়ে হেঁটে
অতঃপর কবি এসে জনতার মঞ্চে দাঁড়ালেন।
তখন পলকে দারুণ ঝলকে তরীতে উঠিল জল
হৃদয়ে লাগিল দোলা
জনসমুদ্রে জাগিল জোয়ার সকল বাঁধন খোলা
কে রোধে তাঁহার বজ্রকণ্ঠ বাণী।
গণসূর্যের মঞ্চ কাঁপিয়ে কবি শোনালেন তাঁর
অমর কবিতাখানি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম'—
এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম;
সেই থেকে স্বাধীনতা এ শব্দটি আমাদের।

৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯০, পূর্বাভাস

সাক্ষাৎকার গল্প

জনপ্রিয় 'শিল্পী'গণ জীবতাবস্থায় সাধারণত প্রচুর সাক্ষাৎকার দেন। এই সাক্ষাৎকারগুলিতে তাঁরা আত্মপক্ষ সমর্থন করেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে তাঁরা একটি গল্প বলেন। আমি শতকরা একশ ভাগ গ্যারান্টি দিতে পারি, বাংলাদেশের সব নিম্নাঙ্গ শিল্পী-সাহিত্যিকদেরই এ গল্পটা জানা আছে এবং সবাই এই একটা গল্পই নিজের জীবনে ঘটেছে বলে দাবি করেন।

প্রথমে গল্পটা বলে নিই। আমার বাল্যকালে কোনো একদিন এই গল্পটা আমি শুনি আমার বোনের কাছ থেকে। দুই ভাই। বড় আর ছোট। ছোটভাই কবিতা লিখে বড় ভাইকে পড়তে দেয়। বড়ভাই পড়ে ঠোঁট উল্টিয়ে বলেন, ধুত, এটা কোনো কবিতা হলো ? ছন্দে ভুল আছে। ছোটভাই আরো নিষ্ঠার সঙ্গে রাত জেগে ছন্দ মিলিয়ে আরেকটা কবিতা লেখে। বড়ভাইকে দেখায়। বড়ভাই আবার মহাবিরক্তির সঙ্গে বলেন, ধুত এটা কোনো কবিতা হরলা। ছন্দ-টন্দ কিস্যু নেই। এবার ছোটভাই মহাযত্নে আরেকটি কবিতা লিখে বড়ভাইকে দেয়। বড়ভাই যথারীতি বলেন, ধুত, তোর দ্বারা কবিতা-টবিতা হবে না, বুঝেছিস। কবিতা হচ্ছে প্রতিভাবানের কাজ। তোর এ কবিতাটিতে অন্তত ছাব্বিশটা ছন্দপতন আছে। ছোটভাই এবার মুখ খোলে: দাদা, এই কবিতাটি আমার লেখা নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা। আমি হুবহু কপি করেছি। কোনো ভুল নেই। রবিবাবু যদি 'এক কবিতা লিখতে গিয়ে ছাব্বিশ জায়গায় ছন্দের ভুল করেন, তবে—'

আমার শৈশবে শোনা গল্পটি যে এতো কাজের তা জানা ছিলো না। এই একই গল্প আমাকে বারবার শুনতে হচ্ছে। সব নিম্নাঙ্গ শিল্পসাহিত্যিকগণ এই একটা গল্পই তাদের সাক্ষাৎকারে বারবার শুনিয়ে যাচ্ছেন।

উদাহরণ দিয়ে কথা বললে বুঝতে সুবিধা হয়। উদাহরণ দিয়েই বলি।

ধরা যাক, আপনি হুমায়ুন ফরীদি'র সঙ্গে কথা বলছেন। তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'দহন'-এর মতো ছবি ছেড়ে 'সন্ত্রাস'-এর মতো ছবিতে অভিনয় করছেন—আপনার খারাপ লাগে না ? চলচ্চিত্রবোদ্ধারা তো আপনার তীব্র সমালোচনা করছেন। এ প্রশ্নের উত্তরে ফরীদি কী বলবেন ? তিনি বলবেন, আরে ভাই রাখেন তো, শিল্পবোদ্ধাদের কথা। ওই শালাদের আমার জানা আছে। আমার এক অধ্যাপক-বন্ধু আছে। আর্টফিল্ম, আর্টফিল্ম বলে পাগল। শর্ট ফিল্মের উদ্বোধন করেন পাঞ্জাবি পরে। আমাকে বলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ফরীদি, তুমি নষ্ট হয়ে গেছো। সেদিন রাত্রিবেলা ওর বাসায় গেছি। দেখি 'ভিসিআর'-এ 'কোরবাণি' দেখছেন। আমাকে দেখেই তাড়াতাড়ি আর্টফিল্ম লাগালেন। অবস্থা বুঝেন।

কেবল ফরীদি নয়, বাংলা সিনেমার সব অভিনেতা-অভিনেত্রীদের এই একটা গল্প মুখস্থ। আপনি কোনো চলচ্চিত্র-নটের কাছে যান, তিনি এই একটি গল্প আপনাকে শোনাবেনই।

যাঁরা পপুলার ছবি আঁকেন, রিয়েলিস্টিক কাজ করে অর্থ-যশ দুই-ই কামিয়েছেন, সুররিয়েলিস্টিক কাজ-কর্ম তেমন বোঝেন না, দরকারি পড়াশুনাটা কম; তাঁদের একজনের যদি সাক্ষাৎকার নেন, তবে তিনি গল্পটা কোন্ কায়দায় বলবেন ? তিনি বলবেন, রাখেন ভাই ইন্টেলেকচুয়ালদের কথা। শোনেন, একবার আমি ছবি আঁকছি— জলরঙে। দেখি, আমার এক আঁতেল বন্ধু এসে হাজির। একটা কাগজ নিয়ে বলছে, দোস্ত, এই ছবিটা দারুণ এঁকেছিস। একেই তো বলে অ্যাবস্ট্রাকট। তাকিয়ে দেখি, কাগজের ওপর মুরগির পায়ের ছাপ। মুরগির পায়ে রঙ লেগে গিয়েছিলো। কাগজের ওপর দিয়ে হেঁটে গেছে। কাগজের ওপরে পড়ে গেছে পায়ের ছাপ। সেই ছাপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে আমার শিল্পবোদ্ধা বন্ধু।

একটাই গল্প। কবিদের সম্পর্কেও প্রচলিত। এক কবিতা পাঠের আসর। কবিতা পাঠ শেষে সমালোচকরা পঠিত কাব্যের সমালোচনা করবেন।

কবিদের কবিতা পাঠ শেষ। সমালোচকরা উঠলেন বলতে। সবার সম্পর্কে একথা-সে-কথা বলার পর সকল সমালোচক একবাক্যে স্বীকার করলেন, হ্যাঁ, কবি শামসুল কাদিরের কবিতাই সেরা। যেমন ভাষা, তেমনি ভাব। কবি শামসুল কাদিরকে বলা হলো নিজের কবিতা সম্পর্কে বলতে। তিনি ভগ্নহৃদয়ে বললেন— ভাই, দুঃখের কথা কী বলবো, কবিতাটি ভুলে ফেলে এসেছি বাসায়, পকেটে ছিলো লন্ড্রির স্লিপ, ভুলক্রমে সেটিই পড়ে ফেলেছি। 'বলাকা অটোমেটিক ড্রাই ক্লিনার্স, একদিনে ধোলাই করা হয়'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

যদি আপনি টেলিভিশনের নাট্যকার হন, তবে সাক্ষাৎকার দেবার সময় কোন্ গল্পটি বলবেন ? হুমায়ুন আহমেদের 'এলেবেলে'তে শিশুদের বিপজ্জনক কাজ সম্পর্কে যে গল্পটি অছে সে-টি। হুমায়ূন সাহেবের একজন অধ্যাপক-বন্ধু টেলিভিশনের মহাসমালোচক। টিভি-নাটক—ওটি তো আমার পরিচারিকার খুবই প্রিয় জিনিস, ইডিয়ট বক্স আর কাকে বলে।

একদিন হুমায়ূন সাহেব তাঁর অধ্যাপক-বন্ধুটির বাসায় গেলেন। ড্রইংরুমে বসে বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছেন। এমন সময় বন্ধুর শিশুপুত্র এসে উপস্থিত। বাবা, চলো, টিভি দেখবে না ?

: না, বাবা, তুমি দেখো, যাও।

— কেন, বাবা, তুমি তো রোজ টিভি দেখ, আজ দেখবে না ক্যানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

: না, বাবা, তুমি যাও।

— বাবা, 'যৌবনের জোয়ার' সিনেমাটি তো এতোক্ষণে দেখলে। অর্ধেক সিনেমা দেখে কেউ উঠে আসে। তুমি তো বাবা কোনো ছবিই অর্ধেক দেখে উঠে আসো না।

এই হচ্ছে টিভি নাট্যকারদের গল্প। এখন বলা দরকার, কথাসাহিত্যিকদের গল্পটা। ওটিও বলেছেন হুমায়ুন আহমেদ তাঁর সর্বশেষ সাক্ষাৎকারে। হুবহু তুলে দিই। 'আপনার লেখাগুলি নাকি হালকা লেখা, আপনার লেখাগুলি পড়তে আরাম, কিন্তু ভাই গভীরতা নেই। আমাকে অসংখ্যবার এ-কথা শুনতে হয়েছে। একজন বিশিষ্ট সাহিত্যিক এ-কথাগুলি আমাকে প্রায়ই বলেন। আমার শুনতে খারাপ লাগে। আমি ঠিক করলাম যে, একবার গভীর লেখা লিখে দেখাবো যে, আমি গভীর লেখা লিখতে পারি। আমি অনেক খাটাখাটুনি করে একটা গল্প লিখলাম। এটার নাম হলো 'খাদক'। উনি পড়ে বলেন যে, পড়তে খুব আরাম, ইন্টারেস্টিং ক'রে লেখা হয়েছে। কিন্তু গভীরতা নেই। আরো কয়েকটি গল্প লিখলাম, একটা উপন্যাসও ওকে পড়তে দিলাম। তিনি প্রতিটি লেখা খুবই আগ্রহ নিয়ে পড়লেন এবং বললেন যে গভীরতা ব্যাপারটি নেই। শেষে প্রচুর খাটাখাটুনি করে একটা গল্প দাঁড় করালাম। গল্পটা লেখা হলো সাধুভাষায়, যদি তাতেও গভীরতা আসে। যথারীতি এ লেখাটিও তাকে দেয়া হলো। তিনি পড়লেন এবং বললেন যে, সবই আছে, পড়তে আরাম লাগে কিন্তু গভীরতা নেই। তখন আমি মনে খুব আনন্দবোধ করলাম। কারণ গল্পটির নাম হচ্ছে 'শৈলজ শিলা' লেখকের নাম মানিক বন্দোপাধ্যায়। আমি মূল গল্পটার শুধু পাত্র-পাত্রীর নাম বদলে মুসলমান বানিয়ে দিয়েছিলাম। আর কিছুই বদলাই নি।'

এইসব গল্প অনেকেই বিশ্বাস করেন। কেননা, মানুষ মাত্রই বিশ্বাসপ্রবণ। আমি করি না। কৈশোরেই আমি বিশ্বাসটা হারিয়েছি। আমি যখন সদ্য ইন্টারমেডিয়েট পাস করেছি তখন সৈয়দ শামসুল হক রংপুরে গেলেন। আমি দুরুদুরু বক্ষে তাঁর সাক্ষাৎকার নিতে গেলাম। লিটল ম্যাগাজিনে সাক্ষাৎকারটি ছাপা হবে। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম—আপনি সর্বপ্রথম রংপুর আসেন কবে, কেন ? সৈয়দ হক বললেন, আমার বাবার সঙ্গে, ট্রেনে করে নতুন বই কিনবো বলে। এই সাক্ষাৎকারটি নেয়া হলো সকালে রংপুর সার্কিট হাউজে। সন্ধ্যায় টাউন হলে অনুষ্ঠান, প্রধান অতিথি সৈয়দ শামসুল হক। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি বললেন: আমি রংপুরে প্রথম আসি একা, বই কিনবো বলে, সন্ধ্যায় ট্রেন থেকে নেমেছি রংপুর স্টেশনে, ভয় ভয় লাগছে, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন জাপটে ধরলো আমাকে, ভয়ে শিউরে উঠলাম, হাত ছাড়িয়ে নিয়ে পেছনে তাকিয়ে দেখি, আমার বাবা।

গল্পকাররা কীভাবে গল্প বানান, তা দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। সেই মুগ্ধতা আজো কাটেনি।

৫ আগস্ট ১৯৯১, পূর্বাভাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একালের রূপকথা

এক.

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের বাঁ হাতের তালু চুলকাচ্ছে। তিনি ডান হাত দিয়ে বেশ মজা করে চুলকাতে লাগলেন। কিছুদিন আগে তাঁর চুলকানি হয়েছিলো, হাতে সে-দাগ এখনো মুছে যায়নি। কিন্তু এখন-যে হাত চুলকাচ্ছে তার কারণ কোনো চর্মরোগ নয়। খোস-পাঁচড়া হলে হাতের তালু চুলকায় না। হাতের তালু চুলকালে অর্থাগম ঘটে, টাকা পাওয়া যায়, এটি একটি সুলক্ষণ।

আজ সকালবেলা তাঁর মন ভালো হয়ে গেলো। এই জেলখানার নির্জন কক্ষে তাঁর মন সাধারণত ভালো থাকে না।

কিন্তু তিনি বুঝতে পারলেন না, জেলখানার ভেতরে তিনি টাকাটা পাবেন কী করে!

অবশ্য তাঁর প্রথম স্ত্রী বেগম রৌশন এরশাদ কারাগারের বাইরে। হয়তো তিনি টাকা পাবেন। অবশ্য সে টাকা পেলে হাত চুলকানো উচিত তারই, আমার নয়—ভাবলেন এরশাদ। যখন সে ফার্স্টলেডি ছিলো, তখনও নানাভাবে সে টাকাপয়সা পেতো, সে-টাকার খোঁজ তো আমি পেতাম না।

তা হলে আজ তাঁর মনটা ভালো হয়ে গেলো কেন?

কারণটা তিনি আবিষ্কার করতে পারলেন খানিকক্ষণ পর, যখন তাঁকে দৈনিক পত্রিকা দেয়া হলো। একটি খবরের দিকে তাঁর চোখ আটকে গেলো। প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়ার দৈহিক নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে একটি বিল সংসদে পাস হয়েছে। তিনি বিলটি পুরোপুরি পড়লেন। তাঁর সজারু গোঁফের নিচে সরু হাসি খেলতে লাগলো। বিলটি নতুন কিছু নয়। ১৯৮৬ সালে অধ্যাদেশ বলে তিনি যে পিএসএফ গঠন করেছিলেন, সেই একই বাহিনী একইভাবে গঠিত করছেন খালেদা, শুধু নামটি বদলে রাখা হয়েছে এসএসএফ।

হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর টেবিলে বসলেন কাগজ-কলম নিয়ে। এসএসএফ গঠনের নিন্দা জানিয়ে একটি বিবৃতি তিনি তৈরি করবেন। তিনি লিখলেন, 'সেনাবাহিনীকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহারের এ হীন চক্রান্ত প্রতিহত করতে হবে। খালেদাবিরোধী জনতার তীব্র আন্দোলন দমন করার জন্যে রক্ষী বাহিনীর কায়দায় এই বাহিনী গঠন করা হয়েছে।' এ পর্যন্ত লিখে তিনি আবার হাসতে লাগলেন। বিবৃতিটিও নতুন কিছু নয়। ১৯৮৬ সালের ১৫ জুন তাঁর অধ্যাদেশটি জারি হবার পর খালেদা এ বিবৃতি দিয়েছিলেন। তিনি শুধু 'এরশাদের' বদলে 'খালেদা' শব্দটি বসিয়েছেন।

ব্যাপারটা তাঁর কাছে কবিতার মতো মনে হলো—যেন প্রতীকের ব্যাপার। 'এরশাদ' শব্দটি কেটে বসিয়ে দেয়া শুধু 'খালেদা'। আচ্ছা, স্বৈরাচারী শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কী? স্বৈরাচারিনি ? হাতের কাছে একটা অভিধান থাকলে ভালো হতো। কিংবা ভালো হতো যদি পাওয়া যেতো সৈয়দ আলী আহসানকে। তা তো আর পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি দীর্ঘশ্বাস গোপন করলেন।

বিষাদ এসে যখন ভর করে তখনই তাঁর মনে পড়ে জিনাতকে। জিনাত এই কারাগারেই আছে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। কোন্ কক্ষে থাকে জিনাত? কোন দিকে ? তিনি টস্ করতে লাগলেন। টসে উঠলো উত্তর দিক। তিনি উত্তরের দিকে তাকালেন। একটা জানালায় একটা রঙিন কাপড়ের মতো দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে জিনাতেরই কক্ষ। তিনি বাথরুমে গেলেন। জুতা দিয়ে বাথরুমের আয়না ভাঙলেন। একটা টুকরো নিয়ে এলেন ঘরের জানালার ধারে। জানালা দিয়ে রোদ আসছে। সেই রোদে ধরলেন আয়নার টুকরো। এক টুকরো আলো প্রতিফলিত হয়ে পড়লো ঘরের ছাদে। সেই প্রতিফলিত আলোর টুকরো তিনি ধরলেন উত্তর বরাবর। সেই আলো গিয়ে পড়লো উত্তরে সেই জানালায়, তারপর লোহার গরাদ গলে ঢুকে পড়লো ঘরে।

এরশাদ শিশুর মতো হাততালি দিয়ে উঠলেন। তারপর অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রইলেন সেই এক জানালার দিকে।

কিন্তু তাঁর আলোকবার্তার কোনো উত্তর তিনি পেলেন না।

দুই.

উপজেলা শব্দটি কেটে 'থানা' করতে হবে। বাংলাদেশে মোট ৪৬০টি উপজেলা। প্রতিটি উপজেলায় ৫০০০ টির মতো সীলমোহর বদলাতে হবে। সরকারি সাইনবোর্ড বদলাতে হবে ১০০টির মতো। প্রতিটি উপজেলার সীমানায় 'স্বাগতম, অমুক উপজেলা', 'খোদা হাফেজ, অমুক উপজেলা' সিমেন্টে খোদাই করে লেখা আছে অন্তত গোটাদশেক দফায়। এগুলি বদলাতে হবে। কত রঙ কত তুলি কত টিন কত সিমেন্ট নষ্ট হবে এ খাতে ? মোট কত টাকা ব্যয় করতে হবে ? এ বরাদ্দ কোথেকে আসবে ?

ম্যাডাম, আপনি কাইন্ডলি বলে দেবেন এই বরাদ্দ কোথেকে আসবে ? সাইফুর রহমান জিজ্ঞেস করলেন ম্যাডামকে।

ম্যাডাম হেসে ফেললেন। এ কী প্রশ্ন জিজ্ঞেস করছেন আপনি আমাকে ? আপনার কি মাথা ঠিক নেই ? এক কাজ করুন, আপনি নারকেল তেলের ওপর থেকে ভ্যাট কমিয়ে দিন। এর ফলে আপনার বিরলকেশ ব্রহ্মতালু ঠাণ্ডা থাকবে।

সাইফুর রহমান ঘামতে লাগলেন। ম্যাডাম স্নিগ্ধ করে হাসলেন। টাকাপয়সা নিয়ে চিন্তা করবেন না। হুদা সাহেব ব্যবস্থা করেছেন।

—হুদা সাহেব ব্যবস্থা করবেন কী করে ?

: উপজেলাকে থানা করায় যে অর্থসংকট দেখা দিয়েছে, তার ফলে সাপ্তাহিক বিচিত্রায় আর অতিরিক্ত লোক রাখা সম্ভব হচ্ছিলো না: তাই তিনি 'অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে' এর নির্বাহী সম্পাদক শাহরিয়ার কবিরকে অব্যাহতি দানের ব্যবস্থা করেছেন।

সাইফুর রহমানের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। এতো বড়ো অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান এতো সোজা। তিনি ম্যাডামের পা ছুঁয়ে সালাম করতে উদ্যত হলেন।

ঠিক এই সময়ে তাঁর ঘুম ভেঙে গেলো। এসি থাকা সত্ত্বেও ওই কক্ষে তিনি কুলকুল করে ঘামছিলেন।

২৩ জুলাই '৯২, কাগজ

নমিনেশন ইন্টারভিউ গাইড

এমপি পদে নির্বাচনে দাঁড়াতে পার্টির মনোনয়ন পাবার জন্যে ইদানীং ইন্টারভিউ-এর প্রচলন হয়েছে। আগে এমন ছিলো না। আগে ক্ষমতাসীনদের মনোরঞ্জন কিংবা প্রথম মহিলাকে নগদ প্রদানের মাধ্যমেই মনোনয়ন পাওয়া যেতো। কিন্তু এখন দিন পাল্টেছে। সুতরাং, এই কঠিন প্রতিযোগিতার যুগে প্রার্থীকে নানাভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে। অন্যসব ইন্টারভিউ-এর জন্যেই বাজারে গাইড পাওয়া যায়। এমনকি কেজি স্কুলে ভর্তির গাইডও বের হয়েছে। কেবল ইলেকশন ইন্টারভিউ-এর কোনো গাইড বাজারে নেই। সেই অভাব পূরণ করতে গদ্যকার্টুনের প্রস্তাবনা :

জনৈক অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ান প্রণীত সিওর সাকসেস ইন নমিনেশন ইন্টারভিউ

ইন্টারভিউ মানে ইন্টারভিউ-ই। ইহা হেলাফেলা করিবার বস্তু নহে। অন্যান্য যে কোনো ভর্তি কিংবা চাকুরির মৌখিক পরীক্ষার মতোই ইহা গুরুত্বপূর্ণ। এই পরীক্ষায় পাস করিবার জন্যে চাই গভীর অধ্যয়ন আর পূর্বপ্রস্তুতি। যাহারা বিভিন্ন পার্টিতে নমিনেশন চাহিয়া দরখাস্ত করিয়াছে, তাহাদের জন্যে উত্তরসহ সম্ভাব্য প্রশ্নমালা নিম্নে সন্নিবেশিত হইল। ইহার শতকরা ৯৫ ভাগ প্রশ্ন কমন পড়িবে।

ইন্টারভিউ'র আগের রাত্রিতে অধিকক্ষণ জাগিয়া থাকিবে না। ভোরে গাত্রোত্থান করিবে। শেভ করিয়া গরম পানিতে গোসল করিবে। অতঃপর সতর্কতার সহিত পোশাক নির্বাচন করিবে। নতুন শাদা সূতির পাজামা-পাঞ্জাবির ওপরে কালো হাফহাতা কোট পরিলে পায়ে পাম্প-সু লাগাইবে। সাফারি কোট পরিতে হইলে চোখে সানগ্লাস লাগাইতে ভুলিও না। দাড়ি থাকিলে তাহাতে মেহেদি লাগাইয়া খোশবু ব্যবহার করিবে। পার্টি অনুযায়ী পোশাক পরিবে। এক পার্টির পোশাক পরিয়া ভুলেও অন্য পার্টির পার্লামেন্টারি বোর্ডের সামনে যাইও না।

নিচে কয়েকটি পার্লামেন্টারি বোর্ডের নমিনেশন ইন্টারভিউ'র আদর্শ প্রশ্ন ও আদর্শ উত্তর দেওয়া হইল। কোনো প্রশ্ন না পারিলে সোজাসুজি 'জানি না, মাফ করবেন' বলিবে না। বরং পেঁচাইয়া ঘুরাইয়া নিজের অজ্ঞতা ঢাকিবে। বুদ্ধি করিয়া বারবার আপা, ম্যাডাম, হুজুর কিংবা লিডারকে সম্বোধন করিবে।

উদাহরণ: এক

: স্লামালেকুম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

—বসুন।

: ধন্যবাদ।

— আপনি কি এবারই প্রথম ইলেকশন করছেন ?

: না, আমি সত্তর সালে নির্বাচন করেছি এবং বিজয়ী হয়েছি।

— একাত্তরে কী করেছিলেন ?

: ইণ্ডিয়ায় গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে...

–থাক্, থাক্, বলতে হবে না, তিয়াত্তরে কী করেছিলেন ?

: জ্বি, তিয়াত্তরেও ইলেকশনে জিতেছিলাম।

—পঁচাত্তরে কী করেছিলেন ?

: (হাত কচলিয়ে) মন্ত্রিসভায় যোগ দিয়েছিলাম।

—'৭৯-এ কী করেছিলেন ?

: জ্বি, ইলেকশন করেছি, জিততে পারিনি। জিততে দেয়নি।

—'৮৬-তে কি করেছিলেন ?

: ইলেকশনে জিতেছিলামই বলা যায়, কিন্তু মিডিয়া ক্যু করে হারায়ে দিলো, এই আর কী।

— আপনি এবার আসুন। ধন্যবাদ।

উদাহরণ : দুই

: আসসালামো আলায়কুম

—বসুন।

: বিসমিল্লাহির রাহমানুর রাহিম (আসন গ্রহণ)।

—এই প্রথম ইলেকশন করছেন ?

: বলেন কী ! জিন্নাহ সাহেব নিজ হাতে আমাকে পলিটিক্সে এনেছেন, তখন থেকেই ইলেকশন করছি ইনশাল্লাহ।

—একাত্তরে কোথায় ছিলেন ?

: দেশে ছিলাম, বীরের মতো ফাইট করেছি।

—বাহাত্তরে কোথায় ছিলেন ?

: কিছুদিন পালায়া ছিলাম। এরপর জেলে নিয়েছে। বুঝেছেন তো, দেশে আইন-কানুন কিছু ছিলো নাকি তখন ?

—পঁচাত্তরের পরে কী করলেন ?

: জেল থেকে ছাড়া তো আগেই পেয়েছি। পরে '৭৯-এ ইলেকশন করে এমপি হয়ে গেলাম।

—ছিয়াশিতে কী করেছেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

: আমি চাই নাই। জনতা ছাড়ে না। ওরাই নমিনেশন পেপার সাবমিট করলো। আমিই ইলেকটেড হয়ে গেলাম আর কী।

—তাহলে এখানে এসেছেন কেন ?

: জাতির সেবা করতে চাই। ঈমান তো কখনো বিসর্জন দেই নাই। জিন্নাহ সাহেবের আমল থেকে দিলে আর জবানে এক। তখনো যে পলিটিক্স করেছি, গত দশ বছরেও তো সেই পলিটিক্সই করলাম। সামনের দিনগুলোতেও ইনশাল্লাহ্ তাই করবো। মার্কা বদলাতে পারি, পলিটিক্স তো আর বদলাই নাই।

—আপনি আসতে পারেন।

: খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

উদাহরণ : তিন

: আচ্ছালামো আলায়কুম ওয়া রাহমাতুল্লাহে বরকাতেহু।

— ওয়ালাইকুম আসসালাম। বসেন।

: আলহামদু লিল্লাহ।

—একাত্তরে কোন্ সেক্টরে ছিলেন।

: আল বদর, ৩২ নং ক্যাম্প, তিন নং সেক্টর।

— কী কী চালাতে জানেন।

: সব। থ্রি নট থ্রি থেকে শুরু করে রামদা।

— কয়টা পাখি মেরেছেন ?

: ১৪ ডিসেম্বর, রায়েরবাজার অপারেশনে ছিলাম।

—মাশাল্লাহ, এরপর কোনো জেহাদে...

: এখন চট্টগ্রাম ট্রেনিং সেন্টারে ট্রেইনার। পায়ের রগ, হাতের কব্জিতে স্পেশালিস্ট।

—মালে গনিমত-এর অভিজ্ঞতা আছে ?

: হে-হে-হে (শরমের হাসি)

— কি, গণ্ডগোলের সময়েও—

: তখন হুজুর জোয়ানি ছিলো, তাকদ ছিলো...

—আচ্ছা, আচ্ছা, আর বলতে হবে না। আপনি আসতে পারেন।

: আসসালামো আলায়কুম ওয়া রহমতুল্লাহ বরকাতেহু।

উদাহরণ ঃ চার

: আসতে পারি।

— সিওর, হোয়াই নট, দিস ইজ ইয়োর রুম।

: থ্যাংক ইউ, লিডার।

— কী অবস্থা ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

: চলছে, কোনোরকম।

— আপনার এলাকায় কে জিতবে ?

: বলা যায় না, এরাও জিততে পারে, ওরাও জিততে পারে। তবে এদের কেন্ডিডেট ভালো না, ওদের টাকার জোর কম।

— তাহলে বলেন, এদের সাথে থাকলে ভালো হয়, না, ওদের সঙ্গে ?

: সবচেয়ে ভালো হয়, এদের সঙ্গেও থাকা, ওদের সঙ্গেও থাকা।

— তা মনে হয় সম্ভব না। যে-কোনো একদিকে যেতেই হবে। নইলে আলাদা।

: আলাদার দরকার নেই। তবে লিডার, এদের সঙ্গে থাকলেই আমার ভালো। এদের তো কেন্ডিডেট নেই, আমার নমিনেশনটা ফাইনাল হতে পরে। তবে ওদের সঙ্গে থাকতে পারলে জেতাটা কনফার্ম হয়।

— আচ্ছা , যাই হোক না কেন, আপনি কিন্তু দাঁড়াচ্ছেনই।

: টাকা-পয়সা ঠিকভাবে দিয়েন, দেখা যাক, এবার পরিচিতি বাড়ুক, পরের বার ফাইট হবে।

— আচ্ছা, এবার আসতে পারেন। লং লিভ—

অনুশীলনী ঃ নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

১। ১৮ দফা ও ১৯ দফার পার্থক্য কি ?

২। ৭ দফা ও ৫ দফার পার্থক্য কি ?

৩। সীল মারিলেই বেহেশ্‌তের টিকিট–এর সমর্থনে পাঁচটি বাক্য বলো।

৪। জর্দার সঙ্গে ভোটের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করো।

৫। ওরা বিদেশের এজেন্ট'–এ বাক্যের সুফল বর্ণনা করো।

৮ জানুয়ারি ১৯৯১, পূর্বাভাস

দি নিউ নয়া জমানার খাবনামা

। পাক-ভারত ইতিহসের প্রখ্যাত জ্যোতিষী বৃটিশভারতের আলোড়ন সৃষ্টিকারী ভারতের শাস্ত্রীয় চিকিৎসায় একাধিক পুরস্কারপ্রাপ্ত মওলানা মোহাম্মদ গোলাম আযম খান হেমায়েতপুরী প্রণীত।

শয্যাগ্রহণের নিয়ম :

উত্তর সিথানে শুইবেন। মুখ কিবলামুখী রাখিবেন। চক্ষু অর্ধমুদ্রিত রাখিবেন। ইনশাল্লাহ ভোররাত্রে খোয়াব দেখিবেন। অচিরেই নিদ্রাভঙ্গ হইবে। অজু করিয়া এই খাবনামা খুলিয়া মিলাইয়া দেখিবেন। আপনার জীবনে এই খোয়াবনামার ফল অব্যর্থ বলিয়া প্রমাণিত হইবে। বিফলে মূল্য ফেরত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

স্বপ্নে কী দেখিলে বাস্তবে কী হইবে

এরশাদকে দেখিলে— অচিরেই আজকের কাগজের পাঠক হইবে।

ম্যাডামকে দেখিলে— পাঁচ টনি ট্রাকের সহিত ধাক্কা লাগিবার আশঙ্কা যোগ রহিয়াছে।

হাসিনাকে দেখিলে— পরিবারে অশান্তি দেখা দিবে, মামলায় হারিয়া ফতুর হইয়া যাইবে।

বদরুদ্দোজা চৌধুরীকে দেখিলে— রোগ শোক বাড়িবে। চিকিৎসকের পেছনে টাকাপয়সা খরচ করিয়া সর্বস্ব হারাইবে।

টেলিভিশনে সংবাদ দেখিলে— রাতকানা রোগে আক্রান্ত হইবে।

অপরাজয় বাংলা'র তিন মূর্তি দেখিলে— কাটা রাইফেলের গুলিতে এক পা হারাইবে।

গর্বাচেভকে দেখিলে— ওপি-টু-তে চান্স পাইয়া আমেরিকা যাইবে।

বুশকে দেখিলে— অচিরেই সংসার ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হইয়া যাইবে।

গায়েবি শক্তির নিকট হইতে ওষুধের ফর্মুলা পাইলে—ইত্তেফাকের বিজ্ঞাপন ম্যানেজার পদে চাকুরি পাইবে।

বিচিত্রা পড়িলে— অচিরেই ফ্যাশন ডিজাইনার পদে চাকুরি পাইবে।

অঞ্জুকে দেখিলে— জলাসক্তি রোগে ধরিবে। পানি দেখিলেই ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলা দেখিলে— পাড়ার রোমিওদের হাতে ধোলাই খাইবে।

বুয়েটে পড়িতে দেখিলে— প্রেমে ব্যর্থ হইয়া আত্মহত্যা করিবে।

আন্তঃনগর ট্রেনে সফর করিতে দেখিলে— সাপ্তাহিক পত্রিকার সার্কুলেশন ম্যানেজার হইবে।

চিত্রবাংলা পড়িতে দেখিলে— ধর্ষণ মামলার আসামি হইবে।

সাঈদীর বক্তৃতা শুনিলে—বউ তালাক হইয়া যাইবে।

সংসদ ভবন দেখিলে— বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক হইবে।

মিছিল-মিটিং দেখিলে— নতুন বেতন কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হইবে।

মাদ্রাসায় পড়িতে দেখিলে—এইড্‌স রোগী হিসাবে সংবাদপত্রের শিরোনাম হইবে।

রাজাকার দেখিলে—চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির চান্স পাইবে।

নির্বাচনে প্রার্থী হতে দেখিলে—অচিরেই কেটিপতি হইবে।

বেইলি রোডে নাটক দেখিলে— বিজ্ঞাপনী সংস্থার কর্ণধার হইবে।

পরী দেখিলে—ইত্তেফাকের রিপোর্টার হইবে।

জনসভা দেখিলে— প্রতারকের খপ্পরে পড়িয়া মোটা অঙ্কের টাকা হারাইবে।

ম্যাকগাইভার দেখিলে—অচিরেই ককটেল বানাইবার ফর্মুলা পাইবে।

আয়োময় দেখিলে—শ্যালিকা-দুলাভাই সম্পর্কের জটিলতায় পড়িবে।

মাসুদ রানা পড়িলে— মুরগি চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িবে।

বিচিত্রা সম্পাদককে দেখিলে—আনন্দ বিচিত্রা'র ফটো-সুন্দরী নির্বাচিত হইবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ধূমপান বিরোধী আন্দোলন করিলে—সিগারেট কোম্পানির শেয়ার কিনিবে।
ইক্ষুর রস খাইলে— অচিরেই ইয়োলোজার্নালিজম আরম্ভ করিবে।
সাঈদাবাদীকে দেখিলে— নিঃসন্তান মহিলা নূরানী চোহরার সন্তান লাভ করিবে।
লন্ডনে বেড়াইতে দেখিলে— চা-বাগানে শ্বশুরবাড়ি হইবে।
আলু খাইলে—বিএনপি'র রাজনীতি করিয়া প্রভূত উন্নতি করিবে।
দৈনিক 'ইনকিলাব' দেখিলে—অচিরেই বেগম জিয়ার মন্ত্রিসভায় স্থান পাইবে।
রেজাউর রহমানকে দেখিলে—দেশছাড়া হইবে।
রওশন এরশাদকে দেখিলে—হিরোইন আসক্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিবে।
আমির হোসেন আমুকে দেখিলে—সর্বগ্রাসী ক্ষুধায় পাইবে।
কর্নেল ফারুককে দেখিলে—অচিরেই ডাকাতি মামলায় ধরা পড়িবে।
সয়ফুর রহমানকে দেখিলে—জুয়ায় অর্থনাশ করিয়া ভিটামাটি বন্ধক দিতে হইবে।
হাতি দেখিলে— অচিরেই বাংলা ছবির নায়ক/নায়িকা হইবে।
সিরাজুল আলম খান দাদাভাইকে দেখিলে—হোটেল শেরাটনে ঢুকিতে পারিবে।
আবাহনী'র মুন্নাকে দেখিলে— স্টেডিয়ামের ব্ল্যাকারদের খপ্পরে পড়িবে।
টারজান দেখিলে—লেংটি পরিয়া বাটি হাতে গুলিস্তানের মোড়ে বসিবে।
এলিজাবেথ টেলর'কে দেখিলে—যে-কোনোদিন সপ্তম বিবাহ করিবে।
হেমায়েতপুর দেখিলে— অচিরেই ছয় টাকা দিয়া পূর্বাভাস কিনিয়া গদ্যকার্টুন পড়িবে।

৯ সেপ্টেম্বর '৯১. পূর্বাভাস

আবার কমলাকান্ত

রঙ্গ করিওনা, রাজপথে রক্ত ঝরিয়াছে।

যাই, ভুরু প্লাক করিয়া আসি। বিউটিশিয়ান বসিয়া আছে, যাই, খোঁপা ফুলাইয়া আসি।

রঙ্গ করিও না, রাজপথে রক্ত ঝরিয়াছে।

মিলনের রক্তের দাগ এখনও রাজপথে লাগিয়া আছে। সেলিমের থেঁতলানো করোটির ফাঁক গলিয়া এক মুষ্ঠি মগজ এখনও কালো পীচে লাগিয়া রহিয়াছে। রঙ্গ করিও না, রাজপথে রক্ত ঝরিয়াছে।

রোল এক।

প্রেজেন্ট ম্যাডাম।

রোল দুই।

ইয়েস ম্যাডাম।

কী ব্যাপার তোমরা আমাকে ম্যাডাম বলিতেছ কেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ম্যাডাম, আপনাকে আর 'আপা' ডাকিব না।

'আপা' ডাকা আউটডেটেড ব্যাপার, আমরা আপনাকে ম্যাডাম ডাকিব। ম্যাডাম, ম্যাডাম, ম্যাডাম...

কল্ মী ম্যাডাম। আপা বলিবেন না, ভাবী তো নয়ই। রঙ্গ করিও না।

মেজর বলিয়া কাহাকেও হেলা করিও না। অখ্যাত বলিও না। একদিন এক ইঁদুর এক সিংহের নিদ্রায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করিল। ইঁদুর বলিল, মাফ করিয়া দিন, একদিন আমি আপনার উপকার করিব।

তুই, আমার কী উপকার করিবি, রে মূর্খ। স্মরণ করো, ইঁদুরটি সিংহের প্রাণ বাঁচাইয়াছিল। কানাকে কানা, খোঁড়াকে খোঁড়া, অখ্যাতকে অখ্যাত বলিও না। নিজে যাকে বড় বলে বড় সেই নয়, লোকে যাকে বড় বলে বড় সেই হয়।

বিশ্বাস হারাইও না। বিপদে ধৈর্য ধারণ করো। আবার নূরলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায় দিবে ডাক—জাগো বাহে কুনঠে সবায়।

এরশাদ হুসেনের বাড়ি রংপুরে যে ছিলো। রংপুরের এরশাদ একদিন ক্ষমতা নিয়াছিলো।

আবার আমার দেশ ঢাকে যেই দালালেরই আলখাল্লায়, নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়।

রঙ্গ করিও না, বিচারপতি সাত্তার জয়লাভ করিল। শাসনকার্য চালাইতে লাগিল। এরশাদ হুসেনের এক ধমকে দাবার ছক উল্টাইয়া গেল।

ইতিহাসের শিক্ষা এই যে, ইতিহাস হইতে কেহ শিক্ষা গ্রহণ করে না।

যাই, জিনসের প্যান্ট ক্রয় করি। মাথায় শাদা ক্যাপ লাগাই।

রঙ্গ করিও না। ৩৮% ভোটার নৌকায় ভোট দিয়াছে। ৩১% ভোটার ধানের শীষে ভোট দিয়াছে।

নিজের চুল নিজে ছিঁড়িও না। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করিও না। ইহাতে অন্যেরা উৎসাহিত হয়।

ভুল স্বীকার করার মধ্যে লজ্জা নাই। বরং ইহা মহত্ত্বের লক্ষণ।

খাল কাটুন। আকাশের নৌকা পানিতে ভাসান। খাল কাটিয়া কুমির আনার কথা মিথ্যা। কুমির নদীতে থাকে। পুকুরেও থাকে। কিন্তু খালে কুমির থাকে না।

মনিরুজ্জামান মিয়ার নাম ভোটার লিস্টে নাই। ড. আনিসুজ্জামানের নামও নাই। জাহানারা ইমামের নামও নাই। ইহার দায়দায়িত্ব কাহার ?

যার ভোট সেই দিন। যাকে খুশি তাকে দিন। দুই দিন পরে নুরুলদিন। রঙ্গ করিও না। বাঘের লেজ দিয়া কান চুলকাইও না।

দুই মহিলা মিলিত হইলে কিছুই উৎপাদিত হয় না। একজন নপুংসকের পক্ষে কিছুই করা সম্ভব নহে। অনেক মহিলা তাহার সহিত যুক্ত হইলেও না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাজনীতিতে শেষ কথা বলিয়া কিছুই নাই। এরশাদ অসুস্থ মির্জা হাফিজকে দেখিতে হাসপাতালে গিয়াছিলেন। বেগম জিয়া যান নাই। ইহা তাহার ব্যক্তিগত ব্যাপার। অন্যের ব্যক্তিগত ব্যাপারে কাহারো হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে।

এখন সকলেই অবসর লইতে চাহে। অবসরপ্রাপ্তদের জন্যে এখন স্বর্ণযুগ। বায়তুল মোকাররমের সামনের একজন ভিক্ষুক বসিয়া থাকে। তাহার সাইনবোর্ডে লেখা: 'অবসরপ্রাপ্ত দারোয়ান।'

বাংলাদেশের গ্রামগুলিতে একজন শিক্ষককে মনে করা হয় সমাজের মাথা। পাকিস্তানে এইরূপ নহে। সেখানে একজন জওয়ানকে সমাজে মনে করা হয় সর্বাধিক গণ্যমান্য।

পাকিস্তানে গণতন্ত্র আসিল। গোলাম ইসহাক খানের কলমের এক খোঁচায় চলিয়া গেল। কাক কা-কা করিতে লাগিল।

বাংলাদেশকে ভারতের কাছে নাকি বিক্রি করিয়া দেওয়া হইবে। স্যার, বাংলাদেশের দাম কতো। ভারত টাকা দিবে ? ছাত্রের এই প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষক কী বলিবেন ?

রক্তের কোনো দাম নাই। রক্ত অমূল্য। ত্রিশলক্ষ মানুষের রক্তের দাম কে শোধ করিবে ? বেচিয়া দেওয়ার জন্যে কেহ দেশ স্বাধীন করে নাই।

যাহারা দাঁড়িপাল্লায় ভোট দিয়াছে, তাহারা পরকালে শান্তি পাইবে। বুড়া আঙ্গুলে অমোচনীয় কালির দাগ দেখাইয়া তাহারা বেহেশতের দরোজা পার হইবে। আব্বাস আলী খান গেটে দাঁড়াইয়া থাকিবেন।

এই জয় ফ্রীডম পার্টির। লোকে ফ্রীডম পার্টিকেই ভোট দিয়াছে। যে এই সহজ কথা বুঝিবে না, সে ইন্ডিয়ার দালাল।

ঢাকার মসলিন বিখ্যাত। মিরপুরের জামদানিও খুব বিখ্যাত শাড়ি। শাড়ি পাইলে মাথা খারাপ হয় না, এমন একটিও মহিলা নাই। যাই জামদানি শাড়ির অর্ডার দিয়া আসি। রঙ্গ করিও না, রাজপথে রক্ত ঝরিয়াছে। রাউফুন বসুনিয়ার হত্যাকারীকে তাহারা মনোনয়ন দিয়াছে, হত্যাকারীর বিচার আর হইবে না।

কোনো হত্যারই বিচার হয় না। হত্যাকারীরা হাসিমুখে ঘুরিয়া বেড়ায়। বক্তৃতা দেয়। দেশবাসী তাহাদের কথা শুনিয়া হাততালি দেয়।

এক বৃদ্ধ লোকের অনেকগুলি পুত্র ছিল। তাহারা নিজেদের মধ্যে বিবাদ করিত। একদিন তিনি বলিলেন, প্রত্যেকে একটি করিয়া কাঠি লইয়া আসো।

ঈশপের গল্পে আজকাল কেহ বিশ্বাস করে না। অথচ, গল্পগুলি মিথ্যা নহে। যে-ই ঐক্য ভাঙিল, সে-ই পরাজিত হইল।

বাংলাদেশের সিনেমা দর্শকরা খুবই গরিব। তাহাদের নিজেদের ঘরে হাড্ডিসার বৌয়েরা কেবলি ঝগড়াঝাঁটি করে। তাই তাহারা মোটাসোটা নায়িকাদের পছন্দ করে। অঞ্জু ঘোষ এদেশের হিট নায়িকা। অনেক নায়িকা মোটা হইবার জন্যে প্যাড ব্যবহার করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রঙ্গ করিও না। সব ব্যাপারে রঙ্গ করা উচিত নহে।

শ্রীদেবী খুব ভালো নাচিতে পারেন। লতা মুঙ্গেশকরের মতো শিল্পী পৃথিবীতে খুব কমই রহিয়াছে। কল্পনায় মিঠুন চক্রবর্তী আমার ঘরে আসে। এ সকলই সত্য। ভিসিআর খুব দরকারি জিনিস। কিন্তু ভারতের নিকট বিক্রি হইয়া যাইব না। আমাদের ভাষা বাঙলা নহে, বাংলাদেশী। এই কথা যে মানিল, সেই সত্তর রাকাত নফল নামাজ পড়ার ছোয়াব পাইল। সাঈদী খুব ভালো বক্তা। জুয়েল আইচের চাইতেও ভালো প্রতিভার অধিকারী। মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান শরিয়ত বিরোধী। সাঈদী ছাহেব কখনো মিথ্যা বলেন না।

রঙ্গ করিও না। অচিরেই খোদার লানত এই বেদ্বীন জাতির উপর বর্ষিত হইবে। তোমরা আল্লাহর কাছে পানাহ্ চাহো।

রঙ্গ করিও না। বসন্তকালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইল। বসন্তের কোকিলেরা গাছে গাছে কুহু কুহু রবে ডাকাডাকি করিল। বসন্ত চলিয়া গেলে কোকিলেরা কাটিয়া পড়িল।

রঙ্গ করিও না। জিরো পয়েন্টে কিংবা প্রেসক্লাবের সামনেও ক্ষমতা পরিবর্তন করা যায়।

কমলাকান্ত আফিঙের বশবর্তী হইয়া এই দপ্তরনামা রচনা করিল। আফিঙ একটি মহৌষধী। ইহার গুণে তৃতীয় নয়ন খুলিয়া যায়। সব সত্য অকপটে বলিয়া ফেলা যায়। তাই এই রচনার কৃতিত্ব আফিঙের, কমলাকান্তের নহে।

৮ মার্চ '৯১, পূর্বাভাস

অগত্যার আদলে

'অগত্যা' বের হয়েছিলো আজ থেকে ৩৫ বছর আগে। 'অগত্যা' এখন নেই, কিন্তু সমাজের চাকা সামনের দিকে এগিয়েছে বলে মনে হয় না। তখনকার গোলমাল মোস্তফাদের চেয়ে আরো বেশি গোলমেলে এখনকার বরবাদ মর্জারেরা, কেননা তারা সাম্প্রদায়িকতা প্রতিষ্ঠিত করতে চায় মার্কসীয় মোড়কে, আক্রমণ খাঁ-দের সংক্রমণে সমাজজীবন আজ আরো বেশি অতিষ্ঠ। ৩৫ বছরের জাতি যতোটা পিছিয়ে গেছে, যতোটা নিকটবর্তী হয়েছে মধ্যযুগের, ততোই অনুভূত হচ্ছে অগত্যার প্রয়োজনীয়তা। অগত্যা, কী আর করা, অগত্যার আদলে পাঠকের পাঠানো চিঠিপত্রের উত্তর :

পাঠকের প্রশ্ন, গদ্যকার্টুনের উত্তর

পাঠক : এদেশে 'মিস বাংলাদেশ' প্রতিযোগিতা আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না কেন, যখন সোভিয়েটরাও আর পিছিয়ে নেই ?

গদ্যকার্টুন : কারণ মিস বাংলাদেশের পদটি সংবিধানসম্মত নয়। তাছাড়া, জাতীয় নির্বাচনের চেয়ে এই নির্বাচনে 'প্রার্থী হাইজ্যাক'-এর ঘটনা বেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঘটতে পারে।

পাঠক : আমাদের উপজেলায় বখাটেদের উপদ্রবে সুন্দরী যুবতীরা রাস্তাঘাটে চলাচল করিতে পারিতেছে না, তাহাদিগকে রাজধানী শহরে লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা নেয়া হউক।

গদ্যকার্টুন : সর্বনাশা প্রস্তাব, রাজধানীতে বাঘমামা সব খাইয়া ফেলিবে।

পাঠক : মায়ের দুধের প্রধান উপকারিতা কী ?

গদ্যকার্টুন : বিড়ালে খাওয়ার ভয় থাকে না।

পাঠক : দুই নেত্রী আবার কবে মিলিত হবেন ?

গদ্যকার্টুন : প্রশ্নকর্তাদের অশ্লীলতা পরিহারের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

পাঠক : বড়োকর্তার দাঁতগুলি দেশী না বিদেশী ?

গদ্যকার্টুন : দেশী। বড়োকর্তা বিদেশী মাল মুখে লাগান না।

পাঠক : বলেন তো, লবণের রাসায়নিক সংকেত NaCl হলে চিনির রাসায়নিক সংকেত কী ?

গদ্যকাটুন : Kg Zafar

পাঠক : দেশের একটি কমিউনিস্ট পার্টি আগে আয়োজন করতো শোভাযাত্রা, এখন আয়োজন করছে পদযাত্রা, ভবিষ্যতে তারা কী আয়োজন করবে ?

গদ্যকার্টুন : বরযাত্রা।

পাঠক : বাঙালি সংস্কৃতির 'প্রতিপক্ষ' সম্পর্কে একটি প্রশ্ন। বরবাদ মর্জারের মাসিক অনিয়মিত কেন ?

গদ্যকার্টুন : ডা. ফাপরউল্লা ভালো বলতে পারবেন।

পাঠক : 'ব্যক্তির চেয়ে দল বড়ো, দলের চেয়ে দেশ বড়ো'—এখন বলতে হবে, দেশের চেয়ে কী বড়ো ?

গদ্যকার্টুন : দেশনেত্রী।

পাঠক : কোনো প্রতিষ্ঠান দুই নাম্বার কি না, কি করে বুঝবো ?

গদ্যকার্টুন : কোনো প্রতিষ্ঠানের নামের শেষে কেন্দ্র থাকলে বুঝতে হবে এটি হয় এনজিও, নয়তো স্বৈরসহযোগী প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ দুই নাম্বার। যেমন : গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বাংলাদেশ কবিতা কেন্দ্র, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র।

পাঠক : জীবিতের নামে নাম, এরকম দুটি জায়গার নাম বলুন।

গদ্যকার্টুন : ছাগলনাইয়া ও এরশাদনগর।

পাঠক : ঢাকা চিড়িয়াখানায় গাধা নেই, জানেন ?

গদ্যকাটুন : আগে ছিলো না, এরশাদ সাহেব আসার পর সেই অভাব ইনশাল্লাহ্ আর নেই।

পাঠক : বাংলা একাডেমী থেকে বইমেলা সরানোর ব্যাপারে সৈয়দ শামসুল হকের আপত্তি সংবাদে ছাপানো হয়েছে, পড়েছেন ?

গদ্যকার্টুন : বাংলা একাডেমী বইমেলার ভিড়ে মেয়ে-টিসিং সম্পর্কে সৈয়দ শামসুল হকের রগরগে লেখা সংবাদে ছাপা হয়েছিলো, পড়েছিলেন ?

পাঠক : খোঁজাউদ্দিন এন্তালিন টেলিভিশনে সাহিত্য অনুষ্ঠান গ্রন্থনা করবেন, মন্তব্য করুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গদ্যকার্টুন : দেশে এইড্‌স সংক্রমনের আশংকা দেখা দিলো, রাজকবিদের সঙ্গে মাখামাখি করে ওর শরীরের যা অবস্থা...

পাঠক : সরকার অভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইনত বাতিল করেছেন।

গদ্যকার্টুন : টিভিতে চমৎকার অভিনয় যিনি প্রায়শই করেন, অভিনয় ব্যাপারটির প্রতি তাঁর তো মমতা থাকবারই কথা।

পাঠক : যখন 'পূর্বাভাস'কে কেউ গালি দেয়, তখন আপনার কেমন লাগে ?

গদ্যকার্টুন : কে গালি দিচ্ছে নির্ভর করে তার ওপর। যদি এনজিও, রাজাকার, কিংবা স্বৈরসহযোগীরা খেপে যায়, বুঝতে হবে ওষুধে কাজ হচ্ছে।

পাঠক : যৌন-বিষয়ে গদ্যকার্টুন নীরব কেন ?

গদ্যকার্টুন : No sex please, because we are Bangladeshi, Bangladeshi's have no sex.

পাঠক : শামসুর রাহমান প্যারিস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস কর্মকর্তার পদ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন কীভাবে ?

গদ্যকার্টুন : শামসুর রহমানের স্পাইনাল কর্ড গজিয়েছে বলে।

পাঠক : আল মাহমুদকে দেখলে মরুভূমির জাহাজের কথা মনে হয় কেন, তা কি তার জামাত-শিবির কানেকশনের জন্যে ?

গদ্যকার্টুন : নত হয়ে থাকতে থাকতে তার পিঠে কুঁজ গজিয়েছে বলে।

পাঠক : গোপাল ভাঁড় সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন কি ?

গদ্যকার্টুন : শোনা যায়, তিনি পরবর্তীতে শাহ মোয়াজ্জেম নামে খ্যাতিমান হয়েছিলেন।

পাঠক : ইদানীং ঢাকার অলিগলি রাস্তাঘাট নোংরা থাকছে কেন ?

গদ্যকার্টুন : আনোয়ার জাহিদ অনেকদিন ঝাড় দিচ্ছেন না বলে। তবে, আনোয়ার জাহিদের রাজনৈতিক পার্টনার হাসনাত সাহেব ঝাড়ু হাতে তুলে নিয়েছেন, দেখা যাক কী হয়।

পাঠক : আমি একটি নৃত্য, একটি সংস্কৃতি, একটি শিল্প নির্মাণ করতে চিত্তের মধ্যে আকুলতা অনুভব করছি, কী করবো ?

পদ্যকার্টুন : সৈয়দ আলী আহসান সংস্কৃতি নির্মাণ কোম্পানি লিমিটেড-এর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

পাঠক : বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও পূর্বাভাস 'গদ্যকার্টুন' বন্ধ করে দিচ্ছে না কেন ?

গদ্যকার্টুন : আপাতত পাবনা মানসিক হাসপাতালে একটি বেডও খালি নেই বলে।

পাঠক : কৃষ্ণের রাধা ছাড়াও আরো ১৬০০ গোপিনী ছিলো, জানেন ?

গদ্যকার্টুন : জানি কিন্তু বলি না। কলিযুগের কৃষ্ণদের সম্পর্কেও অনেক কিছু জানি, কিন্তু বলি না। জানেন তো, পাগলও নিজের ভালো বোঝে।

পাঠক : সাংবাদিক ফরিদউদ্দিন পারদ-এর নাম শুনেছেন ?

গদ্যকাটুন : এডা আবার কেডা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পাঠক : গোলমাল আযম সম্পর্কে কিছুই বলছেন না, ব্যাপারটি কী ?
গদ্যকার্টুন : মজা দেখছি, রাজতন্ত্র আর ইহুদিবাদের বিরুদ্ধে এতোকাল কথা বলে এখন কীরকম স্বরূপে আবির্ভূত হয়েছে। সাদ্দাম হোসেন সবাইকে নেংটো করে ছেড়েছে।
পাঠক : 'আমাদের লক্ষ্য বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'—বলতে কী বোঝেন ?
গদ্যকার্টুন : 'আমাদের লক্ষ্য বৈজ্ঞনিক বিভাজনতন্ত্র'—এ স্লোগানটি হৃদয়ঙ্গম করলেই সব বুঝতে পারবেন।
পাঠক : শেখ হাসিনা বলেছেন, তিনি বিদেশে যান কাজবশত, এরপরও আপনারা তাঁর সমালোচনা করেন কেন ?
গদ্যকার্টুন: আমরা কি কখনো বলেছি, শেখ হাসিনা কামবশত বিদেশ যান ?
পাঠক : কলম হাতে পেয়েছেন বলেই কি যা-তা লিখবেন, সামনাসামনি পেলে ছিঁড়ে ফেলে দেবো।
গদ্যকার্টুন : দোয়া করি, বড় হয়ে প্রাইম মিনিস্টার হন।

২৪ সেপ্টেম্বর '৯০, পূর্বাভাস

চার রোমাঞ্চ

ডেইজির স্বপ্ন

দ্বিতীয় দিনেই মাথা গরম করে ফেললেন তিনি। কাজের মেয়েটার গালে বসিয়ে দিলেন এক চড়। রাগে থর থর করে কাঁপতে লাগলো তাঁর শরীর। কাজটা ভালো হলো না। এটা তাঁর নিজের বাসা নয়, বোনের বাসা। এই বোনটিই গত একটা বছর অনেক কিছু করেছে তাঁদের জন্যে। আর সবাই তো বসন্তের কোকিল। কোনো ব্যাটার দেখা নেই। টিভিতে অনুষ্ঠান করতো এক আইনজীবী, ডাকতো তাঁকে 'মা' বলে, সেও পর্যন্ত একটি বার খোঁজ নেয়নি কেমন আছি। নেমক হারাম!

মেয়েটাকে মারাটা ঠিক হলো না আসলেই। এমনিতেই তিনি অসুস্থ। তাঁকে হাঁটতে পর্যন্ত হচ্ছে অন্যের ঘাড়ে ভর রেখে। এ অবস্থায় উত্তেজিত না হওয়াই উচিত। কিন্তু তিনি কী করবেন ? সহ্যের তো একটা সীমা আছে। তাঁর এতো প্রিয় জামদানীর এ-অবস্থা ? শেষ পর্যন্ত একটা কাজের মেয়ের পরনে ? এই ছিলো এদের মনে ?

তিনি শিশুর মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। সেই ফোঁপানি মিইয়ে এলো ধীরে। এর কারণ অন্যরকম সব ভাবনা এখন তার মনে। মাথায় বাহারি দোপাট্টা জড়ানোর নতুন যে-ফ্যাশনটি এখন ক্ষমতাসীন, সেদিকে চলে গেলো তাঁর মনোযোগ। 'গাঁইয়া', নিজের মনেই বকতে লাগলেন তিনি। কী ফিগার, আস্ত কুমড়া।

তিনি দাঁড়ালেন আয়নার সামনে। দীর্ঘদিন আটক থাকবার ধকল তাঁর চোখে মুখে। তবুও নিজেকে তাঁর মনে হলো সুন্দর। সবার ক্ষেত্রে সবসময় যা হয়।

আমি শুধু সুন্দর নই, আমি যোগ্যতরও— ময়মনসিংহের আঞ্চলিকতা মাখা বাঙলায় উচ্চারণ করলেন বেশ জোরের সঙ্গে। তোমার চেয়ে আমি বেশি অভিজ্ঞ। তুমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ছিলে অন্তঃপুরে আর আমি ছিলাম ক্ষমতার দাবাখেলায় মন্ত্রীর মতোই ক্ষমতাবতী। সব নিয়ম-কানুন ভেঙে আমার জন্যেই সৃষ্টি হয়েছিলো একটি নতুন গুরুত্বপূর্ণ পদ। সব রথী-মহারথীরা প্রতিদিন আসতো আমার পা স্পর্শ করতে।

আমি আবার এই চৌকা পর্দা দখল করবো—খোসা পর্দা দখল করবো—খোসা ছাড়া লিচুর মতন ঘোলা টিভি স্ক্রিনটার দিকে তাকিয়ে বললেন তিনি। আমাকে হতে হবে বিধবা। একটি গোপন অন্যায় ইচ্ছা ফণা তুললো তাঁর মনে।

বুড়োটাকে যদি কেউ এখন অপঘাতে মেরে ফেলতো! ইশ্, কী পপুলারিটি না পেতাম তা হলে আমি!

মানুষের সব ইচ্ছা পূরণ হয় না, তিনি গোপন করলেন দীর্ঘশ্বাস।

কিন্তু অচিরেই তাঁকে নেমে পড়তে হবে মাঠে, যেতে হবে মঞ্চের মাঝখানে, হতে হবে সংবাদ শিরোনাম, প্রতিদিন প্রতিটি বক্তৃতায় কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলতে হবে বিরহকাতরতা ; তিনি কি পারবেন এতোটা অভিনয়-কুশলতা দেখাতে... চিন্তিত হয়ে পড়লেন তিনি।

পারবেন, বছর ছয়েকের একটি শিশু যখন ডাকলো তাঁকে মাম্মী বলে, তার দিকে চোখ পড়তেই তিনি হলেন সুনিশ্চিত।

শরীয়ত আর পলিটিক্স

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেলো বিবি সাহেবার। ঘর অন্ধকার। পাশে তাঁর সাহেব ঘুমুচ্ছেন নাক ডেকে। তিনি বোধ করলেন বিরক্ত। মনে হলো কনুই দিয়ে একটা গুঁতো দেন। কিন্তু দিলেন না। আহা, বেচারি, সারাদিন কতো পরিশ্রম করেছে, ঘুমুক না।

জানালা দিয়ে বারান্দার আলো এসে পড়েছে ঘরে। দূর থেকে ভেসে আসছে ট্রাক চলার শব্দ। সারারাত জেগে এরা ট্রাক চালাবে—ড্রাইভারদের জন্যে মায়া হলো তাঁর।

এই রাতে তিনি একা জেগে। দিন কতো দ্রুত চলে যায়। বাহাত্তর সালে তাঁর সঙ্গে তাঁর স্বামীর পরিচয়। যশোরে। সিরাজগঞ্জের এই যুবক তখন পালিয়ে বেড়াচ্ছেন।

সিরাজগঞ্জে অনেক বিধর্মীর ঘর জ্বালিয়েছেন তিনি, একটা পুরো গ্রামে দুশো বাঙাল মেরেছেন, পাকসেনাদের ডেকে নিয়ে। তাঁর নিজের বিরুদ্ধেই সরাসরি অভিযোগ আছে দু-দুটো খুনের। তাছাড়া আলবদর কমান্ডার হিসেবে পরিকল্পনা করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেদ্বীন শিক্ষকদের নির্মূল করার। সেই দুঃসময়ে যশোরে তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা। ধীরে ধীরে প্রেম। কী সব আনন্দের আর উৎকণ্ঠার দিনই না গিয়েছে। পরে অবশ্য তিনি চলে যান পাকিস্তান, সেখান থেকে সৌদি আরব।

খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। লেপের নিচেও বিবিসাহেবার পা ঠাণ্ডা হয়ে আছে। একটুখানি উষ্ণতার জন্যে তাঁর মধ্যে সঞ্চারিত হলো আকুলতা। হঠাৎ তাঁর মনে উদ্রেক হলো এক জিজ্ঞাসার— আচ্ছা, মিথ্যা কথা বলা না কবিরা গুনাহ। একদিন নবিজিকে এক পাপিষ্ঠ জিজ্ঞাসা করলো— ইয়া রাসুল, আমি চুরি করি, আমি বদমায়েসি করি, আর আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মিথ্যা বলি। এই কুকর্মের যে-কোনো একটি আমি ছাড়তে চাই, আমি কোন্‌টি ছাড়বো? নবিজি (দ.) বললেন, তুমি মিথ্যা কথা বলা পরিত্যাগ করো।

তিনি তাঁর নিদ্রামগ্ন স্বামীর হাত ধরে টানাটানি শুরু করলেন। ঘুম ভেঙে গেলো তাঁর স্বামীর। তিনি গাঢ় স্বরে বললেন, ফজরের নামাজ পড়তে হবে, শরীর-মন পাক রাখো।

— না, এ কথা না, তোমারে একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই, করবো ?

: করো।

— মিথ্যা কথা বলার শাস্তি কী ?

: কবিরা গোনাহ। কঠিন আজাব। হাবিয়া দোজখ।

— তাহলে তুমি এতো বড়ো মিথ্যে কথাটা বললে কি করে ? ঐ যে, আওয়ামী লীগ বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেছে।

: হায়রে বুজদিল, ও তুমি বুঝবে না। শরিয়ত আর পলিটিক্স এক কথা নয়। পলিটিক্সে কেতাবের কথা খাটে না।

মন ভালো নেই, কেউ তা বোঝে না।

তাঁর মনটা ভালো না। খারাপ। খুবই খারাপ। ভাবলেন একটা হুমায়ূন আহমেদ-এর বই পড়বেন। জলের মতো সোজা। পড়তে পারলেন না। একটা বাক্যও ঢুকলো না তাঁর মাথায়। বাদলের মুখটা বারবার ভেসে উঠতে লাগলো তাঁর চোখে। আহ্‌।

অথচ দিনটা তিনি শুরু করেছিলেন ভালোই। ইউনিভার্সিটিতে মঞ্চে বসে মনে হচ্ছিলো তিনি ফিরে পেয়েছেন তার ছাত্রজীবন। হাসি ঝিকমিক করছিলো তাঁর দুই চোখে। পাশে বসা ছাত্রনেতাদের সঙ্গে রসিকতা করলেন দু-একটা।

তারপর যখন পায়রা ওড়াচ্ছিলেন তিনি, তাঁর খুব ভালো লাগছিলো তখন। মনে হচ্ছিলো এক আমুদে বালিকা। গাছের নিচে দাঁড়িয়ে একটা পাকা কুল দেখে যেভাবে উল্লসিত হয় বালিকারা, তেমনি ভঙ্গিমায় তিনি তাকাচ্ছিলেন আকাশে। কিন্তু ঠিক তখনই বাদলকে গুলি করা হয়েছে, উফ্‌। এই ছেলেগুলো এটা কী করলো ! কেন করলো ? কে করালো ? বেশ কিছুদিন পর দেশে ফিরেছেন তিনি। বহুদিন পরে পা দিয়েছেন ক্যাম্পাসে। আর সেদিনই নিহত হলো একজন।

বিপন্ন বোধ করলেন তিনি। নিজের একটি উক্তি খচ খচ করতে লাগলো নিজের কানেই। 'ঐ মহিলার জান ঠাণ্ডা করতে আর কয়টা লাশ দরকার ?' এ-কথা বারবার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগলো কানে। অন্ধকার হয়ে গেলো তাঁর চোখমুখ।

এমনিতেই চলছে নানা ঝামেলা। বোনাই-এর অসুখ। খুবই গুরুতর অসুখ। তার ওপর একটা সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা আছে নিজেদের ভেতরে। বাবার সমস্ত রাজনীতি আর এই বাসাটি ভোগ করছেন তিনি একা। এ-নিয়ে কেউ কোনো কথা তোলেনি বটে, কিন্তু তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। তাঁর এমনিতেই বোঝা উচিত, বোঝেনও। আসলেই এ বাসাটাকে জাদুঘর বানানো দরকার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাঁর মাথা ঝিমঝিম করছে, মনে হচ্ছে অনেকগুলো সুতো জট পাকিয়ে আছে। তিনি খুঁজছেন সুতোর ডগা। কিন্তু খুঁজে পাচ্ছেন না। শুধুই পেঁচিয়ে যাচ্ছে।

ক্রিং ক্রিং। দরোজায় নক। 'আপা, আপনার টেলিফোন...।'

কিন্তু তিনি কিছুই শুনতে পেলেন না। তাঁর কানে কিছুই ঢুকছে না।

রাজনীতিতে চিরস্থায়ী শত্রুমিত্র নেই

মধ্যরাতে ঘুম ভেঙে গেলো তাঁর। একটা স্বপ্ন দেখছিলেন। দুঃস্বপ্নই বলা ভালো। ক্যান্টনমেন্টে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁকে। ঘর অন্ধকার। একটা লাল রঙের বাল্ব জ্বলছে এককোণে। হঠাৎ তীব্র আলোর ঝলকানি। তার চোখ ঝলসে যাবার জোগাড়। তারপর এলো এক লম্বা ফরসা লোক। লালরঙের গোঁফের নিচে দুষ্টুমি হাসি। বললো—ম্যাডাম, কী খাবেন, চা না কফি। আচ্ছা মেজর জিয়ার সঙ্গে শেখ মুজিবের শেষ দেখাটা কোথায় হয়, আপনি জানেন ? শোনেন, আপনি ভয় পাবেন না। মোছলমানরা আওরাতের অবমাননা কখনো করে না।

তাঁর ঘুম ভেঙে গেলো। শীতের রাতেও তিনি ঘামছেন। গলা শুকিয়ে কাঠ। তিনি পিপাসার্ত। বেডসাইড টেবিলে গেলাসে জল ঢাকা। তিনি কম্পিত হাতে গেলাস তুলে নিলেন।

একাত্তর সালের কথা তিনি মনে করতে চান না। কিন্তু স্বপ্ন কোনো বিধিনিষেধ মানে না। খুবই ছেঁড়াখোঁড়া ব্যাপার। কিন্তু প্রতিটি স্বপ্নের পেছনেই কোনো-না-কোনো কার্যকারণ থাকে। মানুষ অবচেতনে যা ভাবে, তাই সে স্বপ্নে দেখে।

তাঁর মনে পড়লো, গোলামের ব্যাপারটা। তিনি নিজে মৌলবাদী নন। একাত্তরে ঐ গোলামকে হাতের কাছে পেলে তিনি বা তাঁর স্বামী কেউই ছাড়তেন না। মুক্তিযুদ্ধে নিজেদের অবদানকে আসলেই তিনি গৌরবের ব্যাপার মনে করেন। এখনো সেই গৌরবকে তিনি আত্মসাৎ করতে চান। গোলামের ব্যাপারটা মেনে নেয়া তার মনে হয় উচিত নয়। কিন্তু তিনি কী করবেন ? ওদের সমর্থন নিয়েই আজ তাঁর এই অবস্থান। ওদের খেপানোটা তাঁর উচিত হবে না। তাছাড়া বাইরের চাপ আছে। বাইরের ব্যাপার-স্যাপারগুলো তিনি নিজে খুব ভালো বোঝেন না। শুধু বাইরের কেউ বেড়াতে এলে তাঁর খুব ভালো লাগে। বেশ সেজেগুজে বসে থাকা যায়।

স্বপ্নদৃশ্যগুলি আবার তাঁর চোখে উঠলো ভেসে। গা কাঁটা দিয়ে উঠলো। তিনি চিৎকার করে উঠলেন—না না, গোলামকে আমি এইভাবে ছেড়ে দিতে পারি না।

উফ্। তাঁর চোখের সামনে নৃত্য করতে লাগলো বিশ্বাসের ছায়ামূর্তি, পন্নীর... তাঁর পুরোটা শরীর অবশ হয়ে গেলো। শিরদাঁড়া বেয়ে নামতে লাগলো বরফের সাপ। তিনি অস্ফুট স্বরে বলতে লাগলেন : রাজনীতিতে চিরস্থায়ী শত্রুমিত্র নেই।

তিনি কম্বলের নিচে ঢেকে ফেললেন চোখকান। কিন্তু শীত কিছুতেই ছাড়লো না তাঁকে।

২৩ জানুয়ারি ১৯৯২, খবরের কাগজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভাগ্যি, অন্যের মনের কথা পড়ার যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হয়নি আজো

'অবৈধ সঙ্গম ছাড়া সুখ অপরের মুখ ম্লান করে দেয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই' – জীবনানন্দ দাশ

সভ্য মানুষেরা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন না, কিন্তু সবারই মনের মধ্যে আছে এক একটা আস্ত জানোয়ার। ওই জানোয়ারটাকে লুকিয়ে রাখার কায়দাটাই হলো আসল, ওই হচ্ছে সভ্যতা।

ধরা যাক, আপনি কাজ করেন সংবাদপত্রে। রংপুর থেকে টেলিফোনে সংবাদ এলো। মারামারি হয়েছে। তিনজন গ্রেফতার। এ-পাশ থেকে আপনি চিৎকার করেছেন, মারা গেছে কেউ ? মরেনি ? মরেছে ? ক'জন ? কী বলেন মরেনি ? দুরো ভাই, এটা কোনো নিউজ হলো, একজনও মরেনি ?

অর্থাৎ সংবাদপত্রের লোকরা চান মানুষ মারতে। কিরে ভাই, আজ রাতে ক'টা ছিনতাই হয়েছে ? একটিও হয়নি ? কী যে বলেন, ক্রাইম না হলে চাকরি থাকে নাকি? পত্রিকার ক্রাইম রিপোর্টার হন্যে হয়ে খোঁজ নেন থানায় থানায়। খুনখারাবি হ'লে তার মুখে হাসি আর ধরে না। ভালো খবর, ভাই বড় খবর, মার্ডার আফটার রেইপ। এ ব্যাড নিউজ অলওয়েজ এ গুড নিউজ।

ওই সাংবাদিকই তারপর গম্ভীরমুখে হাজির হন সেমিনারে। সংবাদপত্র খুললেই দুঃসংবাদ। এসব খবর দিতে আমাদের কলম সরে না। কিন্তু কী আর করা! দেশে কি ভালো কিছু ঘটে ?

ওইরকম মুখে এক, মনে আরেক—এমন অবস্থা অনেকেরই। রাজপথে মিছিল বেরোয়। সহসা উত্তেজনা। টিয়ার গ্যাস, গুলি। নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে গলদঘর্ম নেতা তখন দারুণ টেনশানে— কী খবর, গুলি হয়েছে ? হয়নি ? পড়েছে ? লাশ পড়েছে ? ক'টা ? দুটো। তাতেই হবে। আগুন জ্বলে উঠবে ঘরে ঘরে। এই জুলুম আর চলতে দেয়া যায় না। কথায় কথায় জনতার বুকে গুলি। গায়েবানা জানাজা করো। শোক দিবস করো। কালো ব্যাজ ধারণ করো। শহীদের মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদো। কতোদিন পরে সুযোগ এসেছে। কতোদিন পর আবার লাশ পড়েছে রাজপথে। আ-হা-হা।

এর নাম রাজনীতি। এ নিয়ে বেশি কথা বলতে নেই, বলতেও চাই না। তবে মনে এক, মুখে আরেক— এ-চালবাজির উদাহরণ দিতে গেলে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের কথা না এসেই পারে না। রাজপথের গণআন্দোলন হুসেইন সাহেব সামলাতে পারছেন না কিছুতেই। লাগিয়ে দিলেন দাঙ্গা। বাবরী মসজিদের ছুতোয়। জাপার কর্মীরা পুলিশের পাহারায় ওয়ার্ড কমিশনারদের নেতৃত্বে পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে মন্দিরে ঢিল দিলো, ভাঙলো মিষ্টির দোকান। সঙ্গে সঙ্গে কারফিউ। আর টেলিভিশনে হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের চোখ বেয়ে দরদর করে ঝরছে পানি। সবাই এগিয়ে আসুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঐক্যবদ্ধ হোন। এই দাঙ্গা-হাঙ্গামার অবসান ঘটান। আমি মুসলিম নই, আমি হিন্দু নই, আমি মানুষ। শ্লা।

আসলেই আমাদের প্রত্যেকের মনের অন্ধকার ঘরে এক পশু বাস করছে। তার লাল জিভ থেকে লালা ঝরছে অবিরল। পরস্ত্রী দেখলেই নড়ে উঠছে জিভ। পরশ্রী দেখলেই কাতরতা ফুটে উঠছে চোখে।

যে ডাক্তারের পশার জমছে না, তিনি নিশ্চয়ই মনে মনে চাইছেন রোগ-শোক বাড়ে না কেন। এম. আর. ক্লিনিকের ব্যবসা যাদের, তারা নিশ্চয়ই চান ঘরে ঘরে গর্ভবতী হয়ে উঠুক কুমারীরা।

এক উপন্যাসে পড়েছি হিজড়েদের কথা। এক দম্পতি একবার জন্ম দিয়েছেন এক হিজড়ে শিশুর। সে শিশুকে নিয়ে গেছে হিজড়েরা, তাদের সমাজে। পরে আবার যখন মহিলা হলেন গর্ভবতী, যখন-তখন অবস্থা যখন তাঁর, তখন এলো সেই হিজড়েরা। মনে মনে তাদের একটাই প্রার্থনা—গৃহস্থের খোকা হিজড়ে হোক, গৃহস্থের খোকা হিজড়ে হোক।' শকুন যেমন সর্বদাই প্রার্থনা করে গরু-মড়কের জন্যে, তেমনি আমাদের মনের শকুনও ডেকে ওঠে, গোপনে গোপনে।

আমি সরকারকে সমর্থন করি না। আমার মনের শকুনটা এখন কী প্রার্থনা করছে? সে চাইছে রংপুর-দিনাজপুর অঞ্চলে অভাবটা ঠিকমতো আসছে না কেন ? অনাহারটা বাড়ছে না কেন ? 'দুর্ভিক্ষ' কি শুরু হয়ে গেছে ? যায়নি, তবে যাবে মনে হচ্ছে। ডায়রিয়ায় মানুষ মারা গেছে ? এভাবেই তো শুরু। এ-সরকার পারবে না। দুর্ভিক্ষ হবেই। অযোগ্য সরকার।

আর আমি একজন ঘোরতর সরকার-সমর্থক। আমি কী চাইবো ? কী ব্যাপার, ইন্ডিয়া এতো ভদ্র হয়ে গেলো কেন ? একটু গুঁতোগুঁতি না করলে জনগণের দেশপ্রেম চাঙা হবে কী করে ? ওদিকে ওদের সম্মেলনটা নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে যাচ্ছে। মারামারি কি লাগবে না ? কী বলেন ভাই, এবার ওরা পাঁচ টুকরো না হয়েই পারে না। ভাঙন ঠেকায় সাধ্য কার ?

কোনো কোনো মাওলানা বাগদাদে দুম্বা মানত করেন, ওরা যেন বাবরী মসজিদ দেয় গুঁড়িয়ে। তাতে তাঁর পত্রিকার সার্কুলেশনটা কিছুটা বাড়ে। যাঁরা দোকান দিয়েছেন কাফনের কাপড়ের-আতরের-গোলাপজলের, তারা কি শেষরাতে খুলে রাখা দোকানে ব'সে একবারও চান না একটি মৃত্যু ? কন্ট্রাক্টর আর ইঞ্জিনিয়ার কি চান না আসুক মহাবন্যা, ক্ষয়ে যাক রাস্তাঘাট, ভেঙে যাক ব্রিজগুলি ? উকিলরা কি চান না ঘরে ঘরে লাগুক ক্যাচাল-কাজিয়া, মামলা-মোকদ্দমায় সয়লাব হয়ে যাক দেশটা ? মজুতদরা কি চান না যুদ্ধ-বিগ্রহ, বন্যা-খরা ?

সেই পুরোনো গল্পটা মনে করুন। শুনেছেন, জামানের ছেলেটা কলেজে ভর্তি হয়েছে। ভর্তি হতে পারে, পাস করবে না। শুনেছেন, ছেলেটা পাস করেছে। পাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করতে পারে, চাকরি পাবে না। আরে ভাই, জানেন নাকি, ছেলেটা চাকরিও পেয়ে গেছে। চাকরি পেতে পারে, তবে বেতন পাবে না।

একজন আমলা যখন দাঁড়ান একজন ক্ষমতাসীন রাজনীতিকের সামনে, হাত কচলানির সীমা থাকে না তার। স্যার, জি স্যার, অপনি যা বলেছেন স্যার, দিস ইজ ডেমোক্রেসি স্যার, আপনি স্যার জনগণের প্রতিনিধি স্যার, অল-ইন অল স্যার। আড়ালে ওই আমলাই কিন্তু শালা ছাড়া নাম নেন না তার বস ওই নেতাটির। একটা সিগনেচার দিতে কলমে ভেঙে যায়, চিরটাকাল চোঙা ফুঁকিয়ে এসেছো বাপধন, এডমিনিস্ট্রেশনের তুমি কী বোঝো ?

আমলারা এই করে এসেছে সেই বৃটিশ আমল থেকে। কিন্তু পাকিস্তান আমল থেকে তৈরি হয়েছে এক নতুন ধরনের আমলা। তাঁরা বিশেষ এলাকায় থাকেন, আর মনে করেন— এই জাতির ভালোমন্দের সমস্ত দায়িত্ব তাঁদের। প্রকাশ্যে তাঁরা বাস্টার্ড ছাড়া সাধারণ নাগরিকদের অন্য কোনো অভিধায় অভিহিত করেন না। তাঁদের মনের পারদটা কীভাবে ওঠানামা করে ?

জানা কথা পারবে না, পলিটিশিয়ানদের বাবার ক্ষমতা নাই সামলায়। সব শালা চোর। দেখবেন, মারামারি, কাটাকাটি লেগে যাবে। নিজেরা কামড়াকামড়ি করবে। কী ব্যাপার, বেশ চালাচ্ছে তো। চলছে তো ভালো, সব ঠিকঠিক। আরে না, চিন্তার কোনো কারণ নেই। দুদিনের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যাবে। জিনিসপত্রের দাম বাড়বে, দুর্নীতি বাড়বে, মন্ত্রীর বাড়িতে ডাকাত আশ্রয় নেবে। ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র মরবে। কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাবে। যেতেই হবে।

আবার শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মালিক ম্যানেজারকে দেখলেই ভাবে: নিশ্চয় আমার খেয়ে, আমার পরে ভদ্রলোক চেহারা বানিয়েছে কী, খোদাই ষাঁড়। ম্যানেজারও ভাবে সারাদিন কাজ করে মরি আমরা, আর তুমি সাহেব বসে বসে মুনাফা বাগাও, হারামজাদা।

এই হচ্ছে অন্যের সম্পর্কে আমাদের মনোভঙ্গি। আমরা সবাই নিজ নিজ দোকানে ও মনোবিতানে সাইনবোর্ড লাগিয়ে রাখি: আপনার সেবাই আমাদের লক্ষ্য। এমনিই এক সেবকের কথা বলি। তিনি মোটরগাড়ি মেরামত করে থাকেন। তার সহকারীকে ডেকে বললেন, ওই-যে শাদা রঙের ভোক্সওয়াগনটা গত তিন বছর যাবত এক মাস অন্তর অন্তর আমাদের গ্যারেজে আসতো মেরামতের জন্যে, আমি নিজ হাতে সারিয়ে দিতাম। কিন্তু তিন মাস আগে তুমি ওটা মেরামতের দায়িত্ব পেয়ে কী করলে যে, গত তিন মাসে ওটা একবারও খারাপ হলো না।

এই হচ্ছে গাড়ি মেরামতকারীদের মনের কথা।

অন্যের দুর্ঘটনায় দুঃসংবাদে ব্যথিত হয়, এমন কেউ কি আছে দুনিয়ায় ?

হ্যাঁ, আছে। ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। তাদের ক্লায়েন্টদের দুর্ঘটনায় আসলেই মুষড়ে পড়ে তারা।

১৫ আগস্ট '৯২, ভোরের কাগজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঢোলকলমি সাংবাদিকতা

ধরা যাক, প্রকৃতপক্ষে একটি ঘটনা ঘটলো এরকম: চট্টগ্রামের হাটহাজারীতে এক ব্যক্তি গোরুর হাট থেকে ফিরছিলো সদ্যক্রীত একটি কুরবানীর গোরু নিয়ে। পথে গোরুটি হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। গোরুটির শিঙের গুঁতোয় একজন মহিলা আহত হয়।

এখন আমাদের জাতীয় দৈনিকগুলি এ-খবরটি কীভাবে প্রকাশ করবে ? একটি দৈনিকের নিউজট্রিটমেন্ট নিশ্চয়ই অন্যটির মতো হবে না। কেমন হবে তা হলে ? আসুন, কল্পনা করা যাক। পাঠকদের জন্যে একটি ছোট্ট ধাঁধা, বলতে হবে, কোন্ রিপোর্টটি কোন্ দৈনিকের হতে পারে।

ক) তাহার আর শ্বশুর বাড়ি যাওয়া হইল না

(নিজস্ব সংবাদদাতা)

তাহার আর শ্বশুর বাড়ি যাওয়া হইল না। হাতে মেহেদির রং শুকাইবার আগেই প্রাণপ্রদীপ নিভিয়া গেল।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, মোমেনা খাতুন নাম্নী এক মহিলা শ্বশুরবাড়ি যাইবার পথে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারীতে এক ষাঁড়ের গুঁতোয় আহত হন। মাত্র তিন দিন আগে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। উল্লেখ্য, ষাঁড়ের হাতে (লক্ষণীয় ষাঁড়ের হাত থাকে) এ পর্যন্ত উক্ত এলাকায় গত তিন মাসে পাঁচজন হতাহত হইয়াছে।

খ) হাটহাজারীর মুখ : গ্রামীণ মানুষের জীবনের নিশ্চয়তা কই ?

(পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিনিধি)

গ্রামীণ মানুষের জীবন খড়কুটোর মতোই। প্রতিদিন কে মরছে, কে বেঁচে আছে ধুঁকে ধুঁকে—কে রাখে তার খোঁজ। এমনি একটি নিভৃত গ্রামের নাম হাটহাজারী। সেই গ্রামের এক নিষ্পাপ কিশোরী মোমেনা। কতো স্বপ্ন তার চোখেমুখে। মাত্র দুদিন আগে বিয়ে হয়েছে তার পাশের গাঁয়ের সাহেবালীর সঙ্গে।

মোমেনা লাল শাড়ি পরে হাত মেহেদিতে রাঙিয়ে যাচ্ছিলো শ্বশুরবাড়ি। কিন্তু এক গ্রাম্যবালার স্বপ্ন কি কখনো বাস্তবতা লাভ করে ? মোমেনারও নিয়তিতে সুখ ছিলো না। শ্বশুরবাড়ি যাবার পথে এক উন্মত্ত ষাঁড়ের আক্রমণে নিহত হয় সে।

বাংলার হাজারো গ্রামের অগণিত মানুষ এইভাবে দিন কাটাচ্ছে চরম নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে। কবে একজন মোমেনার জীবন মেহেদি রং শুকানোর আগেই ঝরে পড়বে না ?

(এ কাব্যধর্মী রিপোর্টটি ভিতরের পাতায় ছবিসহ যত্ন সহকারে ছাপা হবে)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গ) ভারত থেকে আসা ষাঁড়ের গুঁতোয় বাংলাদেশী মুসলিম মহিলা নিহত

ভারত থেকে আসা ষাঁড়ের গুঁতোয় মারা গেছে একজন বাংলাদেশী মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারীতে। সম্প্রতি সীমান্তের ওপার থেকে একপাল ক্ষিপ্ত ষাঁড় বাংলাদেশে অবৈধভাবে প্রবেশ করে। এই পাগলা ষাঁড়ের আক্রমণে এলাকাবাসী অতিষ্ঠ। এমনকি রেহাই পাচ্ছে না নিরীহ নারী-শিশু। গত ১৪ জুন এক পাগলা ষাঁড়ের গুঁতোয় নিহত হয়েছে মোসাম্মৎ মোমেনা খাতুন (২০) নামে একজন সদ্য-বিবাহিত মহিলা।

এ ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে জামাত, জাগপা, জাতীয়দল, ফ্রীডম পার্টি হাটহাজারী শাখা বিবৃতি দিয়েছে।

ঘ) পাশবিক : ষাঁড় কর্তৃক যুবতী

চট্টগ্রাম, ১৪ই জুন। এক ষাঁড়ের পাশবিক লালসার শিকার হয়েছে এক যুবতী। মাত্রাতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে যুবতীর মৃত্যু ঘটেছে। ঘটনাটি জনমনে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে।

এক উদ্ভিন্নযৌবনা লাস্যময়ী যুবতী মোমেনা। উত্তেজক লাল রঙের পোশাকে সজ্জিত হয়ে সে যাচ্ছিলো পথ দিয়ে। পথিমধ্যে তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় এক ষাঁড়ের। ষাঁড়টি সহজেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। সে যুবতীটির দিকে শিং বাঁকিয়ে ছুটে যায় এবং তার শিঙের সাথে পেঁচিয়ে যুবতীর শাড়ি ছিঁড়ে ফেলে। অতঃপর সে যুবতীর বুকে, পেটে ও শরীরের অন্যান্য স্থানে মারাত্মকভাবে আঘাত হানতে থাকে। উপর্যুপরি আক্রমণে যুবতী সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলে এবং অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফলে মারা যায়।

(এ ক্ষেত্রে মহিলার রক্তাক্ত শাড়ির ছবি হতে পারে)

সম্মানিত পাঠক, আশা করি, আপনারা নিজেরাই বুঝতে পেরেছেন, কোন্ খবরটি কোন্ পত্রিকায় ছাপা হলে মানাবে। তবে, আমরা কতিপয় সূত্র ধরিয়ে দিচ্ছি আপনাদের, যা ব্যবহার করে আপনারা মিলিয়ে নিতে পারেন প্রদত্ত ধাঁধাটির উত্তর।

ক) এই দৈনিকটি সাধুরীতি ব্যবহার করে এবং এটি সর্বাধিক বিক্রিত।

খ) এই দৈনিকটির মালিক-সম্পাদক একজন প্রাক্তন এমপি এবং চা-বাগানের স্বত্বাধিকারী।

গ) এই দৈনিকটির মালিক একজন কুখ্যাত রাজাকার এবং প্রাক্তন মন্ত্রী। বাগদাদ লাইনে তার চলাফেরা।

ঘ) এই দৈনিকটি রসালো খবর পরিবেশনের জন্যে বিখ্যাত। পত্রিকার লোগোর নিচে এরাও প্রতিষ্ঠাতা অমুক ব্যবহার করে থাকে।

২৩ জুলাই '৯০ পূর্বাভাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আইয়ামে জাহেলিয়াত

অনেক অনেক দিন আগেকার কথা। তখন পাক বাংলাস্তানের লোকেরা খুবই কম্‌বখ্‌ত ছিল। বেশরিয়তি হুকুমত এবং শিরকি হিকমতে দেশ সয়লাব হইয়া গিয়াছিল। তখন ওজারতিতে বেপর্দা আওরতগণও লিপ্ত হইত। এমনকি একজন বিধবা উজিরে-আমীর পদে আসীনা হইয়াছিল। টেলিভিশনে তাহাকে দেখানো হইত। ফলে মরদগণেরা গুনাহগার হইত (নাউজুবিল্লাহ)। অথচ আল্লাহতালা আওরত–জেনানাগণকে পুরুষ জাতির অধীন করিয়া দিয়াছেন।

সে–সময় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি জেনার আখড়ায় পরিণত হইয়াছিল। তোমরা শুনিলে অবাক হইবে, আওরতগণও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িতে পারিত। তাহাদের জন্যে আলাদা আবাসিক হল পর্যন্ত বানানো হইয়াছিল। এইরূপ কবিরাগুনাহে দুনিয়াতেই জাহান্নাম কায়েম করা হইয়াছিল। মক্তব-মাদ্রাসাগুলিতে ইনসানের তৈরি মতবাদ ও ইতিহাস পড়ানো হইত। এমনকি কুফরি মতবাদগুলিও তাহাদের পাঠ্যতালিকায় জায়গা পাইত।

সে-সময়ে বাংলাস্তানে লোকদের বেশরিয়তি কর্মকাণ্ডের সীমা-পরিসীমা ছিল না। যদিও আল্লাহর রাসুল বলিয়া গিয়াছেন—ধনুক বিদ্যা, অশ্ব চালনা ও আপন স্ত্রীর সহিত রঙ্গ করা ব্যতিরেকে সকলপ্রকার খেলাধুলা হারাম, তথাপিও তখন নানা হারাম খেলাধুলার পেছনে রাষ্ট্রীয় মদদ থাকিত। সে যুগে ফুটবল নামে একটি হারাম খেলা খুবই জনপ্রিয় ছিল। একটি চর্মনির্মিত গোলকের পেছনে বাইশজন লোক দৌড়াদৌড়ি করিত। তাহাদের গতর ঢাকা থাকিত না, অব্রু রাখা হইত না। এমনকি, আওরতগণও এ সমস্ত খেলায় অংশ নিত। তাহাদের শরীরের গোপন অংশগুলিও বেআব্রু অবস্থায় থাকিত।

কেতাবে গান-বাজনাকে হারাম করা হইয়াছে। আইয়ামে জাহেলিয়াতে গান-বাজনার ব্যাপক প্রকোপ দেখা দিয়াছিল। এমনকি বেদ্বীন রবীন্দ্রনাথের গানকে জাতীয় সঙ্গীত বানানো হইয়াছিলো। কেতাবে আছে, যখন কোনো ব্যক্তি গান শোনে, তখন ইবলিশ তাহার মাথা পা দিয়া নাড়াইতে থাকে। সে যুগে বাংলাস্তানের মানুষ ইবলিশের সাগরেদে পরিণত হইয়াছিলো। তাহারা গান-বাজনার তালেতালে শুধু মাথাই ঝাঁকাইতো না, গতরের নানান জায়গাও ঝাঁকাইতো। এই প্রক্রিয়াকে তাহারা নাচ বলিত।

শরিয়তে প্রাণীর ছবি আঁকা ও মূর্তি তৈরিকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হইয়াছে, কিন্তু সেকালে বাংলাস্তানের বই-পুস্তকগুলিতে নানা জন্তু-জানোয়ার ও ইনসানের ছবিতে ভরা থাকিত। আল্লাহতালা হাশরের দিনে এই হতভাগ্য বান্দাদিগকে বলিবেন, তোমরা এই ছবিগুলাতে জান দাও। আর তখন তাহারা এইরূপ করিতে ব্যর্থ হইবে এবং তাহাদিগকে দোযখের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হইবে। সেই বেপর্দা আওরতগণ, যাহারা

টেলিভিশনে, মাঠে-ময়দানে পরপুরুষের সামনে উচ্চস্বরে কথা বলিত, তাহাদের প্রতিটি চুল আগুনের সর্প হইয়া তাহাদিগকে দংশন করিবে, তাহাদের ফুটন্ত পুঁজ পান করানো হইবে। কিন্তু সেই আক্কলমন্দ আওরতগণ তাহা জানিয়াও না-জানিবার ভান করিত।

সে-যুগে মূর্তিপূজা খুবই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিকটে ও সাভারে দুইটি বড়ো পূজার বেদি তৈয়ার করা হইয়াছিলো। সেখানে নিহত বেদ্বীনদের উদ্দেশে আরতি নৃত্য করা হইত আর ফুল দেওয়া হইত। এমনকি সরকার-প্রধান আর বিদেশী মেহমানগণও এই পূজামণ্ডপে শেরকিতে মাতিত।

শিরক্-এর পাপে দেশটা জারে জার হইয়া পড়িয়াছিল। একবার এক সাচ্চা মুসলমান শাসক দেশে রাষ্ট্রধর্ম কায়েম করিতে সচেষ্ট হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট, নাস্তিক ও ইন্ডিয়ার দালালরা তাঁহার বিরুদ্ধে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। না-ফরমান তিনটি জোট একটি শয়তানি দলিল প্রস্তুত করিল। তাহাতে 'সংসদ'কে সার্বভৌম অর্থাৎ সুপ্রিম অর্থাৎ 'আকবর' করা হইল। অথচ আল্লাহতালাই একমাত্র সার্বভৌম। ইনসান ও জ্বিন তাহার ইচ্ছা-অনিচ্ছার চাকর মাত্র। আইয়ামে জাহলিয়াতে বাংলাস্তানের মানুষ তাহা বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিল।

এই বেদ্বীনি ধারার বিরুদ্ধে দ্বীনি জামায়াত জেহাদ অব্যাহত রাখিয়াছিল। ইতিপূর্বে একবার একসঙ্গে ত্রিশ লক্ষ হিন্দুস্থানের দালালকে কতল করা হইয়াছিলো। ইহার পরেও প্রায় প্রতিদিনই একজন-দুইজন হিন্দুস্তানপন্থী, কমিউনিস্ট, নাস্তিকের মৃত্যুদণ্ড দ্বীনের খেদমতকারদের নিজস্ব আদালতে কার্যকর করা হইত। কোনো কোনো বেদ্বীনের হাতের পাঞ্জা কাটিয়া ফেলা হইত। কোনো কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের জেহাদের ময়দানে যে আওরতগণকে পাওয়া যাইত, তাহাদিগকে মালে গণিমত হিশেবে গণ্য করা হইত এবং তাহাদিগকে নির্জন পাহাড়ি জঙ্গলে লইয়া যাওয়া হইত। তখন কেয়ামতের আশঙ্কায় কামেল নেকবান্দাগণ খুবই শঙ্কিত ছিলেন। কেননা কেয়ামতের লক্ষণসমূহ ফুটিয়া উঠিতেছিল। কেতাবে আছে, যখন আওরতগণ মরদগণকে শাসন করিবে, তখন বুঝিতে হইবে কেয়ামত আসন্ন। সরকার ও বিরোধী দল উভয় স্থলেই মহিলারা নেতৃত্ব দখল করিলে কেয়ামতের আশঙ্কা দেখা দিল। আসন্ন কেয়ামত ঠেকাইতে দ্বীনি জামায়াতীরা তৎপর হইয়া উঠিল। হযরত মওলানা ছাঈদী সাহেব ফতোয়া দিলেন, হায়েজ নেফাজযুক্ত কোনো জেনানা বিধবা থাকিতে পারে না, অবিলম্বে তাহার বিবাহের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তাহার এই ফতোয়ায় কেহ কর্ণপাত করিল না। যেন আল্লাহ্তালা তাহাদের কর্ণকুহরকে সীল করিয়া দিয়াছেন। ছুম্মুন বুকমুন, উমিউন ফা হুন, লা ইয়ারজেউন। তখন জেহাদ ঘোষণা করা ছাড়া আর কোনো উপায় রহিল না।

তখন নাঙ্গা তরবারি হাতে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হইয়া হাতকাটা গলাকাটা ফৌজেরা বাহির হইল। পকেটে পেট্রোডলার, বুকে পাকিস্তানী জোশ। তাহারা ইতিহাস সৃষ্টি করিল। একের পর এক দ্বীনের শত্রুকে তাহারা কতল করিল। শহীদুল্লাহ কায়সার, মুনির চৌধুরী, ড: ফজল রাব্বী, জি সি দেব প্রমুখকে যে-তালিকা অনুযায়ী খতম করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হইয়াছিলো তাহা এইবারে সম্পূর্ণ করা হইলো। সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমাম, আহমদ শরীফ ইত্যকার নাফরমানদের হাত হইতে ঈমানদারগণ নাজাত পাইল। বিধর্মীদের কচুকাটা করা হইল। বাকিদেরকে তাড়াইয়া সীমানা পার করানো হইল। দেশের অন্ধকার যুগের অবসান ঘটাইতে নূতন সূর্য আকশে দেখা দিলো। চারিদিকে রব উঠিলো : নারায়ে তকবীর...

১ এপ্রিল ১৯৯১, পূর্বাভাস

পুনশ্চ, ইহা একটি গদ্যকার্টুন

এক.

৩১ ডিসেম্বর ১৯৯২। শীতের সকাল। সূর্য যেন আরো খানিকক্ষণ কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকতে চাইছে। বারবারা বুশের ঘুম ভেঙে গেছে ভোর রাতে। আরেকটা দিন চলে গেলো। আজ '৯২-এর শেষ দিন। আগামীকাল পয়লা জানুয়ারি ১৯৯৩। হ্যাপি নিউ ইয়ার। হ্যাপি ? কার জন্যে। হিলারি ক্লিনটনের জন্যে। ২০ জানুয়ারি থেকে ক্লিনটন প্রেসিডেন্ট। হিলারি ফার্স্ট লেডি। ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট আলো। বাইরে সকাল হচ্ছে। বুশ সাহেব প্রশান্ত ভঙ্গিতে ঘুমুচ্ছেন। তার মনে কোনো কষ্ট নেই। জনগণের রায় তিনি মেনে নিয়েছেন। কষ্ট নেই, কথাটা মনে হয় ঠিক নয়। পৃথিবীর জন্যে তিনি কতো কী করেছেন, কমিউনিজমের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছেন, সাদ্দামের দর্পচূর্ণ করেছেন। তিনি সারাটা পৃথিবীর নেতা অথচ মার্কিনিরা তাকে পুনর্নির্বাচিত করলো না, এমন মূর্খ এ দেশবাসী! বারবারা দীর্ঘশ্বাস গোপন করতে পারলেন না। তার চোখের পাতা ভিজে এলো। বুশ সাহেবের ঘুম ভেঙে গেলো কান্নার শব্দে। পাশে বারবারার কান্নাকম্প্র শরীর। তিনি পরম ভালোবাসার হাত রাখলেন বারবারার মাথায়। বারবারা মাথা নিচু করে কাঁদতেই লাগলেন। কেউ কোনো কথা বললেন না দীর্ঘক্ষণ। নীরবতা ভাঙলেন বুশ। বললেন, আজ থার্টি ফার্স্ট। যে বছর চলে যাচ্ছে তাকে যেতে দাও। কাল থেকে একটা নতুন বছরের শুরু। নতুন বছর নিশ্চয়ই আমাদের জন্যে নতুন সৌভাগ্যের বার্তা বয়ে আনবে। বারবারা অবাক হয়ে গেলেন। বুশ কথা বলছেন সরকারি ভাষায়। প্রেসনোটের ভাষায়। এতোটা অ-রোমান্টিক বুশ কখনো ছিলেন না। রাজনীতি আর ক্ষমতা তাকে এমন চাঁছাছোলা মানুষে পরিণত করেছে। তাঁর এমন সুন্দর মুখটিও এখন দেখতে লাগে শেয়ালের মতো।

বারবারা জড়িয়ে ধরলেন বুশের মাথা। বললেন, নতুন বছরে আমি একটা জিনিস চাইবো। এখন বলবো না— আজ রাত ১২টা ১ মিনিটে বলবো।

নারীচরিত্র! বুশ মনে মনে হাসলেন। এখন বলবেন না, রাতে বলবেন।

বুশকে কী বলবেন বারবারা ? সারাটা দিন বারবারা রিহার্সেল দিলেন মনে মনে : বুশ তুমি ৫৫০ কোটি মানুষের নেতা থেকে শুধু আমার হও, শুধু আমার।

দুই.

শয়তানরাজ তার চেলাচামুণ্ডাদের ডেকেছেন দরবারকক্ষে। আজ ৩১ ডিসেম্বর। সারা বছরে কে কী শয়তানি করেছে তার হিসেব-নিকেশ করা দরকার। আগামী বছরের শয়তানির পরিকল্পনাটাও চূড়ান্ত করা দরকার। বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার প্রতিনিধি শয়তান কর্মরত। প্রতিনিধি শয়তানেরা প্রথমে টার্গেট করে কিছু মানুষকে। এই মানুষদের মস্তিষ্ক ধোলাই করা হয়। এরপর ঐ মানুষেরা হয়ে ওঠে সমর্থক শয়তান। সমর্থক শয়তানেরা কাজ ভালো করলে পদোন্নতি পেয়ে হয় কর্মী শয়তান। কর্মী শয়তান থেকে হয় সাথী শয়তান। সাথী শয়তান থেকে পূর্ণ শয়তান। পূর্ণ শয়তানের একটি মজলিশে রুকন থাকে। তাদের নেতাকে বলা হয় আমির-ই-শয়তান।

বাংলাদেশের আমির-ই-শয়তান তার বার্ষিক রিপোর্ট '৯২ পেশ করলো। খবর ভালো না। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কারাগারে দুজন মানুষরূপী মিচকে শয়তান ছিলো। শয়তানতন্ত্রের মূলমন্ত্র হচ্ছে 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা'। সেই মূলতন্ত্র অনুসারে কারাগারেই ওই দুই ব্যক্তিকে টার্গেট করা হয়। অচিরেই তারা সমর্থক শয়তানে পরিণত হয়। তারপর কর্মী শয়তান, তারপর সাথী শয়তান। এ পর্যন্ত সব ঠিকঠাক। কিন্তু মুশকিল হলো ওই দুই মানুষের একজন নিজেকে আমির-ই-শয়তান বলে ঘোষণা করেছে। সে আর শয়তানরাজ্যের অধীনতা মানছে না। নিজেই একটা আলাদা শয়তানরাজ্য সে কারাগারে গড়ে তুলেছে।

আর অপর ব্যক্তিটি এখনো শয়তানরাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করে বটে, কিন্তু তার একটি দাবি আছে। সে বলেছে ওই দাবিটি যদি পূরণ করা না হয় তবে সেও বিদ্রোহ করবে। শয়তানরাজ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। মর্তের দুজন মানুষ শয়তানিতে তাঁকেও হারাতে চায়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ওই ব্যক্তির দাবিটা কী ?

অনতিবিলম্বে কারাগারে তাকে বান্ধবী সরবরাহ করতে হবে।'

এ ব্যাপারে শয়তানরাজ তিনসদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করলেন। বিভিন্ন দেশে শয়তানি কার্যক্রমের রিপোর্ট পেশ করা হলো। সবশেষে শ্রেষ্ঠ শয়তানির পুরস্কার '৯২ ঘোষিত হলো। এ বছর সেরা শয়তানির পুরস্কার পেলেন ভারতে নিযুক্ত শয়তান প্রতিনিধি। তাকে সহযোগিতা করার জন্যে বাংলাদেশের শয়তানের ভাগ্যে জুটলো সান্ত্বনা পুরস্কার।

তিন.

৩১ ডিসেম্বর। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। শরীফ সাহেব সেজেগুজে তার বারে এলেন। এ বারটির মালিক তিনি নিজে। আরো অন্য ব্যবসা আছে, একটি দুগ্ধখামারও আছে তাঁর। সারাবছর সেসব নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। বারটির দেখাশুনা করবার সময় পান না। কিন্তু বছরের একটি দিন তিনি নিজে আসেন বারে। নিজে দাঁড়ান কাউন্টারে। ক্যাশবাক্স ভরে যায় টাকায়। গত ১৫ দিন থেকে এ দিনটির জন্যে তিনি অপেক্ষা করছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

স্পেশাল অর্ডার দিয়ে বেশি করে সওদা আনাতে হয়েছে। সকাল থেকে বিক্রি হচ্ছে হু হু করে। বেশিরভাগই যাচ্ছে বাইরে।

আজ সন্ধ্যাতেই সবগুলো টেবিল ভর্তি হয়ে গেছে কাস্টমারে। কাস্টমার হচ্ছে লক্ষ্মী। তিনি তাঁর খদ্দেরদের দিকে তাকিয়ে কপালে হাত ঠুকলেন। ক্যাসেট-প্লেয়ারে হিন্দি গান বাজছে: 'মে কাহা যাউঙ্গা হোতা নাহি ফয়সালা'। কোনোদিনই ফয়সালা হবে না। বাংলাদেশে যতদিন পার্বতীরা আছে, ততদিন দেবদাসরা থাকবে। তাঁদের ব্যবসা থাকবে।

একজন মোটামতো ভদ্রলোক মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন। হঠাৎ হল্লা। ভদ্রলোক কাঁদছেন: 'আমার মেয়ে আমাকে খুব আদর করে। আমি শালা একটা হারামজাদা'। তাঁর সঙ্গীরা তাকে ধরে বাইরে নিয়ে গেলো। কতো বিচিত্র লোক এসেছে আজ। ব্যবসা জমজমাট। আহা, যদি প্রতিটি রাত থার্টি ফার্স্ট নাইট হতো। শরীফ সাহেব ভাবলেন।

এরশাদ সাহেবের সময়ে এক অদ্ভুত আইন জারি করা হয়েছিলো। রাষ্ট্রধর্মের দেশে মদ্যপান করতে হলে অনুমতি নিতে হবে, সঙ্গে কার্ড রাখতে হবে, যেন জলভ্রমণের পাসপোর্ট। প্রথম প্রথম খুব কড়াকড়ি। লোকজন বসে চায়ের কাপে মদ খেতো। তারপর যথাপূর্বং। রাষ্ট্রধর্ম আছে, মদ্যপানও আছে। এ যেন বোরকার নিচে আর কোনো কাপড় না পরে ব্রেকডান্স দেয়া। নাউযুবিল্লাহ। এসব কী ভাবছেন তিনি। তাঁর বুকের বাঁ পাশটা মুচড়ে উঠলো। একটা স্ট্রোক হয়ে গেছে। ডাক্তার তাকে সাবধানে থাকতে বলেছে।

শরীফ সাহেব মৃত্যুচিন্তায় আক্রান্ত হলেন। কবর খুব অন্ধকার। মুনকার-নাকীর এসে জিজ্ঞেস করবে—বলো, তোমার প্রভু কে ? তিনি হাত ওঠালেন। বললেন, ইয়া পরওয়ারদিগার, সব গোনাহ মাফ করে দাও প্রভু। তুমি তো জানো, তোমার কতো পেয়ারের বান্দাকে আমি শরাব সরবরাহ করেছি, তাদের অছিলায় আমাকে জান্নাতবাসী করো।

স্বর্গের চিন্তায় তাঁর চোখে আলোক ঝিলিক দিয়ে উঠলো। আচ্ছা, স্বর্গে তো সুরা সরবরাহ করা হবে, সেগুলো সাপ্লাই দেবে কোন্ কোম্পানি ? পীর সাহেবকে ধরে স্বর্গের মাল সাপ্লাইয়ের টেন্ডারটা যদি পটানো যেতো।

চার.

কলিমুদ্দিন শেখ ঘুম থেকে উঠেছে কাকডাকা ভোরে। তার পেটটা চিনচিন করে ব্যথা করছে। আরো একটু শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সে উপায় নেই। আজ ১৭ পৌষ। আজ তার ঘর ছাইতে হবে। চালের খড় কমে গেছে। রাতে কুয়াশা ঢোকে ঘরে। একটা কাঁথায় শীত মরে না। খাটিয়াটায় তার তিন বছরের ছেলেটা ঘুমুচ্ছে। ছেলের মা উঠে পড়েছে অনেক আগেই। কলিমুদ্দিন শেখ বিছানা ছাড়লো। চুলার পাড়ে গিয়ে কয়লার একটা টুকরো নিলো। দাঁত মাজতে হবে। দাঁত মাজতে মাজতে সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঘরটার দিকে তাকালো। এবার ধান ভালো হয়েছে। খড়ের অভাব নেই। এবার ঘরটা ভালো করে ছাইতে হবে। যেন দুবছর আর ঘরে হাত না দিতে হয়।

৩১ ডিসেম্বর ১৯৯২, ভোরের কাগজ

মিথ্যা তিন প্রকার : মিথ্যা, ডাহা মিথ্যা ও পরিসংখ্যান

গদ্যকার্টুনের পক্ষ থেকে আমরা এক জরিপ-প্রকল্প হাতে নিয়েছিলাম। জরিপ কমিটি তাঁদের রিপোর্ট আমাদের কাছে পেশ করেছেন, তা থেকে কতোগুলো উল্লেখযোগ্য অংশ তুলে ধরা হলো।

সংবাদপত্রের সংখ্যা

বাংলাদেশে এখন সংবাদপত্রের পাঠকের সংখ্যা সোয়া লাখ, সাংবাদিকের সংখ্যা আড়াই লাখ এবং সংবাদপত্রের সংখ্যা পাঁচ লাখ। অর্থাৎ চারটি সংবাদপত্র পিছু দুজন সাংবাদিক এবং একজন পাঠক।

বেলুনের সংখ্যা

বাংলাদেশে প্রতি বছর এক কোটি বেলুন ব্যবহৃত হয়। দেশে শিশুর সংখ্যা দুই কোটি। অর্থাৎ প্রতিবছর প্রতি দুজন শিশু মাত্র একটি বেলুন ব্যবহারের সুযোগ পায়। বাংলাদেশে রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ সমিতির সঙ্গে যোগাযোগ করে জানা গেছে, প্রতি বছর উৎপাদিত সর্বমোট বেলুনের সংখ্যা দুই লক্ষ। এদিকে, বাংলাদেশের কনডম আমদানিকারক সমিতি সর্বাধিক কনডম বিক্রির পুরস্কার হিসেবে আন্তর্জাতিক জনসংখ্যা পুরস্কার লাভ করেছে।

সমকামীর সংখ্যা

বাংলাদেশে জামাত-শিবিরের সদস্যসংখ্যা পঞ্চাশ হাজার। দেশে স্বাভাবিক ও সমকামীর অনুপাত ২ ঃ ১।

এই জরিপ করা হয়েছে র‍্যানডম স্যাম্পলিং-এর ভিত্তিতে। এলাকা হিসেবে নেয়া হয়েছিলো— চট্টগ্রাম, সুতরাং জরিপের ফলাফল বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নাও হতে পারে।

পুলিশ ও পতিতা

বাংলাদেশে পুলিশের সংখ্যা ছয়লাখ এবং ভাসমান পতিতার সংখ্যা তিন লাখ। পুলিশ ও ভাসমান পতিতার অনুপাত ২ ঃ ১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাজনৈতিক দলের সংখ্যা
১৯৮২ সালে বাংলদেশে রাজনৈতিক দল ছিলো ৩ হাজার ৩ শ ১৩টি। ১৯৯১ সালে রাজনৈতিক দলের সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩ হাজার ৯শ ৯৯টি। ১৯৮২ সালে দেশে ঠিকাদারের সংখ্যা ছিলো ৩ লাখ ৭০ হাজার। ১৯৯১ সালে দেশে ঠিকাদারের মোট সংখ্যা ত্রিশ লাখ পাঁচ হাজার।

টিভির ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান উপস্থাপক
বাংলাদেশে গাধার সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে। ১৯৭৮ সালে দেশে মোট ৩৩টি গাধা ছিলো। ১৯৯১ সালে সে সংখ্যা নেমে এসেছে ১৩-এ। এদিকে টিভি গাইড থেকে দেখা যাচ্ছে, টিভির ম্যাগাজিন অনুষ্ঠান উপস্থাপকের সংখ্যা ১৯৭৮ থেকে এ পর্যন্ত ২০ জন বৃদ্ধি পেয়েছে।

কলামিস্টের সংখ্যা
বাংলাদেশে সাক্ষরের সংখ্যা ১ কোটি ৩৩ লাখ। বাংলাদেশে স্তাম্ভিকের সংখ্যা ২ কোটি ৩৩ লাখ।

বাটার জুতো
বাংলাদেশে মসজিদের সংখ্যা পাঁচ লাখ ছয়চল্লিশ হাজার, জুতো-চোরের সংখ্যা এক লাখ ষাট হাজার। বাটা প্রতি বছর এক কোটি জোড়া জুতা উৎপাদন করে। বাটার জুতো প্রতি বছর বিক্রি হয় সোয়া কোটি জোড়া।

নায়িকাদের ফিগার
বাংলাদেশে চলচ্চিত্র নায়িকাদের গড় ফিগার ৫৪-৫৮ (প্যাড ছাড়া)।

মজলুম জননেতা
বাংলাদেশে মজলুম জননেতাদের জিহ্বার গড় দৈর্ঘ্য দশ ইঞ্চি।

গণ শব্দের গণ ব্যবহার
গণ শব্দটির জন্যে গণধোলাইয়ের ব্যবস্থা করেছে এনজিওগুলো। গণ দিয়ে নামকরণ করা হয়েছে এমন এনজিও-র সংখ্যা ৩শ ৯৯। উদহারণ : গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, গণসাহায্য সংস্থা, গণনাট্য, গণ উন্নয়ন ট্রাস্ট ইত্যাদি।

কলা
বাংলাদেশের কলার দৈনিক উৎপাদন ২ লক্ষ হালি। ১টি বানর প্রতিদিন ৩টি করে কলা খায়। দেশে বানরের সংখ্যা ৫০ হাজার। দেশের ক্যান্টনমেন্টগুলোতে প্রতিদিন ৩ লক্ষ কলা সরবরাহ করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সয়ফুর রহমান

সয়ফুর রহমানের মাথায় চুলের সংখ্যা ১ হাজার ৫শ'টি। সয়ফুর রহমান প্রতিদিন আধাপোয়া নারকেল তেল ব্যবহার করেন। ভ্যাট প্রবর্তনের ফলে আধাপোয়া তেলের জন্যে অতিরিক্ত দিতে হয় দেড় টাকা। অর্থাৎ সয়ফুর রহমানের প্রতি ১০০টি চুলের জন্যে প্রতিদিন ১ পয়সা করে ভ্যাট দিতে হয়।

গদ্যকার্টুনের পাঠক

বাংলাদেশে পাগলের সংখ্যা ১ লাখ ৮০ হাজার। গদ্যকার্টুনের পাঠক সংখ্যা সোয়া লাখ। পঞ্চান্ন হাজার লোক দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় পড়ে থাকে।

আবৃত্তিকার ও কাক

ঢাকায় কাকের সংখ্যা ৮০ হাজার। আবৃত্তিকারের সংখ্যা ৮১ হাজার। আবৃত্তি সংগঠনের সংখ্যা ৮২ হাজার।

২২ জুলাই ১৯৯১, পূর্বাভাস

সম্পূর্ণ বানানো গল্প

গোধূলি পেরিয়ে সন্ধ্যা নেমে এসেছে। তখন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা। তিনি নামলেন গাড়ি থেকে। এই গাড়িটি নিচু ধরনের। মাথা নামিয়ে উঠতে হয়। নামবার সময়েও মাথা নামাতে হয়। নামতে গিয়ে শাড়িটি সামান্য উঠে গেলো। তিনি বিরক্তিবোধ করলেন। আগের পাজেরো জীপটিই ভালো ছিলো।

পাজেরোর কথা মনে হতে তার একটি বিব্রতকর স্মৃতি মনে পড়ে গেলো। তিরাশি-চুরাশির দিকে তিনি একবার জেলা শহর সফরে বেরিয়েছিলেন পাজেরো গাড়িতে। তাঁর পাশে বসেছিলো একজন প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী ব্যারিস্টার। হঠাৎ এক্সিডেন্ট হয়ে গেলো। গাড়ি উল্টে গেলো। অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়ে গেলেন তিনি। কিন্তু পরদিন দেশের সাধুভাষার দৈনিকটিতে ছাপা হলো: 'ব্যারিস্টার অমুক আহমেদ দুই হাতে আগলাইয়া নিজের জীবনের ঝুঁকি লইয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়াছেন।' এই মহাবিরক্তিকর স্মৃতিটুকু ঝেড়ে ফেললেন তিনি। নিজের কক্ষে গিয়ে বসলেন। এই ভবনটি তার খুব পছন্দ। আগে অতিথিভবন ছিলো। আজ তাঁর জন্যে একটি বিশেষ দিন। আজ তিনি জনগণের কাছাকাছি যেতে পারবেন। অনেকেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তিনি তাঁদের কথা শুনবেন। মনোযোগ দিয়েই শুনবেন। তাঁদের সমস্যা থাকলে সমাধানের চেষ্টা করবেন। আন্তরিকভাবেই করবেন।

একটি একটি করে লোক আসছে। বিচিত্র সব সমস্যা নিয়ে কথা বলছে। দেশটা কি সমস্যার গুদাম হয়ে গেছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তবে তিনি সমস্যাগুলি উপভোগই করছেন। মাঝেমধ্যে অবশ্য খুব মজার সমস্যা আসছে। একটা মেয়ে এলো। আঠারো-উনিশ বছর বয়স।

: কী নাম তোমার ?

—মলি।

: বলো, কী বলবে ?

— আপা, আপনি আমার বড় বোনের মতো দেখতে। আমার একটা বড় বোন ছিলো জলি আপা। আমি কি আপনাকে আপা ডাকতে পারি। অবশ্য বুবু ডাকলে ভালো হতো। বুবু ডাকটা আপার চেয়ে বেশি আপন, তাই না আপা ?

তিনি আবার বিরক্তিবোধ করলেন। আপা ডাকটি তার পছন্দ নয়। এই অপছন্দের কথাটি তিনি গোপনও করেন না। একবার এক কর্মীকে তিনি বলেওছিলেন, তাঁকে আপা না ডাকতে। কিন্তু মেয়েটির চেহারার মধ্যে একটা কিছু আছে। তিনি 'না' বলতে পারলেন না। হেসে ফেললেন। বললেন, ঠিক আছে, তুমি আমাকে আপাই ডেকো।

মেয়েটি চলে গেলে তিনি বিষণ্ন বোধ করলেন। জীবনে ছোটখাটো সম্পর্কগুলি আসলেই ছোট নয়—মহামূল্যবান। এই সম্পর্কগুলি থেকে তিনি ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছেন। অবশ্য একেবারেই দূরে সরে যাচ্ছেন—তা বোধহয় ঠিক নয়। তাঁর ভাই বোনেরা তার কাছেই আছে। খুব দূরে সরে যায়নি। তাদের সঙ্গে সম্পর্কগুলি তিনি ঠিকই রক্ষা করে যাচ্ছেন। এ নিয়ে বাজারে কথাও আছে। তবে, বাজারে সব নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি হয়। এই বিষয়টি নিয়েও হচ্ছে।

আরেকজন দর্শনার্থী এলো। লোকটি খুবই কদাকার। লোকটির দাঁত হলুদ রঙের। বোঝাই যাচ্ছে, বহুদিন দাঁত মাজে না। এই লোকটির কথাও তাকে শুনতে হবে। সে যখন কথা বলবে তখন মুখ থেকে দুর্গন্ধ বেরুবে। তবু বসে থাকতে হবে। হাসিমুখে তার কথা শুনতে হবে। পৃথিবীটা আসলে একটা নাট্যমঞ্চ। সবাইকেই বাঁধা সংলাপ মুখস্থ বলে যেতে হয়। তঁকেও তা-ই করতে হবে। তাঁর মনে হলো তিনি ক্লান্ত।

কিন্তু উদ্যম হারালে চলবে না। তিনি একটি নতুন কাজ করছেন। তার অনুগত সাংবাদিকগণ এই কাজটিকে বলেছে 'ঐতিহাসিক'। একজন তো বলে ফেলেছে, খলিফা হারুন-অর-রশীদের পর আর কেউ এরকম করছেন। সর্বস্তরের নাগরিকদের জন্যে দরোজা খোলা রাখছেন। কথাটি তাঁর ভালোই লেগেছিলো। যদিও কথাটি সত্য নয়। খলিফারা হচ্ছে ইজ্জতবান মানুষ। তাঁদের সঙ্গে তুলনা নিরর্থক। কিন্তু তবুও তিনি খুশি হয়েছিলেন। মানুষ আসলেই নিজের প্রশংসা অন্যের মুখে শুনতে ভালোবাসে। তিনিও তার ব্যতিক্রম নন।

তবে তিনিই যে প্রথম এইভাবে জনগণকে দেখা দিচ্ছেন—এই কথা ঠিক নয়, আগের শাসকটিও একই কাজ করতেন। প্রতি বৃহস্পতিবার তিনি জনগণের সঙ্গে দেখা করতেন। অবশ্য এরকম প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়ে নয়। তাঁর সচিবালয়ে যেসব দরখাস্ত আসতো, যেসব আর্জি আসতো, সেসব থেকে বেছে বেছে তিনি লোকদের ডাকতেন। তাতে হৈচৈ হতো না। কিন্তু তিনি হৈচৈ করতেন অন্যক্ষেত্রে। একবার রিপা নামে এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মেয়ের ওপেন হার্ট সার্জারির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে খোঁজখবর নিতেন। মনে হতো খুবই মানবিক উদ্যোগ! আসলে সবটাই ছিলো লোক দেখানো। টেলিভিশনে 'যদি কিছু মনে না করেন' এ ভালো প্রচার দেয়া হয়েছিলো। এ-প্রসঙ্গটি মনে আসতেই তাঁর ভুরু কুঁচকে গেলো। এই একটি লোককে তিনি একেবারেই দেখতে পারেন না। আজ সে কোথায়?—তার ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে চিকন হাসি বেরিয়ে এলো।

রাজীব গান্ধীর কথা মনে এলো। রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকবার সময়ে সপ্তায় তিনদিন সাধারণের সঙ্গে দেখা করতেন। সোম, বুধ ও শুক্রবার। জনগণের কাছে যেতে চেয়েছিলেন রাজীব। বেচারা। জনগণের অতিরিক্ত কাছে যেতেই মারা পড়লেন।

ঘণ্টা চারেক তিনি এইভাবে দর্শন দিলেন। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মুখে স্পষ্ট বিরক্তি। কিন্তু তাঁর মুখ হাসি-হাসি। বাইরে হাজার হাজার লোক শুধু তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই অপেক্ষা করছে। কিন্তু সবাইকে তিনি এইভাবে দেখা দিতে পারবেন না। বাংলাদেশে দশ কোটি লোক। দশ কোটি লোকের প্রত্যেককে এক মিনিট করে সময় দিলে দশ কোটি মিনিট দরকার হবে। দশ কোটি মিনিট কতো বছর ?

তিনি তাঁর সহায়ককে বললেন, আচ্ছা বলেন তো দশ কোটি মিনিটে কতো বছর। হিসেব করে বলেন। ক্যালকুলেটরে হিসেব করে বলেন।

সহায়কটি অবাক হয়ে গেলো। তাড়াতাড়ি ক্যালকুলেটর নিয়ে বসলো বিশ বছর। বড়ো জটিল হিসাব। বারবার ভুল হয়ে যাচ্ছে। তিনি চমকে গেলেন। দিনরাত চব্বিশঘণ্টা যদি দেখা করেন তবে তার দরকার হবে। দিনে বারো ঘণ্টা সময় দিলে লাগবে চল্লিশ বছর। চল্লিশ বছরে লোক বেড়ে হয়ে যাবে ত্রিশ কোটি। সর্বনাশ !

কিন্তু আবার তিনি মুখে হাসি আনলেন। কারণ টিভি-ক্যামেরা এসেছে। ওয়াশ-রুমে গিয়ে মেকআপটা ঠিক করে আসলেন। টিভি-ক্যামেরার ব্যাপারটি তার বড়ই পছন্দ। গভীর-রাত পর্যন্ত তিনি দেখা দিলেন দর্শনার্থীদের। এইভাবে দেখা দেবার মধ্যে একধরনের আনন্দ আছে।

বড়ো বেশি ক্লান্তি নিয়ে ঘরে ফিরলেন তিনি। কিন্তু তাঁর বারবার এ হলুদ দাঁতঅলা কদাকার লোকটির কথা মনে পড়তে লাগলো। তিনি তাড়াতাড়ি বাথরুমে গেলেন। ভালো করে সাবানে হাত ধুলেন। এন্টিসেপটিক ক্রিম লাগালেন। হ্যান্ডকেয়ার লোশন মাখলেন। কিন্তু ঐ হলুদ দাঁতগুলো বারবার তার চোখের সামনে ভেসে আসতে লাগলো। রাতে খেতে পারলেন না। ভালো করে ঘুম হলো না। শুয়ে শুয়ে তিনি বিড় বিড় করতে লাগলেন, 'আমাকে কোন্ ফাঁদে ফেলে রেখে তুমি চলে গেলে'।

যখন তাঁর ঘুম ভাঙলো তখন দুপুর বারোটা। নাশতার টেবিলে তার জন্যে পরোটা আর মাংস সাজানো হচ্ছে।

তিনি জানতেন না, তার মনোভঙ্গিটা বহু আগেই এক কবি লিখে রেখে গিয়েছেন। সুধীন দত্ত। 'সহে না সহে না আর জনতার জঘন্য মিতালি'।

১৪ নভেম্বর ১৯৯১, খবরের কাগজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বেগম রোকেয়ার প্লানচেট সাক্ষাৎকার

নিচে বেগম রোকেয়ার সঙ্গে গদ্যকার্টুনিস্ট এর সাক্ষাৎকারটি হুবহু ছাপিয়ে দেয়া হলো।

গদ্যকার্টুন: বেগম, আপনি বোরখা পরে মুখ ঢেকে এসেছেন কেন ? এটা ১৯৯০ সালের বাংলাদেশ, উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ-শাসিত ভারত নয়।

বেগম রোকেয়া: কী করিয়া বুঝিবো ? যেই দেশের মানুষ এখনো পরীতে বিশ্বাস করে, যেই দেশের সর্বাধিক বিক্রিত সংবাদপত্রে পরীর খবর ছাপা হয়, আর জি হুজুরেরা দেশময় কাঠামো বিস্তার করিয়া রাখে, সেই দেশে প্রবেশের পূর্বে বোরখা পরিয়া আসাই সঙ্গত মনে করি।

গদ্যকার্টুন : বাল্যকালে পাঠ্যপুস্তকে আপনার একটি ছবি দেখেছি। সে ছবিতে আপনার পরনে তো বোরখা ছিলো না।

বেগম রোকেয়া : আমি আমার জ্ঞান হইবার পর সেই-যে বোরখা ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছি, আর কখনো পরি নাই। কিন্তু, অদ্য প্রায় এক শতাব্দী পরে উহা পরিতে হইল। ১৯৯০-এর বাংলাদেশ এক ভয়ঙ্কর অন্ধকার স্থান বলিয়াই আমার ধারণা। এখনে বোরখা ছাড়িয়া আসাকে বিপজ্জনক মনে হইয়াছে।

গদ্যকার্টুন : আপনি কি নারীস্থানের জানালা দিয়ে দেখেননি, এদেশে অনেকেই আছেন যারা বোরখা পরেন না। এদেশ এখন এগিয়ে গেছে, এখানে ফার্স্টলেডি আছে, হাসিনা আছে, খালেদা আছে।

বেগম রোকেয়া : হ্যাঁ, আমি নারীস্থান হইতে দূরবীন লাগাইয়া দেখিয়াছি এখানে অনেকেই বোরখা ছাড়াই চলাচল করিতেছেন। কিন্তু আমি তো আর পর্দা করিবার জন্য বোরখা পরিয়া আসি নাই। আমি আসিয়াছি আত্মরক্ষার তাগিদে। যদি পথেঘাটে কেহ চিনিয়া ফেলে, আমিই সেই রোকেয়া—তবে তাহারা আমাকে মারিয়াই ফেলিবে। অদ্যকার নারীরা শিক্ষালাভ করিতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিতেছে, রাজনীতি করিতেছে—তাহার মূলে যে, সকল নষ্টের গোড়া যে, তাহাকে পাইলে তাহারা কি আর আস্ত রাখিবে ?

গদ্যকার্টুন : 'তাহারা' বলতে আপনি কাদের বোঝাচ্ছেন ?

বেগম রোকেয়া : মিল্লাতীয় আলেম, রাজাকার জালেম, জামাতী ঘাতক কাঠমোল্লাদের।

গদ্যকার্টুন : তার মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন, এখনকার আলেমদের ভয়ে আপনি লুকিয়ে এসেছেন, কিন্তু সেকালের আলেমেরা আপনাকে তেমন কিছু বলেনি।

বেগম রোকেয়া : দেখুন, এই প্রশ্নের উত্তর আপনি লাভ করিবেন আমার নানান লেখায়। অবরোধবাসিনীর ভূমিকায় আমি বলিয়াছি, 'আমি কারসিয়ং ও মধুপুর বেড়াইতে গিয়া সুন্দর সুদর্শন পাথর কুড়াইয়াছি, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজে সাগরতীরে বেড়াইতে গিয়া বিচিত্র বর্ণের বিবিধ আকারের নানাবিধ ঝিনুক কুড়াইয়া আনিয়াছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আর জীবনের ২৫ বৎসর ধরিয়া সমাজসেবা করিয়া কাঠমোল্লাদের অভিসম্পাত কুড়াইতেছি।' সেকালের আলেমরা আমাকে কম জ্বালায় নাই, তাহারা আমাকে কাফের বলিয়াছে, কতল করিতে চাহিয়াছে।

গদ্যকার্টুন : একবার আপনি বলে ফেলেছিলেন, 'নারীদিগকে শোষণ করিবার জন্যে ধর্মগ্রন্থগুলি পুরুষেরা রচনা করিয়াছে'। এই উক্তি এখন করলে কী অবস্থা হতো আপনি জানেন ?

বেগম রোকেয়া : তখনো রেহাই পাই নাই। আমার জীবন বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। শেষে উক্তিটি প্রত্যাহার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছি। তবে হ্যাঁ, তখন তাহারা আমাকে কতল করে নাই, আল্লাহর নিকট হাজার শোকর। কিন্তু এখন হইলে আস্ত রাখিত না। তখন শাসক ছিল ব্রিটিশরা। উহারা আর যাহাই হউক কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল না। কিন্তু এখন এই দেশ রাষ্ট্রধর্মের দেশ। ইহা কোনো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র নহে। মানুষ দিনদিন সামনের দিকে অগ্রসর হয়। আর এই দেশ পিছাইয়াছে। এখন যদি আমি অনুরূপ কোনোকিছু বলিয়া ফেলিতাম তবে মোল্লারা আমাকে কতল করিত, রাষ্ট্র আমার কণ্ঠনালী চাপিয়া ধরিত।

গদ্যকার্টুন : ১৯২৯ সালের মাসিক মোহাম্মদী আষাঢ় সংখ্যায় শ্রীমতী আমিনা খাতুন লিখেছিলেন, কতক্ষণের জন্যে নাক, মুখ, চোখ বন্ধ করিয়া বেড়ানো—উহা ইসলামের বাহিরের পর্দা।' অর্থাৎ নারীরা কোনো পুরুষকে যে কেবল দেখা দেবে না, তাই নয়। বাইরের পৃথিবীকে চোখ মেলে দেখবেও না—এরকমই নাকি শাস্ত্রের বিধান? এ সম্পর্কে আপনি কিছু বলবেন কি ?

বেগম রোকেয়া : এই সম্পর্কে আপনাকে দুইটি ঘটনা বলিবো।

১. পশ্চিম দেশের এক হিন্দু বধূ তাহার শাশুড়ি ও স্বামীর সহিত গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল। স্নান শেষ করিয়া ফিরিবার সময় তাহার শ্বাশুড়ি ও স্বামীকে ভিড়ের মধ্যে দেখিতে পাইল না। অবশেষে সে এক ভদ্রলোকের পিছু পিছু চলিল। কতক্ষণ পরে পুলিশের হল্লা।— সে ভদ্রলোককে ধরিয়া কনস্টেবল বলে, 'তুমি অমুকের বউ ভাগাইয়া লইয়া যাইতেছ।' তিনি আচম্বিতে ফিরিয়া দেখেন, আরে এ কাহার বউ পিছন হইতে তাহার কাছার খুঁটি ধরিয়া আসিতেছে। প্রশ্ন করায় বধূ বলিল, সে সর্বক্ষণ মাথায় ঘোমটা দিয়া থাকে—নিজের স্বামীকে সে কখনো ভাল করিয়া দেখে নাই। স্বামীর পরিধানে হলদে পাড়ের ধুতি ছিল, তাহাই সে দেখিয়াছে, এই ভদ্রলোকের ধুতির পাড় হলদে, সে তাহার সঙ্গ লইয়াছে।

২. ২৮শে জুন, ১৯২৯-এর ঘটনা শুনুন। স্কুলের একটি মেয়ের বাপ লম্বাচওড়া চিঠি লিখিয়াছেন যে, মোটর বাস তাহার গলির ভেতর যায় না বলিয়া তাহার মেয়েকে 'বোরখা' পরিয়া মামা (চাকরানীর) সহিত হাঁটিয়া বাড়ি আসিতে হয়। গতকল্য গলিতে এক ব্যক্তি চায়ের পাত্র হাতে লইয়া যাইতেছিল, তাহার ধাক্কা লাগিয়া হীরার (তাহার মেয়ের) কাপড়ে চা পড়িয়া গিয়া কাপড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নষ্ট হইয়াছে। আমি চিঠিখানা আমাদের জনৈকা শিক্ষয়িত্রীর হাতে দিয়া ইহার তদন্ত করিতে বলিলাম। তিনি ফিরিয়া আসিয়া উর্দু ভাষায় যাহা বলিলেন, তাহার অনুবাদ এই:

'অনুসন্ধানে জানিলাম হীরার বোরখার চক্ষু নাই। (হীরাকে বোরখা মে আঁখ নেহী হায়)! অন্য মেয়েরা বলিল, তাহার গাড়ি হইতে দেখে মামা প্রায় হীরাকে কোলের নিকট লইয়া হাঁটাইয়া লইয়া যায়। 'বোরখা'য় চক্ষু না-থাকায় হীরা ঠিকমতো হাঁটিতে পারে না—সেদিন একটা বিড়ালের গায়ে পড়িয়া গিয়াছিল,– কখনো হোঁচট খায়। গতকল্য হীরাই সে চায়ের পাত্রবাহী লোকের গায় ধাক্কা দিয়া তাহার চা ফেলিয়া দিয়াছে।

দেখুন দেখি, হীরার বয়স মাত্র ৯ বৎসর—এতটুকু বালিকাকে 'অন্ধ বোরখা' পরিয়া পথ চলিতে হইবে। ইহা না করিলে অবরোধের সম্মান রক্ষা হয় না।

গদ্যকার্টুন : এখন যেমন 'মিল্লাত', 'সংগ্রাম' রয়েছে প্রগতিপন্থী লেখকদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করতে, আপনার সময়ে তেমন কিছু ছিলো না ?

বেগম রোকেয়া : ছিল না মানে। দুইটির নাম খুব মনে পড়ে। 'খবিছ' 'গলীদ' নামের দুইটি উর্দু পত্রিকা।

গদ্যকার্টুন : আপনি লিখেছেন, 'সমাজ আমাদিগকে কেবল অবরোধ, কারাগারে বন্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। হযরত আয়শা সিদ্দিকী নাকি ৯ বৎসর বয়সে বয়োপ্রাপ্তা হইয়াছিলেন, সেইজন্য সম্ভ্রান্ত মুসলমানের ঘরের বালিকারা বয়স আট বৎসর পার হইলেই তাহাদের উচ্চহাস্য করা নিষেধ; উচ্চ স্বরে কথা বলা নিষেধ; দৌড়ান লাফান-ইত্যাদি সবই নিষেধ। এককথায় তাহার নড়াচড়াও নিষেধ। সে গৃহকোণে মাথা গুঁজিয়া বসিয়া কেবল সূচিকর্ম করিতে থাকিবে—নড়িবে না, এমন কি দ্রুতগতিতে হাঁটিবেওনা।'

এ ধরনের কথা এখনো উচ্চারণ করতে আমরা ভয় পাই। আপনি যদি দয়া করে বলতেন তবে আপনার জবানীতে প্রকাশ করা যেতো।

বেগম রোকেয়া : দেখেন, তখন আমার মধ্যে জেদ ছিলো। তখন অনেক রিস্ক নিতে পারিয়াছি। এখন এই বয়সে এইসব কথা বলিয়া বিপদ বাড়াইতে চাই না। না, আমার নিজের বিপদের কথা বলিতেছি না। আপনাদের পত্রিকা হুজুরদের কোপানলে পড়িবে। নানা ঝামেলা হইবে।

গদ্যকার্টুন : আপনি কি নারীবাদী ?

বেগম রোকেয়া : আপনি কি আমার 'সুলতানার স্বপ্ন' পড়েন নাই। তাহাতে কি পুরুষদিগকে স্থূল কায়িক শ্রমের দায়িত্ব দিয়া গৃহমধ্যে আবদ্ধ করি নাই ? আমি কি বলি নাই 'স্ত্রীলোকের মস্তিষ্ক পুরুষের অপেক্ষা ক্ষিপ্রগামী'! এ-কথা অনেকেই স্বীকার করেন। পুরুষ কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার পূর্বে অনেকভাবে—অনেক যুক্তি-তর্কের সাহায্যে বিষয়টি বোধগম্য করে। কিন্তু রমণী বিনাচিন্তায় হঠাৎ সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এইসব হইতে আপনিই আমার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত লন। আমি নিজের সম্পর্কে কিছুই বলিতে চাহি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গদ্যকার্টুন : আপনি যখন মর্তস্থানে এসেই পড়েছেন তখন কি একবার রংপুরের পায়রাবন্দ এলাকা থেকে ঘুরে আসবেন ?

বেগম রোকেয়া : আমি সবই জানিয়াছি। আমার উত্তর-নারীরা খুবই কষ্টে দিনাতিপাত করিতেছে, সেই জমিদারি আর নাই।

গদ্যকার্টুন : আপনি কি এখনকার বাংলাদেশ সম্বন্ধে কিছু বলিবেন ?

বেগম রোকেয়া : না, বলিব না। বলিলে ছাপিতে পারিবেন না। কেবল ক্বারী মোহাম্মদ বেলালীর স্ত্রীর কথা পত্রপত্রিকায় ছাপা সম্ভব, আরো অনেক ক্ষমতাধর বেলালী আছেন, যাহাদের স্ত্রীর কোনো ফরিয়াদই পত্রপত্রিকায় ছাপা সম্ভব নহে।

গদ্যকার্টুন : অন্য প্রসঙ্গে আসুন, প্লিজ। এসব সেনসিটিভ বিষয় নিয়ে আলোচনা না-করাই শ্রেয়।

এমন সময় বাইরে স্লোগান শোনা যেতে লাগলো। একদল মৌলানা মিছিল করিতে করিতে যেন এদিকেই এগিয়ে আসে। 'সাপ্তাহিক পূর্বাভাস জ্বালিয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও'।

'এই দেশে এই বেশে' নাটক হইতে শিক্ষা লইয়াছি। উহারা শরৎচন্দ্রের খত্না করিয়া ছাড়িয়াছে। আমাকে পাইলে উহারা শারীরিকভাবে লাঞ্ছনা করিবে। সুতরাং খোদা হাফেজ...।

৮ অক্টোবর '৯১, পূর্বাভাস

ছাঈদী ছাহেবের স্বর্গযাত্রা

সম্প্রতি দেশের সবকটি সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে একটি সংবাদ: জনৈক ছাঈদী ছাহেব গণধোলাই খেয়েছেন যশোর বিমানবন্দরে। জনতার শত্রুরা পিটুনি খাবে জনতার হাতে, এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মজাটা এখানে নয়। মজার ব্যাপার হলো—ওই ছাঈদী ছাহেব বিমানে উঠতে চেয়েছেন বটে, কিন্তু তার নামে কোনো টিকেট করা ছিলো না ওই ফ্লাইটে। অন্যের নামে করা একটি টিকেটে যশোর থেকে পালাতে চেয়েছিলেন হযরত ছাঈদী ছাহেব। কিন্তু নাছোড় জনতা সেই বুজরুগি ধরে ফেলেছে এবং খানিক উত্তম-মধ্যম দিয়ে ফেলেছে। সম্মানিত পাঠক, এই কাহিনীর শুরু বিমানবন্দর ধোলাইপর্বের কিছুটা আগে থেকে। ধরা যাক, ছাঈদী সাহেব ধরা পড়েননি। অন্যের নামে করা টিকেটে তিনি বিমানের সিটে বসে পড়েছেন। বিমান যাত্রা শুরু করেছে।

ফ্যান্টাসি–১

বিসমিল্লাহ। ছাঈদী ছাহেব যাত্রা শুরুর দোয়াটা মনে করতে চেষ্টা করলেন। মনে পড়ছে না। না পড়বার কথা নয়। প্রতিদিনই তাকে বিমানে নানা জায়গায় যেতে হয়। ওয়াজ করতে হয়। হাজার হাজার টাকা বায়না নেয়া থাকে। ওয়াজ শেষে বাকিটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পাওয়া যায়। উত্তম ব্যবসা। আল্লাহর রহমতে তিনি ভালোই আছেন। তবে বিমানে চড়লেই তাঁর বুকটা দুরদুর করে কাঁপতে থাকে। তখনই তিনি যাত্রা শুরুর দোয়াটা পড়ে ফেলেন। কিন্তু আজ তাঁর কিছুতেই দোয়াটা মনে পড়ছে না। তাঁর এক সিট পরেই এক আওরাত বসেছে। খুবসুরৎ আওরাত। কিন্তু কপালে সিঁদুর। মালাউন। মালাউন মেয়েগুলোকে কেন যে আল্লাহতালা এতো রূপ-যৌবন দেন, তিনি ভেবে পেলেন না। কবে যে আবার জেহাদ শুরু হবে। মালে গনিমত হিসেবে এই হিন্দুরমণীদের তার বখরায় তিনি পাবেন। একাত্তরে কী সুখই না পাওয়া গিয়েছিলো! সেইসব দিন কি এই পোড়ার দেশে আর আসবে না ? এইসব চিন্তা করতে গিয়ে তিনি সফর শুরুর দোয়াটা ভুলে গেলেন।

তবে দোয়া ভুলে যাবার কারণটা নিশ্চয়ই এতো সামান্য নয়। তিনি নফসে-আম্বারাকে শাসন করতে জানেন। সবই কিতাব পড়ে শেখা। কিতাবে আছে—একদিন হুজুর পাক বসেছিলেন মস্‌জিদের দাওয়ায়। এমন সময় এক জেনানা ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিলো। হুজুর তার দিকে তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তারপর উঠে পড়লেন তিনি। নিজের বিবির নিকট গমন করে খানিকক্ষণ পরে ফিরে এলেন। অনুসারীদের বললেন, যখন তোমরা পরনারী দর্শনে আর্ত হয়ে পড়ো, তখন তোমরা নিজ স্ত্রীর নিকট গমন করো। কেননা অন্য মেয়েলোকের মধ্যে যা আছে, তোমার নিজ বিবির নিকট তা-ই আছে। ছাঈদী ছাহেব এই মুহূর্তে নিজ বিবির নিকট কীভাবে যাবেন— ভেবে পেলেন না। মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ, তুমি আমাকে শয়তানের কুপ্ররোচনা থেকে রক্ষা করো।

তাঁর দিনকাল ইদানীং ভালো যাচ্ছে না। এই যশোর সফরটাও ভালো গেলো না। লোকজন খেপে আছে। পরিচয় জানতে পারলেই পেটাতে চায়। দেশটা বেদ্বীনে ছেয়ে গেছে। সব শালা কমিউনিস্ট হয়ে গেছে। তিনি সুর করে আবৃত্তি করতে লাগলেন: শোনো শোনো কমিউনিস্টো, শুনলে পাইবা মনে কষ্ট, বাংলাদেশে কমিউনিজম কায়েম হইবো না।

কমিউনিজমের কথা মনে হলেই তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। এবারো হলো। এ থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আবার তিনি পাশের সিটের দিকে তাকালেন। আলহামদুলিল্লাহ। সকল প্রশংসা আল্লাহতালার। আল্লাহ্‌ই এতো সুন্দর রমণী সৃষ্টি করতে পারেন। তিনিই পারেন পয়দা করতে এমন দীর্ঘ কালো চুল, এমন টিকালো নাক, টানা টানা ডাগর চোখ, এমন মরালীর মতো দীর্ঘ গ্রীবা, এমন বাঁকানো নিতাঁজ নির্মেদ কটি, এমন ভারী কলসির মতো নিতম্ব, কলাগাছের মতো উরু, এমন বুক.....বিবি জোলেখার রূপকেও বুঝি হার মানায়....তাঁর বুকের বাঁ-পাশটা ধুক ধুক করে কাঁপতে লাগলো। শরীরের অন্যান্য অঞ্চলেও নড়াচড়া শুরু হয়ে গেলো। তিনি বুকের বাঁ-পাশে হাত দিলেন। হাত আটকে গেলো বুক পকেটে। পকেটের ভিতরে একটা কাগজ খসখস করছে। তিনি কাগজটি বের করলেন। বিমানের টিকেট। তার নামে নয়। যাত্রীর নাম মোহাম্মদ আলী। তিনি সামান্য হাসলেন। টিকেটটা করে দিয়েছে তার পার্টির এক কর্মী। তাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বলা হয়েছিলো যেন ছাঈদীর নামে টিকেট করা না হয়। কারণ সেক্ষেত্রে গণপিটুনির আশঙ্কা আছে। কিন্তু তাকে বলা হয়নি মোহাম্মদ আলী নামে করতে। বেটার পিতৃপ্রেম বড় গভীর। আরেকটু হলেই কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নামে টিকেটটা করতো। তাঁর চিন্তা আর বেশিদুর এগুতে পারলো না। বিমান গরগর করতে লাগলো। এমন বিকট আওয়াজ তিনি কখনো শোনেন নাই। একাত্তর সালে যখন হাত-পা বেঁধে ইন্ডিয়ার দালালদের জবাই করা হতো, তখনো তারা এরকম শব্দ করতো না। বিমান দ্রুত নিচে নামতে লাগলো। ছাঈদী ছাহেব কলেমা পড়তে ভুলে গেলেন। জানালা দিয়ে লাফ দেয়া যাবে কিনা ভাববার আগেই সশব্দ পতন।

পরদিনের সংবাদপত্রে নিউজ হলো : যশোর থেকে ঢাকাগামী একটি বিমান জরুরি অবতারণ করেছে। একজন যাত্রী মারা গেছে। বিমানের চালকসহ অন্য সবাই অলৌকিকভাবে রক্ষা পেয়েছে। নিহত যাত্রীর নাম মোহাম্মদ আলী। চেহারা বিকৃত হয়ে যাওয়ায় তাঁর বিস্তারিত পরিচয় আর পাওয়া যায়নি।

ফ্যান্টাসি–২

যমদূত তাঁর আত্মা নিয়ে হাজির হলো পরলোকে। দুর্ঘটনা-অগ্নিকাণ্ড-পানিতে ডুবে মৃত্যু হলে তার জন্যে বরাদ্দ থাকে শহীদের দরোজা। সাতটা দরোজা পার হলে স্বর্গভূমি। প্রথম দরোজায় হাজির করা হলো তাঁকে।

— নাম ?

: আজ্ঞে, মোহাম্মদ আলী।

— কী কেইস ?

: প্লেইন এক্সিডেন্ট।

— স্বাগতম, শুভেচ্ছা, এগিয়ে যান।

এইভাবে তিনি ছয়টা দরোজা পার হলেন। বাকি রইলো শুধু সপ্তম দরোজা। এটি পার হলেই তিনি পৌঁছে যাবেন স্বর্গে। যেখানে শুধু সুখ আর সুখ। যত ইচ্ছা অনন্ত-যৌবনা নারী আর অনন্তযৌবন নবনীতকোমল বালক।

প্রহরী আটকে দিলো। নাম কী ?

— আজ্ঞে, মোহম্মদ আলী।

: মনে হয় না। কোনো মোহাম্মদ আলীর সঙ্গেই তো চেহারা মেলে না। সত্যি করে বল, নাম কী ?

— এই যে আমার কাছে টিকেট আছে। বাংলাদেশ বিমানের টিকেট। দেখেন, নাম (মোহাম্মদ আলী) লেখা আছে।

প্রহরী মর্তের সবগুলো মোহাম্মদ আলীর ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলো, কারো সঙ্গেই মেলে না। এবার তাঁর গাল বরাবর কষে একটা চড় বসিয়ে দিলো।

— বল্ আসল নাম কী ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

: আজ্ঞে, হযরত মওলানা ছাঈদী ছাহেব আমার নাম।

প্রহরীর চোখমুখ গম্ভীর হয়ে গেলো। সে ছাঈদীর মর্তের হিসেব-খাতা মেলে ধরলো। খুবই পাপী। সারাটা জীবন লোক ঠকিয়ে খেয়েছে। লোকজনদের ধর্মের নামে ভুল বুঝিয়েছে। সরলপ্রাণ মানষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। এ ছাড়াও খুন-ধর্ষণ-ঘরবাড়ি জ্বালানোর সঙ্গে জড়িত। কঠিন ক্রিমিন্যাল। প্রহরী গম্ভীরকণ্ঠে নির্দেশ দিলো, 'এই বদমাইশ সাত নম্বর তোরণ পর্যন্ত আসলো কী করে। একে এক্ষুনি এক নম্বর নরকে নিক্ষেপ করো।'

ছাগলপর্ব

ঢাকার খ্যাতিমান কলামিস্ট, সাংবাদিক, লেখকদের গদ্যকার্টুনের পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছিলো 'ছাগল' বিষয়ে একটি করে লেখা দিতে। কিন্তু খ্যাতিমানেরা এ ধরনের গৌণ কাজ করবেন কেন ? তা-ই বলে কি গদ্যকার্টুন চুপ করে বসে থাকবে ? কোন্ কলামিস্ট, কোন্ সাংবাদিক কী লেখেন, কী লিখতে পারেন— তা আমাদের ঢের জানা আছে। ছাগল বিষয়ে লিখতে গেলে খ্যাতিমান লেখকেরা কী লিখতে পারতেন, তার একটি খসড়া নিচে দেয়া হলো।

হুমায়ুন আজাদ

বাঙালি প্রশংসা করে সিংহের, পছন্দ করে গর্ধভকে আর সেজে থাকে ছাগল। আমার চারপাশে প্রতিদিন দেখি অসংখ্য ছাগল; ফুটপাথে ছাগল, শ্রেণীকক্ষে ছাগল, হাটে-মাঠে-বাজারে ছাগলসভার মাঠে অসংখ্য ছাগল হাততালি দেয়, আর মঞ্চে পাঞ্জাবি পরে ভুল বাংলায় বক্তৃতা দেয় সবচেয়ে নাদুস-নুদুস ছাগলটি। আমাদের সবচেয়ে মেধাবী ছাত্রীটি পরিণত হয় সুন্দর ছাগলে, এবং তাকে দেখা যায় টেলিভিশনের পর্দায়। এদেশে পত্রিকা সম্পাদনা করে ছাগল-সম্পাদক, তাতে লেখে ছাগল-কলামিস্ট। আর সে-সব ছাগখাদ্য চিবুতে থাকে সারাদেশের ছাগল-পাঠক।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ছাগল এখানে আর ছাগল থাকে না, তা হয়ে ওঠে পণ্য। পুঁজিবাদ তাকে পণ্য করে তোলে। সেই-যে গোড়ার কথা ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাই তাকে আঁকড়ে ধরে। ব্যবস্থাই আসল, বদলানো দরকার ওই ব্যবস্থাটিকে, যে ব্যবস্থা ছাগলকে পরিণত করে পণ্যে, যে ছাগল ছাগলসঙ্গীত গাইতো, তাকেও। ক্ষমতার হাতবদল হয়, কিন্তু বদল হয় না ব্যবস্থার। প্রতিবাদ হয় বৈকি, একটি-দুটি ছাগলকে দেখা যায় জোরগলায় চিৎকার করতে, কিন্তু ঘাস-বিচালি-কাঁঠালপাতা পেয়েই সে হতে থাকে মোটাতাজা, শ্রেণীচ্যুতি ঘটে না তার, ওই ছাগলটির।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তসলিমা নাসরিন

এবার এক যুবকের সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হয়। ১৮–২০ বছরের যুবক, সুদর্শন যুবকটি আমাকে গালি দেয় ছাগল বলে। আমি তাকে স্মরণ করিয়ে দেই, আমি পুরুষ নই, নারী। সে আমাকে ছাগী বলতে পারতো। কিন্তু তা সে আমাকে বলেনি। যখনই কাউকে গালি দিতে হয়, ব্যবহার করা হয় পুরুষবাচক শব্দ। গালি দেয়া হয় 'কুকুর' বলে, 'বাঁদর' বলে।

এ সমাজ ছাগলকে করেছে সম্মানিত, আর 'ছাগী'কে উপেক্ষিত। কুরবানি করা হয় পুরুষ-ছাগলকে, নারী-ছাগলকে কুরবাণি করা যেন নাজায়েজ। বাজারে খাসির মাংসের দাম বেশি, বকরির মাংসের দাম কম।

নারীরা বকরির মতোই, সর্বত্রই তার দাম কম।

সৈয়দ শামসুল হক

একটি বোধ আমার মগজের কোষে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে, আমার এমত ধারণা যে, আরো কারো কারো এরকম হয়ে থাকবে, প্রায়শই কিংবা, কখনো সখনো, এই বোধ আমাকে দ্রবীভূত করে, আমি অসহায় ও পীড়িত বোধ করি— যেন বা স্থির একটি পেয়ালায় একখণ্ড বরফ আমি, ক্রমশ গলে যাচ্ছি—যে, ছাগলগণ আর আগের মতন চমৎকার সুস্বাস্থ্যের অধিকারী নয় এবং এ আশঙ্কাও যুক্ত হয় যে, ছাগলগণ এখন যে রবীন্দ্রসংগীত গাইছে তা ভুল স্বরলিপিতে তোলা।

মতিউর রহমান চৌধুরী

কী লিখবো। লিখেই বা কী লাভ। প্রতি সপ্তাহেই তো লিখি। ঘুরে-ফিরে একই কথা লিখি। কী হবে লিখে আর। স্বৈরাচারের পতন হয়েছে। দেশে এখন গণতন্ত্র। অথচ দেশের ছাগলসম্পদ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। দোহাই ম্যাডাম, ছাগলদের নিয়ে রাজনীতি করবেন না। ছাগলেরা রাজনীতির বিষয় নয়। তারা রাজনীতির অনেক ঊর্ধ্বে। প্লিজ, ম্যাডাম, এবার রেহাই দিন। আমাদের একটু শান্তিতে থাকতে দিন। রাতে ঘুমুতে দিন। সেদিন এক ছাগল-নেতার সঙ্গে দেখা। তিনি বললেন, আমাদের কথা লিখুন। আমাদের সঙ্গে অমানবিক ব্যবহার করা হচ্ছে। ম্যাডামকে জানান। ম্যাডাম আমাদের দুঃখ বুঝবেন।

আহমদ শরীফ

আমাদের চিন্তা-চেতনা-মন-মেধা-মনীষায় যে বৈকল্য-ক্লীবতা-অচলতা অতিদৃষ্ট-শ্রুত-ভূত, তাতে ছাগলের মতো গৃহ-বন-বনানী-প্রান্তর-ক্ষেত্রে পালিত জন্তু নিয়েই কথা হওয়া স্বাভাবিক, সঙ্গত, কাঙ্ক্ষিত। ছাগলের দৈহিক-মানসিক-আবেগিক-মাগজিক-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হার্দিক বিকাশে সচেতন ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী-শ্রমজীবী, সাংবাদিক-পাঠক, কর্মচারী-ধর্মচারী, ভাবুক-কামুক সকলের সার্বিক-বাস্তবিক-আনুষঙ্গিক দক্ষতা, তৎপরতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা প্রদর্শন আবশ্যক।

ফরহাদ মজহার

ছাগল নিয়ে লিখাটি মুসাবিদা করার মুশকিল হলো, এ নিয়ে আমাদের ভাবুকতার স্তরটি 'ছাগল গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু' এ জাতীয় বাতচিতে বন্দ। ইহুদি নাসারারা এ ধরনের চিন্তা আমাদের তাহজিব-তামুদ্দুনে ঢুকিয়ে দিয়েছে। অথচ আমাদের ঐতিহ্য যারপরনাই শান-শওকতদার। দুম্বা আমাদের কালচারের শরিক। আমরা সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করতে গিয়ে আমাদের নিজস্ব সম্পদকে বাতিল করে দিয়েছি। আখেরে তা আমাদের নতুন সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। আমরা বাবু-সংস্কৃতির ফেরেকে পড়ে গিয়েছি।

হুমায়ূন আহমেদ

ছাগলরা কথা বলতে পারে না—এ কথা ঠিক না। তারাও কথা বলতে পারে—বড়োই সুন্দর সুন্দর কথা। একবার আমি বাসার সামনের বাগানে পায়চারি করছি। হঠাৎ শুনতে পেলাম : ভাই সাহেব, শুনছেন। দুইডা কাঁঠালপাতা পাইড়া দেন দেহি। কতোদিন কাঁঠাল পাতা খাইনা। তাকিয়ে দেখলাম—একটা ছাগল আমার দিকে তাকিয়ে কথা বলছে। কুরবানির ঈদের জন্যে ছাগলটাকে আনা হয়েছে নীলগঞ্জ থেকে। একদম ময়মনসিংহের উচ্চারণে কথা বলছে।

আমি তাকে কাঁঠালপাতা পেড়ে দিতে গেলাম। মহা ঝামেলা। পাতা ঝুলছে মাথার ঠিক তিন হাত উপর থেকে। লাফিয়ে দুহাত ওঠা যায়, আর এক হাত বাকী থাকে। একটা টুল জাতীয় জিনিস খুঁজছি, তখন ছাগলটা বললো— ভাই সাহেব, টুল খুঁজতাছেন, পাইবেন না, এই বাসায় টুল জাতীয় তো কুন কিছু নাই। আমারে কোলে তুইলা ধরেন।

অবাক কাণ্ড। সে আমার কথা জানলো কী করে? পশুরা আমাদের মনের কথা সব জানে। পশুদের মনের কথা আমরা কিছুই জানি না। আমি ছাগলটিকে মাথার উপরে তুলে ধরলাম। সে আরাম করে পাতা চিবুতে লাগলো। আমার মেয়েরা এসে আমাকে ঘিরে ধরলো। তারা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। ছাগলটি বললো, ভাই সাহেব, তাড়াতাড়ি নামান। শরমের কথা। হিসু পাইছে।

আমি মাথা থেকে তাকে নামিয়ে দিলাম। সে বললো, ভাই সাহেব, মাইয়া পোলাগুলিরে লইয়া একটু ভিতরে যান দেহি। মাইয়া মাইনষের সামনে হিসু করতে শরম লাগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমি বাচ্চাদের নিয়ে ড্রইংরুমে এলাম। কী সুন্দর এই ছাগলটি। লম্বা লম্বা কান। কি চমৎকার করে কাঁঠাল পাতা চিবুচ্ছে। এই ছাগলটিকে দুদিন পরে জবাই করা হবে। তার মাংস আমার টেবিলে দেয়া হবে। আমরা বলবো: বেশ ভালো হয়েছে রান্না, তবে ঝালটা একটু বেশি হয়েছে। ছাগলটির কথা কেউ মনে করবো না। ছাগল আসে, ছাগল যায়, মানুষের তাতে কিছু আসে যায় না।

২ সেপ্টেম্বর ১৯৯১ পূর্বাভাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কথাকার্টুন

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৪
রচনাকাল : ১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৩ সাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একটি রাজনৈতিক কল্পকাহিনী

গোলামের মনটা খারাপ। বেশ খারাপ। এতোটা যে খারাপ তা অবশ্য প্রথমে বোঝা যায়নি। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে, সবাই আশা করেছিলো, জেলগেটে তিনি একটা বক্তৃতা দেবেন। জেহাদি বক্তৃতা। অনলবর্ষী। তা হয়নি। তিনি বললেন, তিনি বাসায় যাবেন। কর্মীরা অবশ্য তাতে হতাশ হয়নি। সারি বেঁধে তার পিছু নিয়েছে। শরীর দুলিয়ে গান ধরেছে—'হাওয়া হাওয়া তুই কী শুনেছিস'। এসব গানবাজনা কিছুই তার কানে যায়নি। তিনি সোজা তার বাসায় চলে এসেছেন। এসেই দরোজা বন্ধ করে দিয়েছেন। কর্মীরা হতভম্ব হয়ে গেছে। কী ব্যাপার, আমাদের নয়নের মণি এমন আচরণ করছেন কেন ? তবে কি আমরা অজান্তেই তার মনে কোনো কষ্ট দিয়েছি। নাকি রাজনীতির ওপর থেকে গোলাম সাহেবের মন উঠে গেছে ? এমন তো হতে পারে, জেলখানায় গভর্নমেন্ট তার কাছে বন্ডে সই করিয়ে নিয়েছে, 'আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে, কারাগার হইতে বাহির হইয়া আমি রাষ্ট্রবিরোধী কোনো কাজে জড়িত থাকিবো না।' কর্মীদের মধ্যে মৃদু গুঞ্জন ওঠে। নেতারা চিন্তিত হয়ে পড়ে। একজন নেতা বারান্দায় দাঁড়িয়ে সমবেত কর্মীদের উদ্দেশে বয়ান করেন, 'বেরাদারানে ইসলাম, আমাদের নেতা গোলাম ছাহেব এখন তার ইবাদতখানায় আল্লাহর ধ্যানে বসেছেন। তিনি এখন আল্লাহর নাম জিকির করছেন। আল্লাহতা'লা তাকে মুক্তি দিয়েছেন। এজন্যে তিনি শোকরানা আদায় করছেন।' কর্মীরা এই বক্তৃতায় কিছুটা শান্ত হয়। নেতাটি এই সুযোগে গোলামের দরোজায় হাজির হন।

—হুজুর, হুজুর

নীরবতা।

—হুজুর, হুজুর পাক।

: আমারে বিরক্ত কইরো না। আমি কিছুক্ষণ একলা থাকবো।

—হুজুর, কর্মীরা মানছে না। তারা আপনার কথা শুনতে চায়।

: আহ্ কেন বিরক্ত করো ?

এই নেতা মুশকিলে পড়ে যান। তিনি অন্দরমহলে প্রবেশ করেন। বিবি ছাহেবার শরণাপন্ন হন। বিবি ছাহেবা সমাস্যাটি বুঝতে পারেন। এই ছেলেগুলো তার মুক্তির জন্যে কতো কী করেছে। তার নাগরিকত্বের জন্যে লড়াই করেছে। তিনি দরোজার কাছে যান। বলেন, 'হুজুর কী করতাছেন। দরোজা খোলেন। দরোজা খুইলা কথা বলেন।' ভেতরে নীরবতা।

ভদ্রমহিলা কেঁদে ফেলেন, 'এতদিন আমারে ফালাইয়া একা একা ছিলেন। আমার কথা তো আপনার মনে থাকে না। কিন্তু এই পোলাগুলা কী দোষ করছে। আপনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মুক্তির লাইগা ১৯ জন শহীদ হইছে।' বিবি ছাহেবা এসব কথা বলেন বিলাপের সুরে। ১৮ জন শহীদের কথা শুনে গোলাম ছাহেব উঠে পড়েন। দরোজা খোলেন। বলেন, 'মসজিদে চলো।' মসজিদে তিনি ছোটোখাটো একটা বক্তৃতা দেন। তার মনটা ভালো না। বেশি কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। তবু তিনি বলেন, 'আমার জন্যে ১৮ জন শহীদ হয়েছে, ভাবতে ভালো লাগছে, আবার খারাপ লাগছে। আমার জন্য ১৮ জন জান দিলো ?' মুখে সত্য কথা এসে গিয়েছিলো। তিনি তাড়াতাড়ি নিজেকে সংবরণ করেন। বলেন, 'আমার জন্যে জান দেয়া মানে ইসলামের জন্যে জান দেয়া। ইসলামের জন্যে জান দেয়া মানে আল্লা ও তার রসুলের জন্যে জান দেয়া।'

কর্মীদের মধ্যে জেহাদি জোশ সঞ্চারিত হয়।

কর্মীদের ঘোর কেটে যাবার আগেই তিনি উঠে পড়েন। ঘরের মধ্যে ঢুকে দরোজা বন্ধ করে দেন। পরদিন পার্টির পাবলিক-মিটিং। গোলাম ছাহেবকে সংবর্ধনা দেয়া হবে। মজলুম জনগণের নেতা আবির্ভূত হবেন জনগণের সামনে। কিন্তু তিনি জানিয়ে দিলেন, তিনি যাবেন না।

পার্টির অ্যাক্টিং লিডার তার কাছে আসে। হুজুর, আপনি মিটিঙে না গেলে যে ইজ্জত থাকে না। জনগণ আপনারে দেখতে চায়।

—না আমি যাবো না। মনটা ভালো না।

: হুজুর কি কোনো কারণে আমার উপর নারাজ। আমি কি কোনো গোস্তাকি করেছি।

— না না। আপনি ঠিকই আছেন। এতোদিন পার্টি চালাইছেন, আরো কিছুদিন চালান। আমারে আর এই সবের মধ্যে ডাইকেন না।

নেতাটি মনে মনে খুশি হয়। এতোদিন কষ্ট করে তাকে পার্টির নেতৃত্ব দিতে হয়েছে। আজ আল্লাহর ইচ্ছায় সেই দুর্দিন নাই। পার্টি এখন অনেক বেশি শক্তিশালী। আর তৈরি-পার্টির তৈরি-গদিতে এসে গোলাম ছাহেব বসে যাবেন, এটা অনিবার্য হলেও মেনে নিতে তার কষ্ট হচ্ছিলো। পার্টির বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, গোলাম ছাহেব আপাতত আড়ালে-আবডালে থাকবেন। কৌশলগত কারণে। কৌশলগত কারণটি অবশ্য কেউ জানে না। গোলাম ছাহেবের অনিচ্ছাই আসল কারণ। অনিচ্ছার কারণটি অবশ্য এক গোলাম ছাড়া আর কেউই জানে না।

ইদানীং গোলাম ছাহেবের মনের সঙ্গে সঙ্গে মেজাজটাও বেশ খারাপ। সারাক্ষণ খিটমিট করেন। একদিন বিকেলে তাকে চা দিতে গিয়েছে এক পরিচারিকা। তিনি বলা নেই কওয়া নেই তার গাল বরাবর কষে চড় মারেন। চড় মারার কারণটিও জানা যায়নি। বিবি ছাহেবা জানার চেষ্টা করেছেন। পরিচারিকাটিকে আলাদা ঘরে নিয়ে গিয়ে জেরা করেছেন।

— তুই কি হুজুরের সঙ্গে কোনো বেয়াদবি করেছিলি ?

: না, আম্মা কি যে কন, আমি ক্যান হুজুরের সঙ্গে বেয়াদবি করবো ?

— তুই কি তার গায়ে হাত দিয়েছিলি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পরিচারিকাটি চিৎকার করে কেঁদে ওঠে। 'আম্মা এইসব কী কন ? বুড়া মরদের গতরে আমি হাত দিমু ক্যান। আমারে আজই ছাড়ায়া দেন। আমি আর এই বাসায় কাম করুম না।' বিবি ছাহেবা তাড়াতাড়ি তাকে চুপ করান। মান-সম্মানের প্রশ্ন। এই সব বাঁদী রাখাই ঠিক নয়।

রাত্রিবেলা বিবি ছাহেবা গোলাম ছাহেবের মন জয়ের চেষ্টা করেন। ভালো আতর লাগান নিজের গায়ে। গোলাম ছাহেবের গায়েও লাগিয়ে দেন। শুয়ে থাকা তার পায়ে ধীরে ধীরে হাত দেন। আস্তে আস্তে পা টিপে দিতে থাকেন। গোলাম ছাহেবের মনটা প্রসন্ন হয়ে ওঠে। ইদানীং কেউ তার কাছাকাছি আসতে সাহস পায় না। এ নিয়ে মনে মনে তার একধরনের দুঃখ আছে। তাছাড়া বিকেলে বাঁদীটাকে মারাটা ঠিক হয় নাই। তিনি আফসোস বোধ করেন। বিবি ছাহেবা স্বামীর মনোভাব বুঝতে পারেন। অনেক দিনের সংসার তাদের।

সুযোগ বুঝে বিবি ছাহেবা গোলাম ছাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, 'আপনার কী হইছে? আপনি এতো মেজাজ খারাপ করেন ক্যান। কাউরে বলা না গেলেও আমারে বলেন। আপনার ভার একটু কমবে।'

'মনটা ভালো না বিবি! খারাপ। খুবই খারাপ।' গোলাম ছাহেব ফোঁপাতে শুরু করেন। তার দুচোখ বেয়ে পানি গড়াতে থাকে। তিনি শিশুর মতো হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন।

—আপনার কী হইছে, আমারে বলেন। মনটারে হালকা করেন। আপনার মনে কিসের দুঃখ ? নাগরিকত্ব মামলা জিতেছেন, জেল থাইকা ছাড়া পাইছেন।

: ওইখানেই তো দুঃখ বিবি, ওইখানেই তো কষ্ট। এই কষ্ট যে কী কষ্ট তুমি বুঝবা না। একাত্তর সালে যখন সোনার পাকিস্তান ভাগ হইলো, আমার কলিজাটা ছিইড়া গেলো। তবু নিজেরে সান্ত্বনা দিছি, আমি তো পাকিস্তান ছাড়ি নাই। আমি তো পাকিস্তানেই রয়া গেছি। পাকিস্তান তো আমার দেশ। এই দেশে আসছি পাকিস্তানের পাসপোর্ট নিয়া। সেই পাক নাগরিকত্ব আর থাকলো না। আমি কি বাংলাদেশের পার্টির আমির হইতে কখনো চাইছি নাকি ? আমি হইতে চাইছি গোটা পাকিস্তানের আমির। এখন ওরা আমারে বাংলাদেশের লিডার বলে। এ যে কী কষ্ট! যেদিন জেলখানায় বইসা প্রথম শুনলাম, আমি বাংলাদেশের নাগরিক সেইদিন থাইকাই মনটা খারাপ। শরীরটাও ভাইঙ্গা পড়ছে। যে বাংলাদেশ আমি কোনোদিন চাই নাই, আজ আমারে সেই বাংলাদেশের নাগরিকত্ব মাইনা নিতে হইলো।

কাঁদতে কাঁদতে গোলাম ছাহেব ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তার স্ত্রীও তার সঙ্গে নীরবে কাঁদতে লাগলেন। হঠাৎ তিনি বিছানায় উঠে বসলেন, 'তবে একটা কথা বিবি কিন্তু ঠিক। আমি কিন্তু আদালতে যাই নাই। কেউ বলতে পারবে না, গোলাম আদালতে গিয়া বলছে—আমি বাংলাদেশকে মানিয়া লইয়াছি, আমি বাংলাদেশে বিশ্বাস করি, আমি বাংলাদেশের নাগরিক হইতে চাই। নাউযুবিল্লাহ। আমার নিজ মুখে এই কথা আমি আগেও বলি নাই, এবারও বলি নাই। হা-হা-হা-হা-হা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কমলাকান্তের কমলালয়

এক.

কমলাকান্ত নিদ্রামগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অহিফেনের গুণে নানা বিচিত্র দৃশ্য ও ভাবনা তার মস্তিষ্কে খেলা করিতেছিল। গোয়ালিনীর তাম্বুলরঞ্জিত ওষ্ঠদ্বয় তার চতুষ্পার্শ্বে নৃত্য করিতেছিল।

কোথাও কোকিল ডাকিয়া উঠিল। মরার কোকিল, তুমি ডাকিতেছ কেন ?

কমলাকান্তের ঘুম ভাঙিয়া গেল।

সে ধড়ফড় করিয়া গাত্রোত্থান করিল। এ কোন্ দেশে সে আসিয়া পড়িয়াছে ? কোন্ শতাব্দীতে ? কে শাসন করে এই রাষ্ট্র ? মন্ত্রণালয়ে বসিয়া কাহারা অবিরাম শাসককুল-অধিপতির কর্ণে মন্ত্রণা দেয় ? কমলাকান্তের দপ্তর ঘাঁটিয়া কিছু মূল্যবান কাগজপত্র উদ্ধার করা গিয়াছে, এই কাগজপত্রগুলি একত্র করিয়া দেখা গিয়াছে, ইহা একটি প্রকল্প প্রস্তাবনা বা প্রোজেক্ট প্রোপোজাল। কমলাকান্তের প্রকল্প প্রস্তাবটি নিম্নরূপ।

প্রকল্পের নাম

'কমলাকান্তের কমলালয়'

অবতরণিকা

যেহেতু কমলাকান্ত নিদ্রা হইতে জাগ্রত হইয়া দেখিল এই রাষ্ট্রের পতি একজন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক অধিকর্তা, যেহেতু কমলাকান্ত নিদ্রা হইতে জাগিয়া দেখিল সে একজন শিক্ষিত ও বেকার যুবক, যেহেতু কমলাকান্তের নিদারুণ ক্ষুধা পাইয়াছে অথচ খাদ্যবস্তু ক্রয় করিয়া খাইবার সাধ্য তাহার নাই, যেহেতু তাহার একটি চাকুরি খুবই প্রয়োজন, কিন্তু এই রাষ্ট্রের সরকার চাকুরিতে নিয়োগ আবার স্থগিত রাখিয়াছেন, যেহেতু সরকার নতুন নিয়োগ বন্ধ রাখিয়াছেন অর্থাভাবের অজুহাতে কিন্তু প্রায় সকল সরকারি দফতর, বোর্ড, প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান, পরিচালক পদে অবসরপ্রাপ্ত সামরিক ও অসামরিক ব্যক্তিকে বসাইয়া বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের পথ রুদ্ধ করিয়া দিতেছেন, যেহেতু কমলাকান্ত গোয়ালিনীকে ভালোবাসে এবং গোয়ালিনীকে বিবাহ করিয়া ঘরে তুলিবার সময় পার হইয়া যাইতেছে, যেহেতু সরকারি চাকুরি লাভ করিবার আর কোনো সম্ভাবনা কমলাকান্তের নাই, যেহেতু এ সরকারের শিল্প দফতর দেশে নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিবার ব্যাপারে খুবই উৎসাহী, যেহেতু প্রতিটি সম্ভাবনাময় শিল্প-প্রকল্পের ক্ষেত্রে সরকার শিল্পঋণ মঞ্জুর করিয়া থাকেন, যেহেতু বেসরকারি মালিকানায় একে একে সকল শিল্পকারখানা-ব্যাংক-বীমা ছাড়িয়া দেওয়া হইতেছে, সেই হেতু, কমলাকান্ত, পেশা: কর্মহীন শিক্ষিত যুবক, সরকারের যথাযথ বিভাগে এই প্রকল্প প্রস্তাবনা পেশ করিতেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রূপরেখা ঃ

বাংলাদেশে দেহপসার একটি স্বীকৃত বৃত্তি। সরকার নিযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাশে আবেদন করিয়া যে-কেহ এই বৃত্তি অবলম্বন করিতে পারে। এইরূপ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বারবণিতার সংখ্যা দেশে অপ্রতুল নহে। ইহা ব্যতীত, অবৈধভাবে শরীরবৃত্তিতে নামিয়াছে এইরূপ বারবণিতার সংখ্যাও কম নহে। কিন্তু অদ্যাবধি এই বৃত্তি শিল্প হিসেবে মর্যাদা লাভ করে নাই। তদুপরি মুক্ত অর্থনীতির কোনো সুফল এই সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রটি লাভ করে নাই। আমলাতান্ত্রিক নানা বাধা এই শিল্পের বিকাশের পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং কমলাকান্ত প্রস্তাব করিতেছে এই শিল্পক্ষেত্রটি সম্পূর্ণভাবে বেসরকারি খাতে ছাড়িয়া দেয়া হউক। যদি তাহা করা হয় তবে কমলাকান্ত একটি সম্পূর্ণ আধুনিক, স্বাস্থ্যসম্মত, বৈজ্ঞানিক ও আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কমলালয় গড়িয়া তুলিবে। ইহার কাঠামো হইবে নিম্নরূপ :

নারায়ণগঞ্জের অদূরে শীতলক্ষ্যার তীরে এক মনোরম নয়নাভিরাম পরিবেশে এই কমলালয়ের সাততলা বিশিষ্ট ভবন নির্মিত হইবে।
আপাতত এই কমলালয়টি হইবে এক সহস্র শয্যাবিশিষ্ট।
কমলালয়ে নিযুক্ত রমণীগণ 'কমলা' নামে অভিহিত হইবেন।
সমগ্র কমলালয়টি কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হইবে।
নিযুক্ত কমলাগণের শিক্ষাগত যোগ্যতা 'স্নাতক' হইতে হইবে। তাহারা হইবে আধুনিক, সম্পূর্ণ নীরোগ, ইংরেজিতে কথা বলিতে পারদর্শী। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়া সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীনভাবে নিয়োগ দেওয়া হইবে। যে-কোনো ধরনের তদ্বির প্রার্থিনীর অযোগ্যতা প্রমাণ করিবে। বলাবাহুল্য, আন্তর্জাতিক বেতন-কাঠামো অনুসারে বেতন দেয়া হইবে।
এক সহস্র কমলার স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্যে দুইশত চিকিৎসক নিযুক্ত হইবে। ইহারা প্রতি দুই দিন অন্তর কমলাদিগকে সার্বিকভাবে পরীক্ষা করিয়া রোগ-জীবাণুর সামান্য স্পর্শ হইতেও বাঁচাইয়া রাখিবে।
সমগ্র ভবনটির বিদ্যুৎ পানি সরবরাহ, শীতাতপ ব্যবস্থা ইত্যাদির তদারকির জন্যে বিশজন প্রকৌশলী নিযুক্ত হইবে।
ইহা ছাড়া প্রশাসনিক কার্যক্রম ঠিক রাখিবার জন্যে ব্যবস্থাপনায় উচ্চ ডিগ্রিধারী একজন মহাব্যবস্থাপক নিয়োগ করা হইবে। তাহার অধীনে অন্যান্য বিভাগীয় ব্যবস্থাপকেরা থাকিবেন। পাঁচশত জন আরদালী, মালী, বাবুর্চি ইত্যাদি নিয়োগ করিতে হইবে।
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পত্রিকা যেমন 'প্লেবয়'-এ বিজ্ঞাপন প্রকাশ ইত্যাদির জন্য একটি শক্তিশালী 'গণসংযোগ বিভাগ' থাকিবে। সেইজন্যে একজন গণসংযোগ অফিসারের অধীনে একটি সেল গড়িয়া তোলা হইবে।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা

এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হইলে বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত নারী-পুরুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রিধারী ব্যক্তি বেকার প্রকৌশলী-চিকিৎসক এবং আধাদক্ষ ব্যক্তির (আরদালী, মালী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রভৃতি পদে) কর্মসংস্থান হইয়া যাইবে। ফলে বেকার সমস্যা অনেকাংশে লাঘব হইবে।

বিভিন্ন মারাত্মক রোগ-বালাইয়ের বিস্তার রোধ হইবে। ফলে দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি ঘটিবে।

দেশের ধর্ষণ ও অন্যান্য সামাজিক অনাচার হ্রাস পাইবে। নারী নির্যাতনের হারও কমিয়া যাইবে।

বিপুল সংখ্যক বিদেশী পর্যটক বাংলাদেশে আসিতে থাকিবে। সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্য সংকটের ফলে প্রবাসী প্রেরিত অর্থের যোগান বন্ধ হইয়া যাওয়ায় অর্থনীতিতে যে বাড়তি চাপ পড়িয়াছে তাহা কাটাইয়া ওঠা যাইবে। আশা করা যায়, মরুভূমি হইতে শেখেরা পেট্রো-ডলারের বস্তা লইয়া আর গোয়া কিংবা থাইল্যান্ড যাইবে না, শীতলক্ষ্যার পাড়ে শরীর জুড়াইবে। দেশের অর্থনীতিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার হইবে।

সার্বিকভাবে নিরোধক ব্যবহার নিশ্চিত করা হইবে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধেও এই প্রকল্প অবদান রাখিবে।

দেশের আনাচে-কানাচে যত্রতত্র নোংরা ঘিঞ্জি অন্ধাকর পল্লি গড়িয়া উঠিবার বর্তমান প্রবণতা হ্রাস পাইবে। ফুসলাইয়া, অপহরণ করিয়া, নির্যাতন করিয়া অনিচ্ছুকদেরকেও দেহবৃত্তিতে রিক্রুটের বেআইনি চক্র চোখে মুখে অন্ধকার দেখিবে।

প্রয়োজনীয় অর্থ

এই প্রকল্পের পরিকল্পনা করা কমলাকান্তের জন্যে যতখানি সহজ হইয়াছে, ছিলিম ছিলিম তামাক উড়াইয়া দিয়াও সে ভাবিয়া পাইতেছে না, কতোখানি অর্থ প্রকল্পটির জন্যে ব্যয়িত হইবে। কমলাকান্ত আশা করে, মাননীয় সরকার এই ব্যাপারে সম্ভাব্যতা যাচাই করিয়া মোট কত অর্থের প্রয়োজন তাহা ধার্য করিবেন। অতঃপর উক্ত পরিমাণ অর্থের সমুদয়ই ঋণ মারফত কমলাকান্তের হস্তে সমর্পণ করিবেন। কমলাকান্তের ঘটিবাটি কিছুই নাই যে, প্রকল্পের মোট অর্থের অংশবিশেষ সে নিজে যোগাড় করিয়া বিনিয়োগ করিবে এবং অতঃপর ঋণের জন্য ব্যাংকের কাছে হাত পাতিবে। কমলাকান্ত নিশ্চিন্ত, ঋণ পরিশোধ সম্ভব হইবে। যখন জহুরুল ইসলামেরা, মন্ত্রীরা, এমপিরা সরকারি ব্যাংক হইতে কোটি কোটি টাকা ঋণ লইয়া শোধ না করিয়া দিব্যি আছেন, তখন কমলাকান্তকেও খানিক ঋণ দিয়া দেখাই হউক না কী হয়। আর বিভিন্ন পর্যায়ের কর্তাব্যক্তিদের কমলাকান্ত চুপি চুপি বলিয়া রাখিতেছে, পার্সেন্টেজের ব্যাপারে নিশ্চিত থাকুন, কমলাকান্ত যাহার যাহার প্রাপ্য তাহা কড়ায়-গণ্ডায় মিটাইয়া দিবে। সরকারি অর্থ সকলে মিলিয়া মিশিয়া গলাধঃকরণ করাই যে উত্তম, কমলাকান্ত তাহা বোঝে।

দুই.

ইহার পর কমলাকান্তের পাণ্ডুলিপিতে অন্য প্রসঙ্গে কিছু হিজিবিজি লেখা। পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না, পরের জন্য তোমার হৃদয় কুসুম বিকশিত করিও। কাঁঠালও

কাঁদি কাঁদি ফলে, মেয়েমানুষও কাঁদি কাঁদি ফলে। মেয়েমানুষ ও ডাব উভয়ে কচি থাকিতেই উত্তম।

কমলাকান্ত চোখের জলে বুক ভাসাইয়া এই প্রকল্প-প্রস্তাবনা রচনা করিল। এই সমাজ তাহাকে বাধ্য করিল। কমলাকান্ত আরো অহিফেন সেবন করিবে। গোয়ালিনী তাহার উপর অভিমান করিবে। কমলাকান্ত বরাহশাবকসম এই সমাজের মাথায় মূত্র ত্যাগ করিবে। বুঝিলাম, কমলাকান্ত ইদানীং অহিফেন লইয়া বড়ো বেশি বাড়াবাড়ি করিতেছে।

১৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯০, পূর্বাভাস

ভালোবাসার কবিতা

কবিকণ্ঠে ভালোবাসার কবিতা শোনার জন্যে সমবেত হয়েছে শত শত মানুষ, বটতলায়। ঢাকা থেকে অনেক দূরে, এক মফস্বল শহরে, বসেছে ওই কবিতা পাঠের আসর। খ্যাতিমান কবিরা এসছেন, তারা একে একে উঠছেন মঞ্চে, পাঠ করছেন নিজের লেখা কবিতা, এক কিংবা একাধিক। ওই সুদূর আধাশহরের মানুষেরা যে কবিদের কখনো দেখেনি, কেবল যাদের নাম শুনেছে, সেইসব বিরল কবিদের সবকিছুই তাদের কাছে মনে হচ্ছে দেখবার এবং লক্ষ্য করবার বিষয়।

মঞ্চে বসে আছেন সারাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত কাব্যবোদ্ধা পণ্ডিতেরা, যাদের বেশিরভাগই অধ্যাপক। কবিদের কবিতা পাঠ শেষ হয়ে গেলে তারা শোনাবেন তাদের মূল্যবান অভিমত, কাব্য সমালোচনার আসরও এটি।

প্রথমে যে, কবি মঞ্চে উঠলেন কবিতা পড়তে, তিনি দেখতে অনেকটা রবীন্দ্রনাথের মতো, দাড়ি-চুলে-গোঁফে ঢেকে গেছে মুখমণ্ডল, পরনে তার খদ্দরের পাজামা-পাঞ্জাবি। তিনি পাঠ করলেন তার নোটবই থেকে। কবিতাটি এরকম :

আমার ভালোবাসার ইরিক্ষেতে
মাজরা পোকার দারুণ প্রকোপ,
আমি কিছু ডায়াজিনন কিংবা বাসুডিন
খুঁজছি, তাই। কিন্তু সব ওষুধ মজুত করে
অদৃশ্য গুদামে চাবি নিয়ে কেটে পড়লে
তুমি, হে নিষ্ঠুর রূপবতী,
বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির মতো
তুমি।

কবিতাটি হিট করলো। করতালি পড়লো ঢের। শ্রোতাদের মধ্যে বসে থাকা এক তরুণী চোখ মুছলো আঁচলে।

দ্বিতীয় কবি বসেছিলেন এক মোটরসাইকেলে। সেখান থেকে মাথায় হেলমেট নিয়েই তিনি উঠে এলেন মঞ্চে, যখনই মাইকে ঘোষিত হলো তার নাম। তার পরনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জিন্সের ট্রাউজার, গায়ে লাল রঙের টি-শার্ট। বুকের মধ্যে পানপাতার মতো হৃদয়ের একখানি ছবি। এই কবি পড়লেন :

তুমি আর আমি যেন
রেললাইন, রেললাইন।
ট্রেন যায়, যায় ট্রেন,
রেললাইন, রেললাইন।
যায় লোকে, হেঁটে যায়,
রেললাইন, রেললাইন।
মিলবো না কোনোদিন
রেললাইন, রেললাইন।

তৃতীয় কবি ছিলেন স্যুটেড, বুটেড। তাঁর কবিতাটি ঃ

গাছগুলি কেটে ফ্যালো।
ওই বড় গাছটি কেটে ফ্যালো,
ওই ছোট গাছটি কেটে ফ্যালো।
ওই গোলাপের ঝাড়টিও কেটে ফ্যালো।
গাছগুলি কেটে ফ্যালো, সবক'টি গাছ।
শুধু ওই ঝাঁকড়াচুল নারকেল গাছটি থাক।

এরপর এলেন গেরুয়া বসন পরা, নেড়ে মাথা এক কবি। তিনি পড়লেন,

আমার আঙিনায় তুমি হাঁস,
সারাদিন প্যাক প্যাক প্যাক।
আমার আঙিনায় তুমি কই ?
আমি ডাকি তই, তই, তই।

এই পর্যায়ে এসে কবিতা পাঠের আসরটি একটুখানি ঝুলে পড়লো। এর কারণ আবিষ্কার করলেন এক প্রভাষক কবি। তিনি বললেন, হ্যাঙ্গারের সঙ্গে শার্ট ঝুলে থাকে বটে, কিন্তু হ্যাঙ্গারটি ঝুলিয়ে রাখতে দরকার হয় হুক। তেমনি কবিতার সঙ্গে পাঠককে আটকে রাখবার জন্য কবিতাতেও চাই হুক। তিনি পড়লেন তার হুক-বিশিষ্ট কবিতাটিঃ

লেডিস হোস্টেলের সামনের রাস্তা
রাত বারোটা।
কতিপয় প্যান্ট হেঁটে যাচ্ছে পথে
কতিপয় শাড়ি আর পাজামা ঘুমুচ্ছে বিছানায়।
কতিপয় গেঞ্জি আর আন্ডারঅয়ার হেঁটে যাচ্ছে,
কতিপয় ব্রা আর প্যান্টি ঘুমুচ্ছে সুখে।
লেডিস হোস্টেলের সামনের রাস্তায় রাত বারোটা,
কতিপয় মাংস ঘুমিয়ে,
কতিপয় জেগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তুমুল করতালি, হৈহল্লার মধ্যে বাকিটা আর শোনা গেলো না। জনতাকে শান্ত করতে এগিয়ে এলেন এক বিরহবাদী কবি। তিনি পড়লেন :

কতো দিন তোমাকে দেখি না।
তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে,
যখন তুমি চুল মেলে দাও জানালায়।
তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে
যখন তুমি জোছনারাতে ছাদে দাঁড়াও।
তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে
যখন তুমি শাদা বিছানায় একাকী ঘুমাও।
তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করে
যখন তুমি স্নানার্থে নগ্ন দাঁড়াও।

কিন্তু হট্টগোল বাড়লো বই কমলো না। তখন অগত্যা উঠে আসতে হলো এই সময়ের সেরা আধুনিক কবিকে। এই কবির চেহারায় এক সৌম্য শান্তভাব, কিন্তু গভীর অমনোযোগিতা ও ঔদাসীন্য তার বেশভূষায়। তিনি মঞ্চে দাঁড়াতেই শান্ত হয়ে গেলো সবকিছু। তিনি পাঞ্জাবির ডান পকেট থেকে চশমা আর কবিতাটি বের করে পড়তে লাগলেন তাঁর প্রেমের কবিতাখানি :

নিউ বলাকা অটোমেটিক ড্রাই ক্লিনার্স।
একটি শাড়ি ধোলাই পাঁচ টাকা
একটি প্যান্ট ইস্ত্রি দুই টাকা
একটি ব্লাউজ ইস্ত্রি এক টাকা
একটি পাঞ্জাবি ধোলাই চার টাকা
মোট বারো টাকা
ডেলিভারীর তারিখ ১৩ এপ্রিল রাত ৮টার পর। প্রাকৃতিক কারণ কিংবা চুরি-আগুন ইত্যাদির কারণে কাপড় হারাইয়া গেলে, কিংবা নষ্ট হইলে কিংবা উঠিয়া গেলে কোম্পানি দায়ী নয়। ধন্যবাদ।

তার কবিতাটি বিপুলভাবে সমাদৃত হলো। সেইসঙ্গে কাব্যপাঠের আসর শেষে শুরু হলো সমালোচনার আসর। সমালোচকেরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন সর্বশেষ কবিপঠিত 'নিউ বলাকা অটোমেটিক ড্রাই ক্লিনার্স' নামের কবিতাটিই প্রেমের কবিতা হিসেবে সবচেয়ে সার্থক ও সবচেয়ে আধুনিক। কেননা, প্রেমের কবিতা হয়েও এটি যথেষ্ট স্মার্ট এবং প্যানপ্যান ক্লিষ্ট কোনো শব্দ এ কবিতাটিতে ব্যবহৃত হয়নি। সবচেয়ে বড় কথা, সংসারের চিত্রকল্প হিসেবে ধোলাই তথা লন্ড্রিকে বেছে নেয়া হচ্ছে এ যুগের দর্শনেরই প্রতিফলন।

বিদগ্ধ পণ্ডিতদের এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসার পর সভাপতি অনুরোধ করলেন এই কবিতার কবিকে তার কবিতা ও কাব্যভাবনা সম্পর্কে কিছু বলতে। যথারীতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উদাসভঙ্গিতে মঞ্চে উঠে এসে কবি বললেন: সুধীমণ্ডলী, আমার একটা ছোট্ট ভুল হয়ে গেছে। আমি যে-কবিতাটি লিখে এনেছিলাম, তা আমার বাম পকেটে রয়ে গেছে, ভুলে আমি আমার ডান পকেটে রাখা লন্ড্রির স্লিপটি পড়ে ফেলেছি, যাই হোক, এবার আমি আমার আসল কবিতাটি পড়বার অনুমতি প্রার্থনা করছি।

(প্রচলিত কৌতুক অবলম্বনে রচিত)

গো. আযমের শাস্তিনামা

গো. আযমের বিচার হতে যাচ্ছে গণআদালতে। গণআদালত মানে জনতার আদালত। জনগণই বিচারক, জনগণের ইচ্ছাই সেখানে আইন। গণআদালতে এই ঘৃণ্য যুদ্ধাপরাধীর বিচারের শাস্তি কি বাংলাদেশে প্রচলিত দণ্ডবিধির মতন হবে, নাকি তা-ও নির্ধারিত হবে জনগণের ইচ্ছা অনুসারে ? যদি গো. আযমের শাস্তির প্রক্রিয়া নির্ধারিত হতে হয় জনগণের দেয়া পরামর্শ মোতাবেক, সেক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রা ও মেয়াদের শাস্তির একটি তালিকা প্রস্তুত করে রাখা দরকার। কথাকার্টুনের পক্ষ থেকে, এই কাজটিই করা হয়েছে। সমাজের সর্বস্তরের লোকের সঙ্গে আলাপ করা হয়েছে কী শাস্তি হতে পরে একজন যুদ্ধাপরাধীর— যে কেবল বিরোধিতা করেনি যুদ্ধের সময়, যুদ্ধের পরেও স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নানা তৎপরতা চালিয়েছে শত্রুদেশের মাটিতে বসে। বিভিন্ন পেশার লোকজন তার শাস্তির যে-প্রস্তাবগুলি দিয়েছে, তা নিচে নথিভুক্ত করা হলো।

একজন পেশ ইমাম : কেতাবে সব গুনাহের মাফ আছে কিন্তু জেনার মাফ নেই। ওই গো. আযমের জন্যে দুনিয়ায় এবং আখেরাতে আছে কঠিন আজাব। তার অর্ধেক শরীর মাটির মধ্যে পুঁতে পাথর নিক্ষেপ করে তাকে হত্যা করতে হবে।

একজন ইসলামী চিন্তাবিদ : গো. আযমের ধর্ম ইসলাম নয়, তা মওদুদীবাদ; ইসলামের দুশমন ওই গো. আযমকে কতল করতে হবে।

একজন ক্রীড়া প্রতিবেদক : প্রথমে গো. আযমকে ক্রিকেটের উইকেট বানাতে হবে। এরপর যথাক্রমে ওয়াকার ইউনুস, ডোনাল্ড ও মার্শালকে দিয়ে বল করাতে হবে। এরপর তাকে বল বানিয়ে শচীন তেণ্ডুলকার, ডেভিড বুন ও রিচার্ডের ব্যাটের সামনে ছেড়ে দিতে হবে।

একজন স্কুলছাত্র : ওকে প্রথমে ছেড়ে দিতে হবে এ-টীমের সামনে। তারপর ম্যাকগাইভার ওকে বাধবে দড়ি দিয়ে। তারপর আমাদের অঙ্কের টিচার ওকে বেত মারবে। তারপর আমাদের বাংলার ম্যাডাম ওকে কানমলা দিবে। আর আমার ছোট আন্টি ওর চুল কেটে দেবে। ওর জামার ভেতর আরশোলা ছেড়ে দেবে ছোটভাইয়া। আর তারপর একটা বন্দুক দিয়ে ট্যা ট্যা ট্যা।

একজন রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ : অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে। ক্ষমা নেই, ক্ষমা নেই, ঘাতকের। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আসে তবে একলা চলো। দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো। তবে ভাই দেখবেন, বেশি রক্তপাত যেন না হয়।

একজন পদার্থবিদ : প্রতিটি ক্রিয়ারই একটি সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে। এতোগুলো লোককে হত্যা করে এতো অত্যাচার নিপীড়ন করে কেউ বাঁচতে পারে ? ওকে মরতেই হবে। ঢাকার সবচেয়ে উঁচু বিল্ডিং থেকে ফেলে দিলেই শেষে নিচে পড়বে। নিউটন বলেছেন, আপেল মাটিতে পড়বেই। তবে তার উচ্চতা হবে $H=ut+{}^1/_2gt^2$. আর ইলেকট্রিক শক দেয়া যেতে পারে। তবে ভালো হয়, পানি দিয়ে মেরে মাথা থেঁতলে দেয়া। ম্যানিংসের সূত্র অনুযায়ী।

একজন রসায়নবিদ : হেমলক পান করানো ঠিক হবে না। কেননা, সেক্ষেত্রে সে হয়তো বলে বসবে ইউ টু ডাই আই টু লিভ.....। কিন্তু তাকে খাওয়ানো যেতে পারে সায়ানাইড কিংবা রাজাম্ল। হাইড্রোক্লোরিক এসিড আর নাইট্রিক এসিড.....। আচ্ছা, একটা গ্যাস চেম্বার বানানো যায় না ? গ্যাসের চাপ তো আয়তনের বিপরীত আনুপাতিক।

একজন মনোবিশেষজ্ঞ : আরে ভাই, মেরে ফেললেই তো শেষ। তার মনোচিকিৎসা করতে হবে। শক-থেরাপি দেয়া যেতে পারে। তবে, তারো চেয়ে বেশি ইফেক্টিভ হবে সাইকোলোজিক্যাল ট্রিটমেন্ট। একটা অন্ধকার ঘর। তাকে বসিয়ে রাখা হবে একটা হাতলবিহীন চেয়ারে। পরদায় দেখানো হবে একজন শহীদের লাশের ছবি। ওই ছবি দেখলেই তার মুখে নিশ্চয়ই ফুটে উঠবে ক্রূর হাসি। তখনই এক হাজার পাওয়ারের বাতি।

একজন রিকশাঅলা : আমার হাতে ছাইড়া দ্যান, চেইন দিয়া কোপাইয়াই বারোটা বাজামু।

একজন কসাই : খালি একবার যদি হ্যারে বগলের লগে পাইতাম।

একজন তরুণী : তার নাম আমার সামনে নেবেন না প্লিজ, আমার যেন কেমন লাগছে।

একজন মুক্তিযোদ্ধা : অস্ত্র জমা দিয়েছি, ট্রেনিং জমা দিইনি। ব্রাশ ফায়ার।

একজন সমাজবিজ্ঞানী : মূলকথা হলো মৌলবাদ। দেশের দারিদ্র্য দূর না হলে তো মানুষ নিয়তিনির্ভর হবেই। তবে মৌলবাদের বিরুদ্ধেও এটি একটি প্রতীকী লড়াই। সেক্ষেত্রে তার ফাঁসি হওয়াই শ্রেয়।

একজন কবি : তার পিঠের বেকায়দা জায়গায় জলবিছুটি লাগিয়ে দেবো, চোখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবো ভ্রূ। তার চুলোর মধ্যে নুন ছিটিয়ে দেবো। পাকা ধানে দেবো মই, বাড়া ভাতে ছাই। নাভীর মধ্যে ধান রেখে ডলে ডলে চাল বার করবো। একটা ইটের ওপর মাথাটা রেখে আরেকটা ইট দিয়ে...মনে নেই, আমার স্বপ্নের উঠোনে সে কুকুর চড়িয়েছিলো ?

একজন দরজী : আমারে দেন। ওর হাতের আঙুলগুলো রিফু কইয়া দিমু। ঠোঁট দুইটা সেলাই কইরা দিমু। আর বোতামের ঘর সেলাই কইরা দিমু চোখের পাতাগুলানরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জনৈক গদ্যকার্টুন বিশেষজ্ঞ : গো. আযমকে জন্মদিনের পোশাকে সাজিয়ে একটা অন্ধকার ঘরে ছেড়ে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, ঢাকার মশারা যেন অবাধে প্রবেশ করতে পারে সেই ঘরে। আর মির্জা আব্বাস যেন ঢাকার মেয়র পদে বহাল থাকেন।

একজন শহীদের স্ত্রী : তিনি কিছুই বললেন না। ভাবলেশহীন তার দু'চোখ, খানিকক্ষণ। তারপর জল ধীরে ধীরে নীরবে ঝরতে লাগালো তার গণ্ডদ্বয় বেয়ে। সে-অশ্রুও শুকিয়ে গেলো। একসময় তার চোয়াল হলো শক্ত। দুচোখে জ্বলে উঠলো আগুন।

কাগজ, ২৩, মার্চ '৯২

আমরা একটা টাকশাল দিচ্ছি

বাঙালির উদ্ভাবনী শক্তি ও প্রতিভা নিঃসন্দেহে খুবই বেশি। স্বল্প পুঁজি জায়গামতো খাটিয়ে অনেক বাঙালি হয়েছেন বিরাট বড়লোক, দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে-ওজনে। তবে সবাই যে পুঁজি বিনিয়োগ করলেই সফল হবেন, তা কিন্তু নয়। এখানে, বাংলাদেশে, শিল্পের চেয়ে বাণিজ্য, বাণিজ্যের চেয়ে দালালি আর দালালির চেয়ে বেশি লাভজনক চোরাচালান। তবুও তো কেউ কেউ বিপ্লব করেছেন বলপেন বানিয়ে, কেউ কেউ রজনীগন্ধা চাষে, আর কেউবা ভিউকার্ড ছেপে। সব শিল্প-উদ্যোগই যে ব্যর্থ হবে তা কিন্তু নয়। ভেবেচিন্তে বের করতে হবে বিনিয়োগের খেত বা ক্ষেত্র বা খাত।

কী সেই শিল্প-খাত, যা এতোটা এক্সক্লুসিভ, এতোটা লোভনীয়, এতোটা ফলবান?

আমরা নিজেরাই একটি টাকশাল বানাবো।

বলেন কী! টাকশাল? দমের ঘোরে চামে বলছেন না তো?

জি না। ভেবে বলছি। খুব ভেবে বলছি।

হঠাৎ টাকশালের আইডিয়া মাথায় এলো কেন?

'ভোরের কাগজ'-এ টাকার ছবি দেখে। একশ টাকার নোট। নকল টাকা। যশোর সীমান্ত দিয়ে ঢুকেছে। পাখির মতো ঢুকছে, ঢুকছে আর উড়ছে, উড়ছে আর ঘুরছে। ঘুরছে আর ঘোরাচ্ছে বিডিআর পুলিশের মাথা, চোখের মণি, কোন্‌টি আসল টাকা আর কোন্‌টি নকল, আলাদা করতে পারছে না তারা। তো, ওই নকল টাকার ছবিই উদ্বুদ্ধ করছে আমাদের টাকশাল বানাতে।

কিন্তু, সরকারের অনুমতি লাগবে না, অনুমতিটা আসবে কোত্থেকে?

জি না, দরকার হবে না। 'এক কোটি টাকা পর্যন্ত বিনিয়োগ করিয়া শিল্প-কারখানা স্থাপন করিতে কোনোপ্রকার পূর্বানুমতির প্রয়োজন হইবে না'—সরকার এ সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে অতি সম্প্রতি। আমার ওই টাকশাল বানাতে এক কোটি টাকা পর্যন্ত লাগবেই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বুঝলাম, অনুমতি লাগবে না, কিন্তু তাই বলে কেউ যদি আগ্নেয়াস্ত্রের কারখানা বানাতে চায়, তাহলে কি সরকার বাধা দেবে না ?

দিতেও পারে, না-ও পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলিতে তো অস্ত্র আছে, মারাত্মক সব অস্ত্রশস্ত্র সরকারি দলের সমর্থকদের কাছে আছে, আছে সরকার বিরোধীদের কাছেও— কই, সরকার তো গা করেন না। তবে, বেসরকারি অস্ত্র-কারখানা সরকারের দমন করাই উচিত নিজেদেরই স্বার্থে, নইলে পাবলিকের হাতে হাতে অস্ত্র চলে গেলে রাষ্ট্রই তো হয়ে পড়বে অচল।

সেক্ষেত্রে একটি বেসরকারি টাকশালও তো রাষ্ট্রে সৃষ্টি করবে মহাবিশৃঙ্খলা, ওটিও নিশ্চয়ই সরকার চলতে দেবে না।

দেবে না নয়, দিতে চাইবে না। কিন্তু ওই 'না'-কে 'হ্যাঁ' করা যাবে সহজেই। ভাইরে, দিস ইজ বাংলাদেশ।

কী করে, কেমন করে ?

নাউ, দিস ইজ দ্যা কোশ্চেন, কী করে সরকারের 'না'-কে হ্যাঁ করতে হবে।

এক নম্বর কথা, আমাদের নোটগুলি হবে খুবই আকর্ষণীয়। প্রতিটি টাকার থাকবে দুটি সংস্করণ— একটি হবে নগর সংস্করণ, আরেকটি মফস্বল সংস্করণ। মফস্বল সংস্করণের এক পিঠে থাকবে বেদের মেয়ে জোছনার ছবি। আর শহর সংস্করণে থাকবে বম্বের হিট নায়িকার ছবি—ধরা যাক, মাধুরী দীক্ষিত। এ-ছাড়া সময় বুঝে ম্যারাডোনা কিংবা ইমরান খানদের ছবিও রাখা হবে। এর ফলে আমাদের নোটগুলি হবে জনপ্রিয়, দেশের মানুষ ব্যাপকভাবে এই নোটগুলি ব্যবহার করবে, আর বাংলাদেশ ব্যাংকের নোটগুলি হয়ে পড়বে অচল।

কিন্তু সরকার তো চলতে দেবে না। তার ওপর ফিল্মস্টারদের ছবি...

আরে, শুধু টাকার এক পিঠটা দেখছেন, অন্য পিঠটায় থাকবে বেগম খালেদা জিয়ার একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি।

উহুঁ, তাতেও কুলোবে না। তিনি হচ্ছেন লৌহমানবী, আপোষহীন নেত্রী। তোষামোদে তিনি টলবেন না।

এমন কোনো নারী নেই, যিনি ক্যামেরার প্রতি দুর্বল নন। তবুও, সাবধানের মার নেই। বেগম জিয়ার ছবির ঠিক পাশেই থাকবে বায়তুল মোকাররমের ছবি। জাতীয় মসজিদ। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। তার ওপর আল্লাহর ঘর। প্রবেশ তোরণে আরবিতে লেখা: আল্লাহু আকবর। টাকার গায়ে ওই আরবি অক্ষরগুলো জ্বলজ্বল করবে। ওই টাকা সরকার ব্যান্ড করতে পারবে না। পোড়াতে পারবে না। বায়তুল মোকাররম থেকে বেরিয়ে ঘাতক-দালালেরা জাহানারা ইমামের সমাবেশে বোমা হামলা চালালো, পুলিশ কিছু বলতে পেরেছে ? আরে ভাই, ঢাকার সবগুলো সুপার মার্কেটের নিচেরতলায় মসজিদ কেন ? সরকারি জায়গা, অন্যায়ভাবে দখল করা। মসজিদ বানালে আর ভাঙতে পারে না কেউই।

কিন্তু তাতেও যদি কাজ না হয়,তাহলে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাহলেও চিন্তা নেই, টাকা ছাপিয়ে প্রথম বহরটা উপঢৌকন হিসেবে দেয়া হবে কর্তাব্যক্তিদের। জানেনই তো, এভরি ম্যান ইজ পারচেসএবল। ফ্যাক্টর শুধু টাকার অঙ্ক।

তো, ওই টাকা পেয়ে কর্তাদের প্রথম চিন্তাই হবে ওই টাকাটাকে বৈধ রাখা, বৈধ করা। আমার মাথার যত চিন্তা সব তাদের মাথায় বদলি হয়ে যাবে। সরকার তখন বলতে শুরু করবে: ব্যক্তিমালিকানাকে উৎসাহিত করাই এ সরকারের প্রধান নীতি, আমরা একে একে সবকিছুকেই ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দিতে চাই, টাকশাল তো কোন্ ছার!

কেন তাহারা স্মৃতিসৌধে গমন করিলেন না ?

ইহা কিরূপে সম্ভব যে, তাহাদের কেহই গমন করিলেন না জাতীয় স্মৃতিসৌধে, অর্পণ করিলেন না পুষ্পার্ঘ্য, নিবেদন করিলেন না শ্রদ্ধা আমাদিগের মহান মুক্তিযুদ্ধে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারকারী শহীদদের প্রতি ? এইরূপ ছাব্বিশে মার্চ আর কখনো আসে নাই। ভবিষ্যতেও আসিবে না—আশা করিতে ক্ষতি কি ?

তাহারা দুইজন। একজন গৃহের প্রধান, অন্যজন পরিবারের প্রধান। উহাদের একজন অন্তত যাইবেন সাভারে, তাহাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু সকল স্বাভাবিকতার মুখে ভস্ম ঢালিয়া তাহারা আসিলেন না। শহীদের আত্মারা স্বর্গের জানালা দিয়া তাকাইয়া তাকাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলো— এই বুঝি আসিলো কিন্তু না। উহারা আসিলেন না।

স্বর্গ-মর্ত-পাতাল ব্যাপিয়া একটি জিজ্ঞাসা ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিলো— কেন উহাদের কেহই ছাব্বিশের সকালে স্মৃতিসৌধে গেলেন না। এই প্রশ্নের জবাব দিতে যাহারা পারিতেন, উহারা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাহিরে। উহাদিগকে যখন হাতের নিকট পাওয়া যাইবে না, তখন আমরাই বা কারণটি উদঘাটন করিবার চেষ্টা করিতেছি না কেন ?

গৃহপ্রধান আর পরিবারপ্রধান যে যে কারণে স্মৃতিসৌধে যাইতে পারেন নাই, তাহার একটি সম্ভাব্য তালিকা নিম্নে সন্নিবেশিত হইলো। হইতে পারে, এই কারণগুলির সমুদয়ই তাহাদের এই মহান অনুপস্থিতির কারণ, অথবা এমন হওয়াও বিচিত্র নহে যে, প্রকৃত কারণ ইহাদের একটিও নহে। যে-যে কারণে তাহারা স্মৃতিসৌধে হাজির হইতে পারিলেন না :

১। ২৭ ফেব্রুয়ারিতে নাচিয়া-গাহিয়া তাহারা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

২। একুশ বছর আগে কী ঘটিয়াছিলো, তাহা তাহারা স্মরণ করিতে পারেন নাই।

৩। ২৬ মার্চকে নয়, তাহারা ২৭ মার্চকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ মনে করিয়া থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

৪। রমজান মাসে স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য (পুষ্প+অর্ঘ্য) প্রদানকে তাহারা শরিয়তবিরোধী নাজায়েজ কর্ম বলিয়া ভাবিয়াছেন।

৫। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্যে খাবার-দাবার কিনিতে গিয়া তাহারা সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। পুষ্পস্তবক কিনিবার সামর্থ্য তাহাদের ছিলো না।

৬। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করিয়া একজন ভ্রমণক্লান্তিতে ভুগিতেছেন। ফলে তাহার পক্ষে সোফায় বসিয়া মার্চপাস্ট প্রত্যক্ষ ছাড়া অন্য কিছু করা সম্ভব ছিলো না।

৭। উহাদের মধ্যে একজন মুক্তিযুদ্ধের কথা শুনিলেই জলাতঙ্ক রোগীর মতন ছটফটাইতে থাকেন। সুতরাং কথা ছিলো অপরজন যাইবেন। কিন্তু সেই অপরজনের পক্ষে নির্ধারিত সময়ে গাত্রোত্থান করা সম্ভব হয় নাই।

৮। তাহারা এইরূপ অঙ্গীকারে পরস্পর আবদ্ধ ছিলেন যে, ২৬ মার্চের সকালটি তাহারা দুইজন একসঙ্গে কাটাইবেন। সেক্ষেত্রে স্মৃতিসৌধে গমনে একজনের আপত্তি থাকায় অন্যজনও যাইতে পারেন নাই।

৯। প্রথমজন দ্বিতীয়জনকে বলিলেন, তুমি যাও। দ্বিতীয়জন উত্তর দিলেন, না, তুমি। এই রূপে 'তুমি' 'না, তুমি' চলিতে লাগিলো। সমস্যার সমাধান হইলো না। কাহারো আর স্মৃতিসৌধে যাওয়া হইলো না।

১০। স্মৃতিসৌধে গিয়া অন্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের চাইতে অন্যের স্যালুট লাভ করাকে অধিকতর লাভজনক মনে হইয়াছিলো।

১১। তাহাদের এইরূপ মনে হইয়াছিলো— 'স্মৃতিসৌধ'! ওখানে কতোবারই তো বেড়াইতে গিয়াছি!'

১২। সেদিন উহাদের শরীর ভালো ছিলো না।

১৩। উহাদের একজনের একটি ভ্রাতুষ্পুত্র আছে সে খুবই আদরের। ওই ভ্রাতুষ্পুত্র বলিলো, 'আমি উড়োজাহাজ দেখিবো। না, তুমি কিছুতেই 'সবকটা জানালায়' যাইতে পারিবে না।' শিশুটির মাতা তখন বগুড়ায় ছিলেন। তাহার এই আবদার তাই অগ্রাহ্য করা গেলো না।

১৪। ২৬ মার্চ গণআদালত বসিতেছে, এই আতঙ্কে তাহাদের কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাইয়াছিলো।

১৫। গণআদালত বানচাল করিবার উদ্দেশ্যে সকল পুলিশ নিয়োজিত হইয়াছিলো, ফলে স্মৃতিসৌধে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় নাই।

১৬। তাহারা স্মৃতিসৌধে না যাওয়াকেই সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাই যান নাই।

১৭। গো. আযমকে খাঁচায় পুরিবার ধকল সামলাইতেই তাহারা অস্থির। স্মৃতিসৌধে না গিয়া তাহাদের মরুজ প্রভুদের তাহারা খুশি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

১৮। ত্রিশ লাখ শহীদের বিয়োগব্যথায় তাহারা এতোটাই অস্থির ছিলেন যে, স্মৃতি-জাগানিয়া স্মৃতিসৌধ দর্শনে তাহারা নিজেদের সামলাইতে পারিতেন না, অধিক শোকে তাহারা মূর্ছা যাইতেন।

১৯। শ্রদ্ধা হইতেছে অন্তরের ব্যাপার, ইহা দেখাইয়া বেড়াইবার বিষয় নহে। অন্তরের শ্রদ্ধা নীরবে নিভৃতে জ্ঞাপন করিতে হয়, তাই তাহারা স্মৃতিসৌধে যান নাই।

২০। তাহারা হিপোক্র্যাসি করিতে পারেন না। অন্তরে বিদ্বেষ গোপন করিয়া মুখে শ্রদ্ধার ভাব আনা তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

এপ্রিল '৯২

স্বল্প-পুঁজি খাটাবেন কোথায় ?

এমন অনেকেই আছেন যারা কষ্টে-সৃষ্টে-খুঁটে, চেয়ে-চিন্তে জোগাড় করতে পারেন কিছু মূলধন, কিন্তু জানেন না তা বিনিয়োগ করতে হবে কোন্ খাতে। তাদের জন্যে এই গঠনমূলক অভিসন্দর্ভ :

জীবন্ত ফটোকপিয়ার

আপনি যদি বছর পাঁচেক আগেও একটি ফটোকপিয়ার যন্ত্র কিনতেন, তা হতো খুবই লাভজনক ব্যাপার। ওই যন্ত্র খুব একটা দুধ দিতে পারছে না আজকাল, কারণ মোড়ে মোড়ে বসে গেছে ফটোস্ট্যাট মেশিন, আর অর্থনীতির ডিমান্ড-সাপ্লাই সূত্র কমিয়ে দিয়েছে লভ্যাংশ।

সে-ক্ষেত্রে এখন আপনার পুঁজি বিনিয়োগ করা উচিত জীবন্ত ফটোকপিয়ার-এ। আপনাকে যা করতে হবে তা হলো, যে-কোনো বিষয় দক্ষতার সঙ্গে হাতে লিখে দেবার গ্যারান্টি দিতে হবে নির্ভুলভাবে। সামনেই এইচএসসি পরীক্ষা। ওই পরীক্ষায় যারা সাফল্য অর্জন করতে চায়, তারা উচ্চশিক্ষার্থে যাত্রা করবে মফস্বলে। ওই হিজরতকারীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে সহায়তা করাই হবে আপনার ব্যবসা। একেকটি পরীক্ষাসিন্ধু পার করে দেবার বদলে আপনি পাবেন উচ্চ পারিতোষিক। বিশেষ করে অঙ্ক আর ইংরেজি পরীক্ষার কপিয়ারদের কদর খুবই বেশি।

তবে সব ব্যবসারই থাকে একটি অভিজাত রূপ। জীবন্ত ফটোকপিয়ারদের মধ্যে যারা উচ্চশ্রেণীর, তারা কাজ করেন টোয়েফল আর জিআরই পরীক্ষায়। টোয়েফল-এ ইদানীং দরকার হচ্ছে পাসপোর্ট, তাই ব্যাপারটি এখন অনেক বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। ভয় পাবার দরকার নেই— যতো বেশি ঝুঁকি, লাভ ততো বেশি। আর জিআরই-তে এখনো দরকার হয় না পাসপোর্টের, এ সত্ত্বেও ওতে লাভের হার আর সম্মান দুই-ই পাবেন বেশি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাজনৈতিক ক্যালেন্ডার

ক্যালেন্ডার ছাপিয়ে বাজারজাত করবার বাণিজ্য একসময় খুবই লাভজনক ছিলো। এখনো তা লাভজনক, কিন্তু ক্যালেন্ডার বিক্রি করে আসে না ওই লাভ, তা আসে কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্যালেন্ডারের কাজটি কন্ট্রাক্টভিত্তিতে ছাপানোর মাধ্যমে। কিন্তু এর চেয়েও লাভজনক দালালি—কোনো সরকারি/বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্যালেন্ডারের কাজটি কোনো বিজ্ঞাপনী সংস্থাকে পাইয়ে দেয়াই এই দালালদের কাজ।

আমরা কিন্তু আপনাকে পরামর্শ দেবো না দালালি করতে, বরং আপনি বের করতে পারেন একটি রাজনৈতিক দিনপঞ্জি। বছরের কোন্ কোন্ দিন হরতাল পালিত হবে, কোন্ দিন পরিবহন শ্রমিকদের মারামারির কারণে বন্ধ থাকবে কোন্ রুটের যানবাহন, তা লালকালিতে চিহ্নিত করা থাকবে ওই ক্যালেন্ডারে। মাসগুলোর নামও বদলে দিতে পারেন। যেমন— জুলাই : বাজেটবিরোধী আন্দোলনের মাস, জুন : জিনিসপাতির দাম বাড়ার মাস, নভেম্বর : লাগাতার হরতালের মাস, ডিসেম্বর : বিজয়ের মাস, ফেব্রুয়ারি : ছাত্রহত্যার মাস, রমজান : দলভাঙার মাস ইত্যাদি।

রাজপথের ইজারাদার

এতোদিন বিভিন্ন হাট-ঘাট-জলমহাল ইজারা দেবার কথা শোনা গিয়েছিলো কিন্তু এখন খুব বেশি করে শোনা যাচ্ছে রাজপথ ইজারা দেবার কথা। সরকারি নেতারা বার বার বলেছেন, এখনো রাজপথের ইজারা কাউকে দেয়া হয়নি। ওই কথাই সৃষ্টি করেছে আশাবাদের। মনে করা হচ্ছে, এখনো সুযোগ আছে, রাজপথগুলোর ইজারা লাভ করা যাবে অচিরেই। রাজপথ বলতে রাজার পথ নয়, বোঝায় পথের রাজা। রাজধানীসহ প্রধান শহরগুলোর প্রধান সড়কগুলোকেও চিহ্নিত করা যাবে রাজপথ হিসেবে। ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ও সড়ক-জনপথ বিভাগ এই শনাক্তকরণের কাজটি করবে, তাদের সহযোগিতা করবেন মির্জা আব্বাসের মতো নেতারা। প্রকৌশলীরা নিশ্চয়ই জড়িত থাকবেন এ-কাজে, সেক্ষেত্রে তারা লাভবান হবেন কোনো কোনো সড়ককে 'ফেভার' করে। এরপর দেয়া হবে বার্ষিক অথবা পঞ্চবার্ষিক, পারলে চিরকালীন ইজারা। ইজারাদারদের প্রাথমিক যোগ্যতা হবে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে আস্থা, শারীরিক সামর্থ্য বিভিন্ন ধরনের 'জিনিস' চালানের পূর্ব-অভিজ্ঞতা, চাঁদাবাজিসহ অন্যান্য জনসমীহ উদ্রেককারী ক্রিয়াকর্মে পারদর্শিতা। ইজারা দেয়া হবে উন্মুক্ত নিলামের মাধ্যমে, তবে যে-কোনো টেন্ডার গ্রহণ কিংবা বর্জনের অধিকার জাতীয়তাবাদী সরকার সবসময়ই সংরক্ষণ করবেন। ওই অধিকারই তো আসল ফাঁক, প্রকৌশলীদের পাত্রমূল্যের গোপন চাবিকাঠি। এখন আপনি যদি স্বল্পপুঁজি বিনিয়োগ করে লাভবান হতে চান, রাজপথের ইজারা পাবার জন্যে সচেষ্ট হোন। মনে রাখবেন, কাজটিতে রয়েছে অনেক বড় জাতীয় দায়িত্ব। আপনাকে ওই রাজপথের ছিনতাই-সন্ত্রাস-হরতাল-মিছিল-চাঁদা সবকিছুরই নিয়ন্ত্রণভার গ্রহণ করতে হবে। আশা করা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যায়, আপনি লাভ করবেন পুলিশ প্রশাসনসহ জামাত-ফ্রিডম ক্যাডারদের শক্তিপূর্ণ সহযোগিতা। আর, সরকার পরিবর্তন হলেও ক্ষতি নেই—মনে রাখবেন, রাজপথের ইজারাদারদের সঙ্গে সব সরকারকেই সুসম্পর্ক রাখতে হয় সহজ কারণেই।

সেকেন্ড হ্যাণ্ড পুষ্পক্রয় কেন্দ্র

লক্ষ্য করে থাকবেন, ঢাকায় এখন পথে পথে গড়ে উঠেছে ফুল বিক্রি কেন্দ্র। ওই ব্যাবসাটিও শুরুতে ছিলো খুবই লাভজনক। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক বছর সাতেক আগে সাভারে ধানের ক্ষেত কিনে নিয়ে আবাদ করেছিলেন রজনীগন্ধা। বলা বাহুল্য, তার আঙুল ফুলে যতটা কলাগাছ হতে পেরেছিলো, এখন আপনার পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। আমরা আপনাকে পরামর্শ দেবো, বরং আপনি একটি সেকেন্ড হ্যান্ড পুষ্পক্রয় কেন্দ্র খুলুন। ফুলের আদান-প্রদান খুবই বেড়ে গেছে ঢাকা শহরে, কিন্তু ওই ফুল খুব একটা কাজে লাগে না কারুরই। একগুচ্ছ গোলাপ উপহার পাওয়া নিশ্চয়ই খুবই আনন্দের ব্যাপার, কিন্তু তারও চেয়ে আনন্দের ব্যাপার যদি ওই গোলাপগুলো কোথাও বিক্রি করে দেয়া যায়। আপনি সেই আনন্দের উৎস হতে পারেন। অল্পমূল্যে কিনে নেবেন সেকেন্ড হ্যান্ড গোলাপ। (জানেনই তো নদী, নারী ও ফুল কখনো অপবিত্র হয় না।) এরপর আপনি সেই কমদামে কেনা ফুলগুলো সরবরাহ করবেন অন্য দোকানে। এছাড়া গোলাপজল-আতর ইত্যাদির ফ্যাক্টরিতেও আপনি পারেন ফুল বরবরাহ করতে।

বাণিজ্যিক শর্টফিল্ম

আপনার স্বল্প মূলধন আপনি খাটাতে পারেন শর্ট ফিল্ম বানানোয়। না, চমকে উঠবেন না, কোনো জটিল, নিরীক্ষাধর্মী ফ্লপ ছবি আপনি নির্মাণ করবেন না, আপনি বানাবেন একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের স্বল্প পুঁজির রগরগে বাণিজ্যিক চলচ্চিত্র। তার পর ওটির প্রদর্শনী করবেন দর্শনীর বিনিময়ে, পাড়ায়-পাড়ায়, শহরে-শহরে। ট্যাক্স দিতে হবে না, ফলে লাভ হবে খুবই বেশি। সতর্কতা ঃ স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র সংসদগুলোর হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করে চলবেন।

এনজিও বিষয়ক তথ্যকেন্দ্র

এনজিও ব্যবসাটির বাজারে এখন প্রতিযোগিতা খুব বেশি। দারিদ্র্য দূর, পরিবার পরিকল্পনা, সবার জন্যে স্বাস্থ্য, মাদকবিরোধিতা, উন্নয়ন, নারী, শিশু—সব বিষয়েই দেশে আছে অনেক এনজিও। লেটেস্ট যে ফ্যাশান চলছে পরিবেশ নিয়ে, ইতিমধ্যে প্রায় অর্ধশত এনজিও গড়ে উঠেছে ওই বিষয়ে। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক ইসলামিক এনজিও-র সংখ্যাও কম নয়। সুতরাং এ-লাইনে করে খাওয়াটা এখন খুবই কঠিন। আপনি এখন যা করতে পারেন তা হলো এনজিও বিষয়েই খুলে ফেলতে পারেন একটি এনজিও। অমন এনজিও-ও আছে একাধিক, সেক্ষেত্রে আপনি যা করবেন তাহলো, এনজিও প্রতিষ্ঠায় আগ্রহীদের কাছে বিক্রি করবেন তথ্য আর পরামর্শ। রেজিস্ট্রেশন কোথায় দেয়া হয়, ডোনারদের সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করতে হয়, এইসব তথ্য বিক্রি করাই হবে আপনার কাজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ

আপনার কষ্টার্জিত টাকা ভুলেও কখনো সংবাদপত্র খাতে বিনিয়োগ করবেন না। সংবাদপত্রে বিনিয়োগ করবেন তারাই, যাদের টাকার গুদামে দেয়া দরকার আগুন, যেমন যুক্তরাষ্ট্র তার অতিরিক্ত গম ফেলে দেয় সমুদ্রে।

শোকের মশকরা

সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুতে এই বাংলাদেশে কমবেশি সবাই শোকাহত। যদিও এককজনের শোকের ধরন-ধারণটা একেক রকম। কেউ ভেবেছেন—আহা রে, লোকটা মারা যাবে, তা তো বোঝাই যাচ্ছিলো আগে থেকে, সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিয়ে রাখলাম না কেন। সত্যজিতের শোক বেচেই তো কামিয়ে নেয়া যেতো কিছু পয়সা। এ ঘরানার শোকে যারা কাতর, তাদের মধ্যে আছেন পত্রিকাঅলারা। তবে তাদের পূর্বপ্রস্তুতির অভাব কিছুটা হলেও পূরণ করে দিয়েছে 'দেশ' ও 'প্রতিক্ষণ'। পর পর দুটো সত্যজিৎ সংখ্যা করেছে 'দেশ', প্রথমটার প্রচ্ছদ কালো, বেশি-বুঝনেঅলাদের মতে ওটিই ছিলো ওদের সত্যজিৎ-মৃত্যু সংখ্যা কিন্তু রায়বাবু মরতে বড় বেশি দেরি করে ফেলায় ওই সংখ্যাটি বাজারে ছেড়ে দিতে হয় আগেভাগে। দ্বিতীয় সত্যজিৎ সংখ্যা 'দেশ'-এর প্রচ্ছদ রঙিন, ওটি বেরিয়েছে তাঁর মহাপ্রায়াণ উপলক্ষে, আসলে ওটি বেরোনোর কথা ছিলো তার জন্মদিন উপলক্ষে। এসবই অতিরিক্ত বোঝেন যারা, তাঁদের কথা। আমরা কেবল দেখলাম, ওই 'দেশ' দুটো কী প্রচণ্ড উপকারই না করে দিয়েছে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকার। সত্যজিতের মৃত্যু উপলক্ষে এদশে যা-কিছু লেখা হয়েছে, তার প্রায় প্রতিটিতেই দু-এক ফোঁটা 'দেশীয়' পঙক্তি চুঁইয়ে ঢুকে পড়েছে বলে রসায়নবিদদের অভিমত। এছাড়া ইত্তেফাক থেকে শুরু করে 'কাগজ' পর্যন্ত সবারই আলোকচিত্র জুগিয়েছে ওই 'দেশ'। যাই হোক, শোকের মধ্যে এই জাতীয় শৌকাশুকি না করে বরং গোড়ার প্রসঙ্গে ফেরা যাক। একেককজনের শোক ছিলো একেক রকম। যেমন ইনকিলাবঅলারা শোকসন্তপ্ত হয়েছেন এই ভেবে—জনাব সত্যজিৎ চিরকাল পানিকে পানি বলেছেন, জল বলেননি। তার মৃত্যুতে মওলানা মান্নান দুফোঁটা চোখের পানি ফেলবেন না, তাও কি হয় ? এদিকে বিচিত্রার মাহমুদা চৌধুরী শোকাকুল হয়েছেন, কারণ তার বাবার মৃত্যু দিবস আর সত্যজিতের জন্মদিবস একই তারিখে। 'যায়যায় দিন' তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শিরোনাম করেছে : 'বিশ্বজিৎ সত্যজিৎ মৃত্যুজিৎ'। সম্ভবত জিৎ-এর অনুপ্রাসের লোভে হেডিংটা আরো বড় হতে পারতো, কিন্তু হাতের কাছে অন্য কোনো সমিল নাম না পেয়ে তারা থেমে গেছে। তাদের সুবিধার জন্যে আমরা আরো কিছু জিৎ-অন্ত্য শব্দ সরবরাহ করছি। ইন্দ্রজিৎ, রণজিৎ। আরো যদি লাগে, সেক্ষেত্রে-হারজিত। (স্মর্তব্য : ভানু মখোপাধ্যায়ের কৌতুক। এবার যদি ছেলে হয় নাম রাখুন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উপপতি, তারপরেও যদি ছেলে হয় তবে ভগ্নিপতি)। কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই সাবেক উপাচার্যের শোকের রকমটা ভাবুন। প্রফেসর আবদুল মান্নানের কথাই বলছি। ভদ্রলোক আজ থেকে বছর দুয়েক আগে এক চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রয়াত চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়ের বিদেহী-আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। এখন, তাঁর কি মনে হচ্ছে না 'সত্যজিৎ মরিয়া প্রমাণ করিলেন, তিনি মরেন নাই!'

ফয়েজ আহমদ-এর শোকটাও অন্যরকম হতে বাধ্য। তাঁর একটা বিখ্যাত বইয়ের নাম 'সত্যবাবু মারা গেছেন'। এখন, এই শোকসাগরের তীরে দাঁড়িয়ে কেউ যদি ভেবে বসে, এটি লেখা হয়েছে সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে, তাহলে ফয়েজ আহমদ-এর কী করবার থাকবে?

যাই হোক, সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর পরে নানা লোকের শোকের একটি সম্ভাব্য রূপরেখা আমরা তৈরি করতে পারি।

নূরনামা (বরবাদ মার্জার প্রণীত)

সত্যজিৎ রায়ের ইন্তেকালের পর মধ্যবিত্ত শহুরে বাঙালিরা যে মর্সিয়ার স্রোত বইয়ে দিচ্ছে, তা নিয়ে কিছু লিখা দরকার। এটা আসলে এক মশকরা। এই মশকরাটাকে খামোশ করে দেয়াটা জরুরি। সত্যজিৎ রায় যে বায়োস্কোপগুলো পয়দা করেছেন, তার সঙ্গে বাঙালি মুসলমান কৃষকের দর্শনের কোনো সংস্রব নেই। এই বুজরুগিটা ধরতে হলে 'বেদের মেয়ে জোসনা' ছবিটা দেখা ও বোঝা দরকার। খেয়াল করা দরকার, শব্দটা জ্যোৎস্না নয়, জোসনা। কৃষকেরা যেভবে উচ্চারণ করে, ঠিক সেই রকম।

মাতাল মিনিবাস (নারী-লেখক কর্তৃক প্রণীত)

চলচ্চিত্র সব সময়ই সাহিত্যের অধমর্ণ। একটি নিকৃষ্ট সাহিত্যকে নষ্ট করলে সৃষ্টি হয় একটি উৎকৃষ্ট চলচ্চিত্র। আমার কাছে তা-ই শিল্প যা পাঠযোগ্য। সত্যজিতের পথের পাঁচালীর চেয়ে বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী এক হাজার গুণে শ্রেষ্ঠ। সত্যজিতের মৃত্যুতে আমি শোকাভিভূত, তা কেবল সত্যজিৎ মরেছেন বলে নয়, তার মৃত্যুতে বাঙালি যে মাতম করছে, তার জন্যেও।

জামাত-ফ্রিডম

সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিন্দুস্থানের দালালেরা আবার ঘোলাপানিতে মাছ শিকারে নেমেছে। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিটিভিতে দেখানো হয়েছে পথের পাঁচালী যার একটি চরিত্রের নাম দুর্গা। ওই দুর্গা শব্দটি থেকেই বোঝা যায় পথের পাঁচালী দেখানোর আসল মতলব।

মাত্র কিছুদিন আগেই মারা গেছেন বাংলা চলচ্চিত্রের প্রবাদ পুরুষ এফ কবীর চৌধুরী। তাঁর নির্মিত 'সওদাগর' ছবিটি বাংলা সিনেমার মাইলস্টোন। অথচ এফ কবীর চৌধুরীর মৃত্যুতে বিন্দুমাত্র শোক প্রকাশ করেনি বাংলাদেশ টেলিভিশন। টিভিতে দেখানো হয়নি নরম-গরম। এর পেছনে অবশ্যই কাজ করেছে ভারতীয় আধিপত্যবাদী চক্রান্ত। দেশের বারো কোটি তৌহিদি জনতা এই চক্রান্ত বরদাশ্‌ত করবে না।

ফিলার

লেখাটি শেষ হয়ে গেলো, কিন্তু এক পৃষ্ঠা শেষ হলো না। কিছু জায়গা থেকেই গেলো। ফলে একটি পুরনো গল্প জুড়ে দিতে হচ্ছে। গল্পটি কেবল প্রাপ্তবয়স্কদের জন্যে।

এক ভদ্রলোক অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন। পথে দেখলেন, কয়েকজন যুবতী বিলাপ করে কাঁদছে, 'অপু মারা গেছে, অপু মারা গেছে'। ভদ্রলোক আরেকটু এগিয়ে গেলেন, আবারো একই দৃশ্য, ক্রন্দনরত যুবতীদের মাতম—'অপু মারা গেছে, অপু মারা গেছে।'

পাড়ার সব মেয়ে অপু মারা যাওয়ায় এতো কান্নাকাটি করছে কেন, তিনি বুঝলেন না। পরে শুনলেন, ট্রেনে কাটা পড়ে এক যুবক মারা গেছে। তিনি গেলেন রেলসড়কের ধারে। গিয়ে দেখলেন, এক সুদর্শন যুবকের ট্রেনে কাটা রক্তাক্ত মৃতদেহ। পাশে পড়ে আছে মরহুমের বিশেষ এক অঙ্গ। পুরুষটির অঙ্গটি প্রায় হাতখানেক লম্বা। ভদ্রলোক ঘরে ফিরলেন, তার প্রিয় স্ত্রীকে ডেকে বললেন,' শোনো, আজ দেখলাম ট্রেনে কাটা পড়ে মারা গেছে এক ছোকরা, ওর ওই অঙ্গটা হাতখানেক লম্বা।' সঙ্গে সঙ্গে তার স্ত্রী বিলাপ করতে শুরু করলো, 'অপু মারা গেছে, অপু মারা গেছে।'

১৪ মে ১৯৯২

একটি খালের আত্মকাহিনী

কে ? এতদিন পরে আমার শিয়রে পদস্পর্শ রাখিলে! কে তুমি পথিক ? কেন ত্রস্ত চলিয়া যাও ? যাইও না পথিক। নিকটে আইসো! দুই দণ্ড উপবেশন করো। এই অভাগিনীর দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করো।

হায়! চলিয়া গেলে! যাও, সকলেই যায়, তুমিও যাইবে, আশ্চর্য কী!

আমি তো নগণ্য একখানি খাল! কে আমার কাহিনী শুনিবে ? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে। শ্রবণ করো। আজ আমাকে যতোখনি নিঃসঙ্গ, অসহায় মনে হইতেছে, চিরটাকাল আমি সেইরূপ ছিলাম না।

আমার জন্মদিনটার কথা আমি জানি না, আমার মনেও পড়ে না। কেন কী কারণে কে আমার জন্ম দিয়াছিলো ? হয়তো আমার পাশে সড়ক নির্মিত হইয়াছিলো, সেই সড়কটির জন্যে মাটি সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে ধরণীপৃষ্ঠ খুঁড়িতে হইয়াছিলো, ফলে নিতান্তই পার্শ্বজাত হিসেবে আমার জন্ম। ধরিত্রীর প্রথাই এইরূপ যে, জাতক তাহার জন্মের জন্যে দায়ী নহে। নিতান্তই অন্যের আনন্দের প্রতিক্রিয়ায় তাহার জন্ম।

তাহার পর দিন যাইতে লাগিলো। আমিও সাবালিকা হইয়া উঠিলাম। কী যে করুণ, নিঃসঙ্গ, কষ্টকর, একঘেয়ে, ক্লান্তিকর একেকটি দিন! কিন্তু যৌবন এমন, ঘুঁটেকুড়েনির জীবনেও সে আনে খননের উৎসব। সেই যে বোদলেয়ার দেবাদিদেব কামকে প্রণাম করিয়াছিলেন সাধু-তস্কর, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সকলের শরীর-মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পুণ্যস্পর্শ বুলাইবার জন্যে—বুঝি, তাহা কতোখানি সঙ্গত। আমার জীবনেও আসিলো এক মহা ধুমধামের দিন। আকাশে-বাতাসে বাজিয়া উঠিলো শানাই।

জানি না কেন, কোন্ নিগূঢ় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে, শত শত গণ্যমান্য মানবের পদক্ষেপে ধন্য হইলো আমার দুইকূল আর বক্ষদেশ। মানবসমাজে বিবাহের পূর্বে যেরূপ গায়ে-হলুদের অনুষ্ঠানাদি হইয়া থাকে, আমার ক্ষেত্রেও সেইরূপ হইয়াছিলো। তিনদিন ধরিয়া আমাকে ঘিরিয়া চলিয়াছিলো নানা লোকাচার। প্রথম আমার চতুষ্পার্শ্বের জঙ্গল-লতা-গুল্ম সাফ-সুতরো করা হইয়াছিলো। তারপর আমার শরীরের ক্লেদগুলি অপসারণ করা হইয়াছিলো। সেখানে ছড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিলো পরিষ্কার বালুকারাশি। আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, এতো আয়োজন সব একজন মাত্র মহাপুরুষের জন্যে।

আর আসিলেন সেই মহামানব।

হেলিকপ্টারে ভটভট আওয়াজ হইলো। সেই শব্দ যেন হ্যমিলনের বংশীবাদন। শত শত মানুষ ছুটিয়া আসিলো আমার দুই পাড়ে। অতঃপর তিনি অবতীর্ণ হইলেন। পরনে জিনসের প্যান্ট, গায়ে শাদা টি-শার্ট, মস্তকে শাদা ক্যাপ, চোখে সানগ্লাস। তিনি যেই আমার কটিদেশে পা রাখিলেন, অমনই আমার সমগ্র শরীর জাগিয়া উঠলো। সোমত্থ নারীর মতো।

বুঝিলাম, এই সেই মহামানব, যাহার জন্যে আমি আমার তনুমন এতোদিন ধরিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছি। তিনি নামিবামাত্রই তাহার মস্তকের উপরে শুরু হইলো পুষ্পবৃষ্টি। তারপর তিনি একখানা মঞ্চে আরোহণ করিলেন। যন্ত্রসহযোগে উচ্চকণ্ঠে তিনি দান করিলেন ভাষণ। বারবার উচ্চারণ করিলেন, বলিতে আজো শরীর শিহরিয়া ওঠে, এই চিরউপেক্ষিত খালেরই নাম। বলিলেন, তোমরা সকলে মিলিয়া এই খালটি খনন করো। এই খাল একদিন তোমাদিগকে কদলী ফল দিবে, শস্য দিবে, মৎস্য দিবে।

তাহার সেই বচনসুধা শ্রবণে আমার সারা শরীর কাঁটা দিয়া উঠিলো।

অতঃপর আসিলো সেই মুহূর্ত। সেই ক্ষণটির বর্ণনা দিবো কী করিয়া ? আমার চক্ষুদ্বয় মুদ্রিত হইলো। দেহ কাঁপিতে লাগিলো। কণ্ঠ শুষ্ক হইলো।

আর তিনি তাহার কোদালখানি উত্তোলন করিলেন। ক্যামরা ক্লিক করিলো। টিভি ক্যামেরা সচল হইলো। নিরাপত্তারক্ষীরা অতিউৎসাহীদের ধাক্কা মারিলো। তিনি কোদালের কোপ আমার অঙ্গে বসাইলেন। হাততালি পড়িলো লোকে তাহাই শুনিলো। তিনি আমার উঁচু পাড়ে গিয়া বসিলেন। লোকে তাহাই দেখিলো। কিন্তু আমার ভিতরে কী ঘটিয়া গেলো তাহা কেহই বুঝিলো না। কেহই শুনিলো না।

তারপর সকলে চলিয়া গেলো। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা গেলো। রাজনীতির ছেলে-ছোকরারা কাটিয়া পড়িলো। গমের ভাগ-বাটোয়ারা লইয়া কোন্দল করিতে করিতে একজন চেয়ারম্যান, তিনজন মেম্বার আর চারজন গ্রাম-সরকার-প্রধান প্রস্থান করিলো।

তারপর দুই-তিন দিন অবশ্য দুই-একজন আসিয়াছিলো। মাটি-কাটা শ্রমিক, যাহারা আমাদের এই গ্রামেই থাকে, কিছুদিন আমার নিকটে আসিলো, মাটি কাটিলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অতঃপর তাহারাও আসা বন্ধ করিয়া দিলো। আর আমি পড়িয়া রহিলাম অর্ধখোদিত। আমাকে জাগাইয়া দিয়া উহারা আমার কথা বিস্মৃত হইলো! কথা ছিলো, আমার শরীর ভরিয়া উঠিবে কানায়-কানায়, তাহা কতো লোকের কতো উপকারে আসিবে, কিন্তু কিছুই ঘটিলো না।

অপেক্ষায় অপেক্ষায় সময় কাটে আমার। দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘতর রজনী। প্রতিটি দিন যায়। আশায় আশায় মনে মনে ভাবি, মানুষেরা আসিবে, আর আসিবেন তিনি। আকাশে মেঘেরা ওড়ে, তাহাকে মিনতি করিয়া বলি— ও মেঘদূত, তুমি যাও, মানুষের কাছে যাও, বলো, একটি অর্ধকাটা খাল তাহাদের জন্যে অপেক্ষা করিতেছে। দিন যায়, রাত্রি আসে। আমার বক্ষের কাছে শীতল আলো জ্বালে জোনাকিরা। আবার আমি ছাইয়া যাই জঙ্গলে। রাত্রি বাড়ে। বিষণ্নস্বরে ডাকে শেয়াল। আকাশে এক টুকরা চাঁদ, বিষণ্ন করুণ অশ্রুর মতো জোছনাপাত করে। একটি ব্যর্থ, একাকী, নিঃসঙ্গ, দগ্ধ যৌবন লইয়া একাকী চাঁদের মতো জাগিয়া থাকি আমি। একটি খালেরও যে বেদনা থাকিতে পারে— রাজনীতিনিষ্ঠ মানুষেরা সব বোঝে, শুধু এই কথাটি বোঝে না।

খবরের কাগজ, ১৯ ডিসেম্বর '৯১

যাহা বলিব সত্য বলিব

এক. নমনীয় জিভ

সত্য : বিনে পয়সায় কোনো কথা প্রচার করতে চান ? একজন নারীর কানে তা তুলে দিন ফিস ফিস করে এবং বলুন, 'কাউকে বলবেন না, প্লিজ।'

অর্ধসত্য : নারী কর্তৃক প্রচারিত কথার পুরোটাই আমি বিশ্বাস করি।

মিথ্যা : কতিপয় রমণী বসে আছে, বসবার ঘরে, চুপচাপ।

দুই. ভালোবাসা কিংবা মুরগী প্রতিপালন

সত্য : তোমাকে আমার ভালো লাগে।

অর্ধসত্য : কেবল তোমাকেই আমি ভালোবাসি।

মিথ্যা : তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচব না।

তিন. গণ্ডগোল হৃদার-ওপনেটি বায়োস্কোপ

সত্য : গোলাম আযমের ফাঁসির দাবিতে ঢাকায় অর্ধদিবস হরতাল পালিত হয়েছে।

অর্ধসত্য : হরতাল হয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত; জনগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পালন করেছে এ হরতাল।

মিথ্যা : বাংলাদেশ টেলিভিশনের সংবাদে বলা হয়েছে, ঢাকায় হরতাল পালিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চার. বাজেট নিয়ে বাজে কথা

সত্য : জাতীয় অর্থ বাজেট '৯২-'৯৩ হবে বিদেশ-নির্ভর, উদ্বৃত্ত, মধ্যবিত্তের স্বার্থসচেতন এবং বিশ্বব্যাংকের নসিহত মাফিক।

অর্ধসত্য : অর্থমন্ত্রীর পক্ষে বিরাজমান বাস্তবতায় এর চেয়ে ভালো বাজেট করা সম্ভব ছিলো না।

মিথ্যা : ঘোষিত বাজেটের কেবল নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়নি বিরোধীদল, বরং তারা ঘোষণা করেছে একটি বিকল্প বাজেট, দেখিয়ে দিয়েছে বর্তমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতেই কতো ভালো বাজেট করবার ক্ষমতাই না তারা রাখে।

পাঁচ. আপায় কইছে

সত্য : শেখ হাসিনা ঘরোয়া পরিবেশে আবেগপ্রবণ, মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন, অত্যন্ত সদালাপী, হাসিখুশি একজন বাঙালি রমণী।

অর্ধসত্য : ব্যক্তিগত জীবনে শেখ হাসিনা কখনো পরচর্চা করেন না।

মিথ্যা : শেখ হাসিনা তার বক্তৃতায় বলেছেন, কষ্টার্জিত সংসদীয় গণতন্ত্র রক্ষায় আমাদের উচিত বেগম জিয়াকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করা এবং তাকে পাঁচ বছর কাল নির্বিঘ্নে ক্ষমতায় থাকতে দেয়া।

ছয়. যন্তর মন্তর-ষড়যন্তর

সত্য : বেগম জিয়া তার বিরুদ্ধে সব সময়ই ষড়যন্ত্র দেখতে পান।

অর্ধসত্য : বিরোধী দল ও গণআদালতীদের বিক্ষোভ আন্দোলনে সরকার বেকায়দায়।

মিথ্যা : রাজপথ কাউকেই ইজারা দেয়া হয়নি।

সাত. জামাতী মাতামাতি

সত্য ; বিএনপি-এমপি ফরিদা হোসেনের উক্তি যথার্থ, 'জামাতের রাজনীতি হচ্ছে মহিলাদের বিরুদ্ধে লাগা।'

অর্ধসত্য : জামাত বেগম জিয়াকে মহিলা মনে করে।

মিথ্যা : জাহানারা ইমামের আহ্বান অনুযায়ী বিএনপির মুক্তিযোদ্ধারা ওই দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসবেন।

আট. তারেক আরেকবার

সত্য : স্বাধীন দেশের প্রতিটি নাগরিকের অধিকার আছে ব্যবসা করবার।

অর্ধসত্য : তারেক রহমানের বাণিজ্য চলছে বেশ ভালোভাবেই।

মিথ্যা : বাবার ছেঁড়া গেঞ্জি বুকে জড়িয়ে তারেক রহমান ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছেন নিয়মিত।

নয়. প্রতিবেশী বেশি বেশি

সত্য : ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতের বড়ভাইসুলভ আচরণ বিরূপ প্রতিক্রিয়া ফেলে থাকে।

অর্ধসত্য : বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক সরকার থাকলে ভারত-বাংলাদেশের উন্নতি ঘটবে সহজেই।

মিথ্যা : ভারত-বাংলাদেশের মধ্যকার সব সমস্যা মিটে গেলে সবচেয়ে খুশি হবে বিএনপি।

দশ. ইতিহাসের চাকা ও পাংচার সমস্যা

সত্য : বিশ্বের শোষিত শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তির জন্যে মার্কসবাদের কোনো বিকল্প নেই।

অর্ধসত্য : বিশ্বজোড়া সমাজতন্ত্রের পতন মার্কসবাদকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে।

মিথ্যা : বাংলাদেশের কমিউনিস্টরা এদেশে সমাজতন্ত্র কায়েম করে দেখিয়ে ছাড়বেন ইতিহাসের চাকা পেছনের দিকে ঘোরে না।

এগারো. পর্ণোগ্রাফ প্রসঙ্গ

সত্য : সব আবেদনের মধ্যে যৌনাবেদনই সেরা।

অর্ধসত্য : যুবকেরা রাত্রি জেগে সাঈদীর ওয়াজ শোনে, এ হচ্ছে এক ধরনের শ্রুতিকাম।

মিথ্যা : 'বিশ্বব্যাপী মার্কসবাদের পতনের মূল কারণ, ওর সব আবেদন ছিলো কেবল যৌনাবেদন ছাড়া।'

গোলামের ১৪ ডিসেম্বর

ডিসেম্বরের ১৪ তারিখ। এই দিনটি একটি বিশেষ দিন। আর ক'দিন পরেই দিনটি আসছে। ১৩ তারিখ রাত থেকেই অস্থির হয়ে পড়বেন গোলাম। এশার নামাজ পড়তে গিয়েই শুরু হবে তাঁর অস্থিরতা। নানা ভাবনা ভিড় জমাবে তাঁর মাথায়। চিন্তা করবার জন্যে মানুষের দরকার হয় একাকিত্ব। গোলাম সারাদিন কখনো একা থাকতে পারেন না। পার্টির লোকজন এসে ভিড় জমায়। মধ্যপ্রাচ্যর লোকজনও আসে। কিন্তু দুটি কাজে তিনি হয়ে পড়েন একা। এক. বাথরুমে, দুই. নামাজ পড়তে বসে। বাথরুমে কুলুপের ব্যাপারটি তার বড়ই পছন্দ। এই জিনিসটা খুব কাজের। পায়চারি করতে করতে সেরে নেয়া যায় নানা জরুরি চিন্তাভাবনা। নামাজও কাজে আসে খুব। দুনিয়ার যত চিন্তা, সবই তখন মস্তিষ্কে।

১৩ তারিখ রাতে সবার আগে তার মাথায় যে চিন্তাটি আসবে তা হলো— 'ইয়া আল্লাহ, আর একটা সপ্তাহ সময় তুমি কেন আমাকে দিলে না, আমি তো আমার পরিকল্পনা গুটিয়ে এনেছিলাম প্রায়।'

আসলেই তিনি তার পরিকল্পনা অনেকটা সারতে পেরেছিলেন। তিনি জানান, একটা জাতির পুরোটাই চিন্তা করতে পারে না—কেউ কেউ পারে। বাকিরা থাকে হুজুগে। হুজুগওয়ালাদের নিয়ে কোনো চিন্তা নেই। যত চিন্তা মাথাওয়ালাদের নিয়ে। কাজেই সবার আগে দরকার মাথাওয়ালাদের শেষ করে দেয়া। বাঙালি, হারামজাদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তার মনে পড়বে সব। আজ থেকে ২০ বছর আগের কথা, তবুও। কী জেহাদি জোশই না ছিলো তখন। এখন বুড়ো হয়ে পড়েছেন। সেই জোয়ানি নেই, নেই সেই তাকদ। একাত্তরে সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখে তিনি গিয়েছিলেন মোহাম্মদপুরে, আলবদরদের হেডকোয়ার্টারে। ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার আলবদরদের এই হেডকোয়ার্টারটা খোলা হয়েছিল। তার নির্দেশেই হয়েছিলো। পরিদর্শন করে তিনি বেশ শান্তি পেয়েছিলেন। সবকিছু এগুচ্ছে তারই কথামতো। ঐ বদমাশ বুদ্ধিজীবীদের ধরে ধরে প্রথমে এসি সেক্টরটিতে আনা হয়েছিলো। তারপর হত্যা... সবকিছুই থাকে মাথায়। সব কাজ হয় সেই মোতাবেকই। তিনি অনুভব করবেন চরম পুলক। তার সেই ঐতিহাসিক ভূমিকা লোকে ভুলতে পারবে না, এ-কথা ভেবে আশ্বস্ত হবেন তিনি। সংবাদপত্রে তার কীর্তি মুদ্রিত হয়ে আছে, ইতিহাস নিশ্চয়ই একদিন মূল্যায়ন করবে সে-সবের।

৭ এপ্রিল ৮১ সালের সাপ্তাহিক বিচিত্রাটি তিনি তোরঙ্গ খুলে বের করবেন। এতে সে কীর্তিগাথা আংশিকভাবে তুলে ধরা আছে। "অধ্যাপক গোলাম বুদ্ধিজীবী হত্যারও অন্যতম নায়ক। একাত্তরের সেপ্টেম্বরের প্রথমদিকে রাও ফরমান আলীর সাথে এক বৈঠকে অধ্যাপক গোলাম বুদ্ধিজীবী নিধনের একটি নীলনকশা পেশ করেন। সে নীলনকশা অনুযায়ী পরবর্তীকালে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে হত্যা করা হয়। নীলনকশা প্রণয়নে আবদুল মালেক, ব্যারিস্টার কোরবান আলী, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, আব্বাস আলী খান প্রমুখ জামাত-নেতারা জড়িত ছিলেন। স্বাধীনতার পর বুদ্ধিজীবী হত্যা সংক্রান্ত যে দলিল পাওয়া যায় তাতে স্পষ্ট নির্দেশ ছিলো পূর্ব পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখা হয়তো সম্ভব হবে না। তবে একটা কাজ করতে হবে যাতে পাকিস্তান হারলেও তারা দেশ চালাতে না পারে। অধ্যাপক গোলাম এ নীলনকশা বাস্তবায়নের জন্যে তার দলীয় ক্যাডার অর্থাৎ আলবদর ও আলশামসকে নির্দেশ দেন। এলাকাও ভাগ করে দেয়া হয়।"

বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক। হো হো করে হেসে উঠবেন তিনি। জোর দেবেন 'নায়ক' শব্দটির ওপরে। তিনি তো নায়কই। হা হা হা। ছোটবেলায় তার বড়ো শখ ছিলো বড় হয়ে নায়ক হবার। একবার একটা বায়োস্কোপ দেখে তিনরাত ঘুমুতে পারেননি। তখনই ঠিক করেছিলেন বড় হয়ে সিনেমায় যাবেন। পরে আর যাওয়া হয়নি। সিনেমায় যেতে না-পারার একটি সূক্ষ্ম দুঃখবোধ আজো তার অন্তরে রয়ে গেছে। খুব গোপনে। তবে তিনি সুখী। খুবই সুখী। জীবনের বেশিরভাগ মনোবাঞ্ছাই তার পূরণ হয়েছে।

ঘড়ির কাঁটা বারোটা অতিক্রম করবে। শুরু হবে ১৪ ডিসেম্বর। শুরু হবে তার পায়চারি। অস্থিরতা। আর অস্ফুটভাবে পরপর উচ্চারণ করবেন তিনি: 'ইয়া আল্লাহ, আর কটা দিন সময় যদি পাওয়া যেতো!'

তবে তিনি হতাশ নন। রাজনীতিতে কতো ওলটপালট হয়। আবার হবে। এবার আরেকটু যত্ন করে সমাধা করতে হবে কাজটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তালিকাটি পূর্ণাঙ্গ করতে হবে। আহমদ শরীফ, সুফিয়া কামাল, জাহানারা ইমাম, শামসুর রাহমান, ফয়েজ আহমদ, হুমায়ূন আজাদ... আঙুল গুণতে থাকবেন তিনি। না, খালিহাতে গোনা যাবে না। বসতে হবে। মজলিশেই বিষয়টি ফয়সালা করতে হবে। এবার ধরতে হবে ছাইমাখা হাতে। খালি হাতে ধরলে হবে না।

রাত গভীর হবে। দূরে একটা কুকুর ডেকে উঠবে। ঐ প্রাণীটিকে তিনি সহ্য করতে পারেন না। কুকুর থাকলে ফেরেশতা আসে না। দেশটা কুকুরে ভরা। ফেরেশতারা আসবেন কীভাবে ?

আহারে, দেশ ছিলো একটা।

পাকিস্তান। সোনার পাকিস্তান। মাঠভর্তি সোনালি গম। পাকা, পাকা। কী হাসিন আওরাত। তাদের কী দেমাগ। কী জোয়ানি। বেহেশতের হুররাও অমন নয়।

শেষরাতের শীতে তিনি ঘুমিয়ে পড়বেন। ঘুমের ভেতরে খোয়াব দেখবেন তিনি। খোয়াবের সাধারণত মাথামুণ্ডু থাকে না। তারও থাকবে না। প্রথমে দেখবেন জান্নাতুল ফেরদাউস। এক বিশাল বিছানায় শুয়ে আছেন। তাকে আবৃত করে রেখেছে সত্তরটি হুর। তারা তাকে ঢেলে দিচ্ছে শরাব। তিনি বলছেন—শরাব দরকার নেই, সাকি, তোমার মুখসুধা... এই স্বপ্ন থেকে অন্য একটি স্বপ্নে হঠাৎ চলে যাবেন তিনি। এক ডিনার পার্টি। খেতে বসেছেন তিনি। শাদা প্লেট। সামনে রাখা খাবারদাবার। তিনি একটি মুরগির রান তুলে নেবেন পাতে। চিবিয়ে খেতে থাকবেন। কী খাচ্ছেন তিনি ? অন্যরকম স্বাদ। তাড়াতাড়ি ভালো করে তাকাবেন। দেখবেন, টেবিলে স্যুপের বদলে দেয়া হয়েছে মানুষের তাজা রক্ত। মুরগির বদলে মানবশিশুদের কাটা হাত-পা। একটা বিশাল পাত্রে অনেকগুলো কাটা মাথা। আর সেসব তিনি গিলতে শুরু করবেন গোগ্রাসে। তার স্বপ্ন ভেঙে যাবে।

বাইরে আজান। আসসালাতো খাইরুম...। ওঠা দরকার। নামাজ মানে চিন্তার সুবিধা। ভোরের পবিত্র বাতাসে তার হঠাৎ মনে হবে, কী করছেন এসব তিনি। জীবনে বহু পুস্তক পাঠ করে তিনি সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে। তাই পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত ধর্মীয় বিধানেই তিনি আস্থা রেখেছেন। মৃত্যুর পরে তার বিচার হবে। সেদিন তো সত্যের মুখোমুখি দাঁড়াতেই হবে। সেদিন তো তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কেন তুমি ধর্মকে ব্যবহার করেছো তোমার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে। এদেশের লোকেরা ধর্মপ্রাণ, শুধু এই সুযোগটি গ্রহণ করে ক্ষমতা দখলের লক্ষ্যেই তুমি ব্যবহার করেছো ধর্মপ্রাণ মানুষদের। পার্টির কাজকেই সমার্থক করে তুলেছো ধর্মীয় আচার পালনের। তুমি তো জানতে, এ কতো বড় গুনাহ। এইসব প্রশ্নের উত্তরে কী বলবেন তিনি ?

তিনি অসহায় বোধ করবেন। তার মনে হবে, এ দুনিয়ায় তার মতো গুনাহ্গার আর নেই। তিনি মন্ত্রমুগ্ধের মতো যাবেন তার স্ত্রীর কাছে। ঘুমন্ত। এই নারীটিকেই তিনি কখনোই গুরুত্ব দেননি। তার আদর্শই তাকে গুরুত্ব দিতে দেয়নি। কিন্তু আজ তিনি এই নারীটির আশ্রয়কেই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় মনে করবেন। তিনি তাকে ঘুম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

থেকে ডাকবেন এবং বলবেন—বিবি সাহেবান, ওঠো। একটা সওয়ালের জবাব দাও। আচ্ছা বল তো, আমার জীবনটা কি ব্যর্থ হয়ে গেছে ?

ঘুম জড়ানো চোখে উঠবেন তার স্ত্রী। বলবেন, কী কন। কোনো ব্যর্থ মানুষের কাছে কি দুইজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী দুইজনই আসে ?

খবরের কাগজ ১২ ডিসেম্বর '৯১

বাঙালির সিএনএন-দর্শন

বাসার ছোট ছেলেটি কাজের ছেলেটিকে ডাকছে—হারামজাদে। হারামজাদা নয়, হারামজাদে। এ-হচ্ছে ভিসিপিতে হিন্দি ফিল্ম দেখার সুফল। কথায়-কথায় ছেলেমেয়েরা বলে উঠছে—অমুক ? ও-তো আমার জান। 'জান' শব্দটা আমাদের সময়ে কেবল কবচ করবার জন্যেই লাগতো। এখন লাগে যখন-তখন। তু মেরা জান হ্যায়, তু মেরা জীবন হ্যায়। ভিসিপি-যুগের আগে টিভি-যুগ। সে-যুগের শুরুর বর্ণনাটা পাবেন 'ছাগল'-এ। সঞ্জীবের ছাগলে। 'ঘরেতে ভ্রমর এলে কী করে ? গুনগুনিয়ে ওঠে। ঘরেতে টিভি এলে কী হয় ? প্রথমে বাড়ির ছাদের ওপরে চিরুনির মতো এন্টেনা। তার সঙ্গে একটা ঘুড়ি কিংবা পায়রা...।' খুবই সরেস বর্ণনা। বাড়ির ঠিকানা দেবার সময়ে আপনি বলছেন—মোড় ঘুরতেই দেখবেন ছাদের উপরে এন্টেনা, ও পাড়ায় এন্টেনা মাত্র একটা বাড়িতেই...। কতদিন আগে পড়েছি, আজো মনে অছে। প্রায় হুবহু।

টিভি-যুগের শুরু দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে। সবার আগে ঢাকায়। তারপর দেশের যে এলাকায় টিভি উপকেন্দ্র হয়েছে, সে-অঞ্চলে। যে-বাসায় এন্টেনা খাড়া হলো, সে বাসার প্রেস্টিজই আলাদা। পাড়ার সবাই দল বেঁধে যাচ্ছে সে বাসায়। জানালা খোলা। সে জানালার শিক ধরে দাঁড়িয়ে যাদের প্রবেশাধিকার নেই তারা। ভেতরেও শ্রেণী-বিভাজন, মেঝেতে বাচ্চাকাচ্চারা। তারপর মোড়ায় বালক-বালিকা। সোফায় আম্মা-খালাম্মারা। উল বুনছেন আর টিভি দেখছেন। চোখে চশমা। সাধারণত পরা হয় না। টিভি দেখতে লাগে। এক-আধজন মুরুব্বি গোছের খালু বা চাচা-বা মামা বা বাবা। তার হাতে খবরের কাগজ (তখন ভোরের কাগজ ছিলো না)। আল মনসুর ধরছেন মিতা চৌধুরীর হাত। রোমান্টিক ডায়ালগ। মোড়া-ক্লাসের কিশোর-কিশোরীর বুকে চিকন বেদনা। সোফাক্লাসে মেয়েমহলে দীর্ঘশ্বাস। চাচা সাহেব তখন মুখ ঢেকে ফেলেছেন খবরের কাগজে। উড়ন্ত গাঙচিলের মতো সেই কাগজের পক্ষবিস্তার। পৃথিবীব্যাপী কতো কী ঘটছে। সেসব নিয়ে তিনি ব্যস্ত। টিভির পর্দায় কী ঘটছে না ঘটছে, কি বা এসে যায়।

এদিকে বাংলাদেশ টেলিভিশন সীমান্ত পেরিয়ে ইলিশের মতো দাদারা গিলতে লাগলেন দেদারসে। বৌদি-ভাইপোরাও বিটিভি বলতে পাগল। সকাল-সন্ধ্যা, এইসব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দিনরাত্রি আমাদের মতো ওদেরও রাজপথ ফাঁকা করে দেয়। লোকসভা-রাজ্যসভায় কথা উঠলো। সীমান্ত এলাকায় দূরদর্শন খুললো সম্প্রচার-কেন্দ্র। তাতেই বাংলাদেশে শুরু হলো দূরদর্শন-যুগ। ইনডোর এন্টেনায় কুলোচ্ছে না আর। বেড়ে গেলো বাঙালির জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বাঁশের ব্যবহার। প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেলো কে কতো উঁচুতে বাঁধতে পারে এন্টেনা। বাজিছে দামামা, বাঁধরে আমামা, শির উঁচু করি মুসলমান। কিংবা চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির। শির উঁচু করে দাঁড়ালো এন্টেনা। সে-এন্টেনা যে-সে নয়। তার সঙ্গে জুড়ে দেয়া হলো ঘটিবাটি। কিন্তু তাতেও ছবি ঠিকভাবে আসে না। পর্দা জুড়ে ঝিরিঝিরি। এই আসে, এই চলে যায়। পিছলায়। শুরু হলো বাঁশ ঘোরানোর প্রতিযোগিতা। এন্টেনা থাকবে পূর্ব-পশ্চিমমুখি। লেজটা পুবে, মাথাটা পশ্চিমে বাঁদিকে কাত হবে একটু। কতোটা কাত। স্বামী বেচারা ছাদে। বৌটা ঘরে। স্বামী আকাশের দিকে তাকিয়ে বাঁশটা একটু ঘোরালেন। মুখে চিৎকার—এসেছে, এসেছে ? না, আসেনি। মধুভাষিণীর মধু। আরেকটু ঘোরানো হলো। ছবি এসেছে, কিন্তু সাউন্ড গেছে। এই কুস্তি চললো কিছুদিন। বাঙালি হুজুগে জাতি। বেশ কিছুদিন মেতে রইলো এই এক হুজুগে। বিশেষ করে দূরদর্শনের ক্রিকেটের লোভে। তারপর সেই উদ্যমেও পড়লো ভাটা।

কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘ পথ ? উদ্যম বিহনে কার....? এবার এলো ডিশ এন্টেনা। ঢাকার কোনো কোনো বাড়ির ছাদে দেখা যেতে লাগলো ওল্টানো ছাতার মতো ওই রহস্যময় ডিশটিকে। অ্যাপার্টমেন্ট আর বিদেশী দূতাবাসের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রগুলি লাভ করলো ওই ওল্টানো ছত্রের ছায়া। বাকিরা চাইলো আড়চোখে। মহাকৌতূহলী দু-একজন দেখতে গেলো কী দেখায় ডিশ এন্টেনা।

অতঃপর সিএনএন। উদ্বোধন করলেন প্রিয়ংবদা প্রধানমন্ত্রী। বিপুল উদ্যমে বাঙালি দেখলো তার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। দোস্ত, কি দেখায় সিএনএন ? কিছুই জিভে লাগে না। ফ্রেন্ড, সকাল নয়টা থেকে সাড়ে নয়টা পর্যন্ত একটু ফলো করো। শোবিজটা দেখো। দেখাবে। ঘুম থেকে সাততাড়াতাড়ি উঠে অধীর আগ্রহে বসে রইলো বন্ধুটি। ন'টা এলো। সাড়ে ন'টা গেলো। শোবিজ টুডে হলো। শোবিজটা লাল রঙে, টুডেটা কালোয়। তেমন কিছুই দেখা গেলো না। সন্ধ্যায় আবার দেখা দু বন্ধুর। কী দোস্ত, কিছুই তো দেখালো না। কী বলবো ফ্রেন্ড, আজকেরটাই সবচেয়ে পানসে।

এই হচ্ছে বাঙালির সিএনএন-দর্শন। একদিন সবাই খুশি। বাংলাদেশের খবর দিয়েছে। কী খবর ? নৌপথে ডাকাতির। বাংলাদেশের কোনো কাগজই যাকে খবর মনে করেনি, তাই আমেরিকা ঘুরে 'নিউজ' হয়ে এলো।

প্রথম প্রথম কী দেখায় তা বুঝতেই কেটে গেলো সময়। আস্তে আস্তে রপ্ত হয়ে গেলো অনুষ্ঠানসূচি। ওয়ার্ল্ড নিউজ। ওয়ার্ল্ড নিউজ : টপস্টোরিজ, পাঁচ মিনিট পর পর হেড লাইন নিউজ। বিজনেস টুডে। ওটা তেমন ভালো লাগে না। তবে দুনিয়া চলছে ওই করে করে। মানি লাইন। মানিই তো সব। স্পোর্টস। খালি বেসবল দেখায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বোঝা যায় না, লাইন ছাড়া দৌড়ায়। স্টাইল। ই....মা, কী সুইট! স্মার্টনেস দেখার মতো। কী সুন্দর হাঁটছে, গ্রীবা উঁচিয়ে। ল্যারি কিং লাইভ। নট বাড। বিলকসবি, উডি এ্যালেন, বুশ, ক্লিনটনের সাক্ষাৎকার। ওয়েদার। ফ্লোরিডায় বৃষ্টিপাত। ফরিদপুরের কি ?

এদিকে অফিসে-কলেজে-ইউনিভার্সিটিতে আড্ডার বিষয় বদলে যাচ্ছে। আমার প্রিয় নিউজ-কাস্টার সুসান রুক। আমার ফেভারিট বেটিনা লুশার। বেলা শ' কিংবা ক্যারন-এর ভক্ত দাঁড়িয়ে যায় কেউ কেউ। বাঙালি ডেইলি লাইফ-এ প্রভাব ফেলে সিএনএন। আজ তাড়াতাড়ি ঘুমুতে যাবো। কাল সকালে উঠতে হবে। বুশ-ক্লিনটন বিতর্ক দেখবো। হ্যালো, আপা, ডিবেট দেখেছেন, পেরোটা কী মজার!

এই একটু একটু করেই সিএনএন ঢুকে যাচ্ছে বাঙালির হাড়ে। ঢাকায় গড়ে উঠেছে ক্লিনটন সাপোর্টারস ক্লাব। প্রেসক্লাবের সামনে ওপি-ওয়ানধারীরা ধর্মঘট করছে। তাদের ব্যানারে লেখা—বিলাভেড বুশ, উই ওয়ান্ট টু গো টু আমেরিকা। যারা আমেরিকা যেতে চায়, কিন্তু পাচ্ছে না ভিসা, তারা তেমনটা বলতেই পারে। বরং বলা উচিত ছিলো—ডিয়ার বুশ, উই ওয়ান্ট টু কাস্ট ভোটস ফর ইউ। কিন্তু ভোরের কাগজে প্রতিদিন যে বিশেষ খবর যাচ্ছে ওই হাতির নির্বাচনের, তার পেছনেও কি নেই সিএনএন-এরই প্রভাব ? সিএনএন আমেরিকাকে ঢুকিয়ে দিয়েছে মধ্যবিত্ত বাঙালির ঘরের ভেতরে। তবে এই চিত্র খুব সাধারণ নয়। মোটের উপর বাঙালি হতাশ। আবার ভিড় বাড়ছে ভিডিও লাইব্রেরিতে। মাধুরীর নতুন ক্যাসেট এসেছে ?

সিএনএনে আসলেই পোষাচ্ছে না। এতো ফাস্ট। কিছু দেখানোর আগেই অন্য দৃশ্য। চলে যাবার পরে বোঝা যায়, কী দেখালো। ওটা মেয়েমানুষ ছিলো। আর আছে ম্যাডোনা। মাঝে-মধ্যে। সুতোটি ছাড়া। তার নতুন বই 'সেক্স'-এর খবর। কিংবা অ্যালবাম 'ইরোটিকা'। ভাইবোন পাশাপাশি বসে দেখছে। নির্বিকার। কেউ কারো দিকে তাকায় না। সহ্যশক্তি বাড়ছে।

বাড়ছে বাড়ুক। সহিষ্ণুতাটাই আসল। পরমতসহিষ্ণুতা। একটু একটু করে বাড়ুক। আর এই অচলায়তনটা ভেঙে পড়ুক। রক্ষণশীলতার বদ্ধঘর। মৌলবাদের গুমোট গুহা। 'এখন এ সমাজকে সঠিকভাবে আক্রমণ করা সম্ভব কেবল শরীর দিয়ে।' সিএনএন অতোটা শরীরী নয়। তবু বুশ-ক্লিনটন-পেরো কীরকম করে ডিবেট করছেন! কেমন ক্যাজুয়ালি! আমাদের নেত্রীরা করুন না অমন। কোমরে আঁচল পেঁচিয়ে। আস্তে আস্তে হবে। এ সমাজটাও এগুবে। এক গো-ভক্ত চাষি সদ্যোজাত বাছুরকে কোলে নিয়ে আদর করতেন। প্রতিদিন ওটি তার কোলে কোলে থাকতো। দিন যায়, বছর যায়। তিনি প্রতিদিনই কোলে নেন ওই বাছুরটাকে। বছর চারেক পরে একই ঘটনা। একটা আস্ত গরুকে তিনি তুলছেন কোলে। টেরই পাচ্ছেন না ওজন। আস্তে আস্তে সয়ে যায় সবই। এই অসহিষ্ণু সমাজেরও যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাংলাদেশের কাছ থেকে বহু কিছু শেখার আছে মার্কিনিদের

সমাজতন্ত্র মানে কী ? গভর্নমেন্ট বাই দ্যা পিপল অব দ্য পিপল...। গেটিসবার্গ...। আব্রাহাম লিংকনের ভূমিকা। জি না। হাজার হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি গণতন্ত্রের পথে। বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে। আম্রপালীর দেশে। মগধের রাজা বিম্বিসারের সময়ে ভারতবর্ষে পার্লামেন্ট ছিলো। ছিলো গণপ্রতিনিধিরা। পার্লামেন্টারি সিস্টেম অব ডেমোক্রেসি। আব্রাহাম লিংকন সেদিনের ছেলে। তিনি কিসের গণতন্ত্র শেখাবেন ?

গণতন্ত্র শিখতে হলে আসতে হবে বাংলাদেশে। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি। দাম দিয়ে কিনেছি বাংলা। জাহাজে করে চুপচাপ গিয়ে টুপ করে নেমে পড়লাম আর দেশটি হয়ে পড়লো আমার। এত সোজা না। বর্গী খেদিয়েছি, মগ-পাঠান-ইংরেজ তাড়িয়েছি, পাকিস্তানীদের খাইয়েছি নাকানি-চুবানি, দেখিয়ে দিয়েছি জনতার শক্তি কতো বড়ো। গণতন্ত্র বুঝতে হলে জানতে হলে তাই আসতে হবে এই দেশে, আমার সোনার বাংলায়।

কথা সত্যি, মার্কিনিরা সম্প্রতি ইলেকশন করলো। ওটা কোনো ইলেকশন হলো ? বাংলাদেশের কাছে কতো কিছুই তো শেখার ছিলো তাদের। শিখলো না, জাতীয় জীবনের সর্বত্র প্রয়োগ করলো না।

প্রথমেই বলা যাক বুশের কথা। পৃথিবীর সফলতম মানুষ। পুরো সোভিয়েত সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো করে ছেড়েছেন। অমন নেতা হাজার বছরে একটা আসে। আর তিনিই কিনা জিততে পারলেন না। আমেরিকার গম দিয়ে বাংলাদেশে ভোটারদের মন কাড়া চলে, আর আমেরিকায় গেলো না ? আসলে গোড়াতেই ভুল ছিলো। প্রথম ভুল প্রচারমাধ্যমগুলোকে স্বাধীনতা দেয়া। খাঁটি গণতন্ত্রের প্রথম শর্তই হলো অবাধে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে দেয়া। আগে থেকেই জরিপ করে 'অমুক জিতবে', 'অমুক জিতবে' করলে ভোটাররা স্বাধীনভাবে ভোট দেবে কীভাবে ? সুতরাং মুক্ত ও অবাধ নির্বাচনের স্বার্থে প্রথমেই উচিত ছিলো প্রচারমাধ্যমের লাগামহীন স্বাধীনতার নাকে রশি পরিয়ে দেয়া। খবরে শুধু দেখানো হবে প্রেসিডেন্ট আর ফার্স্টলেডিকে। জনগণ দেখতে চায়। জনগণের কথা মেনে চলার নামই তো গণতন্ত্র। আর দেখানো হবে রানিংমেট ভাইস প্রেসিডেন্ট আর সেক্রেটারিদের। তারা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে নতুন নতুন স্কুল-কলেজ-ব্রিজ-কালভার্টের উদ্বোধন করবেন। মোনাজাতের আগে বক্তৃতা। সে বক্তৃতায় চলবে কর্তার গুণগান। সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচি অবশ্যই অবহিত করতে হবে জনগণকে।

জনতা জানতে চায়। পৃথিবীর সব গণতান্ত্রিক দেশেই তা-ই করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কথা। সে দেশ গণতন্ত্রের তীর্থভূমি—নদী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দিয়ে সেখানে কুলুকুলু রবে বয়ে চলে গণতন্ত্র। ভোটের দাবিতে সেখানে মানুষ হাসতে হাসতে বুকের রক্ত রাস্তায় ঢেলে দিতে পারে। তাই বলে বিরোধীদলের কথা থাকবে না, তা নয়। রেডিও-টিভি খবরে ক্লিনটনের কথাও বলা হবে। খবরের শেষে ছবি থাকলে কথা থাকবে না। কথা থাকলে ছবি নড়বে না। ছবি নড়লেও বক্তৃতার অংশবিশেষ কেটে ফেলা হবে। কিছু প্রশ্ন উঠলেও বলা হবে, ফ্রিডম অব প্রেসের কথা। তার পুরো এখতিয়ার টিভির নিউজ এডিটরের। নেতৃবৃন্দের এ বিষয়ে কিছুই বলবার নেই। বুশ-ক্লিনটনের আসলে অনেককিছু শেখার ছিলো বাংলাদেশ থেকে। বুশ সাহেব ভোট চাইতে পারতেন ঈশ্বরের নামে। মিসেস হিলারি ক্লিনটন তো আগে থেকেই আল্ট্রা র‍্যাডিক্যালে দিলেই হতো—ওরা কমিউনিস্ট, ঈশ্বর মানে না। ওদের ভোট দিলে দেশ থেকে গির্জা উঠে যাবে। এতে কাজ হতো। সারা দুনিয়ায় ভোট পড়ছে ঈশ্বরের নাম, আমেরিকাতেও পড়তো। এ ছাড়াও অন্য ফন্দি-ফিকির করা যেত। বাংলাদেশের হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের কাছ থেকে বুদ্ধি-পরামর্শ নিয়ে আগে থেকেই একটা ফলাফল তৈরি করে রাখা যেতো। ভোট গোনাগুনির আর দরকার ছিলো না। ভোটের রাতে সেই ফলাফল টিভিতে দেখালেই হতো। ম্যাডোনার ছায়াছবি। ফাঁকে ফাঁকে নির্বাচনী বুলেটিন। আর মাঝে মধ্যে বাইবেল থেকে পাঠ।

এগুলো করতে দরকার বাঙালি ব্রেইন। তা নাহয় ওদের নেই। কিন্তু, নির্বাচনে হেরে যাবার পর সতর্ক হওয়া তো তেমন কঠিন কিছু ছিলো না। বুদ্ধিমানেরা দেখে শেখে, বোকারা শেখে ঠেকে। ঠেকে যাবার পরও যদি রিপাবলিকানরা একটু শিখতো। প্রথমেই বলতে হতো নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে। ফলাফল পূর্বনির্ধারিত। ডেমোক্র্যাটরা তাদের পোষ্য মিডিয়াতে আগে থেকেই প্রচার করছে। বোঝাই যাচ্ছিলো, এক অদৃশ্য শক্তি পূর্বপ্রস্তুত ব্লুপ্রিন্ট অনুসারে অতি সূক্ষ্মভাবে নির্বাচনের ফলাফল নিজের পক্ষে পরিবর্তন করেছে। এতে জনমত প্রতিফলিত হয়নি। জনগণ এই ফলাফলে হতাশ, বিমূঢ়। জনগণ ফলাফল মেনে নিতে পারে না। কিন্তু বুশ কেবল বয়সেই বেড়েছেন, বুদ্ধিতে নয়। উল্টো তিনি বললেন, আমরা সবাই এখন জড়ো হবো ক্লিনটনের পেছনে। বলবে কী লোকে ? বলবে—আপোষকামী, কায়েমী স্বার্থবাদী। ক্ষমতার পেছনে পেছনে গেছে। অপোজিশন মিনস অলওয়েজ অপোজিশন। সব সময়েই বিরোধিতা করো। প্রতি মুহূর্তে ধাক্কা দাও। ধাক্কা দিয়ে দিয়ে গণতন্ত্র শেখাও। এক মুহূর্ত শান্তিতে থাকতে দিলেই গণতন্ত্রের বিপদ। ওদিকে ক্লিনটনও একটা কমবখত। নির্বাচনে জিতেছে এটাই তো সুযোগ। তার বলা উচিত, ঈশ্বর রক্ষা পেয়েছে। গির্জা রক্ষা পেয়েছে। আমেরিকার স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষা পেয়েছে। বিদেশী প্রভুর মার্কিন দালালদের জনগণ প্রত্যাখ্যান করেছে। তবে চারদিকে শুরু হয়েছে গণতন্ত্র আর সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন থাকতে হবে।

আসলে মার্কিনিদের কাছে কাণ্ডজ্ঞান আশা করা বোকামি। এতবড় নির্বাচন হয়ে গেলো, অথচ পোস্টারে কোনো মৃত নেতার ছবি নেই। গুলি খেয়ে কি ওদের একজন নেতাও মারা যায়নি !

এ সবই ইতিহাস আর ভৌগোলিক জ্ঞানের অভাব। পৃথিবীর ইতিহাসে গণতন্ত্রের সবচেয়ে পুরোনো ঐতিহ্য এই ভারতীয় উপমহাদেশের তথা বাংলাদেশের। ২০ বছরের ইতিহাসে এখানে পার্লামেন্ট এসেছে পাঁচটা, প্রেসিডেন্ট গোটাদশেক, সংবিধানে সংশোধনীই ডজনখানেক। এসব ইতিহাস তো মার্কিনিদের জানা নেই। জানবেই বা কোত্থেকে ? ওদের তো আর 'বাংলাদেশী সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক, নিপাত যাক' বলে স্লোগান দিতে হয় না। তবে এই গল্পটা সবার জানা, ওদেরও জানা উচিত ছিলো। একটা প্লেনে চড়ে যাচ্ছিলেন প্রেসিডেন্ট কার্টার, প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ, আর প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। তখন বাংলাদেশে সবে গণভোট হয়ে গিয়েছে। হঠাৎ প্লেনে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা গেলো। বৈমানিক জানালেন, তিনজন আরোহীর দুজনকেই ফেলে দিতে হবে চলন্ত বিমান থেকে—এতোটা ওজন টানতে পারছে না ইঞ্জিন। কাকে কাকে ফেলে দেয়া হবে আর কে কে থাকবে তা কীভাবে ঠিক করা যায়। কার্টার বললেন, ভোট হোক। যিনি জিতবেন তিনিই থাকবেন। ডেমোক্রেসি তো তাই বলে। ব্রেজনভ বললেন—না, আমি থাকবো, এটাই দরকার বিশ্বশ্রমিক সংহতির জন্য। জিয়াউর রহমান কিছুই বললেন না, একটা 'হ্যাঁ' বাক্স নিয়ে এসে বললেন, উপস্থিত তিনজন ভোটারই ইতিমধ্যে ভোট দিয়ে ফেলেছেন। তিনজনই চেয়েছেন 'আমি' থাকি বিমানে। গণভোটে প্রমাণিত তাই।

ভোরের কাগজ, ১২ নভেম্বর ৯২

মিলনপর্ব : রাজনীতি ও নারীস্বাধীনতা

আর দেখা হয়ে গেলো দুজনার। প্রথম জন পুরুষ—একজন রাজনীতিবিদ। দ্বিতীয় জন নারী—একজন নারীবাদী। তাদের দুজনের মধ্যে দেখা হয়ে গেলো। আর ঠিক তখনি ঘড়ির কাঁটার মতো ডেকে উঠলো একটা তক্ষক: টিক,টিক, টিক।

আমি আপনাকে দেখেই চিনতে পেরেছি। রাজনীতিবিদ বললেন—নারীবাদী নারীর দিকে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে। সেই দৃষ্টিতে এমন কিছু ছিলো, নিতান্ত নারীবাদী না হলে যে কোনো নারীর শরীরের রোমকূপে সংবাদ পৌঁছে যেতো। এভাবে কেউ তাকায় ? ভাবলেন নারীবাদী। কিন্তু মুখে হাসি এনে বললেন, কী করে চিনলেন ?

বলবো ? আচ্ছা, বলি। নারীবাদী চিনবার উপায় আমি মুখস্থ করে রেখেছি। পত্রিকায় লিখেছে—যে নারী পুরুষের মতো পোশাক পরে, মোটরসাইকেলের পেছনে বসে দুই ঠ্যাং দুদিকে দিয়ে আর কোল্ডড্রিংস খাবার সময় স্ট্র কিংবা গ্লাস ব্যবহার না করে সরাসরি বোতল থেকে খায়, তাকেই নারীবাদী বলে চিনতে। ঐ সূত্রটি কাজে লাগালাম আপনার ক্ষেত্রে। ফলাফল হান্ড্রেড পার্সেন্ট।

কিন্তু আপনাকে আমি এখনো চিনতে পারিনি—নারীবাদী বললেন রাজনীতিবিদকে। অবশ্য আমি এখানে আসবার আগে শিখে এসেছি রাজনীতিবিদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চেনার উপায়। যে ব্যক্তি তার জিভ দিয়ে নাক ছুঁতে পারে, সেই একজন রাজনীতিবিদ। এছাড়াও রাজনীতিবিদদের চাপা এতো শক্ত হয় যে, এরা চিবিয়ে আস্ত সুপারি গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিতে পারে। কিন্তু সূত্র শিখে এলে হবে কী, প্রয়োগ তো করতে পারছি না। কী করে জানবো আপনি জিভ দিয়ে নাক ছুঁতে পারেন কিনা। আপনাকে তো আর বলতে পারি না, প্লিজ জিভটা বের করে নাক ছুঁয়ে দেখান না। রাজনীতিবিদ হাসতে লাগলেন। প্রাণখোলা হাসি। ভালো বলেছেন। আমি আপনাকে যতোটা দিতে পেরেছি,আপনি ফিরিয়ে দিয়েছেন তার চেয়ে বেশি। টিট ফর ট্যাট। হা-হা-হা।

কী যে বলেন ? নারীবাদী লাল হয়ে উঠলেন লজ্জায়। যদিও তিনি বুঝতে পারলেন একজন নারীবাদী হিসাবে ব্লাশ করাটা মোটেও উচিত হচ্ছে না তার। কিন্তু শরীর সব সময় মনের আনুগত্য স্বীকার করে চলে না। 'আপনার সঙ্গে কি আমি পেরে উঠবো কথায়, হাজার হলেও আপনি একজন রাজনীতিবিদ', বললেন তিনি।

রাজনীতিবিদ হো হো করে হেসে উঠলেন আবার। আসলেই ভদ্রলোকের মনটা পরিষ্কার। না হলে কি কেউ এভাবে হাসতে পারে ?

আপনাকে একটা গল্প বলি। মুখ খুললেন রাজনীতিবিদ। আপনার ঐ জিভ দিয়ে নাক স্পর্শ করবার কথা শুনে মনে পড়লো। একটা হোটেল। সন্ধ্যাবেলায় সেখানে এসে ভিড় করে নারী-পুরুষেরা। তারা পান করে, আর বাছাই করে সঙ্গী অথবা সঙ্গিনীকে। তারপর একে অন্যের কোমর জড়িয়ে ধরে বের হয়ে যায়। এক ভদ্রলোক লক্ষ্য করলেন, একটা টেকো মাথার লোক প্রতিদিন আসে হোটেলে। আর শহরের শ্রেষ্ঠ সুন্দরীরা কেমন ছোকছোক করে সেই টেকোমাথা লোকটির জন্যে। সুন্দরীরা যেন তার সঙ্গের লোভে লালায়িত। লোকটা প্রতি সন্ধ্যায় আসে, আর নতুন নতুন বান্ধবী কব্জা করে নিয়ে যায়। ব্যাপার কী ? কী আছে ঐ টেকোমাথা লোকটির মধ্যে ? ভাবতে লাগলেন ভদ্রলোক। টেকো কি বড়লোক খুব ? খোঁজ নিয়ে জানলেন, মোটেই তা নয়। সে কী দেখতে সুন্দর ? কক্ষনো না। মাথায় চুল নেই, চোখ দুটো ছোট, তার ওপর খানিক ট্যারার লক্ষণও আছে।

তাহলে ? তাহলে শহরের সুন্দরীরা কেন পাগল তার নামে ? উপায়ান্তর না দেখে ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন এক সুন্দরীকে। আচ্ছা আপনারা সবাই, মানে সুন্দরীরা একবাক্যে ঐ টেকোর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হতে রাজি, ব্যাপারটি কী একটু খুলে বলুন তো ?

ব্যাপার আছে, জবাব দিলেন সুন্দরী, কিন্তু খুলে বলা যবে না। ঐ টেকোর মুখের দিকে একবার ভালো করে তাকান। কিছু দেখতে পাচ্ছেন কি ? অসাধারণ কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না ? লক্ষ্য করুন, সে তার জিভ দিয়ে নাক চাটছে। বুঝতে পেরেছেন ব্যাপারটা ?

এ পর্যন্ত বলেই হাসতে লাগলেন রাজনীতিবিদ। নারীবাদী বুঝে উঠতে পারছিলেন না, তার কী করা উচিত। রীতিমতো অশ্লীল গল্প। তিনি কি গম্ভীর হয়ে যাবেন ? একজন নারীবাদীর কি একটি পুরুষালি কৌতুক শুনে হাসা উচিত নয় ? কি মনে

করবেন বেচারা রাজনীতিবিদ, যদি তিনি না হাসেন ? অগত্য তিনিও হাসলেন, বড়ো পরিমিত হাসি। বললেন, শেক্সপিয়রের সেই পঙ্‌ক্তিটি আপনার জানা আছে ? তার জিহ্বা দিয়ে সে যদি কোনো নারীকে জয় করতে না পারে, তবে সে কোনো পুরুষই নয়'। জিহ্বা বলতে তিনি বুঝিয়েছেন কথাকে, শারীরিক অর্থে তিনি ব্যবহার করেননি তা। আসলে সবাই তো আর শেক্সপীয়ার বুঝবে না, কী বলেন ?

রাজনীতিবিদটি তেমন শিক্ষিত নন, কিন্তু যথেষ্ট বুদ্ধিমান। তাকে যে খোঁটা দেয়া হলো, তা তিনি বুঝলেন। শেক্সপিয়র সম্পর্কে ক্লাসে শেখা একটি উক্তি তার মনে পড়ে গেলো, কাজে লাগাতে ভুললেন না তিনি, বললেন: শেক্সপিয়র এজন্যেই মহৎ যে, তিনি সর্বদাই তার কথার দুটি অর্থ করতেন। একজন একটি অর্থ ভেবেই উচ্ছ্বসিত, আরেকজন খুশি বিপরীত অর্থটি ভেবে। কিন্তু তিনিই চুপ করে থাকবেন যিনি বুঝতে পারবেন দুটো অর্থই।

পরিবেশটা হঠাৎ হয়ে পড়লো গম্ভীর। শীতল পারদের মতো একধরনের নীরবতা নেমে এলো তাদের দুজনের মধ্যে।

নারীবাদী বুঝতে পারলেন ভেঙে দেয়া দরকার এই নীরবতা। তিনি বললেন, আচ্ছা, রাজনীতি বলতে আপনি কী বোঝেন, বলুন তো।

রাজনীতিবিদ আবার হেসে উঠলেন। আর হাসলে তাকে আসলেই সুন্দর দেখায়, ভাবলেন নারীবাদী।

রাজনীতিবিদ কণ্ঠ যথেষ্ট গম্ভীর করে বলতে শুরু করলেন—হ্যাঁ, অনেকেই মনে করে রাজনীতি মানে রাজার নীতি, জনগণের সম্পর্ক কোথায় তার সঙ্গে ? কিন্তু রাজপথ মানে যেমন রাজার পথ নয়, পথের রাজা; তেমনি রাজনীতি মানে রাজার নীতি নয়, নীতির রাজা।

এইসব রাজা-বাদশা জাতীয় সামন্ততান্ত্রিক শব্দ আপনারা এখনো ব্যবহার করেন ? খুবই অবজ্ঞাসূচক কণ্ঠে বললেন নারীবাদী।

: না, না, সামন্ততান্ত্রিক কোনো অর্থে আমরা 'রাজা শব্দটি ব্যবহার করছি না। নীতির রাজা মানে, নীতিশ্রেষ্ঠ। 'সেরা' অর্থে এখানে রাজা ব্যবহার করা হয়েছে।

—দাঁড়ান, একটু ধীরে। নীতির রাজা বুঝলাম, কিন্তু নীতির রানি নয় কেন ?

: মানে, সেরা অর্থে সবসময়ই রাজাই ব্যবহার করা হয় কিনা।

—সব সময় নয়। অন্তত একটি উদাহরণ আমি দিতে পারবো, যেখানে সেরা অর্থে 'রানী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 'সকল দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি'। শোনেন, আমি একজন নারীবাদী। নারীবাদ এই শিক্ষাই দিচ্ছে, পুরুষতন্ত্র শেকড় ছড়িয়েছে বহু গভীর পর্যন্ত। খেয়াল করুন, সামান্য একটা শব্দ রাজনীতি—সেখানেও পুরুষবাদী মনোভাব ?

: পুরুষতন্ত্রকে গালি দেন, কোনো আপত্তি নেই। আমিও দিয়ে থাকি। জানেন তো এখন 'নারীবাদী' হওয়াটা পুরুষদের জন্যেই আধুনিকতার প্রতীক। কিন্তু তাই বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'রাজনীতি'কে সামান্য শব্দ আপনি বলতে পারেন না। শোনেন, রাজনীতিই সব। 'দালান উঠছে তাও রাজনীতি, দালান ভাঙছে তাও রাজনীতি'—আমার কথা নয়, কবির কথা। আপনারা যে 'নারীবাদ' 'নারীবাদ' বলে এতোটা চিৎকার করছেন, কিন্তু সমাজে তার কোনোই প্রভাব পড়ছে না। তার কারণ কী জানেন ? কারণ হচ্ছে, রাজনীতি সম্পর্কে আপনাদের অজ্ঞতা। রাজনীতিই সব। এই যে নারী-স্বাধীনতা, এটি অবশ্যই একটি রাজনৈতিক ইস্যু।

রাজনীতিই যে সবকিছুর গোড়ায় তা আমি বুঝি। একটা গল্প বলি, তাহলে আপনিও বুঝবেন। একজন ডাক্তার, একজন ইঞ্জিনিয়ার, আর একজন রাজনীতিবিদদের মধ্যে তর্ক হচ্ছে, কে শ্রেষ্ঠ এই নিয়ে। ডাক্তার বললেন, আমি শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর যেদিন মানুষ তৈরি করেন, সেদিনই ডাক্তারিশাস্ত্র দরকার হয়ে পড়লো। সুতরাং মেডিক্যাল সাইন্স হচ্ছে আদিতম বিজ্ঞান, আর চিকিৎসক হচ্ছে আদিতম পেশাজীবী।

ইঞ্জিনিয়ার বললেন, তা ঠিক। কিন্তু তার আগে সমগ্র বিশ্বজুড়ে ছিলো লণ্ডভণ্ড অবস্থা, চাঁদ-সুরুজের ঠিকঠিকানা নেই। তখনই ঈশ্বর অনুভব করলেন ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা। তিনি তখন ইঞ্জিনিয়ারিং মেধা প্রয়োগ করে বিশ্বকে চমৎকার করে সাজালেন। তারপরেই না সৃষ্টি করলেন মানুষ। সুতরাং ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে আদিতম বিদ্যা।

এবার মুখ খুললেন রাজনীতিবিদ। বললেন—আপনি বলছেন, শুরুতে বিশ্বজুড়ে ছিলো লণ্ডভণ্ড অবস্থা, কেবল বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য। তা-ই সাজিয়ে ঠিক করলো প্রকৌশল বিদ্যা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এই বিশৃঙ্খলা আর লণ্ডভণ্ড অবস্থাটি সৃষ্টি করলো কে ? ঐখানেই ছিলো এক রাজনীতিবিদ। রাজনীতিকেরা অবশ্যই আদিতম পেশাজীবী। তারা আছেন সর্বত্রই, তাদের কাজ হচ্ছে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা।

এই পর্যন্ত বলে থামলেন নারীবাদী। তার মুখ জুড়ে হাসি। অবশ্যই সেই হাসি বিজয়ীর।

: না, আপনার সঙ্গে পেরে উঠবো না কথায়। আসলে নারীবাদী হলেও আপনি তো নারীই। মুখরতাই আপনার স্বভাব। সেই যে গল্প আছে—রাজা বললেন, আমাকে এমন একটা কথা শোনাও যা সম্পূর্ণ মিথ্যে, পুরো অবাস্তব। এ একটা গল্প বলে, সে আরেকটা, কোনোটাই পছন্দ হয় না রাজার। বলেন, না এমন তো ঘটতেও পারে। শেষে একজন বললো, 'কয়েকজন তরুণী বসে আছে, বসবার ঘরে চুপচাপ।' রাজা বললেন, 'হ্যাঁ, হয়েছে, এই বাক্যটিই কেবল পুরোপুরি মিথ্যা, একেবারেই অসম্ভব।' তো সেই তরুণীদের একজনের সঙ্গে আমি কি করে পেরে উঠবো কথায় ?

অবজেকশন। খেপে গেলেন নারীবাদী। আপনি বারবার নারীদের হেয় করে কথা বলছেন, একজন নারীবাদী হিসেবে আমার কর্তব্য এর প্রতিবাদ করা। আমি এর তীব্র প্রতিবাদ করি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুই.

নারীবাদী ও রাজনীতিকের এই সাক্ষাৎকারের পরে কিছুদিন কেটে গেলো। এরা পরস্পরের সঙ্গে মাঝেমধ্যেই দেখা করতেন। মত বিনিময় করতেন। কথা বলতেন। কথা কাটাকটি করতেন। ঝগড়া করতেন। একদিন নাকি একদফা মারামারি হয়ে গিয়েছিলো।

নারীবাদীকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করতো রাজনীতিবিদদের সম্পর্কে, তিনি বলতেন, না, বড়ো বেশি গ্রাম্য, ফিউডাল। আস্ত গাওয়ার। রাজনীতিবিদকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করতো নারীবাদী সম্পর্কে, বলতেন—আস্ত একটা ডিনামাইট, মহাবিপজ্জনক। গোখরোর বাচ্চা।

কিন্তু আমরা চাইছিলাম এ দুয়ের মিলন। রাজনীতিবিদ ভদ্রলোকের পয়লা বৌ মরে গেছে। আর নারীবাদী ভদ্রমহিলার সপ্তম স্বামীর সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না। পৃথিবী জুড়ে মানব-প্রগতির জন্যে সবচেয়ে বড়ো দুঃসংবাদ হলো, রাজনীতি আর নারী-স্বাধীনতা হাত ধরাধরি করে চলছে না। অথচ এ দুটিকে আলাদা করে দেখলে মানব-প্রগতি অসম্ভব। সে অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। রাজনীতিবিদের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে হবে নারীবাদীকে এবং একদিন অবাক হয়ে দেখলাম আমরা যে, নারীবদী গোখরোর বাচ্চা ডিনামাইট গিয়ে উঠেছেন গ্রাম্য ফিউডাল রাজনীতিবিদের ঘরে। একদিন এক চিনে রেস্তোরাঁয় এ উপলক্ষে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানও হয়ে গেলো। লিভিং টুগেদার-ফুগেদার কিছু নয়, একেবারে কাজি ডেকে রেজিস্ট্রী করে ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী বিয়ে। সবেচেয়ে অবাক কাণ্ড, নারীবাদী রমণীটি খুবই স্বামীপরায়ণা হয়ে উঠলেন। রীতিমতো স্বামীর পা থেকে জুতো খুলে দেন, তার পা টিপে দেন, ইদানীং বাইরেও আর খুব একটা বেরোন না।

কী ব্যাপার ? এতোখানি পরিবর্তন ঘটতে পারে মানুষের ? নাকি মেয়েরা হচ্ছে তরল পদার্থ— যখন যে পাত্রে রাখা যায়, সেই পাত্রের আকার ধারণ করে— তাই সত্যি ?

অবশেষে একদিন মওকামতো পেয়ে খুবই আন্তরিকতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলো নারীবাদীকে—ব্যাপার কী ? আপনি কি আপনার নারীস্বাধীনতার ব্রত ত্যাগ করেছেন ?

তৃতীয় কেউ জানবে না, এই শর্তে উত্তর পাওয়া গেলো তার কাছ থেকে। তিনি বললেন—শোনেন ভাই, নারীস্বাধীনতার জন্যেই তো পরেছি এই পরাধীনতার শেকল। নইলে বেটা ঐ রাজনীতিবিদের সঙ্গে একই বিছানায় শোওয়া অসম্ভব।

—কেমন ?

: শোনেন, আমার যা মনে হচ্ছে, অচিরেই আমার হাজব্যান্ড মি. রাজনীতিবিদ পার্টিপ্রধান আর সেই সূত্রে রাষ্ট্রপ্রধান হতে যাচ্ছে। আর যদি রাষ্ট্রপ্রধান হয়েই যায়, তাহলে তো নির্ঘাত অপঘাতে ওর মৃত্যু। তখন আমিই আসছি পার্টি আর রাষ্ট্রের ক্ষমতার শীর্ষে। অঙ্ক অতি সোজা। ম্যানিলায় যা ঘটেছে, ঢাকায় যা ঘটেছে, তা তো ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির প্রমাণ। আর একবার ক্ষমতা পেলেই হয়, দেখিয়ে দেবো নারীবাদ কাকে বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কাল্পনিক সাক্ষাৎকারে ম্যারাডোনা

অবসর লইয়া তন্ত্র-মন্ত্র সাধনা করিবো

অবশেষে ম্যারাডোনার সাক্ষাৎ মিলিল। অবশ্য মিলিত না, ইতালির বিখ্যাত সাংবাদিক পাওলো ভিয়ানিনির কল্যাণে সম্ভব হইল, তিনি ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ভিয়ানিনি জানাইলেন, ম্যারাডোনার মন খুবই খারাপ। তিনি এখন কাহাকেও সাক্ষাৎকার দেন না। তবে, যেহেতু আমি বাংলাদেশ হইতে আসিয়াছি, তাই তিনি অনেক কষ্টে রাজি হইয়াছেন। তাহাকে জানানো হইয়াছে, বাংলাদেশ খুবই ধনী দেশ, পেট্রো-ডলারের স্রোত বহিয়া যায় বাংলাদেশে। এই সাক্ষাৎকার পর্বটি হইবে আধঘণ্টার। ম্যারাডোনার সেক্রেটারির সঙ্গে আমার খানিকক্ষণ দরাদরি হইয়াছে। যাক সেসব কথা। ম্যারাডোনাকে ধন্যবাদ যে, অবশেষে সাক্ষাৎকার দিতে তিনি রাজি হইয়াছেন।

কথা হইতেছে ইতালির এক বিখ্যাত হোটেলে (সাংবাদিক রীতি অনুযায়ী হোটেলের নাম গোপন রাখা হইল)। ম্যারাডোনা তখন বাথরুম হইতে সবে গোসল করিয়া ফিরিলেন এবং তার স্ত্রী চুল শুকাইতেছিলেন। ম্যারাডোনার দিকে তাকাতেই চমকিয়া উঠিলাম। একী হইয়াছে তাহার! গালভর্তি দাড়ি। চক্ষু কোটরাগত। কণ্ঠার হাড় বাহির হইয়া গিয়াছে। মনে হইল যেন নির্বাসিত এক সম্রাট। ধীরে ধীরে কাঁপিতে লাগিল। মনে মনে বলিলাম— শান্ত হও, সাহস সঞ্চার করো, তাকাইয়া দেখো। যাহার পায়ের জাদুতে অসম্ভবও বাস্তবতা লাভ করে, যাহার নামে কোটি কোটি মানুষ মূর্ছা যায়, এই সেই ম্যারোডানা। যাহা হউক, ফুটবলের নির্বাসিত সম্রাট দিয়েগো ম্যারাডোনার বাণীবদ্ধ সাক্ষাৎকারটি নিম্নে অক্ষরে অক্ষরে ছাপা হইল।

প্রশ্ন : আপনার দল আর্জেন্টিনা এবার ফাইনালে উঠিতে পারিয়াছে, এই সাফল্যে আপনার প্রতিক্রিয়া কি ?

ম্যারাডোনা : সবই ঈশ্বরের হাতে, ঈশ্বর, ঈশ্বর।

তবে আমাদিগকে ছোট করিয়া দেখিবেন না। আমরা ব্রাজিলকে হারাইয়া আসিয়াছি। ইতালি, যুগোশ্লাভিয়াকে মোকাবিলা করিয়া যোগ্যতর দল হিসাবেই আমরা ফাইনালে উঠিয়াছি।

প্রশ্ন : ফাইনালের ফলাফল সম্পর্কে কিছু বলিবেন কি ?

ম্যারাডোনা : রেফারিং-এর মান কী ছিলো, সকলেই জানেন। ইহারা ১৪ জন আমাদের ৯ জনের হাত-পা বাঁধিয়া আমাদিগকে হারাইয়াছে।

প্রশ্ন : তাহা হইলে ঈশ্বর কী করিলেন, তিনি বাধা দিলেন না কেন ? ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতা নড়ে না, আর গোল হওয়া তো দূরের কথা।

ম্যারাডোনা : রেফারিং-এর মান খারাপ হইলে তাহার উপর ঈশ্বরও খবরদারি করেন না।

প্রশ্ন : কিন্তু ঈশ্বরের হাত তো আপনার ছিলোই।

ম্যারাডোনা : আপনি কী বোকার মতো প্রশ্ন করিতেছেন! আপনি কি খেলা দেখেন নাই ? উহারা প্রথমেই ফাউল করিয়া আমার হাতটি অকেজো করিয়া দেয়। আমি তখন দাঁতে দাঁত চাপিয়া আর্তনাদ করিতেছিলাম। হায়, হায়, সব গেলো, ঈশ্বরের হাত ভাঙিয়া গেল।

প্রশ্ন : আপনি বলিতেছেন, ঈশ্বরের হাত ভাঙিয়া যাওয়ায় আর্জেন্টিনা ফাইনালে গোল করিতে পারে নাই।

ম্যারাডোনা : না, মানে, সে রকমই আর কী!

প্রশ্ন : বাংলাদেশের একটি দৈনিকে আপনাকে নিপুণ হস্তশিল্পী বলা হইয়াছে, আপনার অভিমত কী ?

ম্যারাডোনা : আমি তো শিল্পী। লোকে তো সেই রকমই বলে। তবে কণ্ঠশিল্পী নই তাহা বুঝি।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আমরা এতোদিন জানিতাম, ঈশ্বর নিরাকার; কিন্তু আপনি বলিতেছেন ঈশ্বরের হাত আছে, ইহাতে কি ঈশ্বর নারাজ হন না ?

ম্যারাডোনা : না, না, আমি তো আমার হাতকেই ঈশ্বরের হাত বলিয়াছি।

প্রশ্ন : কিন্তু নিজের হাতকে ঈশ্বরের হাত বলিয়া প্রচার কি শিরক নয় ?

ম্যারাডোনা : আমার মনে হয় না যে, ঈশ্বর ইহাতে মাইন্ড করিয়াছেন। না হইলে আমরা ফার্স্ট রাউন্ডে থার্ড হইয়াও ফাইনাল পর্যন্ত আসিতে পারিলাম কীভাবে ?

প্রশ্ন : আচ্ছা, এবার অন্য একটি প্রসঙ্গ। আপনার দলের শিবিরে ইতালীর তত্ত্বাবধায়ক প্রতিদিন আসিয়া টেবিল-চেয়ার ও প্লেট গুনিয়া যাইতো, আপনারা কতটি ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন তার হিসাব লইবার জন্যে— এতে কি আপনারা অপমানিত বোধ করেন নাই ?

ম্যারাডোনা : হ্যাঁ করিয়াছি। আমি তো আগেই বলিয়া দিয়াছি, উহারা কি আমাদিগকে ইন্ডিয়ান মনে করিয়াছে যেন আমরা চেয়ার প্লেট-এর ব্যবহার জানি না।

প্রশ্ন : এবার অন্য প্রসঙ্গ। ইতালির মেয়েদের চোখে প্রিয় খেলোয়াড় ব্যাজিও। আর অপ্রিয় খেলোয়াড় ম্যারাডোনা। মন্তব্য করিবেন কি ?

ম্যারাডোনা : মেয়েরা ফুটবলের কী বোঝে ? ফুটবল মেয়েদের খেলা নয়। মেয়েরা তো সুঁইয়ের মধ্যে সুতা ঢুকানো ছাড়া আর কোথাও কিছুই ঢুকাইতে পারিবে না।

প্রশ্ন : ব্রাজিল সম্পর্কে মন্তব্য করিবেন কি ?

ম্যারাডোনা : ব্রাজিলের উচিত গোল করা অনুশীলন করা। ফুটবল গোলের খেলা, গ্যালারিকে আপ্যায়িত করা ফুটবলারের কাজ নয়।

প্রশ্ন : আপনি ফিফার নিকট হইতে অতিরিক্ত অর্থ দাবি করিয়াছিলেন, কিছু পাইলেন কি ?

ম্যারাডোনা : পাই নাই, ইহা ঘোরতর অন্যায়। নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া খেলিতে হয়, অথচ টাকা যায় বেশির ভাগই ফিফার ঘরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রশ্ন : ফুটবল হইতে অবসর লইয়া কী করিবেন ?

ম্যারাডোনা : তাবিজ-মাদুলির ব্যবসা করিব। ঝাড়ফুঁক তন্ত্র-মন্ত্র সাধনা করিব। সকলই ঈশ্বরের ইচ্ছা।

প্রশ্ন : আপনাদের প্রশিক্ষক বিলার্ডো অবসর লইয়া কী করিবেন, আপনার কোনো পরামর্শ আছে কি ?

ম্যারাডোনা : আমার মনে হয়, তিনি মিউজিক ডিরেক্টর হইলে ভালো করিবন।

প্রশ্ন : আপনি কি এবছরও ইতালির লিগে খেলিবেন ?

ম্যারাডোনা : মনে হয় না। উহারা আমাকে লইবে না। লইলেও খেলা উচিত হইবে কি ?

প্রশ্ন : আপনি বাংলাদেশে চলিয়া আসুন, ওখানকার আবাহনী একটি খ্যাতিমান দল।

ম্যারাডোনা : হ্যাঁ এ প্রস্তাব পাইয়াছি, রাজিও হইয়াছিলাম। কিন্তু পরে শুনিলাম ওখানকার মোহামেডানে এমেকা, চিমা প্রমুখ খেলিয়া থাকে। আফ্রিকানদের বিরুদ্ধে আমি নাই।

প্রশ্ন : আপনার জীবনে কোনো শখ অপূর্ণ রহিয়াছে কি ?

ম্যারাডোনা : হ্যাঁ, অস্কার পুরস্কার এখনো পাই নাই। আমার মতে ইটালীয়া '৯০-এর জন্যে শ্রেষ্ঠ অভিনেতার পুরস্কার আমার পাওয়া উচিত।

প্রশ্ন : আপনার বৈবাহিক জীবন সম্পর্কে একটি প্রশ্ন। আপনার সস্ত্রীক নগ্নস্নানের ছবি ছাপা হইয়াছে।

ম্যারাডোনা : সময় শেষ হইয়া গিয়াছে। এরপর কথা বলিলে আরো এক মিলিয়ন ডলার দিতে হইবে।

প্রশ্ন : আচ্ছা, আর কিছু বলিবো না। আপনার শেষ কথা কিছু বলিবেন কি ?

ম্যারাডোনা : আমরা হারি নাই, রেফারি আমাদিগকে হারাইয়া দিয়াছে।

প্রশ্ন : রেফারি আপনাকে জিতাইয়াও দিয়াছিলো। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে সেই খেলায় না জিতিলে আপনারা চারজনের মধ্যে চতুর্থ রাউন্ডেই বিদায় লইতেন।

এ-কথা শোনার পর ম্যারাডোনা তাহার হাঁটু ধরিয়া মেঝেতে বসিয়া পড়িলেন। আহ্-উহ্। ছটফট করিতে লাগিলেন। দুইজন লোক কোথা হইতে আসিয়া তার পায়ে স্প্রে করিতে লাগিলো।

অপর একজন দৌড়াইয়া আসিয়া আমাকে একটা লালকার্ড দেখাইয়া দিলো। আমি কিছুই বুঝিতে না পারিয়া দরোজার দিকে রওয়ানা দিলাম। কোথায় ফাউল করিলাম, বুঝিয়া উঠিলাম না। দরোজা পার হইয়া শেষবারের মতো ভিতরে তাকাইয়া দেখিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা বিশ্বাস করিতে কষ্ট হয়। ম্যারাডোনা একলাফে উঠিয়া হাসিতেছেন। তাহার সঙ্গীসাথীরাও তাহার প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া হাসিঠাট্টায় মত্ত হইয়া উঠিল।

আমি মনে মনে বলিলাম— চিয়াও, ক্যামেরুন আসিতেছে।

রক্তের ফোঁটা ঝরে পড়ল সারা বাংলায়

সংবাদটি শোনামাত্রই হর্ষিত হইলেন তিনি। একটি চিকন হাস্যরেখা তার ফুসফুস থেকে উদ্ভূত হয়ে ওষ্ঠদ্বয়ের সঙ্গমস্থলে উঁকি দিলো অদৃশ্যেই। 'বাঘের বাচ্চা'—স্বগতোক্তি করলেন তিনি। বিপক্ষের দুইজন গুলিবিদ্ধ এবং নিহত! হ্যাঁঃ!

তিনি স্মৃত হলেন, একদা তার দুজন কর্মীকে কী বাণী তিনি দিয়েছিলেন। ওই কর্মীদ্বয় অভিযোগ করেছিলো, প্রতিপক্ষীয় মস্তানগন কর্তৃক তারা প্রহৃত। 'শুধু মার খেলে চলবে না, মার দিতে হবে, বুঝলে'—বলেছিলেন তিনি। কর্মীদ্বয় নির্বোধের মত তাকিয়েছিলো। যেন বা দুটি ছাগল দণ্ডায়মান দুপায়ে।

না, তারা ছাগ ছিলো না, তারা প্রকৃতই শার্দুল-শাবক। তারা শিখেছে হত্যা করতে। হত্যার বদলে হত্যা। ইতিপূর্বে প্রতিটি সংঘাতে পরাজিত হয়েছে তার শাকবেরা, এইবার, এই একটি বার, প্রথমবারের মতন তারা জয়লাভ করলো সম্মুখ সমরে।

'আমি কি পাষাণ'— অকস্মাৎ এই বোধটিও জাত হলো তার মস্তিষ্কের কোষে, দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায়। (আর কে না জানে যে, দ্বন্দ্বই সত্য।) না, তিনি প্রস্তরহৃদয়া নন।

যারা নিহত, তারা সন্ত্রাসবাদী এবং প্রতিপক্ষীয়।

তারা মানবসন্তান এবং তাদের শোণিতও লোহিত বর্ণের।

যারা নিহত, তাদের হস্তে আগ্নেয়াস্ত্র ছিলো আর মৃত্যুই অস্ত্রধারীদের একমাত্র পরিণাম।

তারা কোনো-না-কোনো মাতার প্রাণাধিক পুত্র, পিতার ভরসাস্থল, ভগ্নীর ভ্রাতা।

যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুনিধনই একমাত্র নৈতিকতা।

ঠিক সেই মুহূর্তে রাজধানীর সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠটির অঙ্গনে, একজন সদ্যবিধবা তরুণী বিলাপ করে উঠলো। (আর শব্দ শক্তির একটি রূপমাত্র, এবং শক্তি অবিনাশী)। সেই তীব্র তীক্ষ্ণ আহাজারি আর্তনাদ পাড়ি দিলো দুই শতাধিক কিলোমিটার দূরে, তার, আমাদের কাহিনীর প্রধান চরিত্রের, কর্ণকুহরে।

তার হৃদযন্ত্র কম্পমান হলো। তিনি এন্টাসিডের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। বললেন— না, আমি আর কোনো হত্যাদৃশ্য অবলোকন করতে চাই না।

আর এই নারীটি বাংলার যে-কোনো নারীর মতোই কোমলস্বভাবা, মমতাময়ী এবং কিঞ্চিত কলহপটু। তিনি বলেছিলেন একদা একজন মশহুর শায়ের সাংবাদিককে, 'আমার নামটি লক্ষ্য করুন। এরূপ নাম বাংলার ঘরে ঘরে বিদ্যমান।' আর আমরা পাঠকবৃন্দ মানসচক্ষে প্রত্যক্ষ করি, একজন হাফপ্যান্ট পরিহিত বালিকা একটি দ্রুত ধাবমান ছাগশিশুকে অনুগমন করেছে, পটভূমিকায় প্রান্তরপূর্ণ শস্য। তার চক্ষুদ্বয় হয়ে পড়লো অশ্রুসিক্ত। 'আমি আর কোনো মৃত্যু চাই না।' তিনি পুনরায় উচ্চারণ করলেন স্বগতভাবে। তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত উত্তরবঙ্গ পরিভ্রমণে ক্লান্ত। তার স্মৃতিকোষে হাজার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হাজার ভুখা-নাঙ্গার ক্লিষ্টদেহ। আর প্রতিটি জনসভাই হয়েছিলো কেমন বিশাল, জমায়েত হয়েছিলো দারুণ! একটি সুখকর ঢেকুর হলো উদ্‌গীরিত; তিনি হর্ষিত হলেন। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে, সুদূর রাজধানী থেকে ত্রাণব্রতে আগত একটি দল যন্ত্রযান খুঁজছিলো প্রত্যন্ত এলাকায় খাদ্য পৌছানোর জন্যে এবং প্রশাসন জানিয়ে দিলো যে, তাদের হাতে আর একটি যানবাহনও নেই; সকল সরকারি যান একজন গুরুত্বপূর্ণ নারীর জনসভার জনদের বহনে নিয়োজিত।

আর সকল কর্মের শ্রেষ্ঠ রাজনীতি। তিনি, আমাদের কেন্দ্রীয় চরিত্র যিনি, সামলে নিলেন নিজেকে। উত্তম খিচুড়ি পরিবেশিত হয়েছে খাবার টেবিলে, তিনি বোধ করলেন যে তিনি ক্ষুধিত।

তিনি খাবারটেবিলে উপবিষ্ট হলেন। তার অমাত্যেরা সঙ্গে। তারা বললো— সম্মানিত ভগিনী, আমাদের পরবর্তী করণীয় কী ? আমরা কি যুদ্ধজয়ের এ আনন্দে উৎসব করবো ?

তিনি তাকালেন এইসব অমাত্যের দিকে। টেবিলের চারদিকে একপাল ছাগল উপবিষ্ট।

রহস্যময় হাস্য ছড়িয়ে পড়লো তার মুখমণ্ডলে। 'আমরা কেন হত্যাকাণ্ডের দায়িত্ব নেবো ? জেনে রাখুন আমাদের হাত ফেরেশতার হাতের মতোই নিষ্পাপ।'

তখন প্রস্তুত হলো বিবৃতি। প্রতিপক্ষের অন্তর্দ্বন্দ্বে দুটি মূল্যবান প্রাণ হত হলো, যা দুঃখজনক এবং ক্ষমতাসীনদের অক্ষমার্হ ব্যর্থতা। এই বাক্যটি লিখিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই অমায়িক পরিতৃপ্তি বোধ করলেন তিনি। ক্ষমতাসীনগণ ব্যর্থ। হাঃ হাঃ। আর যারা রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ব্যর্থ তাদের উচিত ক্ষমতা ত্যাগ। এই সিদ্ধান্ত অঙ্কিত হলো তার মানসে।

কিন্তু তিনি মোমের মতন নম্র-হৃদয়ের অধিকারী। সুতরাং পুনরায় বিচলিত হলেন এবং সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তিনি তার শাবকদের নির্দেশ দেবেন ঐ বিদ্যাপীঠে রাজনীতি স্থগিত রাখতে। তখন একটি অতিকায়-ফড়িং সদৃশ আকাশযান, আমরা যাকে বলবো হেলিকপ্টার, একটি রক্তস্নাত লাশ নিয়ে গেলো এক দূর পাড়াগাঁয়ে। সেই আকাশযান থেকে রক্তের ফোঁটা টপটপ করে ঝরে পড়লো সারা বাংলায়। এবং একদিন রাজধানীর সুরম্য ভবনটিতে, যা লুইকান কর্তৃক পরিকল্পিত, তিনি ঘোষণা করলেন যে, অতঃপর এখন থেকে আমার বাহিনীর সকল কার্যক্রম রাজধানীর সর্বোচ্চ বিদ্যায়তনটিতে স্থগিত রাখা হলো। তিনি আশাবাদও যুক্ত করলেন যে, প্রতিপক্ষ বাহিনীও তাদের অপারেশন বন্ধ রাখবে। এই ঘোষণাটি তার মধ্যে একটি প্রশান্তির উদ্রেক করলো। আমি আমার কর্তব্য করেছি, এবার প্রতিপক্ষের পালা।

কিন্তু দ্বান্দ্বিকতাই সত্য। রাত্রি নেমে এলো ঢাকায়। অন্ধকার। এবং রাত্রি নেমে এলো তার বাসভবনে। নেমে এলো নির্জনতা।

আর তখন, সেই বরফের মতো নিঃসঙ্গতায় এলো একজন, অনুজ তার, বেঁচে থাকলে যার বয়েস হতো সদ্য নিহত ঐ দুই তরুণের মতোই।

— ভাই, তুই !

: আর রক্তপাত আমার ভালো লাগে না, আপা।

— আমারও নয়, ভাই।

: বিশ্বাস করি না।

— কেন তুই কি আমার সর্বশেষ ঘোষণাটি শুনিসনি ? আমি তো আমাদের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছি।

: তা যে সমাধান নয়, আপা তুমি খুব ভালো জানো।

তার স্বপ্নগ্রন্থি ছিন্ন হয়ে গেলো। তিনি ডুকরে উঠলেন— আমি জানি ভাই, আমি জানি। কিন্তু কী করবো আমি। এছাড়া আমি আর কিইবা করতে পারতাম ?

ঠিক তখনি কোথাও হস্তান্তরিত হলো ইস্পাতের বধির, শীতল, নির্মম, ভয়ঙ্কর নলগুলি। তিনি, যেন মেলায় হারিয়ে যাওয়া বালিকা, কেঁদে উঠলেন— বাবা, তুমি কোথায় ?

বাংলাদেশী ভাষা

সত্তর দশকের শেষদিকে একবার বিজয় দিবসের আমন্ত্রণপত্রে সবাইকে দেয়া হয়েছিলো দাওয়াত, তোলা হয়েছিলো কওমি নিশান, অনুষ্ঠিত হয়েছিলো কুচকাওয়াজ, জানানো হয়েছিলো খোশ আমদেদ। সেবার বিরোধীদল ওই অনুষ্ঠান বর্জন করে। তার জবাব দিয়েছিলেন মওদুদ আহমেদ। বলেছিলেন, আবদুল মালেক উকিলের নাম বদলে ভগবান দাস আইনজীবী রাখলেই হয়। তখন থেকেই আমরা বুঝতে পারি আরেকটা নতুন ভাষা আসছে, যার নাম বাংলাদেশী ভাষা। পাকিস্তান আমলে আমরা দেখেছি পাকবাংলা, জিয়ার আমল থেকে শুরু হলো জাতীয়তাবাদী বাংলা। মন্ত্রীবর্গ বলে থাকেন, তারো চেয়ে বেশিবার বলে ফ্রিডম পার্টি—অন্যের নির্বাচনী ওয়াদা পূরণের জন্যে জনগণ বিএনপিতে ভোট দেয় নাই। কথা সত্য। কিন্তু বিএনপির নির্বাচনী মেনিফেস্টোর অঙ্গীকার তো বাস্তবায়ন করতে হবে বিএনপিকেই। না, বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল কিংবা রেডিও টিভির স্বায়ত্তশাসনের মতো ছোটখাটো বিষয় নিয়ে আমরা ভাবিত নই। ফেব্রুয়ারির ভাষাক্রান্ত সময়ে আমাদের সমুদয় চিন্তা বিএনপি'র ওই নির্বাচনী অঙ্গীকারটি নিয়ে— যার নাম বাংলাদেশী ভাষা। বিএনপি তার নির্বাচনী অঙ্গীকারে উল্লেখ করে বাংলাদেশী ভাষা ও সংস্কৃতির কথা, এবং বাংলাদেশের খাঁটি প্রেমে উদ্বুদ্ধ একমাত্র সঙ্গীত 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ'-এর কথা।

কিন্তু আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি, এই ফেব্রুয়ারিতে সবাই বাংলা ভাষার কথা বলছে, গাইছে বাংলার জয়গান, অশ্রুপাত করছে 'বাংলা' 'বাংলা' করে। বাংলাদেশী ভাষা নিয়ে কারো কোনো মাথাব্যথা নেই। ভোটারদের প্রতি নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা। আপোষহীনতার এই কালপর্বে এ-অবস্থা বরদাশত করা উচিত নয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মোটেই। যেদিকেই তাকাই দেখতে পাই ভারতের দালাল। এই দুর্যোগময় পরিবেশে সরকারের উচিত খুবই তাড়াতাড়ি কতোগুলি ব্যবস্থা নেয়া।

সুপারিশমালা

১. বাংলা একাডেমির নাম বাংলাদেশী একাডেমি, বাংলা মোটরের নাম বাংলাদেশী মোটর, বাংলা ফাইভের নাম বাংলাদেশী ফাইভ, বাংলা মদের নাম বাংলাদেশী মদ, বাংলা সিনেমার নাম বাংলাদেশী সিনেমা, বাংলা ঘরের নাম বাংলাদেশী ঘর, দৈনিক বাংলার নাম দৈনিক বাংলাদেশ, বাংলা সনের নাম বাংলাদেশী সন, বঙ্গভবনের নাম বাংলাদেশী ভবন, বাংলাবাজারের নাম বাংলাদেশী বাজার রাখা।

২. আইয়ুব আমলের, আরবি হরফে বাংলা (দেশী) লেখার প্রকল্পটি আবার চালু করা।

৩. রামপুরা টিভিকেন্দ্র রহিমপুরায় স্থানান্তর করা।

৪. জীবনানন্দের রূপসী বাংলা সম্পাদনা করে রূপসী বাংলাদেশ বানানো।

৫. ১৯৫২ সালের ইতিহাস নতুন ও শুদ্ধরূপে প্রণয়ন করা। রেডিও-টিভিতে হুদাদের দিয়ে অনবরত বলিয়ে নেয়া যে, ২১ ফেব্রুয়ারি এক মেজর সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা বাংলাভাষার দাবি তোলেন।

এ ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, এ নিয়ে বিস্তর গবেষণাকর্মের দরকার আছে। আশা করি জাতীয়তাবাদী সরকার যথেষ্ট ওয়াকিবহাল এ বিষয়ে। তবে সময় যতো পার হয়ে যাচ্ছে, পরিস্থিতি ততো নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। বিএনপি সরকার তাদের নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করবে না— এটা হয় না, হতে পারে না। মোনায়েম খান চেয়েছিলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখিয়ে নিতে, আর জাতীয়তাবাদী সরকার পারবে না বাংলাভাষার বদলে বাংলাদেশী ভাষা চালু করতে ? দেশ ভারতের কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছে, এ-জুজু হাজির থাকলে সবই সম্ভব এ-দেশে। এ-জুজু দেখিয়ে সবার আগে যা করতে হবে, তা হলো এবার ফেব্রুয়ারিতে সরকারি সব অনুষ্ঠানে 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো'র বদলে 'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ' গাইয়ে নেয়া।

কে আর আসিবে ফিরে এই বাংলায়

মাদাম ফাইলটির আগামাথা বুঝতে পারলেন না প্রথম দফায়। ২০০০ সালটা তাঁর জন্যে গুরুত্বপূর্ণ নানা কারণে। সবার জন্যে স্বাস্থ্য দিতে হবে, শিক্ষা দিতে হবে। প্রচুর এইডস্ আসছে। কিন্তু ১৪০০ সাল ব্যাপারটা কী ? অবশ্য এরকম একটা কবিতা আছে বলে মনে পড়ছে। আমার বসন্ত গান তোমার বসন্ত দিনে...এই জাতীয় একটা পঙ্‌ক্তি ছিলো খুব ইম্পর্ট্যান্ট। ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। ব্যাখ্যা করতে হতো। আলোচ্য অংশটুকু

কবি.....। কোন্ কবি কে জানে ? শেষপর্যন্ত পরীক্ষাটা আর দেয়া হয়নি। না দিয়ে ভালোই করেছেন। পরীক্ষা-টরীক্ষা দিলে আজ বড় জোর হতেন শিক্ষিতা। ফাইলটি নেড়েচেড়ে পিএস-এর দিকে তাকালেন তিনি। জিজ্ঞাসাসূচক দৃষ্টি।

: বাংলা ১৪০০ সাল আসছে ১৪ এপ্রিলে। ১লা বৈশাখ। এজন্যে আমাদের কর্মসূচি থাকা দরকার।

— ও আচ্ছা, কোথায় সই করতে হবে ?

: খুব বড়ো একটা বিষয়। ১০০ বছর পরে এরকম একটা বছর আসে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের একটা কবিতা আছে।

— বলেন কী! কবিতাটা রবীন্দ্রনাথের নাকি ? জাতীয়তাবাদ বিরোধী কিছু নেই তো ? কোনো ষড়যন্ত্র ?

: জিনা, কাজী নজরুল ইসলাম ওই কবিতার জবাবে রবীন্দ্রনাথকে সালাম জানিয়েছিলেন। ভক্তি গদগদ সালাম। 'আজি হতে শত বর্ষ আগে কে কবি স্মরণ তুমি করেছিলে আমাদের শত অনুরাগে...।'

— তাহলে তো ভালোই। কর্মসূচি কী ?

— সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে সবাই গানবাজনা করে আর কী! পার্কে-টার্কে যায়। পান্তাভাত খায়।

— আমাকে আবার উদ্বোধন করতে হবে না তো ? দেখবেন। উদ্বোধন করতে হলে সকাল দশটার আগে নয়। একটা ছুটির দিন আমি মাটি করতে পারবো না।

পিএসটি এমন ভক্তি করলো, সে-কথা কি আর জানি না। পরপর দুবছর আপনি স্মৃতিসৌধে যেতে পারেননি। তিনি ফাইলটি এগিয়ে দিলেন মাদামের দিকে। মাদাম নিশ্চিন্তে স্বাক্ষর করলেন তাতে।

দুই.

১৪০০ সাল উপলক্ষে মধ্যলোকে বাঙালিদের জন্যে বিশেষ কর্মসূচি নেয়া হয়েছে। মধ্যলোক হচ্ছে ইহলোক আর পরলোকের মধ্যবর্তী এক জায়গা। দুনিয়া থেকে মানুষ ওই জায়গায় যায় মৃত্যুর পর।

মধ্যলোকের বাঙালি স্টেটের প্রধান একজন রোবট আকৃতির জীব। তিনি বললেন, যেসব বাঙালি গত একশ বছরে বাংলাদেশে ছিলেন এবং জীবিতাবস্থায় পুনর্জন্মের আশা ব্যক্ত করেছিলেন, তাদেরকে ১৪০০ সাল উপলক্ষে পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হবে। যারা যারা পুনর্জন্মের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছিলেন, তারা দলিলপত্রসহ ভিসা অফিসে যোগাযোগ করুন।

মর্তলোকে থাকতে পুনর্জন্মের আশা অনেকেই ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু কোনো ডকুমেন্ট নেই তাদের। এক ব্যক্তি লিখিত প্রমাণ নিয়ে হাজির হলেন। তাঁর হাতে একটি বই। রূপসী বাংলা। সেটি খুলে তিনি দেখালেন তাঁর আকাঙ্ক্ষা : 'আবার আসিব ফিরে....এই বাংলায়, হয়তো মানুষ নয়, হয়তোবা শঙ্খচিল শালিখের বেশে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

— তোমাকে বাংলায় যাবার অনুমতি দেয়া হলো।

: ঢের ঢের খুশির খবর।

— তুমি বাংলায় যেতে চেয়েছ। শঙ্খচিল অথবা শালিখের বেশে। তোমার প্রথম চয়েস কি শঙ্খচিল ?

: তবুও বলার ছিলো কিছু। মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব থেকে যায়। আমি কি পারি না যেতে মানবের বেশে ?

— না, তা তুমি পারো না।

: তা হলে শালিখের বেশ নেয়া ভালো নয় কি ?

— তোমার ইচ্ছা।

: এখন তুমি বলো তুমি কোন্ বাংলায় যেতে চাও ? পূর্ববাংলায় মানে বাংলাদেশে, নাকি পশ্চিমবঙ্গে অর্থাৎ বঙ্গে।

— মানেটা বোঝা গেলো না ঠিক। এখন কি পাখিদেরও পাসপোর্ট লাগে ? আকাশেও কি সীমানা বসানো হয়েছে ?

: তুমি গেলেই সব দেখতে পাবে। তবে কোথায় তুমি ঠিক পৌছতে চাও, তা বলো।

— আমি আমার জন্মভূমিতে যেতে চাই সবার আগে।

: তথাস্তু।

অনেক শালিখ পাখির ভিড়ে একটি নতুন শালিখ এসে জুটলো বরিশালে। শালিখগুলো তাকে তার দলে নিতে চাইলো না। শালিখদের দলপতি বললো, কে তুমি ভাই, কোত্থেকে ?

— আমি এক শালিখ। অন্য এক বনে ছিলাম। তোমাদের দেশে এসেছি ১৪০০ সাল দেখবো বলে।

: কোন্ দেশ থেকে এসেছো ? ইন্ডিয়া থেকে ? তোমাকে কি পুশব্যাক করেছে ?

এই নতুন শালিখটি এদের কথা কিছুই বুঝতে পারলো না। এরা এমন করে কথা বলছে কেন ? নাকি ১৪০০ সালে এসে পাখিসমাজেরও বিস্তর উন্নতি ঘটে গেছে ? তাদের ভেতরেও ঢুকে গেছে রাজনীতি, ভেদাভেদ ? কে জানে রে বাবা।

: শোনো নতুন শালিক, তুমি বাংলাদেশী না বাঙালি ?

— পাখিদেরও কি বাংলাদেশী-বাঙালি আছে নাকি ?

: কেন থাকবে না ? সবার আছে। যেমন ধরো, অমন যে গোবেচারা গোরু, তাদেরও জাতীয়তার সংকট আছে। বর্ডার এলাকায় গেলে দেখতে পাবে, শতশত ভারতীয় গোরু আটক করে রাখা হয়েছে। শালিখেরা কি গোরুর চেয়ে অধম প্রাণী নাকি ?

— সে-ও তো সত্য, সত্য বটে ঢের। আমি বাংলাদেশেরই পাখি। বরিশালের গৈলা, ফুল্লশ্রী-তে ধানসিড়ি নদীটির তীরে আমার জন্ম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

: তুমি হিন্দু না মুসলিম ?

— পাখিদের আবার হিন্দু-মুসলিম কী ?

: ধরো তুমি যদি হিন্দু হও তাহলে তুমি ব্যাংক লোন পাবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশ।

— আমার তো লোনের দরকার নেই।

: তা নেই ঠিক, কিন্তু তবুও একটা বন্ডে তোমাকে সই করতে হবে।

তারপর সেই শালিখপতি একটা কাগজে তাকে সই করিয়ে নিলো। আমি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে মুগ্ধ হয়ে জাতীয়তাবাদী পাখি দলের শালিখ শাখায় প্রাথমিক সদস্যপদে স্বেচ্ছায় সানন্দে যোগ দিলাম। ইতি—পক্ষানন্দ দাশ।

প্যাডটা লাল ও সবুজ কালিতে ছাপা। নিচে বাম পাশে সভাপতির স্বাক্ষর। লে. ক. (অব.) খয়েরিয়া খান।

এতো কিছু করার পর পক্ষানন্দ দাশ ছাড়া পেলো। সে একটুখানি উড়ে আরেকটি গাছে গিয়ে বসলো। সেখানে অনেকগুলো পাখি কিচির-মিচির করছে। সে সেই দলে ভিড়লো। একটি মেয়েপাখির সঙ্গে তার খাতির হয়ে গেলো। রমণীর সঙ্গে পুরুষের কখনো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক হয় না, হয় শত্রুতাপূর্ণ প্রেম; কিন্তু পক্ষানন্দ বাবুর সঙ্গে মেয়ে পাখিটির সম্পর্ক বন্ধুত্বের সীমা অতক্রিম করলো না। এর কারণ স্ত্রীজাতি সম্পর্কে তার সমূহ ভীতি। ওই মেয়েশালিখটি তাকে বললো, তুমি সিগনেচার করেছো ?

— হ্যাঁ, করলাম।

: ভালোই করেছো। তোমার আর কোনো ভয়-ডর থাকলো না। ওই-যে সভাপতিটি দেখছো, ওকে সভাপতি বানিয়েছে মানুষদের সরকার। মানুষদের সরকার নাকি সব জায়গাতেই নিজেদের লোক বসাতে চায়। কোনো সংগঠন বাদ থাকবে না। এমনকি শালিখদের সভাপতিকেও হতে হবে জাতীয়তাবাদী। এর নাম হচ্ছে দলীয়করণ। বুঝলে ?

পক্ষানন্দ বাবু কিছুই বুঝলো না। প্রথম দফায় বুঝতে সময় লাগলো। এরপর সে জাহাজের ছাদে এক গোপন কুঠুরিতে উড়ে এসে জুড়ে বসলো। জাহাজ সদরঘাটে ভিড়লো। ১৪০০ সাল। পয়লা বৈশাখ। ভোরবেলা। পক্ষানন্দ শালিখবাবু উড়তে উড়তে এলো রমনা গ্রিনে। এসে দেখলো এলাহি কাণ্ড। শত শত নারী। খুব সুন্দর করে সেজে এসেছে তারা। পুরুষও আছে কিছু কিছু। তাদের পরনে পাঞ্জাবি। গান হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের গান। পক্ষানন্দের ভালোই লাগলো। একটু দূরে গিয়ে দেখলো আরেকটা মঞ্চ। সেখানেও গান হচ্ছে। পক্ষানন্দবাবু সেখানে একটা গাছের ডালে বসতে চাইলো। একদল কাক এলো তেড়ে। তুই ব্যাটা এতক্ষণ অই অনুষ্ঠানে আছিলি, অহন এইডায় আইছস কিল্লাই। কল্লা নামায়া ফালামু।

পক্ষানন্দ কিছুই বুঝলো না। এখানেও দু-ভাগ। দু-দল।

সে ভাবলো একটু উপস্থিত বুদ্ধি খাটাবে। তাড়াতাড়ি বললো, ওরা ওখানে কী কী চক্রান্ত করছে তাই দেখতে গিয়েছিলাম একটু। আমি জাতীয়তাবাদী শালিখ দলের বরিশাল শাখার মেম্বার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একটা কাক তার দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো। বললো, কোন্ গ্রুপ ? মতলব কী? নেতা হইবার চাস ? বিদেশ ভ্রমণের চান্স পাইতে চাস ? আমজাদ হোসেনের মতো নাটক লিখবার চাস ? গিয়াস কামালের মতো সাতটা কমিটির প্রেসিডেন্ট হইবার চাস? আমার দলে ভিইড়া যা। অন্য গ্রুপ করলে কিন্তু ভুঁড়ি ফাসায়া দিমু।

পক্ষানন্দ বাবুর কান্না পেলো। এ কোথায় এলাম রে বাবা। অদ্ভুত আঁধার এক পৃথিবীতে এসেছে কি আজ ? মনে তার খুব অশান্তি।

ভাবলেন দুনিয়ায় শান্তি আর কোথায় পাওয়া যাবে ? দু-দণ্ড শান্তির লোভে তার মনে হলো, যাই একটু নাটোর ঘুরে আসি।

একটা নাইট কোচের মুরগির খাঁচায় বসে দিব্যি রাতারাতি নাটোর পৌছলো পক্ষানন্দ শালিখবাবু। মনে অশান্তি। চোখে-মুখে পথশ্রমের ক্লান্তি। পাড়াটা খুঁজে পেতে একটু সময় লাগলো। রাস্তায় একটা মিষ্টির দোকানের সাইনবোর্ড দেখে চমকে উঠলো সে! 'বনলতা মিষ্টান্ন ভান্ডার।'

বাড়িটার সামনে গিয়ে দেখলো সেই দালানটা নেই। সেখানে একটা মার্কেটের নির্মাণকাজ চলছে। সে একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করলো। একটা সজনে গাছের ডালে গিয়ে বসলো পাখিটা। এমন সময় তিনটা বাজপাখি তেড়ে এলো তার দিকে। এখানে কী চাস ?

— আজ্ঞে বনলতা সেনের বাড়িটা কোথায় ?

: ইন্ডিয়ার দালাল নাকি ? পাঙ্খা কাইটা ফালামু। চক্ষু উপড়াইয়া ফালামু। বনলতা সেনের বাড়ি খুঁজো। অরা তো কবেই গেছে গা। তাড়াইয়া দিছি। তরেও দিমু। নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার।

ওই তিনটা বাজ তাদের নখদন্ত নিয়ে হামলে পড়লো তার উপরে।

তিন.

জীবনানন্দ দাশ বাংলাদেশ থেকে জানে বেঁচে ফিরে এসেছেন মধ্যলোকে। এর কারণ জীবের মৃত্যু হয় একবার, দ্বিতীয়বার মরার একটা আরজি মধ্যলোকের প্রধানের কাছে পাঠাবেন বলে ঠিক করলেন।

মুদ্রাদোষ

বাঙালির অনেকগুলি মুদ্রাদোষ কিংবা মুদ্রাগুণ আছে। এরমধ্যে একটি হচ্ছে, কোনো মানুষের ছবিঅলা কাগজ সামনে পেলেই পকেট থেকে কলম বের করে তার চেহারা বিকৃত করে দেয়া। নারীর ছবি পেলে দাড়িগোঁফ যুক্ত করা, নিদেনপক্ষে মানুষটির চোখে চশমা এঁকে দেয়া।

বাঙালির আরেকটি মুদ্রাগুণ হচ্ছে—অন্যের নাম বিকৃত করা, কিংবা নতুন নামকরণ করা; অর্থাৎ খেতাব দেয়া। পরে দেখা যায় আসল নামটাই লোকে ভুলে গেছে, জনগণের দেয়া বিকৃত নামে ব্যক্তিটি সর্বজন পরিচিত হয়ে উঠেছে।

আমাদের স্কুলে আমরা হেডস্যারের নাম দিয়েছিলাম 'হেডু'। আমার নিজের ধারণা, হেডমাস্টারের প্রতি ছাত্রদের ভালোবাসার প্রকাশ এই নামকরণ। আমরা আদর করেই সাধারণত নামের শেষে হ্রস্ব উকার, যুক্ত করি। যেমন— ধরা যাক, মেয়ের নাম সীমা। বাসার সবাই তাকে আদর করে ডাকবে 'সীমু'। নামের এ আদরজড়িত বিকৃতি হবেই। এভাবেই, লাবলু হয়ে যায় লাবু, আমীর হোসেন হয়ে যান আমু, হাসিনা হয়ে যান হাসু। স্কুলেই আমাদের এক স্যারের নাম ছিলো 'ক্যান্ডেল'। স্যার একদিন ক্লাসে এসেছেন।

ব্লাকবোর্ড ডাস্টার দিয়ে মুছে লিখতে গেছেন চকখড়ি দিয়ে, কিন্তু লেখা হচ্ছে না। লেখা হবে কী করে ? স্যার ভুল করে চকের বদলে মোমবাতি নিয়ে এসেছেন। সেদিন থেকে স্যারের নাম হয়ে গেলো 'ক্যান্ডেল'। কথায় কথায় মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে ছাত্রদের মাথায় আঘাত করতো বলে এক স্যারের নাম রাখা হয়েছে 'ঠুয়া স্যার।'

স্কুলের স্যারদের আমরা আরো অনেকগুলো নামে ডাকতাম। একজন লম্বাটে একহারা গড়নের স্যারের নাম ছিলো 'কৌটা'। একজন স্যার বেজায় পেটাতেন, তার নাম ছিলো 'গামা স্যার'। কলেজে একজন দাঁড়িঅলা বদরাগী স্যারের নাম হয়ে গেলো 'খোমেনী স্যার'।

ঢাকায় একজন ছাত্রনেতার নাম হয়ে গিয়েছিলো 'ঘিরিঙ্গি'। 'ঘিরিঙ্গি' শব্দটি বাংলাভাষার নতুন আবিষ্কার। জটিল, ষড়যন্ত্রময়, চক্রান্তকারী, প্যাঁচবিশিষ্ট কাউকে বোঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে। বইমেলায় একটি চায়ের দোকানের নাম রাখা হয়েছিলো 'ঘিরিঙ্গি'। অন্য একজন ছাত্রনেতা সেই সাইনবোর্ডটি দেখিয়ে বলেছিলেন— দোকানের নাম 'ঘিরিঙ্গি' না রেখে 'অমুক আহমেদ' রাখলেই তো চলতো।

নতুন নাম দেয়ার প্রবণতাটির ঐতিহাসিক গুরত্বও কম নয়। আমরা প্রতিটি নেতারই কোনো-না-কোনো উপাধি দিয়েছি। যেমন— দেশবন্ধু, শের-এ-বাংলা, বঙ্গবন্ধু, ভাসানী। প্রত্যেক কবির জন্যেও বরাদ্দ করেছি কোনো না কোনো অভিধা। যেমন— পল্লিকবি, স্বভাব কবি, বিদ্রোহী কবি, বিশ্বকবি। কিছুই খুঁজে না পাই, মহিলা কবি কিংবা তরুণ কবি। ভবিষ্যতে পুরুষ কবি কিংবা বৃদ্ধকবিও বলা হবে কিনা কে জানে।

এর উল্টোচিত্রও আছে। কোনো বিশেষ ব্যক্তির নামটি আবার অন্যদের জন্যে খেতাবে পরিণত হয়েছে। যেমন— মীরজাফর। এমনি একটি নতুন শব্দ যুক্ত হয়েছে বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডারে—রাজাকার। সাম্প্রতিক রাজনীতিতে আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দের জন্যে বেশকিছু খেতাব চালু করেছি। এরমধ্যে বুবুজান আর ভাবীজান গ্রাহ্য হয়েছে ব্যাপকভাবে। ঐ কৃতিত্বটি 'যায়যায়দিনের'। আগে মুজিবকে বলা হতো মইজ্জা, শিক্ষক সমিতির আবুল কালাম আজাদকে জিপু।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নিজের নামকরণ নিজেই করেছেন এবং নিজের পত্রিকায় নিজের সাক্ষাৎকার ছেপেছেন. এরকম একজন সাংবাদিক আছেন ঢাকায়। নিজেকে তিনি বলেন, 'বাংলার রবিনহুড'। সম্প্রতি চেষ্টা চলছে বেগম জিয়াকে 'দেশনেত্রী' অভিধায় অভিষিক্ত করার। এর আগে অবশ্য তাকে প্রকাশ্য জনসভায় 'বঙ্গমাতা' খেতাবও দেয়া হয়েছিলো। শেষেরটি কেন জনপ্রিয় হয়ে উঠলো না, বলা মুশকিল। তবে তার 'ম্যাডাম' নামটি সর্বজনস্বীকৃত। তিনি নিজেই নাকি তার এক কর্মীকে বলেছিলেন, 'কল মী ম্যাডাম'। জানি না. এ ঘটনা সত্যি কিনা। তবে, penthouse পত্রিকায় চিঠিপত্র কলামের নাম 'কল মী ম্যাডাম'। ব্যাপারটি খুব স্বস্তির না।

তবে ম্যাডাম আরেকটি খেতাব পেয়ে গেছেন। শাহ মোয়াজ্জেম জাতীয় পার্টির এক জনসভায় সম্প্রতি বলেছেন— আল্লাহর কাছে হাজার শোকর, আমরা আজ এখানে জনসভা করতে পারছি। না, জনগণের ভয়ের কথা বলছি না। 'তুফানি বেগম' চীনে গেছেন, ফলে আজ দেশে ঝড়-বৃষ্টি বাদল নেই, তাই জনসভা হতে পারছে। এই খেতাবটি ম্যাডাম বেশ পাকাপাকিভাবেই পেয়ে গেছেন। যে ধর্মীয় মূল্যবোধকে কৌশলে কাজে লাগিয়ে ম্যাডাম ভোটে জিতেছেন, তাই আজ তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্যে অশিক্ষিত মানুষ দায়ী করছে তাকে। আবার উল্টোটাও হয়েছে। 'আপোষহীন' বলতে একসময় তাকেই বোঝাতো।

এরশাদ আমলে বেশকিছু উপাধি চালু হয়ে গিয়েছিলো। যেমন—চিনি জাফর, গৃহপালিত বিরোধী নেতা, চোরা-মতিন।

রাজনৈতিক দলগুলিরও নানা নামকরণ হয়েছে এদেশে। বিএনপি-কে 'বাজাদল', বাকশালকে 'বাকশিয়াল', সিপিবি'কে হারমোনিয়াম পার্টি, পাঁচ দলকে প্যাঁচদল।

আবার সরাসরি বলতে না-পারার কারণে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতে গিয়ে আমরা কিছু নতুন অভিধা আমদানি করেছি। যেমন—উত্তরপাড়া।

অতিরিক্ত ভালোবাসার কারণেও কিছু নব্য নামকরণ ঘটেছে। 'চার্লি প্রেসিডেন্ট' এর নিদর্শন।

দেশের সংবাদপত্রগুলির নয়া নামকরণ করেছিলো একটি কার্টুন পত্রিকা। পূর্বাভাসকে বলেছিলো 'দুর্বাগ্রাস', অপর একটি সাপ্তাহিককে 'বরের কাগজ'।

আহা! বেচারা!

ফরিদ আলী সাহেবের উত্তেজিত হওয়া বারণ। ডাক্তারের নিষেধ। হার্টের প্রবলেম। ব্লাডপ্রেশার। ইদানীং ডায়াবেটিসের লক্ষণও দেখা দিচ্ছে। সবই বড়োলোকের লক্ষণ। বড়োলোকদের এসব রোগ হতে হয়। ফরিদ আলী সাহেব তাই মোটামুটি খুশিই। লোকজনের সামনে বেশ গর্ব করে বলেন— ইসিজি করিয়ে নিই রেগুলার, ব্লাডপ্রেশারটা চেক করি। কোথাও চায়ের আলাপ উঠলেই তড়িঘড়ি বলে ওঠেন—

আমি আবার চায়ে চিনি খাই না। প্রফেসর চৌধুরীর বারণ। হা-হা-হা। যেন চায়ে চিনি না-খাওয়াটা এক বিশাল আনন্দের ব্যাপার।

ফরিদ আলী সাহেব সকালবেলায় পত্রিকা পড়েই একটু নার্ভাস হয়ে পড়লেন। বুকের বাঁ পাশটা চিনচিন করতে লাগলো। অকারণে তিনবার বাথরুমে গেলেন। তাঁর স্ত্রী ব্যাপারটা লক্ষ করলেন।

কী হয়েছে, কোনো প্রবলেম ? তোমাকে এমন অস্থির দেখাচ্ছে কেন ?

কোথাও কোনো প্রবলেম নেই ফরিদ আলী সাহেবের। মানবজীবনের প্রধান সমস্যা টাকাপয়সা। কিন্তু ফরিদ আলী সাহেবের জন্যে 'মানি ইজ নো প্রবলেম।' জীবনে অর্থকড়ি খুবই কামিয়েছেন। জীবনটি শুরু করেছিলেন শূন্য থেকে। এখন তিনি বিশাল বড়োলোক। বাংলাদেশে বড়োলোক গোনা হয় কার কতো ব্যাংকঋণ অনাদায়ী, তা দিয়ে। ফরিদ আলী সাহেব ইনশাল্লাহ ব্যাংক ডিফল্টার তালিকার গোড়ার দিকেই আছেন। আর টাকা থাকলে জীবনে কোনো সমস্যাই সমস্যা না। এই এক ম্যাজিক। এই এক চাবিকাঠি। টাকা। টাকার সর্বোত্তম ব্যবহার। লাগসই প্রয়োগ। তারপর আরো টাকা। আরো প্রয়োগ, আরো টাকা, আরো প্রয়োগ। অথচ জীবন শুরু করেছিলেন খালিহাতে এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কেরানি হিসেবে। সেখানেই কপালটা খুলে যায়। বস্‌দের নারীসঙ্গের দরকার হতো। তাঁর ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়লো তারা। সেখান থেকেই বড়ো বড়ো কর্তাদের সাথে যোগাযোগ। যুক্ত হলেন শাড়ির ব্যবসায়। বর্ডারের ওপার থেকে এপারে আনা। কতো কর্তার পেছনে যে টাকা ঢালতে হলো। সব শালাকে তার চেনা। মাংস দেখলে কুকুর যেমন করে, টাকা দেখলে তেমনি করে কর্তারা। তারপর ব্যবসা গেলো নানাদিকে খুলে। এ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স। চিনি আমদানি। ব্যাঙের পা, থুক্কু চিংড়ি রফতানি। কতো কী !

কী ব্যাপার, কী ভাবছো ? ফরিদ আলীর স্ত্রী ভাবাকুল স্বামীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

ফরিদ আলী সম্বিত ফিরে পেলেন। তার বুকের বাঁ পাশটা আবার মোচড় দিয়ে উঠলো। তিনি অস্ফুট আর্তনাদ করতে লাগলেন।

কী হয়েছে, ডাক্তার ডাকবো ? তাঁর স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তিনি হাত ধরে তাকে থামালেন। তেমন কিছু না। ডাক্তার এর সমাধান করতে পারবে না। দ্যাখো, কাগজে কী লিখেছে। তিনি কাগজে একটা খবরের ওপর আঙুল রাখলেন। 'দুর্নীতির প্রতিবাদে অর্ধদিবস হরতাল'। তাঁর স্ত্রী খবরটা পড়লেন। তাঁকে চিন্তিত মনে হলো। তবু স্বামীকে অভয় দিয়ে বললেন, এই খবর পড়ে তোমার এ-অবস্থা হলো, তুমি একটা পুরুষ নাকি ?

ফরিদ সাহেবের পৌরুষ জেগে উঠলো। তিনি সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি দাও।

ঠাণ্ডা পানি খেয়ে তাঁর মাথা ঠাণ্ডা হলো। বললেন— আরে তাই তো, এ-সামান্য কারণে আমার বুক ব্যথা করছে, হার্টটা আসলেই উইক হয়ে গেছে। এসব খবরে ভয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পাবার কী আছে ? পলিটিশিয়ানরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কী করবে ? ওদের চাঁদা লাগবে না ? রাওয়ের বিরুদ্ধে এক কোটি রুপি নেবার অভিযোগ উঠেছে, অমন অভিযোগ ইচ্ছে করলে এদেশের রথীমহারথীদের বিরুদ্ধে তোলা যায়। শুধু কি পলিটিশিয়ান ? পলিটিশিয়ানদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে যারা অবতীর্ণ হন, তারাই কি ধোয়া তুলসীপাতা নাকি! তাদের দাপটে তো ব্যবসা-বাণিজ্যই করা যায় না। লোয়েস্ট হয়েও টেন্ডার পাওয়া যায় না। আর সদাপ্রভু আমলা তো আছেনই। দশ হাজার টাকা বেতন পান। একেকজনের দু-তিনটা নিশান-প্যাট্রোল-পাজেরো। ছেলেমেয়ে পড়ায় আমেরিকায়। কোত্থেকে আসে ? হিসেব অতি সহজ। আমরা বাঁচিয়ে রাখি। বেতন দিই আমরা। লোন নিতে টাকা দিই, লোন না দিলে টাকা নিই। কাজ পেতে টাকা দিই, কাজ পেলে টাকা দিই। এদেশের দুর্নীতি বন্ধ হলে সব শালারা ভুঁড়ি শুকিয়ে মরবে। আমলা মরবে, কামলা মরবে, নায়ক মরবে, অধিনায়ক মরবে, সর্বাধিনায়ক মরবে, ইঞ্জিনিয়ার মরবে, কন্ট্রাক্টর মরবে, আয়কর-দায়কর পাইকারি হারে মরবে, উকিল মরবে। কাজেই কিস্যু হবে না, দুর্নীতি চলবে।

এক কোটি টাকা চুরি করে ধরা পড়লে বুঝতে হবে চুরি করা উচিত দু-কোটি টাকা। কারণ তাহলে ভাগ্যবিধাতাদের পার্সেন্টেজ বেশি হবে। টাকায় সব হয়। শুধু ব্যবহারটা জানতে হয়। হা-হা-হা।

ফরিদ সাহেবের আহত পৌরুষ চাঙা হয়ে উঠলো। তিনি স্ত্রীকে কাছে টেনে নিলেন। তার স্ত্রী লাল হয়ে বললেন, তবু দুর্নীতি-টুর্নীতি নিয়ে হরতাল-টরতাল ডাকা ঠিক না। মন্ত্রী-মিনিস্টার হলেই কি মান-সম্মান থাকবে না নাকি ?

আমার কিন্তু লোকটার জন্যে খুবই মায়া লাগছে। আহা, বেচারা।

স্বপ্নপুরাণ

আপার মেজাজটা আজ বেশ ফুরফুরে। সারাদিন একটা বই পড়েছেন। হুমায়ূন আহমদের এলেবেলে। বেশ আমুদে বই।

আজ দিনের বেলায় কোনো কাজ ছিল না। হরতাল ছিলো। তার দলই ডেকেছে। অর্ধদিবস হরতাল। নতুন-পুরনো নানা দাবিদাওয়া নিয়ে ডাকা হয়েছে হরতালটি। আসল কথা মাঠ গরম করা। শীতকাল এলেই বাঙালির চাই গরম আঁচ। আন্দোলন না থাকলে বাঙালির শীতকালটা জমে না। তাছাড়া সরকারি দলের মতিগতিও ভালো নয়। কো-অপারেশন দিতে চাইলেও নিতে চায় না। সবকিছু নিজে নিজে করতে চায়। তাছাড়া সবকিছু লুটেপুটে খাচ্ছে। ঠিকাদারি কাজ থেকে ঝাড়ুদারের পদে লোক নিয়োগ পর্যন্ত চলছে পলিটিক্যাল রিক্রুটমেন্টে। এটা সহ্য করা যায় না। তার পার্টিটি দেশের সবচেয়ে বড় দল, অন্তত তিনি তাই মনে করেন। কিন্তু দেশপ্রেমের কারণে তা করেন না। জনগণের দুর্ভোগ বাড়িয়ে তিনি নিজের ভালো চান না।

তবে মাঝেমধ্যে হরতাল ডাকা ভালো। দোকান যে খোলা আছে, তা প্রমাণের জন্যই তা দরকার। অবশ্য তাতে গরিবের দুঃখকষ্ট বাড়ে, রিকশাঅলা শ্রেণীর লোকদের খুবই কষ্ট হয়।

রিকশাঅলাদের ব্যাপারটি তিনি খুব ভালো বোঝেন। তার নিজের কিছু রিকশা আছে। পার্টির যেসব গরিব কর্মী মারা গেছে তাদের পরিবারকে দেওয়া। সেই রিকশাঅলারা প্রায়ই তার কাছে আসে। একটা রিকশায় তো একটা মাইক্রোফোন স্থায়ীভাবে লাগানো। তাতে সারাদিন বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বাজানো হয়। এছাড়া অসুবিধা হয় রোগীদের। একবার হরতালের সময় একটা টেলিফোন এলো। টেলিফোনের অপর প্রান্তে এক তরুণ। বললো— আপা, আমার বাবা হাসপাতালে, যে-কোনো মুহূর্তে মারা যেতে পারেন। বাবার মৃত্যুশয্যার পাশে আমি উপস্থিত থাকতে চাই। আমি কী করে এখন মিরপুর থেকে ডিএমসিতে যেতে পারি, আপনি কি বলে দেবেন?

আপা তাকে কী জবাব দেবেন, বুঝতে পারেননি। কেবল তার চোখ ছলছল করে উঠেছে। পিতৃবিয়োগের দুঃখ তার মতো আর কে বুঝেছে?

আজকের হরতালটিও যথারীতি সফল। হরতাল উপলক্ষে বিবৃতিটি তৈরি করাই আছে। আগের সরকারের আমল থেকেই তৈরি করা। সরকারের স্বৈরাচারী আচরণের প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল করার মাধ্যমে জনগণ এই সরকারের বিরুদ্ধে তাদের অনাস্থাই জ্ঞাপন করলো। এই সরকারের ক্ষমতায় থাকবার কোনো অধিকার নেই। সেই বিবৃতিতে তারিখ বসিয়ে একটু পরে পত্রিকা অফিসগুলোতে পৌঁছাতে হবে। প্রচার সম্পাদক সেই দায়িত্ব পালন করবেন। বিবৃতিটি ছাপা হবে তার নামে। তার নিজের কোনো কাজ নেই। সবকিছুই ঘটবে আপনাআপনি।

আজ কোনো প্রোগ্রাম নেই। হরতাল পালিত হয়েছে শান্তিপূর্ণভাবে। ফলোআপ কর্মসূচি ঘোষণার দরকার নেই। বিকেলে একটা মিটিং হয়েছে সিটি কমিটির। কেন্দ্রীয় নেতারা তাতে বক্তৃতা করেছেন। কিন্তু এসব সভায় তার যাবার দরকার নেই। সুতরাং তার আজ বেশ অবসর।

অবসর কাটানোর জন্য তিনি বসলেন টিভির সামনে। একটু পরে খবর হবে। এখন হচ্ছে বিজ্ঞাপন। ইদানীং বিজ্ঞাপনগুলো বেশ ঝরঝরে হচ্ছে। একটা শাড়ির বিজ্ঞাপন হচ্ছে— জিয়া, জিয়া, জিয়া। আপা হেসে ফেললেন।

তার সঙ্গে বসে টিভি দেখছে দুজন ছাত্রনেতা। এদের একজন দেখতে অনেকটা তার ছোটভাইয়ের মতো। একই বয়স। সে কারণেই এই ছাত্রনেতাটিকে তিনি খুবই ভালোবাসেন। ছেলেটি আপার হাসির মাজেজা ধরে ফেললো সহজেই। সে-ও হাসলো। খবর শুরু হয়ে গেছে। মাদামকে দেখাচ্ছে। তাই দেখানোর কথা। তিনি একটা জনসভায় বক্তৃতা করছেন। ১০ মিনিট ধরে সেই বক্তৃতা চলছে। তিনি বেশ জাতিগঠনমূলক কথাবার্তা বলছেন। বলছেন, 'দেশে এখন দু-ধরনের রাজনীতি চলছে, একটা উন্নয়নের রাজনীতি আর একটা ধ্বংসের রাজনীতি; একটা উৎপাদনের রাজনীতি, আর একটা হরতালের রাজনীতি..।' আপা দারুণ পুলক অনুভব করলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আগের শাসকটি ঠিক একই ভাষায় কথা বলতো। তবে কবিতা-টবিতা লেখার বাতিক থাকায় তার বাংলাটা ছিল পরিশুদ্ধ। তাছাড়া উচ্চারণও ছিলো নির্ভুল। জাতীয়তাবাদী শব্দটিকে যাতীয়তাবাদী বলতো না। তবে তার চেহারাটা ফোটোজেনিক ছিলো না। হাসলে মনে হতো কাঁদছে। কিন্তু মাদামকে দেখতে ভালোই লাগে।

আরো আশ্চর্যের বিষয়, এসব কথা তাকে খুব মানিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে না যে তিনি কখনো হরতাল আহ্বান করতেন। অথচ কথায় কথায় হরতাল ডাকায় তার জুড়ি ছিলো না। হরতালগুলো সাধারণত সবাই মিলে ডাকা হতো। কিন্তু একবার মাদামের দল ডাকলো একাকীই। যথারীতি সেই হরতালও সফল হলো। তখন তার দল বক্তৃতা করলো: অমুক লীগকে ছাড়া বাংলাদেশে হরতাল হয় না, এটা ঠিক নয়।

মাদামের বক্তৃতা চলছেই। 'আগে ছিলো স্বৈরাচারের আমল, তখন দরকার ছিলো হরতালের। এখন গণতন্ত্রের আমল। এখন আর হরতালের দরকার নেই।'

ছাত্রনেতা দুজন খেপে গেছে। একজন উঠে দাঁড়িয়েছে উত্তেজনায়। অন্যজন হাতের আঙুল ফোটাচ্ছে। রাগ হলে সাধারণত সে আঙুল ফোটায়। সে বললো: আপা, শুনেছেন, কী কয় ? এ তো পুরো আগেরটাকে কপি করছে। কার্বন কপি নয়, ফটোকপি।

আপা তাদের কথা শুনতে পেলেন না। তিনি কী যেন এক গভীর ভাবনায় আচ্ছন্ন। ছেলেটি সেদিকে খেয়াল করলো। বললো: আপা, আপনি কি অতো-শতো চিন্তা করছেন ? আপা, বেশি চিন্তা করবেন না। চিন্তা করলে আপনাকে খুব কঠিন মহিলা মনে হয়। অনেকটা শিশির ভট্টাচার্যের আঁকা কার্টুনের মতো। আপা, বলেন না, কী ভাবছেন ?

আপা সম্বিত ফিরে পেলেন। তার লজ্জা লাগছে। কারণ তিনি ভাবছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। তিনি মনে মনে নিজেকে বসিয়েছিলেন ওই টিভি পর্দায়। নিজেকে বসিয়েছিলেন ক্ষমতার কেন্দ্রে। বিরোধীদল হরতাল ডেকেছে এবং জবাবে তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, 'ভাইয়েরা আমার। এখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি ক্ষমতায়। এখন আর মার্শালম্যানরা ক্ষমতায় নেই, এখন ক্ষমতায় সাধারণ মানুষেরা, কৃষকের ছেলেরা, শ্রমিকের ছেলেরা। এখন আর হরতালের দরকার নেই। হরতাল করলে জনগণের দুর্ভোগ বাড়ে।' এই বক্তৃতা দিচ্ছেন তিনি গম্ভীর মুখে। তার চোখে চশমা। তাকে কি তখন খুব খারাপ লাগবে ? মনে হয় না। সবচেয়ে বড় কথা, মাদাম তখন বিবৃতি দেবেন; বলবেন, হরতাল হলো বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত প্রতিবাদ জানানোর গণতান্ত্রিক রীতি। এর বিরুদ্ধে যারা কথা বলেন, তারা গণতন্ত্র হত্যাকারী, একদলীয় শাসনের প্রণেতা। আপা ভাবছিলেন, এসব গালি শুনতে তার কেমন লাগবে ? এদেশে জনগণ সবসময়ই অপোজিশানের পক্ষে, তখন বল আর তার কোর্টে থাকবে না।

তবুও তার ভালোই লাগবে আসলে। টিভি-ক্যামেরার সামনে উৎপাদনের রাজনীতি করতে কারুরই খারাপ লাগার কথা নয়।

— কী বলো, তোমরা ?

আপা জিজ্ঞেস করলেন ছাত্রনেতাদের।

কী বিষয়ে আপা ?

আপা আবার লজ্জিত হলেন। মানুষের বুকের গভীরে বহু কথা থাকে, খুব কাছের সঙ্গীটিকেও তা বলা যায় না।

আমি কিরূপে সর্বস্বান্ত হইলাম

কী খাবেন ?

ভাবাভাবির কিছু নেই। চটপট উত্তর। খাবো, তবে একটা শর্তে। গাড়িটা কিন্তু আমার।

যিনি খাওয়াবেন, তিনি খুবই অতিথিবৎসল। একবার একজন ডাবের জল খেতে চেয়েছিলেন তার কাছে। খাওয়াতে পারেননি। পরের দিন বাসায় গিয়ে হাজির। এক ডজন ডাব হাতে। এরপর থেকে তিনি নিজের ঘরে সবসময় ডাব রাখেন। চাইলেই বরফ মিশিয়ে পরিবেশন করেন। অতিথি যা চাইবেন এই ভদ্রলোক তাই দিয়ে দিতে প্রস্তুত। কোনো এক দেশে নাকি অতিথি আপ্যায়ন করা হয় স্ত্রী-সঙ্গ দিয়ে, ভাগ্যিস ভদ্রলোক সেই রীতি জানেন না।

ভদ্রলোক বললেন: নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। যতো ইচ্ছে কোল্ড ড্রিংকস খান। ছোট বোতল, বড় বোতল, ক্যান। বিদেশী ক্যানও আছে। তবে কথা কী জানেন, ছিপিটা আমার। ওটা দেখা, কালেক্ট করা, পাওয়ার আনন্দ, না-পাওয়ার বেদনাটা উপভোগ করা আমার নেশায় পরিণত হয়ে গেছে। কাল আমার ছোটছেলেটা আমাকে না দেখিয়ে একটা বোতলের মুখ খুলে ফেলেছিলো বলে ওর গালে পাঁচ আঙুল বসিয়ে দিয়েছি। হারামজাদা।

আমিও ছাড়বার পাত্র নই। ভদ্রলোকের যা নেশা, আমার তা রোগ। চোখের সামনে একটা লোক গাড়ি নিয়ে যাবে, আর আমি তা চেয়ে-চেয়ে দেখবো, আমার করার কিছু থাকবে না, তা হয় না। আমি বললাম, তাহলে খাবো না। যদি খেতেই হয় তবে গাড়ি আমার। এক টাকা দশ টাকা চাই না, ফুটবল পেলেও দরকার নেই, কিন্তু মোটরসাইকেল কিংবা গাড়ি পেলে...। আলোচনার পরিণতিটা হয়ে গেলো যৌথ নদী কমিশন বৈঠকের মতো। বিচার মানি, কিন্তু তালগাছটা আমার।

ছিপি না পেলে আমি খাবো না। ভদ্রলোক খাওয়াবেনই, তবে ছিপি ছাড়া। খাপ ছাড়া ব্যাপারটাই আমার কাছে খাপছাড়া। খাপ পেলে আমি খাবো, নইলে না।

ব্যাপারটা জাতিসংঘে উঠলো। স্ত্রী বললেন, আগে খুলেই দেখো কী আছে তারপর ভাগ করো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমার স্ত্রী বললেন, এ যে দেখছি বীরবলের গল্পের বোকার তালিকার মতো। আমার যদি একটা ঘোড়া থাকতো, আমি ঘুরে বেড়াতাম। আমার যদি একটা বাঘ থাকতো তোর ঘোড়াটাকে খেয়ে ফেলতো। তারপর মারামারি দুই বোকায়। হি-হি-হি।

তার হি-হি-হি আমার ভালো লাগছে না। আমার চোখ লাল হতে শুরু করেছে, চুল খাড়া। সাইক্লোনের পূর্বাভাস। ১০ নম্বর। তিনি চুপ করে গেলেন।

এ হচ্ছে একদিনের ঘটনা। কয়েকটা দিন গেছে আমার এমনি। পত্রিকায় আর টিভিতে বিজ্ঞাপন দেখে শুরু। পুরো জীবনযাপনের স্টাইলটাই গেলো পাল্টে। সকালের নাশতায় এক গ্লাস কোক। রাতে ঘুমুতে যাবার অগে ইসবগুলের ভুষি সহযোগে এক গ্লাস কোক। অতিথি আপ্যায়নে এক গ্লাস কোক। বড় বোতল নয়, ক্যান নয়, সাত টাকা দামী একটা বোতল। বোতল দেখলেই ছোঁ। ওপেনার দিয়ে ওপেনিং। একেবারে আলীবাবার চিচিং ফাঁক। ভেতরে ৪০ দস্যুর সঞ্চয় একখানা গাড়ি। ফস। ভোটের আগেই কেবল ফস করবার কথা, কিন্তু এখন করে যখন-তখন। তারপর দুই চোখে একটা বাঁকানো ঠোঁটে মুচকি হাসি। আবার চেষ্টা করুন। ধুস শালা।

এক মাসের বেতন সাত দিনেই ফস। আমরা একটা আলাদা ডিপার্টমেন্ট খুলেছি সংসারে। ছিপিগুলো সেই ডিপার্টমেন্টে ভাগ-ভাগ করে রাখা হয়। 'আবার চেষ্টা করুন' গুলো রাখা হয়েছে ওয়েস্ট পেপার বক্সে। ভিক্ষার চাল রাখবার কৌটায় এক টাকা। আরো আছে। ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা। আলাদা আলাদা বাক্স। সিগনেচার পেন দিয়ে আর্ট পেপারে লিখে স্কচটেপ দিয়ে লাগিয়ে রাখা। ওয়েস্ট পেপার বক্সটা উপচে পড়ছে। আবার চেষ্টা করুন। চেষ্টা করেই চলেছি।

রবার্ট ব্রুসও এতোটা পারতেন না। ভোরের কাগজ-এ চিঠি ছাপা হয়েছে। পত্রলেখক উপদেশ দিয়েছেন, ওই ছিপিতে 'আবার চেষ্টা করুন'-এর বদলে লেখা হোক 'সাত দিন পরে চেষ্টা করুন', 'কোক-ফান্টা গ্যাস্ট্রিক আলসারের জন্যে ক্ষতিকর', 'অতিরিক্ত কোল্ডড্রিঙ্কস খেলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়' ইত্যাদি। লিখলেও কোনো লাভ হতো না। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। আমাকে নিবৃত্ত করবে সাধ্য কার ? আমি কিনতামই। ট্রাই অ্যান্ড ট্রাই এগেইন। একবার না পারিলে দেখো শতবার। গুণে গুণে একশবার ট্রাই করলাম। প্রবাদ হচ্ছে জ্ঞানীগুণীদের জীবনের গবেষণার সার। বৃথা যেতেই পারে না। আমার জীবনে ফলটি দাঁড়ালো ৭৩টি 'আবার চেষ্টা করুন', ২৫টি একটাকা, ২টি পাঁচটাকা। তাতে হতোদ্যম হলে তো চলবে না।

বার্থ ডে পার্টিতে কেস আনাও। ম্যারেজ ডে এবার একটু নাহয় বড় করেই করলাম।

অফিসে গিয়ে লোকজনকে জিজ্ঞেস করি, কোক খাবেন। একটাই শর্ত। পয়সা দেবো আমি, কোক খাবেন আপনি। বিনিময়ে আপনি আমাকে দেবেন ছিপিটা। সবাই খুশি, আমিও খুশি। ছিপিটা আমার হাতে তুলে দিয়ে সবাই এমন একটা ভাব করে যে কত্তো উপকার করলাম। আমিও কৃতার্থবোধ করি। যাক, কোক কেনার একটা বৈধ অজুহাত তো পাওয়া গেলো।

পাড়ার মুদির দোকানে একটা ফুটবল টাঙানো। ইটালিয়ান ফুটবল। একজন ক্রেতা পেয়েছেন। গর্বিত দোকানি সেটা দোকানে রেখে দিয়েছেন। ওই দোকানেই দেখলাম আরেক কৌশল। কোকের বোতল আলোর দিকে ধরে ফাঁকা জায়গাটায় চোখ বসিয়ে বাইরে থেকে দেখে বোঝা ভেতরে মাল কী আছে। আমি নিজেও চেষ্টা করেছি বোঝার। ব্যর্থ চেষ্টা। বোঝা যায় না। দোকানি মহাচাপাবাজ। এমন ভাব করে যেন চোখদুটো তার এক্সরে মেশিন। পর্দার আড়ালের খবর সব জানা। সামনে দিয়ে ঘোরতর পর্দানশীনার চলাচলও বিপজ্জনক। এতোই যদি তোমরা দেখতে পাবে বাপু, তবে একটা গাড়িও তোমরা পেলে না কেন। সিলেটে, ফরিদপুরে, গুলশানে— এক এক করে ছটি গাড়িই তো শেষ হয়ে গেলো।

পত্রিকা ওল্টালেই এই এক বড় দুঃসংবাদ। 'এবার গাড়ি পাইয়াছে ড্রাইভার নিজেই।' কচু কাটতে কাটতে পেশাদার খুনি, আর গাড়ি চালাতে চালাতে গাড়ির মালিক!

ধীরে ধীরে সব শেষ হয়ে এলো। পকেটের টাকা আগেই ফুরিয়েছে। বৌয়ের গয়নায় এখনো হাত পড়েনি। তার আগে ছটি গাড়ি শেষ। পত্রিকার খবর যোগ করলে অবশ্য গাড়ির সংখ্যা আরো বেশি হবে। ওই হিসেবে অবশ্য ভুল থাকতেই পারে। বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলো ঢোলকলমি পোকার কামড়ে শত শত মানুষ হত্যা করেছে। আদতে দেখা গেছে, ঢোলকলমি পোকার কোনো ক্ষতিকারক ক্ষমতা নেই। খুবই নিরীহ ধরনের পোকা। একবার দৈনিক ইত্তেফাকে ছাপা হলো : 'কপাল কারে কয়'। খুলনার একই ব্যক্তি লটারিতে এক লাখ টাকার প্রথম পুরস্কার আর ৫০ হাজার টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার পেয়েছে। দুদিন পর যথারীতি ক্ষমাপ্রার্থনা। প্রেমিকাকে পটাতে গিয়ে এই মিথ্যে সংবাদ রটানো হয়েছে। আসলে এ ধরনের কিছুই ঘটেনি। প্রেমিকাকে পটাতে দু-চারটা গাড়ি তো লোকজন পেতেই পারে।

সব খেলা ভেঙে যায়। এই গাড়ি-গাড়ি খেলাও ভেঙে গেলো। প্রাইজবন্ডে ৫০ হাজার-লাখ টাকা পাওয়া কাউকে যেমন চোখে দেখা যায় না; দেখা যায় কেবল সংবাদপত্রে— গাড়ি পাওয়া ভাগ্যবানদেরও আমরা কেউ চোখে দেখলাম না। না-দেখেই ভালো হয়েছে। টিভি-পর্দায় সুবর্ণা মুস্তফা মারুতি গাড়ি পেলেন, এই দৃশ্যই সহ্য করা যায় না; চোখের সামনে কাউকে পেতে দেখলে তো অসহ্য বোধ হবেই।

যাই হোক, একটা গাড়িও পেলাম না। পাবো যে প্রায় নিশ্চিত ছিলাম। এখন মনে হচ্ছে না-পেয়েই ভালো হয়েছে। ইন্ডিয়ান গাড়ি। নিশ্চয়ই কোনো রাজনীতি আছে।

এই লেখাটা লিখতে বেশ কষ্ট হয়েছে। এখন একটা কোকাকোলা খাওয়া দরকার। শর্ত একটাই। ছিপিটা আমার। গাড়ি ইন্ডিয়ান হলেও ক্ষতি নেই। একটু আগে যে-মন্তব্য করেছিলাম তা স্রেফ ইয়ার্কি করে। হে যমদূত, তুমি কি রসিকতাও বোঝো না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পণ্যবাদী প্রগতি

যে-যুগের যে-ভাও।

সেদিন অফিসে খুব হাসাহাসি হচ্ছিলো। একজন রসিয়ে বলছিলেন এক প্রখ্যাত গায়িকার কথা। তার গানের ক্যাসেট প্রায় বিশ হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেছে। বাড়িতে গিয়ে দেখা গেলো টিউবওয়েলের পাড়ে গায়িকা দাঁত মাজছেন কয়লা দিয়ে। হি-হি-হি। চোখ বন্ধ করে হেসে এই গল্প শোনালেন একজন।

মনটা খারাপ হয়ে গেলো। আমাদের শৈশবে আমরা বিস্তর দাঁত মেজেছি কাঠকয়লা দিয়ে। সবচেয়ে ভালো ছিল বাঁশের কয়লা। আর ছিল দাঁতন। নিমগাছের ডালের। ঘোড়ানিমের হলে চলবে না, হতে হবে জাতনিম। জাতনিমের ফল হয় না, ঘোড়ানিমের হয়। বিশ বছর প্রতিদিন নিমডাল দিয়ে দাঁত মাজলে সাপে কাটলেও মৃত্যু নেই। ছোটবেলায় শেখা। তারপর কোন্ ফাঁকে কয়লার স্থান দখল করলো লাল-নীল-সবুজ জেল আর তর্জনীর জায়গা টুথব্রাশ— আল্লামালুম।

কয়লার জায়গায় টুথপেস্টটা তো তবু বোঝা যায়। কিন্তু কী করে যে আমরা ঢুকে গেলাম ওয়ানটাইম বলপেন আর চিপস সংস্কৃতির ভেতরে, কতো তাড়াতাড়ি আর কতো ভীষণভাবে—বোঝা মুশকিল। বিয়ের আসরে রেজিস্টারে দস্তখত করতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে নববধূ— একি! এ যে কালির কলম। কতোদিন কালিতে লিখি না!

হ্যাঁ, এখন কলম বলতে বোঝায় ওয়ানটাইম বলপেন, খাবার বলতে চিপস, ক্র্যাকারস, গ্রিননাট। 'ভুলো না আমায়'-এর বদলে ফে, কিংবা টাচ।

আমার ভাস্তে দীপ্ত পড়ে কেজি ওয়ানে। তার দাবি হচ্ছে সাত টাকা। সেদিন তার মা তাকে দশ টাকা দিয়েছেন। সে ফেলে দিয়েছে জানালা দিয়ে। দশ টাকার ভেতরেই যে সাত টাকা থাকে, তা সে মানতে চায় না। তো সাত টাকা দিয়ে কী হবে ? সে কোল্ডড্রিংস খাবে। এছাড়া তার খাদ্যতালিকায় আছে টিভি-বিজ্ঞাপনে-দেখা নানা ফাস্টফুড। এর মধ্যে একটি হলো টিউলিপ। ওটা কী জিনিস ? ওটাও একটা পানীয়, ফলের গন্ধযুক্ত। আম খাবো না, জাম খাবো না, কৃত্রিম ফলের রস খাবো। বাচ্চারা 'র' উচ্চারণ করে 'ল' দিয়ে। রস তাই হয়ে যায় লস। খাও।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'ফুলের মূল্য' গল্পটি ছিল আমাদের পাঠ্য। ম্যাগী ভাইয়ের কবরে ফুল দেবে, কবরটি ভারত-বাংলাদেশের কোথাও হবে। ফুল কেনার জন্য তাই সে প্রভাতবাবুর হাতে তুলে দিয়েছিল টাকা। সেই টাকা প্রভাতবাবু দিব্যি মেরে দিয়েছিলেন। মানুষের যে-কোনো কর্ম কিংবা অপকর্মের পেছনে থাকে যুক্তি। প্রভাতবাবুর পেছনেও ছিল। তিনি আমাদের বোঝালেন, বাংলায় ফুল কিনতে টাকা লাগে না সত্যি, কিন্তু ওই টাকা খরচ করার মধ্যে ম্যাগীর একধরনের সান্ত্বনা ছিলো। তাই তিনি টাকাটা ফেরত দিতে পারেননি। অল্প কটা সেন্ট মেরে দিয়ে প্রভাতবাবুও কম অনুশোচনায় ভোগেননি। লিখে ফেলেছেন 'ফুলের মূল্য' নামের অসাধারণ গল্পটি।

তাতে আমাদের লাভই হয়েছে। কিন্তু আজ মনে প্রশ্ন জাগে, সারা বাংলাদেশে ফুলের বাণিজ্য যে হারে জমজমাট, তাতে পুরো একশ পাউন্ড মেরে দিয়েও কি এখন কোনো প্রভাতবাবুর পক্ষে সম্ভব হবে এই নিয়ে গল্প লেখা।

ঢাকা শহরে একবার ধুম পড়ে গিয়েছিল চাইনিজ রেস্তোরাঁর বাণিজ্যের। এখন কোন ব্যবসাটা লেটেস্ট ? পিজা বিক্রির। পিজাল্যান্ড, পিজাহাট, পিজাইন, পিজাপ্যালেস কতো কী! প্রতিটি রাস্তার মোড়ে। ভবিষ্যতে মনে হচ্ছে আরো গজাবে। নামকরণ নিয়ে যাতে সংকটে পড়তে না হয় সেজন্য একটা তালিকা দিয়ে দিই। পিজা ডিস্ট্রিক্ট, পিজা কান্ট্রি, পিজা কন্টিনেন্ট, পিজা ওয়ার্ল্ড, পিজা বিল্ডিং, পিজা ম্যানশন, পিজা কর্নার, পিজা রুম, পিজা কিচেন, পিজা বাথরুম।

একটি জনপ্রিয় দৈনিকের সাহিত্য-সম্পাদকের কাছে গেলেন একজন তরুণ কবিযশ প্রার্থী। সাহিত্য-সম্পাদক নানা গল্প করলেন; বললেন, কবিতা দিয়ে যাও। তারপর নিয়মিত যাতায়াত। বললেন, বাসায় এসো। বাসাটা চেনা হলো। একদিন পত্রিকা অফিসে ঢোকামাত্রই তরুণ কবিটি হাতে লাভ করলেন বাজারের থলের হাতল। বাজারটা বাসায় পৌঁছে দিয়ে এসো। তার কয়েকদিন পরে যুক্ত হলো সম্পাদক সাহেবের দুই ছেলেকে অঙ্ক বুঝিয়ে দেবার ভার।

ভাই, আমার কবিতা ?

হবে, হবে।

তরুণও হাল ছাড়ে না। কবি তাকে হতেই হবে।

এখন আর সাহিত্য-সম্পাদকদের সে সুদিন নেই। এখন আর তরুণীরা ঘিরে থাকে না সাহিত্য-সম্পাদকের টেবিল।

ওই চাঁদ উঠেছে থিয়েটারপাড়ায়। হাজার হাজার নাটকের গ্রুপ। অক্লান্ত পরিশ্রম করে কাজ শিখছে ছেলেমেয়েরা । চারদিকে শুদ্ধ উচ্চারণ, আবৃত্তি ও টিভি উপস্থাপনা শেখার ক্লাস। নগদ টাকায়। কেউ কেউ শর্টফিল্মের দুয়ারে। অহোরাত্র একই চিন্তা— যদি লাইগা যায়। একবার টেলিভিশনে মুখ দেখালেই স্টার। তারপর বিজ্ঞাপনী ফার্ম। কিংবা জেনারেল সাপ্লায়ার। অমন তারকাকে কাজ দেবে না, কে অমন সংস্কৃতিবিমুখ ? সব তারকার পকেটেই আছে একটা চলিষ্ণু বিজ্ঞাপনী সংস্থা। কেউ কেউ আবার শুধু অভিনেতা নন, নেতাও; তারা বাগিয়ে নেন কোটি কোটি টাকার ঠিকেদারি।

জীবন এখন ফাস্ট। শেরাটনের মেঝের মতো পিচ্ছিল। অর্থনীতি বাজারমুখী। ছোট ছোট পণ্যে ভরে যাচ্ছে দেশ। প্রতিযোগিতা দিয়ে চলছে টিভি বিজ্ঞাপন। আমাদের জীবনযাপনের ধরনই যাচ্ছে পাল্টে। সাহিত্য সম্পাদকরা তরুণ লেখক খুঁজে পাচ্ছেন না, তারা সবাই ধরনা দিচ্ছে অন্যত্র। লিখছে বিজ্ঞাপনের পাণ্ডুলিপি। সুতরাং সাহিত্যপাতা ভরতে হচ্ছে আজেবাজে লেখকের কথাকার্টুন দিয়ে।

পাঠক সেসব পড়বে কেন ? তারা চাইছে স্টারের মুখ।

যে-যুগের যে-ভাও। পত্রিকার সম্পাদক তাই গ্লাসনস্তের বদলে পড়ছেন তারকালোক। অধীত বিদ্যেয় কুলোচ্ছে না।

পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে যে খাপ খাইয়ে চলতে পারে সেই তো প্রগতিশীল আসলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমার কিছু ভাল্লাগে না

দিনের পর দিন দিন যদি আপনার এরকম হয়, তাহলে আপনি ভুগছেন বিষণ্নতায়। বিষণ্নতা একটি রোগ।

খ্যাতিমান বহুজাতিক কোম্পানির বহুল প্রচারিত বিজ্ঞাপনের গুণে এমত ভাবা নিশ্চয়ই সঙ্গত ছিলো যে, আমি ভুগছি বিষণ্নতায়।

প্রথমে বলে নেয়া যাক লক্ষণগুলি। আমার কিছুই ভাল্লাগে না, কিস্যু না। সব কিছুই খারাপ লাগে। পাখির জুলুম, মেঘের জুলুম খারাপ লাগে। হাসিখুশি সুখি মানুষ দেখলে তো মনে হয় কষে গাল বরাবর মেরে দেই একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চড়।

আগে রবীন্দ্রসঙ্গীত আমার প্রিয় ছিলো খুবই। দিনরাত বেজে চলতো ক্যাসেট, আমিও করতাম গুনগুন। শুধু তা নয়, গীতবিতান প্রায় মুখস্থ হবার জোগাড়। এখন এসব কিছুই ভালো লাগে না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে রীতিমতো করুণা করতে ইচ্ছে করে। এতো বড়ো দাড়িচুলঅলা একটা মানুষ এইসব ছেলেমানুষি লেখা লিখে গেছে—আহা, ওসব যে দাঁড়ায়নি কিছুই, মুখ ফুটে তাকে কেউ একটুখানি বললোও না।

আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস সকালবেলায় চায়ের টেবিলে দৈনিক পত্রিকা পড়া। কিন্তু ওটিও ছেড়ে দিয়েছি সম্প্রতি। কারণ একটাই, ভালো লাগে না। বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলির মান হচ্ছে মুদি দোকানিদের উপযোগী। এদেশে বেশি চলে যে দৈনিকটি, তার একটি শিরোনাম এরকম: 'রংপুরে লড়াই হইবে বাঘে-মহিষে কিংবা সেয়ানে-সেয়ানে', 'বাঘে-মহিষে'র সঙ্গে 'সেয়ানে'র পার্থক্যটা কী ? যেমন বাংলাদেশের সাংবাদিক, তেমন তাদের পাঠক। ছাগলের জন্যে ঘাসই উত্তম খাদ্য।

ছোটবেলা থেকেই আমার রস ও রসনাজ্ঞান টনটনে। আমার দেহের পৃথুলাকৃতির জন্যে দ্বিতীয় জ্ঞানটির মাত্রাতিরিক্ত প্রয়োগই যে দায়ী সন্দেহ নেই। অর্থাৎ খাবার-দাবারের ব্যাপারটি আশৈশব আমার খুবই প্রিয়। কিন্তু এ ব্যাপারটিকেও এখন আমার মনে হয় খুব স্থূল। খাদ্যগ্রহণ প্রক্রিয়াটি আসলে একটি স্থূল প্রক্রিয়া। একজন সুন্দর তরুণী হাত দিয়ে মেখে ভাত খাচ্ছে—এর চেয়ে অশ্লীল দৃশ্য আমার কাছে আর কিছু নয়। সুতরাং খাদ্যের প্রতিও আমার জন্মেছে একধরনের বিরূপ মনোভাব। কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না। শুধু-যে খেতে ইচ্ছে করে না তাই নয়, শুতেও ইচ্ছে করে না আজকাল। নারীসঙ্গকে মনে হয় অত্যন্ত কঠিন এক কাজ। একেকটা মেয়ে যতক্ষণ চুপ করে থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা সহ্যের সীমার কিছুটা ভেতরে থাকে, কিন্তু মুখ খুললেই মনে হয় কে যেন খুলে দিলো ল্যাট্রিনের ভেন্টিলেশন পাইপের মুখ। মেয়েদের মতো এমন অসংস্কৃত প্রাণী মানবসমাজে আর দ্বিতীয়টি নেই। এরা শেক্সপিয়র বোঝে না, নন্দনতত্ত্ব বোঝে না, এমনকি বোঝে না মার্কসকে। আমার কিছুই ভালো লাগে না। গোলাপ, যা আমার সমস্ত শৈশব ছিলো প্রবল কাম্য সুন্দর ব্যাপার, এখন মনে হয় একটি ভুল জ্যামিতির সমন্বয়। এর মধ্যে সিমেট্রি নেই, গন্ধটার মধ্যে একটা খ্যাত খ্যাত ভাব; আর সবচেয়ে বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কথা—গোলাপ ফোটে রাশি রাশি। যা-কিছু জনপ্রিয়, যা-কিছু অতিপ্রজ, তাই তো ক্লিশে। একবার এক তরুণী আমার জন্যে এনেছিলো এক অর্ধনিমীলিত গোলাপ। আমার মনে হয়েছিলো, এর চেয়ে গ্রাম্য ব্যাপার আর কী হতে পারে! বাজারে যে ভিউকার্ডগুলি বিকোয় সিকির দামে, তার সাথে থাকে যে দুআঙুল আর গোলাপ কুঁড়ি, এ যে অবিকল তারই প্রতিকৃতি। বলার দরকার নেই, ওই মেয়েটিকে আমি মূল্যায়িত করি নৈর্ব্যক্তিক দূরত্ব নিয়ে, অর্থাৎ তাকে আমি ফিরিয়ে দেই।

চলচ্চিত্র আমার ভালো লাগে না একেবারেই। একটি অতিপ্রশংসিত চলচ্চিত্রের চেয়ে একটি অতি নিকৃষ্ট নীলছবিকেও আমার মনে হয় উত্তম। আসলে চলচ্চিত্র যে একটি শিল্পমাধ্যম, তা নয়। যা-কিছু অশিল্প, তাই বিরক্তিকর, আবর্জনামাত্র। এখন যে লেখকের যে পুস্তকই আমি হাতে নেই না কেন, আমার মনে হয় হাতটা নোংরা হয়ে গেলো। বাংলাদেশে এখন আর কোনো লেখক নেই, আমার ধারণা এরকম। কবিতা তো এখন রীতিমতো অসম্ভব ব্যাপার। গত কয়েক দশকে এদেশে একটি কবিতাও লেখা হয়নি। সে কারণেই কবিতা-টবিতা আমার বিবমিষার উদ্রেক করে। আগে আমার বালক বয়সে, নাটক দেখতে যাওয়া আমার কাছে ছিলো বেশ মর্যাদার ব্যাপার। ইদানীং বেইলি রোড আমার কাছে বিখ্যাত মনে হয় শাড়ির দোকানের জন্যে, নাটকের জন্যে নয়। বস্তুত এদেশে এখন কোনো নাটক হয় বলে আমি মনেই করি না।

দিনের পর দিন আমার এই অবস্থা চলছে। সবকিছুকেই মনে হয় ক্লিশে। সূর্য ওঠা আর ডুবে যাওয়াকে মনে হয় ক্লিশে। খাওয়া-শোওয়াকে মনে হয় ক্লিশে। কারো চোখে পানি দেখলে তো মনে হয় শরৎচন্দ্রের চেয়েও ক্লিশে। রাজনৈতিক দল ও নেতাদের মনে হয় চতুর পতিতা মাত্র।

সবকিছুই আমার ক্লিশে মনে হয়, কেবল 'ক্লিশে' এই শব্দটি এখনও পর্যন্ত ক্লিশে হয়ে উঠতে পারেনি।

'দিনের পর দিন' এই অবস্থা চলতে থাকায় আমার মা (অত্যন্ত ক্লিশে একটি প্রপঞ্চ) খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন এবং আমাকে নিকটস্থ ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে দেন। কিন্তু ডাক্তার আমার রোগকে বিষণ্নতা বলে শনাক্ত করেননি। তার মতে বিষণ্নতা কোনো রোগই নয়। তাহলে আমার রোগটি কী ? আমি কি ভুগছি কোনো মর্মপীড়ায়, কোনো কঠিন বিরহে ? না, কেইস হিস্ট্রিতে তেমন কিছু নেই। আমার ভেতরে কি দেখা দিয়েছে ঐশী প্রত্যাদেশ লাভের পূর্বলক্ষণ, ঋষিত্ব লাভের পূর্বাবস্থা ? না, চিকিৎসকদের বক্তব্যের সঙ্গে তা মেলে না মোটেই।

ডাক্তার আমার সবকিছু খুব ভালোভাবে দেখেশুনে হাসতে হাসতে বললেন, কংগ্রাচুলেশনস।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। লিঙ্গভেদে আমি-যে পুরুষশ্রেণীর মধ্যে পড়ি, তাতে আমার নিজের কোনো সন্দেহ নেই। সেক্ষেত্রে আমাকে দেখে ডাক্তার অভিনন্দিত করছে কেন ? মাতৃত্বের কোনো লক্ষণ...

ডাক্তার আমার ভয় দূর করে বললেন, আপনি বুদ্ধিজীবী হতে চলেছেন। ইয়্যু আর গোয়িং টু বি অ্যান ইন্টেলেকচুয়াল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জাতীয় মশানীতির প্রাক-বিবেচনা

ব্যাপারটা প্রথম দফায় বুঝতে পারিনি। মাথার ওপর একঝাঁক মশা বেশ একটু দূরত্ব বজায় রেখে উড়ছিলো বটে, কিন্তু ওরকম তো কতোই উড়ে। একটু গাঢ় রঙের কাপড় পরলেই তো পেছনে লাগে মশারা। এখন মনে হচ্ছে, এটা কোনো সাধারণ ব্যাপার ছিলো না। পরিকল্পিতভাবে মশারা ফলো করেছে আমাকে। অফিস থেকেই পিছু নিয়েছে আমার।

পত্রিকায় একটি লেখা বেরিয়েছে আমার, মশা নিধনের আহ্বান জানিয়ে। ভোরে বেরুলো কাগজটা, দুপুর থেকেই টিকটিকির মতো আমার পিছু নিলো একঝাঁক মশা। আমি যেখানে যাই, এরাও সেখানে যায়। কী মুশকিল!

আমার জীবনে এ ধরনের অভিজ্ঞতা এই প্রথম। আমি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের তীব্র সমালোচনা করেও লিখেছি অনেকবার, কিন্তু কেউ আমাকে গণতন্ত্র শেখানোর চেষ্টা করেনি। অতীতে করেনি বলে বর্তমানে করতে পারবে না, তা নয়। লেখার কারণে এই প্রথম হুমকির মুখে পড়লাম এবং তাও মশাদের তরফ থেকে। বিষয়টা খুলে বলি। মশকতাড়িত হয়ে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরেছি। শুয়ে পড়েছি বেলাবেলি। চারিদিকে মশারির সীমাহীন বিরুদ্ধতা। লাইট জ্বালানো। তখনই লক্ষ করলাম ব্যাপারটা। প্রায় শ-দুয়েক মশা মশারির বাইরে। তাদের ১৯৯টি বসলো আমার পায়ের কাছে মশারির কোণে। একটি উড়ছে একাকী। ১৯৯টি মশা একযোগে টেনে তুললো মশারীর কোণাটা আর বাকি মশা ঢুকে পড়লো। ফোকর দিয়ে মশারির ভেতরে। ভেতরে ঢুকে কিন্তু সে তার কর্তব্য ভুলে গেলো না। মশারি টেনে তোলার দায়িত্বে ওই ১৯৯টির সঙ্গে যোগ দিলো ভেতর থেকেই। একেই মনে হয় বলা যায়, সংসদের ভেতরে-বাইরে আন্দোলন। তখন বাইরে থেকে আরেকটা মশা ঢুকে গেলো মশারি ভেতরে এবং ভেতরে ঢুকে যথারীতি যোগ দিলো মশারি টেনে তোলার কাজে। আমি কিন্তু তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবছি, দেখি না ব্যাটারা কী করে।

এ কায়দায়, সবকটা মশা ঢুকে পড়লো মশারির ভিতরে। আমি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম মশারির ভেতর থেকে। অতঃপর ঘরের ভেতর থেকে। মানুষের বুদ্ধির কাছে মশারা প্রথম দফায় হার মানলো। যে ২০০ মশাকে পাঠানো হয়েছিলো প্রতিশোধ গ্রহণে, তারা একযোগে বেরিয়ে আসতে পারলো না বলে রয়ে গেলো আমার মশারির মধ্যে। আমি ছদ্মবেশ ধারণ করে এক সংরক্ষিত এলাকায় আশ্রয় নিলাম, এ এলাকাটায় মন্ত্রী-মিনিস্টাররা থাকেন বলে সচরাচর মশারা এদিকে আসে না। সেই ডিপ আন্ডারগ্রাউন্ডে মশারির ভেতরে অলস জীবনযাপন করতে গিয়েই কতগুলো ভাবনা নিয়ে নাড়াচাড়া করবার সুযোগ মিললো। এই-যে ঢাকা শহরে ৭০ লাখ লোক, এরা মশার সঙ্গে পেরে উঠছে না কেন? কেন মনুষ্যরাজ্য আজ পরিণত মশক-রাজত্বে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উত্তরটা পেয়ে গেলাম আমার বিরুদ্ধে পরিচালিত মশাদের প্রথম কমান্ডো অভিযানের রণকৌশল থেকে। মশারা টিকে আছে, কারণ মশারা ঐক্যবদ্ধ। মানুষ পারছে না, কারণ মানুষ মূলত একা। সুতরাং মশা নির্মূলের জন্যে প্রথমেই যা করা দরকার, তা হলো 'ডিভাইড এণ্ড রুল পলিসি' গ্রহণ করা। মশাদের এই ঐক্য ভেঙে দিতে হবে। এজন্যে একটা কাজ করতে হবে। কৌশলে মশাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে হবে রামমন্দির-বাবরি মসজিদ বিতর্ক। ফলাফল পাওয়া যাবে হাতে-নাতে। মানুষের আর কিছু করবার থাকবে না, দেখা যাবে আপনাআপনিই ঝাঁকে-ঝাঁকে মশা পড়ছে আর মরছে। এছাড়া মশাদের উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে জীবনের প্রতি বৈরাগ্যে। সেজন্যে কাম্যু-কাফকা-বোদলেয়ার-প্লাথ পড়ানোর দরকার নেই, বাংলাদেশ টেলিভিশনের ধারাবাহিক নাটক আর খবর দেখলেই চলবে। দেখা যাবে, মশারা আত্মহত্যা করছে দলে দলে।

আরেকটা উপায় আছে। মশাদের ভিতর থেকে কিছুসংখ্যককে বানাতে হবে শিবিরকর্মী। তাহলেই আপনাআপনি বাকি মশারা হাত-পা কাটা অবস্থায় অসহায় হয়ে পড়বে। অবশ্য এই পদ্ধতির একটা মুশকিলের দিক আছে। ওই শিবির মশা কটাকে মারবে কে ? সরকার মারবে না, বিরোধীরা মারবে না, সম্ভবত অ্যারোসোল-মর্টিন-মশার কয়েলেও কাজ হবে না।

এতক্ষণ ধরে মশা মারার যে কটা পদ্ধতি প্রস্তাবিত হলো সব কটাই বেশ ইউটোপিয়ান। অনেকটা হবুচন্দ্রের ধূলি-বিতাড়নের প্রয়াসের মতো। তবে একটি উপায় আছে খুবই বাস্তব, খুব সহজ।

এই সময়ে এই শহরের সবচেয়ে ক্ষমতাধর ব্যক্তিটির নবনীত কোমল কপোলে একটি মশাকে বসবার সুযোগ করে দিতে হবে। তারপর তিনি তার শুভ্র সুন্দর জনসমর্থিত শক্তিশালী হাত দিয়ে নিজের গালেই একটা ছোট চড় মারবেন, তাতেই দেশ থেকে দূর হয়ে যাবে সব মশা।

গোপাল ভাঁড়ের প্লানচেট সাক্ষাৎকার

প্লানচেট-এর চোটপাটে গোপাল ভাঁড় নির্দিষ্ট সময়ের তিন ঘণ্টা পরে এই তিরানব্বই সালের বাংলাদেশে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তাকে দেখে এ-কথাকার্টুনিস্ট চমকে ওঠেন। এ-গরমের মধ্যেও গোপাল ভাঁড় আগামাথা ঢেকে রেখেছেন চাদরে। তার শরীরের পাশ মাঝেমধ্যে দেখা যাচ্ছে। মাথায় টুপি-পাগড়ি, কপালে নামাজের দাগ, গালভর্তি দাড়ি, ঘাড়ে গামছা, পরনে আলখাল্লা, এক হাতে তসবি—এযে আস্ত পীর মতিউর রহমান। তাই প্রথম প্রশ্ন—

: আপনি কি গোপাল ভাঁড় ?

: জি, আমিই গোপাল ভাঁড়, তবে আমার নাম জনসমক্ষে গোলাম ভাঁড়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

: আপনার এ বেশ কেন ?

: কেন, কোথাও ভুল হলো নাকি ? আমি তো হুজুরদের ফ্যাশান পুরোপুরি ফলো করে জ্বলজ্যান্ত হুজুর সেজে এসেছি।

: না, ভুল হয়নি, বেশ মানিয়েছে, কিন্তু...

: ভাইরে, এ তো তিরানব্বই সালের বাংলাদেশ, এদেশে তো গোপাল সাজা কঠিন, গোলাম সাজা সোজা, তাই এ বেশ।

: কিন্তু আমরা তো জানতাম আপনার পোশাক ছিলো দুধর্মের মিলনের প্রতীক। অর্ধেক দাড়ি, অর্ধেক টিকি, অর্ধেক দুতি, অর্ধেক লুঙি।

: আছে, এখানো আছে। চাদরের নিচে ঢাকা আছে। বর্ডার পার হলে ঐ বেশ দেখতে পাবেন। একেবারে আদভানীর মতো সেজেছি। এই দেশে আমি বলি 'নারায়ে তকবীর', ওই দেশে গেলে 'রাম নাম সত্য হ্যায়'।

: আচ্ছা, আচ্ছা, তো আপনার মর্তধামে অবতীর্ণ হতে এতো সময় লাগলো কেন?

: ওই সেই পুরনো গল্প। আমি তো ঠিক সময়েই রওনা হয়েছি। হাঁটতে ধরে দেখি, এক পা এগোই তো তিন পা পিছোই।

: থাক, থাক, আর বলতে হবে না। নবদ্বীপের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় উপস্থিত হতে দেরি করে আপনি ওই গল্প শুনিয়েছিলেন। ওটা আমরাও জানি। বরং আমাদের মুখে আপনি শুনুন। আপনি পথে নেমে দেখলেন আপনি এক পা সামনে হাঁটছেন আর দুই পা হাঁটছেন পিছনের দিকে। আধঘণ্টা হাঁটার পর আপনি গন্তব্য থেকে গেলেন আরো অনেক দূরে সরে। তখন আপনার মাথায় বুদ্ধি এলো। আপনি ঘুরে দাঁড়ালেন। তারপর এক ঘণ্টা হেঁটে আপনি রাজসভায় পৌছলেন। কি ? ঠিক ?

: হ্যাঁ, ঠিক আছে, তবে আরেকটু যোগ করতে হবে। আমি পথে নেমে দেখি এক পা সামনে এগোই তো দুই পা যাই পিছিয়ে। তাই তাড়াতাড়ি ঘুরে গেলাম আর হাঁটতে লাগলাম দ্রুত। অধঘণ্টা হাঁটার পরে দেখলাম বাংলাদেশে পৌছতে পারছি না। তখন দেখা মোল্লা দোপিঁয়াজার সঙ্গে। তাকে বললাম—ভাইরে, আমি বাংলাদেশে যেতে পারছি না কেন ? তিনি বললেন, তুমি তো গোড়াতেই ভুল করেছো। তুমি এক পা এগোও, দুই পা পিছাও। এটাই বাংলাদেশে যাবার উপায়। তোমাকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে না। বাংলাদেশও প্রতিদিন পিছাচ্ছে। বাংলাদেশ সামনে এগোয় নাই, কেবল পেছন দিকে হেঁটেছে। একাত্তর থেকে শুরু হয়েছে তার উল্টোদিকে হাঁটা। আবার রাজাকারতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং বাংলাদেশে পৌছাতে হলে তোমার হাঁটতে হবে উল্টোদিকে। মোল্লা দোপিঁয়াজার কথা শুনে তারপর আমি আবার উল্টোমুখো হলাম। তো এখন বলেন, আপনারা আমাকে ডেকেছেন কেন ?

: আমরা আপনার একটা সাক্ষাৎকার নিতে চাই।

: লজ্জা দেবেন না। এটা আমার এলাকা না। এটা হচ্ছে নাজমুল হুদা সাহেবের এলাকা। আপনারা তার সাক্ষাৎকার নেন। যখন যার জামানা। কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় গোপাল ভাঁড়, এরশাদের মন্ত্রিসভায় শাহ মোয়াজ্জেম আর খালেদা জিয়ার সভায় আছেন নাজমুল হুদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

: না, না, তাকে চটানো যাবে না। জানেন না তো, তিনি ইচ্ছে করলেই ডিএফপি'র বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিতে পারেন। সেইজন্যেই তার ইন্টারভিউ নেন। খুশি হবেন। আপনারা বিজ্ঞাপন পাবেন।

: আমাদের বিজ্ঞাপনের দরকার নেই। কী বলতে আমরা কী বলে ফেলবো, পরে আমাদের পত্রিকাই বন্ধ হয়ে যাবে। তার চেয়ে আপনিই কথা বলুন।

: তাড়াতাড়ি করেন, মশা কামড়াচ্ছে।

: আচ্ছা, বীরবল, নাসিরউদ্দিন হোজ্জা, মোল্লা দোপিঁয়াজা— এদের মধ্যে আপনি কাকে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন ?

: আমি এদের কাউকেই প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি না। আপাতত ভালো করছেন ওই নাজমুল হুদাই।

: নাজমুল হুদা সাহেবকে আপনি ঈর্ষা করেন ?

: কী যে বলেন! আমি কম লেখাপড়া জানা মানুষ, আমি কি একজন ব্যারিস্টারকে ঈর্ষা করতে পারি ?

: তাহলে আপনি কাকে ঈর্ষা করেন ?

: আমি ঈর্ষা করি ফালু সাহেবকে।

: আপনার কাছে কার কোন্ উক্তি সবচেয়ে স্মরণীয় বলে মনে হয় ?

: 'দুই মহিলা মিলিত হলে কিছুই উৎপাদিত হয় না'— শাহ মোয়াজ্জেম, 'রাষ্ট্রদ্রোহিতার মতো অপরাধ তো গণ্যমান্য লোকেরাই করে'— নাজমুল হুদা, 'চাকরির বয়সসীমা তো ত্রিশ বছর করেছি, এরপরেও ছাত্ররা রাজনীতি করছে কেন'— খালেদা জিয়া, আর 'এক মিনিটও শান্তিতে বসতে দিবো না'— শেখ হাসিনা।

: আচ্ছা বাংলাদেশে চাটুকারিতা শিল্পের বর্তমান মান সম্পর্কে কিছু বলুন।

: খুব বিকশিত হয়েছে এ শিল্প। একটা বাক্য শুধু শুনুন। মওলানা মান্নানের উক্তি—'সুন্দরবনের সব গাছ কেটে যদি কলম বানানো হয় আর বঙ্গোপসাগরের পানিকে যদি কালি করা হয়, তবুও এরশাদের গুণগান লিখে শেষ করা যাবে না।'

: আচ্ছা, একবার রাজার সন্তান লাভের খবর শুনে আপনি বলেছিলেন, মলত্যাগের মতো আনন্দ হলো। এখন এ ধরনের খবর শুনলে কী বলবেন ?

: একই কথা বলবো। তবে তা প্রমাণের জন্যে রাজাকে যখন জঙ্গলে নিয়ে যাবো, হাতে ধরিয়ে দেবো দৈনিক ইনকিলাব।

: ধরেন, আপনাকে বর্তমান মন্ত্রিসভায় জায়গা দেয়া হলো। তারপর ওই পায়েসের পুকুর আর গুয়ের পুকুরের গল্পটা প্রধানমন্ত্রী আপনাকে বললেন। আপনি কী জবাব দেবেন ? চাটাচাটি পর্যন্ত নামবেন ?

: আমি চাকরি ছেড়ে দেবো। সবার চেয়ে চরিত্র বড়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাজাকার ও মশা মারার জন্যে

জনগণ বিএনপিকে ভোট দেয় নাই

নাজমুল হুদা বলেছিলেন, স্বৈরাচারের আমলে আন্দোলনের স্বার্থে কিছু তরুণের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে দেয়া হয়েছিলো, কিন্তু এখন আর অস্ত্রবাজির দরকার নেই। পরে অবশ্য তিনি বিবৃতি দিয়ে বলেন, না, তিনি আগ্নেয়াস্ত্রের কথা বলেননি, বলেছিলেন কলমকে অস্ত্র বানাবার কথা। তা তিনি বলতেই পারেন। বিভিন্ন জিনিসকে অস্ত্র বানানোর প্রক্রিয়াটি তার মতো কে আর জানে ? তিনি এখন অস্ত্র বানিয়ে ছেড়েছেন বিজ্ঞাপনকে। তিনি সরকারি বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন দিনকালকে, কিন্তু তা থেকে বঞ্চিত করেছেন অন্যান্য কাগজকে। সরকারি বিজ্ঞাপনের এ উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহারকেই বলা হয় বিজ্ঞাপনী অস্ত্র।

যাহোক, স্বৈরতন্ত্রের আমলে সরকার উৎখাতের স্বার্থে কিছু তরুণদের অস্ত্র দেয়া হয়েছিলো, এমন কথা বাজারে রটানো হলেও কিছু মশা ছাড়া হয়েছিলো কিনা, সে সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। কিন্তু বিএনপি সরকার দুটো বিষয়ে সমান ব্যর্থ—এক. সন্ত্রাস দমনে, দুই. মশা নির্মূলে। সন্ত্রাস দমনে বিএনপি জারি করেছে সন্ত্রাস দমন আইন, কিন্তু মশা দমনে বিএনপি এখন পর্যন্ত কোনো রকমের বিল পাস করেনি। তাহলে কি আমরা ধরে নেবো এই মশা গণতান্ত্রিক মশা!

বিএনপি সরকার কেন মশা দমন করে না, তার কারণগুলির একটি সম্ভাব্য তালিকা আমরা তৈরি করতে পারি।

১. বি.এন.পি. সরকার বিশ্বাস করে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-কারখানার বিকাশে কেবল মশার কারণেই দেশে গড়ে উঠেছে কয়েল শিল্প, মশারি শিল্প। মশা না থাকলে এসব শিল্প-কারখানা পড়বে লোকসানের মুখে, লে-অফ হবে, লকআউট হবে, শ্রমিকেরা অনশন করবে। হয়তো কোনো রুই-কাতলার সঙ্গে অর্থকরী যোগাযোগ আছে এসব কোম্পানির মালিকদের।

২. পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, মশা কামড়িয়ে থাকে কেবল বিরোধীদলের ভোটারদের। সিলেটের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী বলে দিয়েছেন স্রোতের অনুকূলে থাকতে। তা না হলে উন্নয়ন হবে না। সাফ-সাফ জানিয়ে দিয়েছেন তিনি। ভোটাররা স্রোতের প্রতিকূলে থাকায় মশাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না।

৩. ফেরাউন না নমরুদের নাকের ভিতর দিয়ে বুকের মধ্যখানে পৌঁছে গিয়েছিলো এক মশা আর মিটিয়ে দিয়েছিলো তার আল্লাহ্ হবার শখ। বেগম জিয়া হয়তো ভেবেছেন এই মশা, সেই আল্লাহ্ প্রেরিত মশার বংশধর। তাদের মারা হলে তা হবে গোনাহ্‌র কাজ।

৪. মশার অত্যাচারে নারী-পুরুষ বাধ্য হচ্ছে বোরখা পরতে। শরীরের সমুদয় অঙ্গ ঢেকে রাখতে। যেমন প্রধানমন্ত্রী নিজে (ঢাকেন)। বিএনপি সরকার

দেশে পর্দাপ্রথা প্রবর্তন করার জন্যে মশাকে ব্যবহার করছেন রাজনৈতিকভাবে।

৫. মশার অত্যাচারে মানুষ বাধ্য হচ্ছে তাড়াতাড়ি মশারির ভেতর ঢুকতে। ফলে আলো ব্যবহৃত হচ্ছে কম। লোডশেডিঙের হারও আসছে কমে।

৬. মশার কারণে লোকে রাতে ঘুমুতে পারছে না ফলে চুরি ডাকাতি যাচ্ছে কমে।

৭. সম্ভবত মশারা কথা দিয়েছে, তারা জেলখানায় গিয়ে নিত্যদিন গান শোনাবে হুসাইন মুহম্মদ এরশাদকে, বিনিময়ে তারা চায় বেঁচে থাকার অধিকার। বেগম জিয়া তার আপোষহীনতার স্বার্থে মশাদের এ দাবি মেনে নিয়েছেন।

৮. বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এবং সৌদি আরবের সঙ্গে মশার কোনো সমঝোতা থাকবে। ফলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বিএনপি মশাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছে না।

৯. বিএনপি'র নির্বাচনী মেনিফেস্টোতে মশা সংক্রান্ত কোনো অঙ্গীকার নেই, তাই এ ব্যাপারে সরকার কোনো উদ্যোগ নিতে পারছেন না।

১০. মশারা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি নয়। রাজাকার ও মশা মারার জন্যে জনগণ বিএনপিকে নির্বাচিত করে নাই।

বাঙালির ব্যালান্স

ব্যালান্স করে টিকে আছি, ভারসাম্য বজায় রেখে রেখে। দুপায়ে সমান ভর দিয়ে চলতে হবে। এক পা ছোট, এক পা বড় হলেই খোঁড়াতে হবে। কে আর খোঁড়াতে চায় বলুন। সবাই চায় চলার ছন্দে মনের আনন্দে চলতে। সুতরাং ভারসাম্য বজায় রাখা প্রতি পদক্ষেপে। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে। শুনেছো, বড় ভাবীকে শাড়ি কিনে দিলে মেজোভাবী তো মাইন্ড করবেন। এক কাজ করো, এবার আমি নাহয় নাই নিলাম, ওটা মেজোভাবীকে দাও। বুদ্ধিমান কর্তা জানেন, একদিকে ব্যালান্স করতে গিয়ে আরেকদিকে ওলটপালট করা চলবে না। নিজের বউকে বঞ্চিত রেখে ভাইয়ের বউ ? এতো বড়ো সাহসী পুরুষ ত্রিভুবনে কমই আছে। এ অঙ্ক কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ভাইয়ের বউরা পেলে শ্যালিকারা কী দোষ করেছে ? স্ত্রী যতোই লক্ষ্মী হোন না কেন, ব্যালান্স করতে না পারলে সমুদ্রে নিম্নচাপ আসন্ন, ১০ নং মহাবিপদ সংকেত। ছোটো ছোটো মাছধরা ট্রলারের ওপর দিয়ে যাবে প্রথম ঝাপটা। কাজের মেয়ের কানের ওপর দিয়ে শুরু। তারপর ছোটো ছেলেটার পিঠ। সাম্যবাদী রাজনীতি অচল, কিন্তু ভারসাম্যের রাজনীতি অপরিহার্য। ওই কথাটা সবচেয়ে বেশি বোঝেন সংবাদপত্রঅলারা। আজকে আবাহনীর রিপোর্টটা বেশ জম্পেশ হয়েছে। কালকে মোহামেডানেরটা যেন ঠিক থাকে। আজকে শেখ হাসিনার ছবি প্রথম পাতায়। তা হলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আগামীকাল খালেদা জিয়ার। ওই হিসেব যে পত্রিকা সবচেয়ে ভালো বোঝে, তাদের পত্রিকা সবচেয়ে বেশি চলে। প্রথম পাতায় ইঞ্চি মেপে মেপে বিএনপি-আওয়ামী লীগ পাশাপাশি। কেহ কারে নাহি ছাড়ে সমানে সমান।

ব্যালান্স করে চলাটা আসলে বাঙালির নিজস্ব কৌশল। আত্মরক্ষার উপায়। কিংবা বাঙালির ভণ্ডামির এক মোক্ষম প্রকাশ তার সবকিছু ঠিক রেখে চলার প্রবণতায়। তাকে শ্যামও রাখতে হবে, কুল ছাড়াও চলবে না। সে গাছেরটিও খাবে, তলারটিও কুড়াবে। যেখানে যতো নৌকা আছে, সবকটাতেই সে পা রাখবে (যেখানে যতো ধানের শীষ আছে, সেখানেই সে হাত রাখবে)। আগে ছিলো রবীন্দ্রসঙ্গীত আর নজরুল গীতি। নজরুলের বহু গানের সুর তো নজরুল নিজে দেননি। তবুও বলতে হবে নজরুল সঙ্গীত। ব্যালান্স। একই মাপের জুতো পরিয়ে দাও রবিবাবু আর নজরুল সাহেবের পায়ে। তাতে যার পা ছোটো তিনি হয়তো আরামেই থাকবেন। যার পা বড়ো, কষ্ট হবে তার। তাহলে দুজোড়া জুতোই বড়ো বানাও। তবু ব্যালান্স করে চলো। যারা ব্যালান্স করছে, টিকে আছে তারাই। যোগ্যতমের উর্ধ্বর্তন। এখন ব্যালান্স হচ্ছে মুরগিতে আর গরুতে। তুমি একটা মুরগি পাবে আর আমি পাবো একটা গরু। ব্যালান্স তো হলোই। বানরের পিঠাভাগ। কাজেই একটু মুক্তিযুদ্ধ থাক, একটু রাজাকারিও থাক। ভারসাম্য তো হলো। যারা ব্যালান্স করতে পারে তারাই যাবে ক্ষমতায়। যারা পারে না, তারা পথে পথে ঘুরে বেড়াবে। বাঙালি শান্তিপ্রিয় অর্থাৎ ব্যালান্সপ্রিয়। সিএনএন, বিবিসি চলবে এককোণে। একদিকে ভিসিপিতে শিল্পার গরম গরম, অন্যদিকে সাঈদীর ওয়াজ। একদিকে বাবার বাড়ি, অন্যদিকে শ্বশুরবাড়ি।

ওই ব্যালান্সটা অবশ্য মাঝে মধ্যে থাকে না। সে এক সময়। যেমন একাত্তর। সবাই এক পক্ষে, অল্প কজন বিপক্ষে। ব্যালান্সটা নষ্ট হয়ে গেলো। দেশটা স্বাধীন হলো। নব্বইয়েও ব্যালান্স থাকলো না। ফলে ক্ষমতার বদল। এখন আবার চলছে ব্যালান্স করে করে। চলুক। ভারসাম্য ঠিক রাখতে পারলে সরু সুতোর ওপর দিয়ে হাঁটা যায়। সার্কাস। বাঙালি ক্রমাগতভাবে সেই সার্কাস দেখিয়ে যাচ্ছে।

'তিন নম্বর ম' বন্দনা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

আইসো, আমরা তাহার গুণকীর্তন করি, তাহারি বন্দনা গাহি। কারণ তিনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা আর তাহার ইঙ্গিতেই মর্তের মানুষেরা লাঠিপেটা হয়। ও কোকিল, তুমি তাহার নামগান করো, নতুবা রাইফেলের বাঁটের গুঁতায় শরীর থেঁৎলাইয়া যাইবে; ও ভ্রমর তুমি গুনগুন গুঞ্জনে তাহারই ভজনা করো, নচেৎ তোমার মাথা ফাটিয়া রক্ত ঝরিবে। কারণ তিনিই দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, পেয়াদা-পাইক-লশকর সকলি তাহার অধীন আর তিনিই সরবরাহ করিয়া থাকেন মোটা রুটি আর ছোলা।

আইসো, আমরা তাহার প্রশংসা করি। তিনিই শ্রেষ্ঠ এই বাংলাদেশে, আর এই এশিয়া মহাদেশে। আইসো আমরা প্রার্থনা করি, যেন তাহার প্রোমোশন হয়। কেননা, তিনি উদ্ভূত হইয়াছেন মুসলিম লীগ হইতে আর নিশ্চয়ই তাহার কীর্তি ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবে। আর কে আছে, একমাত্র তিনি ছাড়া, যাহার পেয়াদারা অপরাহ্নে চোখে অন্ধকার দেখে আর সাংবাদিক দেখিলেই ধর্ষকামে হিসহিস করিতে থাকে। নিশ্চয়ই আইয়ুব-এরশাদের বাহিনীও ম্লান হইয়া যাইবে তাহার প্রেসক্লাব অভিযানের কাছে। আইসো আমরা তাহার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি, তাহার পক্ষেই সম্ভব পাকিস্তানী জোশ ও জোয়ানির জেল্লা আকাশে তুলিয়া ধরা। আর কেন তিনি পদত্যাগ করিবেন, কারণ তিনি তো বলিয়াছেনই যে, আইনভঙ্গ হইলে আপনারা আদালতে যান। নিশ্চয়ই কুকুরের কাজ কুকুর করিবে এবং শেখ সাদী পদ্য লিখিবেন।

আর তাহার কল্‌বে খাস রাজাকারি তরিকা, আর তিনি যেখানেই মুক্তিযোদ্ধা নাম্নী দুষ্কৃতকারী দেখিবেন, সেখানেই বুলডোজার চালাইবেন। আর যদি তোমরা দেখো যে, রতন সেনকে হত্যা করা হইয়াছে, কিংবা মেননের প্রতি গুলি ছোড়া হইয়াছে, তোমরা ভ্রুক্ষেপ করিও না। নিশ্চয়ই কমিউনিস্ট নিধন সোয়াবের কাজ। নিশ্চয়ই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে আলবদর ব্রাদারদের উত্তম তরবারি ও আগ্নেয়াস্ত্র সরবরাহে আল্লাহতালার সদিচ্ছা রহিয়াছে। তার এই বাংলাদেশে আর কোনো সভা সমাবেশ শোভাযাত্রা সহ্য করা হইবে না। এদেশে কেবল মাহফিল-জামাত-আসর বসিবে। নিশ্চয়ই তাহার সহিত নিজামীর দোস্তি অমর হইয়া থাকিবে। আর যেখানেই মুক্তিযোদ্ধা দেখিবে, সেখানেই হামলা চালইবে। একাত্তরে পরাজয়ের প্রতিশোধ লইবার ইহাই সর্বোত্তম সময়, ইহাকেই গণতন্ত্র বলে। বিরোধীদলের সমাবেশ দেখিলেই লাঠি উঁচাইয়া আইসো, গোলাগুলি বাধাও, বোমাবাজি করো।

আর শোনো, বেহেশতে কোনো জানালা নাই। রুমীরা কিছুই জানিবে না। তাহারা বেহেশতে নিশ্চিন্তে ঘুরিয়া বেড়াইবে। ভাবিবে, তাহাদের রক্তে গড়া বাংলাদেশ তাহাদের মনের মতন রহিয়াছে। সুতরাং তাহারা কিছুই জানিবে না। তাহার জননী সংজ্ঞা হারাইলেও কিছু যাইবে-আসিবে না। লাঠিই হইতেছে ঈশ্বর। লাঠিই গণতন্ত্র। গভর্নমেন্ট বাই দ্য লাঠি, ফর দ্য লাঠি, অব দ্য লাঠি। ইহার জন্যই নূর হোসেন রক্ত দিয়াছিলো।

আর হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ কারাপ্রাচীরের আড়ালে হাসিয়া উঠবে, উঠুক। সে যাহা জানে নাই, সে যাহা করে নাই; এখন তাহাই হইবে, তাহাই ঘটিবে। বিরোধীদের সভাসমিতি করিবার খায়েশ চিরতরে মিটাইয়া দেওয়া হইবে। আইসো, আমরা তাহার গুণকীর্তন করি। আর তিনিই কামিয়াব একমাত্র। এই দেশ রাজাকারের আর পেয়াদা-পাইকের। এই দেশ নিতম্বে লাঠি পেটানোর। সবাই তাহার কীর্তি। তিন পদত্যাগ করিবেন না। তাহার প্রমোশন হইবে। হইতেই হইবে। তিনি তিন নম্বর 'ম'। 'ম' তিন প্রকার; আমরা তাহা জানি, সকলেই জানে। প্রথম দুইটি 'ম' তাহারই ইচ্ছার অধীন। আর তিনি নিজে তিন নম্বর 'ম'। রাজাকার তালিকায় তাহার নাম লেখা আছে: এম থ্রি বা ম-তিন। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভাঙলে মাটির মতো

ভাঙতে হবে, ভেঙে গুঁড়ো করে দিতে হবে। কিন্তু মুশকিল হলো, ভাঙারও নিয়ম আছে। ভাবছেন, আমি শক্তির কবিতা থেকে কোট করতে যাচ্ছি। বলতে যাচ্ছি, ভাঙারও নিয়ম আছে, যেমন তেমন করে ভাঙলে ভাঙার বিজ্ঞান থুতু দেবে না। আমি লিখতে বসেছি গদ্যকার্টুন, ভাঙতে বসেছি লেখার প্রথা, পারলে হাটে দুচারটা হাঁড়িও ভাঙা যাবে, তাই বলে রসরচনা লিখতে বসে পদ্য উদ্ধৃত করে রসভঙ্গ করাটা আমার ইচ্ছা নয়। জানি, রসরচনা লেখা কঠিন, ও-জিনিস লিখতে বসা মানেই কলম ভাঙার জোগাড়। কথা হচ্ছে, ভাঙারও শ্রেণীভেদ আছে। আপনি যখন বিরোধীদলে থাকবেন, তখন যা ভাঙবেন, সরকারি দলে গেলে তা কিন্তু ভাঙবেন না। ধরা যাক, বিএনপি'র কথা। তারা যখন এরশাদবিরোধী আন্দোলনে ছিলো, তখন তারা কী কী ভাঙতো? ভাঙতো ১৪৪ ধারা, কারফিউ, রাস্তার আইল্যান্ড, ২৮ নভেম্বরে সচিবালয়ের গেইট, পারলে দু'চারটা গাড়ি। তারা ভাঙতো সামরিক আইন-কানুন। এখন বিএনপি সরকারি দল। এখন তাদের পক্ষে নিষেধাজ্ঞা ভাঙাটা কঠিন। বরং তারা এখন ভাঙে হরতাল। ভুলক্রমে ভেঙে বসে সরকারি প্রটোকল। তাই মাননীয় রাষ্ট্রপতি যখন হজ্বে যান, তখন ভুলে যান স্পিকারের হাতে রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব অর্পণ করে যেতে। বিএনপি সবচেয়ে বেশি করে ভাঙে জনসভা আর মিছিল, বিশেষ করে জাতীয় পার্টির। নির্মূল কমিটির সমাবেশ ভাঙতেও তারা দারুণ ওস্তাদ। 'বিশ্বাস'-শোভিত বিএনপি সরকার চার দফা চুক্তি করবে বিরোধীদলের সঙ্গে, ওই চুক্তি ভাঙবে বলেই। একে ঠিক বিশ্বাসভঙ্গ বলা যাবে না।

সাদ্দাম হোসেনের পক্ষে সম্ভব শান্তিভঙ্গ করে কুয়েতে হামলা করা, আর আমেরিকার পক্ষে সম্ভব তার দাঁতভাঙা জবাব দেয়া, সকল আন্তর্জাতিক রীতিনীতি ভেঙে ইরাকে ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা রাত্রির অন্ধকারে। ভাঙার ব্যাপারে সবচেয়ে বড়ো নিশ্চয়ই বামপন্থী দলগুলি, বিশেষ করে জাসদ। কতোবার যে ভাঙলো ইয়ত্তা নেই। কিন্তু ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গের পর এখন ভেঙে যাচ্ছে মন, বামপন্থী দলগুলোর মতো ভাঙাচোরা অবস্থায় এখন আর কে আছে। ছোটোরা ভাঙবে তেলের শিশি আর বুড়ো খোকারা ভাঙবে দেশ—এটা সবচেয়ে ভালো বুঝেছিলেন অন্নদাশংকর রায়। যাদের দেশ ভাঙার ক্ষমতা নেই, তারা ভাঙবে ঘর আর সন্তানের বুক। তবু ভুল ভাঙবে না বড়দের। কাঁচা ঘুম ভেঙে গেলে আপনি আমি সবাই রাগ করবো, কিন্তু মধ্যরাতের অতিথি এলে পরিচারিকার ঘুম ভাঙিয়ে তাকে কাজে লাগাতে আমাদের কিচ্ছু যাবে আসবে না। খাটতে খাটতে ওর শরীর যদি ভেঙে যায় তবুও। নজরুল ইসলাম লাথি মেরে বন্দিশালার তালা ভাঙবেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ভাঙবেন চাবি। বলবেন, 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে।' শামসুর রাহমানের চিন্তা অবশ্য 'ভাঙাহাটে গণতন্ত্র তোমরা' দেবে কি দেবে না তা নিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ আমারবই.কম

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামলে ক্ষতি নেই, কিন্তু লক্ষ রাখবেন যেন আকাশ ভেঙে না পড়ে মাথায়। বাবার নাম ভাঙিয়ে খেতে পারেন, টাকা ভাঙিয়েও। হাঁটু ভেঙে বসতে পারেন, তাতে লোকে যদি আপনাকে হাঁটুভাঙা 'দ' বলে, আমাকে দায়ী করবেন না। মেলা ভেঙে গেলে পড়ে থাকবে ভাঙাচোরা কত কী ছাইভস্ম, সেসব ফেলতে দরকার হবে ভাঙা কুলো, ভালো কুলোতে আর কুলোবে না। ভগ্নদূত সম্পর্কে আমরা বিশেষ কিছু জানি না, জানি না ইউনানী জাতীয় রোগ....ভঙ্গ সম্পর্কেও, এসব বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলে ভগ্নমনোরথে ফিরতে হবে। একবার একটি ব্রিজ ভেঙে গেলে এক জায়গার নাম হয়ে গিয়েছিলো 'ভাঙা পুল'—এটা জানি।

ভাঙা নিয়ে সবকিছু ভেঙে বলা যাবে না, তাই সংক্ষেপে বাকিটা বলি। মনভাঙা আর মসজিদ ভাঙা সমান কথা, তা বলে বাবরী মসজিদ ভাঙাটা ঠিক নয়, আবার তার জবাবে অন্যায় মন্দির-ভাঙাও। কতো লোকের যে সাজানো বাগান ভেঙে গেলো তাসের ঘরের মতো এই এক ইস্যুতে, বিজেপি-জামায়াতকে কে তা বোঝাবে ? রেকর্ড ভাঙা ভালো হলেও ভাঙা রেকর্ড বাজানো ঠিক নয়, তাতে গানের চরণ মৌসুমীর 'প্রিয় প্রিয় প্রিয়'র মতো ভালো শোনাবে না। ফরিদপুরের একটি জায়গার নাম 'ভাঙ্গা'। তার মানুষগুলো মোটেই মাজাভাঙা নয়। আর হ্যাঁ, হাটে হাঁড়ি ভাঙার কারণে পাকাপোক্ত ইটের ঘরও অনেক সময় ভেঙে যায়। তাই সাধু সাবধান, গোপন কথা একান্ত বন্ধুর কাছেও ভেঙে বলবেন না।

ভালো জাতের ভাঙার মধ্যে আছে ফর্ম ভাঙা, বিশেষ করে শিল্প-সাহিত্যের। বৌয়ের মান ভাঙতে পারলে আপনি রীতিমতো সুপুরুষ, তবে মন ভাঙবেন না কারো, সংসার তো নয়ই। নেশা ভাং করে নিজের চাপাও ভাঙতে পারেন, তাতে আপনার কপাল ভাঙলে দায়ী থাকবেন নিজেই। তার চেয়ে ভালো সিঁড়ি ভাঙুন, উপরে উঠতে পারবেন। জল ভেঙে বেশিদূর যাওয়া যাবে না সত্যি, ঢাকার ড্রেইনেজ সিস্টেমের যে অবস্থা, বর্ষাকালে হাঁটুজল অপনাকে ভাঙতেই হবে। নিদেনপক্ষে খোলা ম্যানহোলে হোঁচট খেয়ে হাঁটু ভাঙলে তো মোটেই অসুবিধা হবার কথা নয়। চোঙা ফুঁকে ফুঁকে আপনার গলাটা ভাঙতে পারেন, স্লোগানটা হওয়া চাই—এ সমাজ ভাঙতে হবে, নতুন সমাজ গড়তে হবে। খুবই ভালো ধরনের ভাঙা, গড়তে চাইলে ভাঙতে তো হবেই। স্বরভঙ্গ নিয়ে আল মাহমুদ কবিতা লিখবেন, আবার বলবেন—সবাই বলে ভাঙো ভাঙো, কেউ কি আর ভাঙে, ষাটের দশক বগল বাজায় বউ নিয়ে লাঙে। কী কথা! লাঙ। শব্দ ব্যবহারে রীতিভাঙা আর গ্রাম্যতা যে এক জিনিস নয়, তা তাকে কে বোঝাবে ? কোথাও যখন বেড়াতে যাবেন, তখন ইস্ত্রির ভাঁজ ভেঙে জামা পারবেন। বাসররাতে স্ত্রীর লাজ ভাঙবেন। মনে রাখবেন, প্রথম রাতেই বিড়ালের ঠ্যাং ভাঙতে হয়।

যার যেমন ক্ষমতা, সে অনুযায়ী ভাঙচুর করবেন। ক্ষমতা থাকলে পার্লামেন্ট ভাঙবেন, মন্ত্রিসভা ভাঙবেন; না থাকলে কমিটি ভেঙে দেবেন। রেকর্ড ভাঙা খুবই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মহৎকর্ম, তবে দল বদলের রেকর্ড না ভাঙলেই হয়। ওটা নাহয় শাহ মোয়াজ্জেম সাহেবেই ভাঙুন। যিনি রোজা রাখবেন তিনি নিশ্চয়ই সহজেই রোজা ভাঙবেন না; যিনি মৌনব্রত অবলম্বন করেছেন তিনিও ব্রত ভাঙবেন না। অনশনভঙ্গ করতে হলে ভালো ফলের রস ব্যহার করবেন। চারাগাছে ফুল ফুটলে ডাল ভাঙবেন না। আরেকটু বড়ো হবার সুযোগ দেবেন। সবুরে মেওয়া ফলে। ভালোমতো ফলুক। তবে চান্স পেলে চাক ভেঙে মধু খাবেন। মধু জিনিসটা ফিডারে খাওয়া ঠিক নয়।

রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে শুনতে পাবেন কোনো জাগরণী কণ্ঠস্বর : 'জাগো বাহে কুনঠে সবাই' কিংবা হতাশার গুমোট ভেঙে বেজে উঠবে বজ্রকণ্ঠস্বর : 'এবারের সংগ্রাম, আমাদের মুক্তির সংগ্রাম'।

যানজট বিষয়ে একটি বোরিং রচনা

রিকশাঅলা বললো, ভালোই হইলো। পেট ফাইটা যাইতাছে। কামটা সাইরা আসি।

রিকশা দাঁড়িয়ে আছে। অটল হিমাদ্রি। সামনে রিকশা, পিছনে রিকশা। নড়বার কোনো লক্ষণ নেই। কখন নড়বে—এ আশা কেউ করে না। আমিও করি না। আমার কোনো তাড়া নেই। অফিসের সময় পার হয়ে গেছে। খাতায় লাল দাগ পড়ে গেছে। এর চেয়ে একদিন পরে ছুটির দরখাস্ত নিয়ে হাজির হওয়া ভালো। বাঁপাশে দু-রিকশা পরে একটি রিকশায় এক মনোহর তরুণী। হুড ফেলা। চুল ছোটো। রোদ্দুরে চিকচিক করছে, বাতাসে মৃদু মৃদু উড়ছে। হাতে একটা গোলাপ থাকলে ভালো হতো। বলা যেতো— তোমার হাতে গোলাপ, তুমি আমার কাছে ঋণী রইলে। নেই।

রিকশাঅলা ফিরে এসেছে। কী করে এলো কে জানে। চারদিকে রিকশা। এক চুল ফাঁক নেই। ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি, তারই সঙ্গে মিলেমিশে বাস-কার-বেবিট্যাক্সি-মোটরবাইক।

একটা এম্বুলেন্স আটকা পড়েছে। দম ফাটিয়ে সাইরেন বাজাচ্ছে। চারিদিকে হট্টরোল। হট্টরোল মানে হাটের শব্দ। সুতরাং এ শব্দটি তেমন লাগসই হলো না। বলা ভালো জটরোল। যানজট। জানজট। মালজট। শেষেরটা বলা কি উচিত হবে। দু-রিকশা পরই একটি চক্ষুহর তরুণী।

স্যার, অবস্থা খারাপ। এম্বুলেন্সের মধ্যে পোয়াতি। যখন-তখন অবস্থা। খুব কষ্ট পাইতেছে। মরদটা কানতাছে। এইবারই পয়লা বোধ হয়।

অমানবিক ব্যাপার। এম্বুলেন্সে সাইরেন বেজেই চলেছে। শব্দটা বুকে এসে বিঁধছে। কিছু একটা করা দরকার।

ফুটপাতে আখের দোকান। একজন ট্রাফিক পুলিশ আখ কিনছেন। মওকা বুঝে দোকানি রেট বাড়িয়ে দিয়েছে। তিন টাকা পিস। পুলিশ সাহেব খেপে গেছেন। তিনি সঙ্গী ডাকতে গেলেন। একা একা ঝামেলা করা ঠিক নয়। সব ক্রিমিনালরা একজোট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সত্যি তাই। হকাররা একজোট হয়ে গেছে। কোত্থেকে গজারি কাঠের লাঠি এসে গেছে।

পুলিশ সাহেব সঙ্গীসাথী নিয়ে ফিরে এলেন। ওয়াকিটকিতে দ্রুত খবরাখবর আদান-প্রদান হচ্ছে।

ভয়-ভয় লাগছে। মারামারি লেগে গেলে দৌড়ানোর জায়গা নেই। এই জ্যাম আজকে কাটবে বলে মনে হয় না। গ্যাঞ্জাম লেগে গেলে বাসে আগুন লাগানো যে হবে তা তো নিশ্চিতই। কাঁদানে গ্যাস ছোড়া হবে। বড় ঝামেলায় পড়া গেলো। না, মেঘ কেটে যাচ্ছে। ট্রাফিক পুলিশ গ্যাঞ্জামে যায় না। রিকশাঅলা ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করলো। ট্রাফিক পুলিশ হইতেছে চামারের গুষ্ঠি। দুই টাকা দিলেই হয়। এরা কখনো গ্যাঞ্জাম পাকায় না।

স্যার, দেখেন তাকায়া। রিকশাঅলা পেছনের দিকে ইঙ্গিত করলো। একটা রিকশার হুড তোলা। সামনে পর্দা লাগানো। বৃষ্টি নেই, কিন্তু পর্দা। ভেতরে একজোড়া প্রেমিক-প্রেমিকা। হয়তো কোথাও বেড়াতে যাবার কথা ছিলো। এই জ্যামে আটকা পড়ে প্রোগ্রাম বাতিল। বেচারা। রিকশাঅলা ওদের সমস্যাটা বুঝলো না। কেয়ামতের আর দেরি নাই, বেহায়াপনা দেখলে মনডা কয় মুখে জুতা মারি। বেরসিক রিকশাঅলা।

এম্বুলেন্সের সাইরেন থেমে গেছে। একজন লোক একটা রিকশার সিটে দাঁড়িয়ে আযান দিতে শুরু করলো। মাশাআল্লাহ খুশির খবর। রিকশাঅলা খবর নিয়ে এলো। পোলা হইছে। মিষ্টি কিনতে লোক গেছে।

সত্যি সত্যি মিষ্টি চলে এলো। এম্বুলেন্সের মধ্যে নবজাতক কাঁদছে। জটরোলে সেই কান্না শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু মিষ্টি এলো আমার রিকশা পর্যন্ত। মুসলিম সুইট ঘরের মিষ্টি। বিসমিল্লাহ সহযোগে ভক্ষণ করা উচিত। আদরের সঙ্গে।

ওই তরুণীটার দিকে তাকালাম। আশ্চর্য। ওর হাতে সত্যি সত্যি একটা গোলাপ। মেয়েটা গোলাপ পেলো কোথায়! 'তোমার হাতে গোলাপ, তুমি আমার কাছে ঋণী রইলে'। কবিতার পঙ্‌ক্তি চলে আসছে। একটা লাইন এসেছিলো। এসেও ফিরে গেলো। কারণ গোলাপের উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে। পাশের রিকশায় এক কেতাদুরস্ত তরুণ। এই জ্যামের মধ্যে ছেলেটা ফুলের দোকানে গেলো কী করে? পারবে নাইবা কেন? মানুষ তো বাঁদরেরই বংশধর। এক রিকশা থেকে লাফিয়ে আরেক রিকশায় সহজেই যাওয়া যাবে। তাছাড়া প্রেম হচ্ছে এক আশ্চর্য মহৌষধি। সুস্থ মানুষকে পরিণত করে ইনক্রেডিবল হাল্কে।

সামনে পেছনে ডানে বাঁয়ে যানবাহনের বন্যা। স্থির বন্যা। তেলরঙে আঁকা। সামনে যদ্দুর চোখ যায় তদ্দুর। পেছনেও তাই।

নড়েছে, নড়েছে। রব উঠলো। একমাইল দূরে নাকি নড়েছে। ওয়াকিটকিতে খবর পাওয়া গেছে। যাক, তাহলে নড়লো। ভাইসব। একটা ট্রাকের মাথায় মাইক লাগানো হয়েছে। বক্তৃতা হবে বোঝা যাচ্ছে। ভাইসব, আজকের এই প্রতিবাদসভায় দলে দলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যোগ দিন এবং আওয়াজ তুলুন— রাস্তায় রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম, সহ্য করা হবে না। জ্বালো জ্বালো, আগুন জ্বালো।

অবস্থা খারাপ। বিরোধীদল এখন এখানে সভা করবে। যানজটের বিরুদ্ধে সভা। সরকার কি মিটিং করতে দেবে ? এই সরকার বিরোধীদের মিটিং সহ্য করে না। ১৪৪ ধারা জারি করে। আবার বুক কাঁপতে লাগলো।

আমার আশঙ্কা অমূলক নয়। কোত্থেকে যেন দাঙ্গা পুলিশ এসে জুটেছে। প্রচুর পুলিশ। হাতে বেতের ডাল। কাঁধে রাইফেল।

রিকশায় রিকশায় জনতাও জঙ্গী হয়ে উঠছে। তারা স্লোগান ধরেছে— জ্বালো, জ্বালো, আগুন জ্বালো।

বাঁ পাশের দু-রিকশা পরে সেই তরুণী। এখন আর একা নেই। তরুণটি তার পাশে এসে বসেছে। একজনের হাত আরেকজনের কোলে। মাইকে বক্তৃতা হচ্ছে। 'সামনের রাস্তা দিয়ে মন্ত্রী যাবে বলে রাস্তার মুখ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। ফলে এই ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি হয়েছে। মজলুম জনতার কষ্ট হচ্ছে। এই সরকারকে উৎখাত না-করা পর্যন্ত এই স্বৈরাচারী দুর্দশার অবসান ঘটবে না।'

উচিত কথা। সবকিছুর মূলে তো রাজনীতিই।

ওই তরুণ-তরুণীর সেদিকে খেয়াল নেই। তারা চলে গেছে অন্য রাজ্যে। এখন তাদের পাখা গজিয়েছে। তারা শুভ্র নীল আকাশে উড়ছে। তাদের পা এই দুনিয়ার মাটি স্পর্শ করছে না। সেখানে সিটি কর্পোরেশন নেই। মেট্রোপলিটন পুলিশ নেই। যানবাহন নেই। যানজট নেই। ওরা খুব ভালো যাচ্ছে।

ম্যানহোলগুলোকে স্টেশন বানাবো, সুয়েরেজ খালগুলোকে রাস্তা। আন্ডারগ্রাউন্ড কম্যুনিকেশন সিস্টেম গড়ে তুলবো। একটা বুড়োলোক রিকশায় দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে। তার পরনে কিস্যু নেই। একটু আগে ছিল।

পুরান পাগল। রোদে পাগলামি বাড়ছে। সর্বজ্ঞ রিকশাঅলা বললো।

রোদ পড়ে আসছে। বিকেল হয়ে গেলো। অফিস ছুটির সময় হয়ে গেছে। আর বসে থাকা যায় না। এবার উল্টোমুখ হয়ে বাড়ি ফেরা দরকার।

রিকশাঅলাকে বললাম— ভাইরে, এবার হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করি। হাঁটতে না পারলে রিকশার মাথায় মাথায় লাফিয়ে যাবো। আর ভালো লাগে না।

দাঁড়ান, খবর আছে। কাজী সাহেব আসতেছে। ওই যে দেখতাছেন একজোড়া পোলামাইয়া, ওদের বিয়া পড়াইবো। সোয়াবের কাম। বিনা পয়সায় সোয়াব কামাইয়া যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও!~আমারবই.কম

গণতান্ত্রিক ফ্যান্টাসি

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫
রচনাকাল : ১৯৯৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৪ সালের নভেম্বর পর্যন্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

স্বর্গের দুয়ারে

পাপ-পুণ্যের হালখাতা হাতে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। বিরক্তি লাগছে। খুবই দীর্ঘসূত্রিতাময় ব্যবস্থা। একটা লাইনে দেয়া হচ্ছে হালখাতা। সেটা নিয়ে যাও আরেক লাইনে। সেখানে একটা স্লিপ ধরিয়ে দিল। তারপর আরেক লাইন। এটা পাপের হিসাব বিভাগ। পাপের হিসাব করতে বসেছেন দশজন হিসাবরক্ষক। একজন হিসাব করছেন 'মিথ্যা বলার পাপ'। একজন 'পরের ক্ষতি'। একজন 'চুরি'। একজন 'খুন-খারাবি'। বেঁচে থাকতে কখনো খুন করি নাই। খুন-খারাবির হিসাবরক্ষক আমাকে একটা এনওসি দিলেন। নো অবজেকশন সার্টিফিকেট। এরপর রেপের হিসাব। নারী উত্যক্তকরণ। যৌন-অনাচার। লাইনে দাঁড়ালাম। লাইনের মাথায় পৌছতে পৌছতে বারোটা বাজার উপক্রম। আমার সিরিয়াল নং ক-স-ণ-৩০০০৬৯২১। তার পাশে আমার নাম লেখা। বিশাল রেজিস্টার খাতা। এ খাতায় পৃথিবীর মানুষদের যৌন অপরাধের হিসাব কড়ায়গণ্ডায় লেখা। আমার নামের পাশে লালকালিতে লেখা 'ধর্ষণ'। আক্কেল গুড়ুম হবার যোগাড়। চিরকাল যোগীর জীবনযাপন করেছি। রেপ করলাম কবে?

ব্যাপার কী? মাথা খারাপ হয়ে গেলো প্রায়। হতাশ হয়ে নিজের হালখাতাটা নিয়ে লাইনের বাইরে দাঁড়িয়ে রইলাম। ধর্ষণ খুব বড় পাপ। এর শাস্তি কঠিন নরকবাস। নরকবাস না হয় চোখমুখ বন্ধ করে কোনোরকমে সহ্য করা গেলো, কিন্তু এই ধর্ষণের অপবাদ মাথায় নিয়ে বাকি দিনগুলো কাটিয়ে দিতে হবে, ভাবতেই নিজের ওপরে ঘৃণা ধরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে আত্মহত্যা করি। কিন্তু এটা অমরলোক। এখানে এলে কেউ আর মরতে পারে না।

মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে আছি। একটা ছেলে এসে পাশে দাঁড়ালো।

চিনতে পারছো?

আসলেই চিনতে পারিনি। ভালো করে তাকিয়ে দেখে চিনলাম। আমাদের পাড়ার কালু বদমাস। কুখ্যাত বদমাস ছিল লোকটা। এমন কোনো অপরাধ নেই যে সে জীবনে করেনি। মদ-নারী-চুরি-ডাকাতি সবকিছু ছিল তার কাছে ডালভাত। কালু বদমাস আমার হালখাতাটা টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগলো। লালকালিতে লেখা 'ধর্ষণ'। তার দাঁত বেরিয়ে এলো। বললো, যেমন কর্ম তেমন ফল, তার নাম কর্মফল। মরলোকে যেসব বদমাসি করেছো, অমরলোকে এসে তার প্রতিফল তো ভোগ করতেই হবে। কয়টা রেপ্?

আমি কিছু বললাম না। আমার কান লাল হয়ে গেছে। একটা গুণ্ডা-বদমাস-লম্পট এসে আমাকে নীতিবাক্য শোনাচ্ছে। হায় হায়, একি হলো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কালু বললো, তুমি নিশ্চয়ই দুটো-চারটে রেপ করোনি। এক-আধটা ভুল পুরুষ মানুষ জীবনে করতেই পারে। এজন্যে তোমার অনন্তকাল নরকবাস হবে না। মাত্র ছত্রিশ শ জীবনকাল পার করলেই তোমার নরকবাসের অবসান ঘটবে। গল্প করার সময় নেই। আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে কালু বদমাস আরেকদিকে দৌড় ধরলো।

এরকম হতে পারে না। দুনিয়ায় আমি নিজ-স্ত্রী ব্যতীত কোনো নারীর অঙ্গ স্পর্শ করিনি। নিশ্চয়ই কোথাও কোনো ভুল হয়ে গেছে। আমি যৌন-অনাচারের লাইনে আবার দাঁড়ালাম।

লাইনের মাথায় পৌছতে পৌছতে আমার কতোটা সময় যে লাগলো, কী বলবো। শেষপর্যন্ত পৌছলাম হিসাবরক্ষকের টেবিল পর্যন্ত। তিনি আমার হালখাতা খুলেই ক্ষেপে উঠলেন। তুমি আবার এসেছো কেন ?

আমি বললাম, দেখুন আমার চুরির পাতায় এনওসি আছে, মিথ্যার খাতায়ও কোনো লালদাগ পড়েনি, যে-ব্যক্তি কখনো মিথ্যা বলেনি, তার পক্ষে কি ধর্ষণ করা সম্ভব ? আমি যখন দুনিয়াতে মিথ্যা বলিনি, আপনারা নিশ্চয়ই বুঝছেন, আমি এখনো মিথ্যা বলতে পারি না। আমি স্বপ্নেও কোনোদিন কাউকে রেপ করিনি, বিশ্বাস করুন।

হিসাবরক্ষক হাসলেন। বললেন, ঠিক আছে, তুমি অভিযোগ-বিভাগে যাও। তোমার অভিযোগ ওঁদের জানাও। ওঁরা তাহলে খুঁজে বের করবেন কোথায় গোলমাল হয়েছে।

আমি অভিযোগ-বিভাগের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। এই অমরলোকের একটা প্রধান অসুবিধা এখানে ঘড়ি নেই। সময়ের কোনো আগামাথা নেই। আমি অভিযোগ-বিভাগে ঘোরাঘুরি আরম্ভ করলাম। মহাবিরক্তিকর এক অভিজ্ঞতা। আমার সঙ্গের লোকজন সবাই যার যার কর্ম অনুযায়ী ফল নিয়ে দিন কাটাচ্ছে, কেউ স্বর্গে কেউ নরকে। আমি একা ভবঘুরের মতো অভিযোগ-বিভাগে ঘোরাঘুরি করছি। অমরলোকের এই পর্বটাই সবচেয়ে খারাপ। অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটানো। নরকেও এতো খারাপ লাগে না।

আমাকে অভিযোগ-বিভাগে ঘোরাঘুরি করতে দেখে একজন আমার প্রতি যেন দয়াপরবশ হলো। সে এগিয়ে এসে বিড়বিড় করে আমার কানে বললো, আপনার সমস্যা কী ?

আমি তাকে সমস্যাটা বোঝানোর জন্য মুখ খুললাম। সে বললো, আড়ালে আসুন।

সে আমাকে এক নির্জন কোণে নিয়ে গেলো। বললো, সব সমস্যার সমাধান আছে। আপনারটারও আছে। একটু মালকড়ি ছাড়তে হবে।

কী বললেন ?

মালকড়ি ছাড়তে হবে।

এখানে আমি মালকড়ি পাবো কোথায় ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সে হেসে ফেললো। অমায়িক হাসি। বললো, এখন আপনি মালকড়ি কোথাও পাবেন না, এটা সত্যি, তবে স্বর্গে ঢুকে গেলে প্রচুর পাবেন। সবকিছু পাবেন। এয়ার কন্ডিশন্ড বাড়ি, গোটা দশেক গাড়ি, রিমোট কনট্রোল খাবার সরবরাহ ব্যবস্থা।

স্বর্গের বর্ণনা শুনে বেশ ভালো লাগলো আমার। বেশ আধুনিক হয়েছে। যাহোক, দালালটি চোখেমুখে অর্থপূর্ণ হাসি ফুটিয়ে বললো, অন্য ব্যবস্থাও আছে। তবে ভালোর মধ্যে ভালো হলো, সব করবেন কিন্তু এইডসের কোনো ভয় নেই।

আমি আমতা আমতা করতে লাগলাম, এসব নয়, আমি বলছিলাম কী...

সে আমার কথা কেড়ে নিয়ে বললো, ওসবও আছে। সবধরনের মাল। ওয়াইন লিকার বিয়ার।

আমি বললাম, আমার পানের অভ্যাস নেই।

দালালটি খুশি হলো। আপনার মতো লোকই তো আমার চাই। আপনি শুধু কতোগুলো চেকে এখন সই করে দেবেন। স্বর্গের চেক। তারপর আপনি স্বর্গে ঢুকে যাবেন। আরাম-আয়েশে থাকবেন। আমরা যারা স্বর্গের বাইরে বিভিন্ন বিভাগীয় কাজে নিয়োজিত তারা তো খুব শুকনো দিন কাটাই। সারাদিন কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকতে হয়, আনন্দ-ফূর্তি করার সময়ও পাই না, সুযোগও পাই না। তাই আপনাদের মতো স্বর্গগামী দু-একজনের কাছ থেকে, এমন আগাম চেকে স্বাক্ষর করিয়ে রাখি। তারপর আপনারা যখন স্বর্গবাসী হন, আমরা তখন স্বর্গের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে এটা-ওটা তুলে নিয়ে আসি। একটু ফূর্তিফার্তা করি। আমাদেরও তো সাধ-আল্লাদ থাকতে আছে। নাকি থাকতে নেই ? কি বলেন ?

কথা তো ঠিকই। এদেরও সাধ-আল্লাদ আছে।

কিন্তু আমার হালখাতার কর্মফল কি বদল হবে ?

হবে।

আপনি চেকে সই করলেই হবে।

তাহলে হিসাবে গোলমাল হবে না ?

দালালটি ক্ষেপে গেলো। আপনাকে নিয়ে তো আর পারলাম না। হিসাবে গোলমাল হবে কেন ? বাংলাদেশ থেকে আমদানি করা বুদ্ধি। কাজে না লেগেই পারে না।

বাংলাদেশ থেকে ? সেটা কেমন ?

দালালটি আমাকে সব বুঝিয়ে বললো।

এই যে আমার ঘাড়ে ধর্ষণের পাপ চাপানো হলো, এ পাপটা করেছে অন্য কোনো দাগী আসামি। কিন্তু তার কাছ থেকে মালকড়ি পেয়ে ওটা তারা চাপিয়ে দিয়েছে আমার ঘাড়ে। মোট ধর্ষণের সংখ্যাতে কোনো হেরফের নেই। বাংলাদেশে এরকম করা হয়। দেখা গেলো, টেলিফোন বিল, বিদ্যুৎ বিল এসেছে পাঁচগুণ দশগুণ। সেসব ক্ষেত্রে এটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে আসতে হয়। বিল প্রস্তুতকারক প্রতিমাসে বিল কম করে দেবে, আর বিনিময়ে নেবে প্রতিমাসে নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা। এরকম চুক্তি যাদের সঙ্গে করা থাকে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তারা দেশে-বিদেশে হাজারটা টেলিফোন কল করে। কিন্তু টেলিফোন বিলে সেসবের জন্য চার্জ ধরা হয় না। এসব বাড়তি বিল তখন বিতরণ করে দেয়া হয় অন্য নিরীহ গ্রাহকের ঘাড়ে। সেই বুদ্ধিটা প্রয়োগ করা হচ্ছে অমরলোকে। অমরলোকের হিসাবরক্ষক, স্বর্গের দ্বার-রক্ষক, সবাই, এরকম।

আমার খুব খারাপ লাগলো। মরলোকে কোনো বড় ধরনের পাপ করিনি, অসততা করিনি, অমরলোকে এসে করবো ?

দালালটি আমার মনোভাব বুঝতে পারলো। সে তাগাদা দিল, তাড়াতাড়ি ঠিক করুন কী করবেন। না হলে যান, নরকে যান।

আমি সবকিছু লোভ সম্বরণ করতে পারি, কিন্তু টিভি দেখার লোভ সম্বরণ করতে পারি না। জিটিভি আমার খুব প্রিয়।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, নরকে কি টিভি আছে ?

লোকটি বললো, আছে।

আমি বললাম, নরকে টিভিতে কী কী দেখায় ?

এরশাদের কবিতা, গাবদুল গাই ছিকদারের আলোচনা, আটটার সংবাদ, আমজাদ হোসেনের ঈদের নাটক।

আমি বললাম, আর স্বর্গে ?

ইচ্ছামতো চ্যানেল টেপা যায়। যখন যা দেখতে চান।

আমি বললাম, আমি রাজি। আনো চেক, এক্ষুনি সই করে দিচ্ছি।

খালি চেক সই করে দিলাম। স্বর্গের চেক। চেকের উপর স্বর্গের নাম ও মনোগ্রাম অঙ্কিত। খুব ভালো লাগলো দেখে। দালালটা আমার হালখাতাটা নিয়ে দ্রুত অভিযোগ-বিভাগে ঢুকে গেলো। আমি চিন্তায় পড়ে গেলাম। কোনো ঠক-বাটপারের হাতে পড়িনি তো ?

একটু পরে সে ফিরে এলো। পাপের দশটা বিভাগ থেকেই আমার জন্য সে এনওসি নিয়ে এসেছে। আমি এখন পুণ্যের লাইনের দিকে যেতে পারি। জানি না, পুণ্যবিভাগের হিসাবরক্ষকেরা কিসের দাবি নিয়ে বসে আছেন। দালালটি বললো, কোনো অসুবিধা হবে না। শুধু স্বর্গে গিয়ে আমাদের কথা ভুলে যাবেন না। এটা-ওটা জিনিস একটু এদিক-ওদিক করবেন। আর কোনো প্রবলেম হলে আমার নাম বলবেন।

দালালটি তার নাম বললো।

মিস্টার টেন পার্সেন্ট।

ডায়রিয়ায় না অনাহারে

রৌমারীর চরের মোহাম্মদ আলী, বয়স ৩৫। পেশায় ক্ষেতমজুর। যখন মারা যায়, তখন তার স্ত্রী শহরবানু ভয়ঙ্কর কান্নাকাটি শুরু করলো। শহরবানু গত ১৫ দিন ধরে ভাত খায় না, তবে ১৫ দিন সে অনাহারে ছিল, তাও বলা যাবে না। কারণ এই ১৫

দিনে তারা বহুকিছু খেয়েছে। তাদের খাদ্যতালিকাটা বিরাট। এই তালিকায় রয়েছে—সেদ্ধ গম চার কেজি (মানুষটা মরার আগে কামে গিয়েছিল, মাটি কেটে তিনদিনে চার কেজি গম পেয়েছিল, বেশ খাওয়া গেছে সেদ্ধ গম, এটা খাওয়ায় ঝামেলা কম, আটা বানাতে হয় না, রুটি বানাতে হয় না, তবে ফুলী, বয়স ১০, জেদ ধরেছিল গম ভেজে খাবে, গমভাজি খুব সোয়াদের খাবার, আল্লাদিপনা করার সময় এখন নয় সেটা ফুলী বোঝেনি, তবে সুরুজ আলী বয়স ৮ অতোটা আল্লাদি নয়, সে যা দেয়া যায়, তাই খায়), কলার মোচা সেদ্ধ, কচু ভর্তা, এবং ঘেঁচু সেদ্ধ। কিন্তু ছাবেদ আলী বয়স ৬, সারাদিন ভাত খামো ভাত খামো বলে কাঁদে। গত ১৫ দিন তারা ভাতের মুখ দেখেনি, ভাতের ফেনও নয়। কারণ মণ্ডলের বাড়িতে এখন ভাতের মাড় ফেলে দেয়া হচ্ছে না। এবার আল্লাহ গজব দিয়েছেন, ক্ষেতে আবাদ নেই, সব পুড়ে গেছে খরায়, মণ্ডলের বউ বলেছে তাদেরও এবার ভাত কিনে খেতে হবে, ঘরের ভাতে হবে না, তারা গাছ বেচছে, বাঁশ বেচছে, লাগলে গরুও বেচবে।

ভাতের অভাব বাহে ভাতের অভাব, বসি থাকলে খামো কী—বলে মোহাম্মদ আলী কামের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছিল, কিন্তু কাজ ছিল না, কোনো কাম নাই, নিড়ানির কাম নাই, কাটামারির দেরি বহু, ঘর ছাওয়ার কাম নাই, বেড়া বান্ধার কাম নাই, মোহাম্মদ আলী কী করবে, কী খাবে, উপায় না-জেনে একবার ভেবেছিল পালিয়ে শহরে যাবে, বৌ-ছাওয়ালরা কী করি খায় খাউক মুই তো বাঁচো, টাউনোত (শহরে) ম্যালা কাম বাহে, এশকা (রিকশা) টানিও খাওয়া যায়।

তার আগে মোহাম্মদ আলী শেষ চেষ্টা হিসেবে একটু নয়ছয় করতে চেয়েছিল, মুন্সিবাড়ির বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ চুরি করে বেচবে; কিন্তু কিনবে কে ? আরেকবার ভাবলো গরু চুরি করে, কিন্তু সাহস হয় নাই। নয়ছয় ভাবতে ভাবতে মোহাম্মদ আলীর পেট খারাপ হলো, পাতলা পায়খানা, সে তেমন আমল দেয় নাই, দাস্ত তো হয়ই কতোজনের, সে বিছানায় পড়লো, ওঠার শক্তি নাই, তিনদিন ধরি হাগতে হাগতে মানুষটা মরি গেলো।

হাসপাতালে নেন নাই ? থানা সদরে ? কেন নেন নাই ? চেয়ারম্যান-মেম্বাররে খবর দেন নাই ? কেন দেন নাই'? স্বাস্থ্যকর্মীকে খবর দিয়েছিলেন ? মোহাম্মদ আলীর মৃত্যুর পর তার বাড়ির কদর বেড়ে গেলো। শহর থেকে সাংবাদিকরা এলো ছবি তুলতে। শহরবানু কাঁদতে লাগলো। ক্লিক ক্লিক। শহরবানুর তিন ছেলেমেয়ে (আরেকটা ছিল, গত বছরে মারা গেছে)।

অনাহারে মৃত মোহাম্মদ আলীর স্ত্রী কাঁদছে, শোকে না ক্ষুধায়। তার উপোস করা ছেলেমেয়েরা। এই ছিল ছবির পরিচিতি সংবাদপত্রে। এরপর তার বাড়িতে সব মাতুব্বররা এলো, অফিসাররা এলো, সাংবাদিকেরা এলো।

বিতর্ক জমে উঠলো। চেয়ারম্যান-মেম্বাররা মিটিং-এ বসলো। মোহাম্মদ আলী কেন মারা গেলো। ডায়রিয়ায় নাকি অনাহারে ? সগীর মেম্বার চালাক ও শিক্ষিত, তিনি এসএসসি পাস, বললেন, আসেন আমরা এটাকে 'অনাহারে' বলি, তাহলে অনেক গম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আসবে, রিলিফ আসবে, ফুড ফর ওয়ার্কের গম আসবে, আমাদের দিকে আল্লাহ মুখ তুলে তাকাবে।

চেয়ারম্যান সাহেব চিন্তিত, কারণ জেলা থেকে ফুড অফিসার এসে বলে গেছেন, না, এটা অনাহারে নয়, ডায়রিয়ায় মৃত্যু। অবশ্য সিভিল সার্জন বলেছে, ডায়রিয়ার বিরুদ্ধে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা আগে থেকেই নেয়া হয়েছে, প্রচুর খাবার স্যালাইন দেয়া হয়েছে, উত্তরপাড়ায় গাউছাবাড়ির সামনে একটা টিউবওয়েলও বসানো হয়েছে; ডায়রিয়ায় মরে নাই, সাপের কামড়ে মারা যেতে পারে।

থানার সরকারি দলের সভাপতি সাহেবও কর্তব্য স্থির করতে পারেননি। কারণ না-খেয়ে মোহাম্মদ আলী মারা গেছে—এ-কথা বললে তিনি আর নমিনেশন পাবেন না। কিন্তু তার কর্মীরা বলেছে অনাহারের কথাই বলেন, তাহলে গম আসবে। লোকাল মার্কেটে ১০০০ মণ গম বেঁচে দিলে কতো টাকা আসবে তিনি হিসাব করতে লাগলেন, কারণ সামনে ইলেকশন, নগদ টাকা না থাকলে নমিনেশন পাওয়া যাবে না।

একটি পর্যবেক্ষণ

মোহাম্মদ আলী যে ডায়রিয়ায় মারা গেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই। এদেশে প্রতিবছর লক্ষাধিক লোক ডায়রিয়ায় মারা যায়। বেশিরভাগই শিশু। এটা নতুন কিছু নয়।

শহরবানুর চিৎকার

শহরবানুর কাছে লোকজন আসে। তারা প্ররোচিত করে বলেন, আপনার স্বামী ডায়রিয়ায় মারা গেছে। বলেন, আপনার স্বামী না খেয়ে মারা গেছে।

শহরবানু কেঁদে ফেলে। সে বুঝতে পারে না, তার স্বামী গেছে এইটাই তো কথা, কেমন করে মারা গেলো সেটা নিয়ে কেন এতো কথা ?

'হামি অতো বুজি না, হামার মানুষক ফিরি আনি দ্যাও,' হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে শহরবানু।

মোহাম্মদ আলী নিজের দোষে মরেছে

মোহাম্মদ আলী নিজের দোষে মরেছে। তার স্ত্রী কেন অন্যের বাড়িতে খেটে খাবার এনে দিতে পারেনি ? তার ছেলেমেয়েগুলো অন্যের বাড়িতে কাজ করে খেয়ে বেঁচে গেলো, আর মোহাম্মদ আলী নিজে বাঁচলো না। নিশ্চয়ই তার নিজের দোষ আছে।

হায়াৎ উঠি গেছে বাহে

হায়াৎ-মউৎ-রেজেক-দৌলত আল্লার হাতে। আল্লাহ রেজেকে রাখে নাই, খায় নাই হায়াৎ উঠি গেছে, মরি গেছে। এতো কথা ক্যান ?

সংবাদপত্র থেকে—১

'ভুরুঙ্গামারী থানার অভাবী মানুষজন অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছেন। গত ২২ সেপ্টেম্বর এ থানায় ডায়রিয়ায় মারা গেছে অহিতন নেসা (৩৫), শিরিন বেগম (১০) ও শেফালী (৫)।

খরায় পোড়া উত্তরাঞ্চল, ভোরের কাগজ, ২৮ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪

সংবাদপত্র থেকে–২

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রায়। সকলেই ডাল-ভাত খেতে পাচ্ছে। এটা আমার কথা নয়। দেশের মানুষ, দেশের বাইরের মানুষের কথা।

সিলেট মাদ্রাসা ময়দানে প্রধানমন্ত্রী, ভোরের কাগজ, ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

সংবাদপত্র থেকে–৩

নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রীকে সামনাসামনি 'মিথ্যাবাদী' বলে অভিযুক্ত করেছে সে-দেশের এক স্কুল ছাত্র। এজন্য স্কুল-কর্তৃপক্ষ তাকে ক্ষমা চাইতে বলেছে। প্রধানমন্ত্রী তিজম বোলগায় গত শুক্রবার ক্রাইস্টচার্চের বার্নাসাইড হাইস্কুল পরিদর্শনে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, নিউজিল্যান্ডে কেউ অনাহারে নেই। এ-কথা বলামাত্র টোরি রাশব্রুক নামে ওই ছাত্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলে ওঠে, 'উনি মিথ্যে বলছেন।'

ভোরের কাগজ, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪

শহরবানু কি শিক্ষা পেলো ?

শহরবানুর ওপর দিয়ে নানা ধকল যাচ্ছে। নানাজনে আসে, নানা কথা বলে। কেউ বলে মাথায় হাত দিয়া বসেন, কান্দেন, ছবি তুলি। কেউ বলে, কান্নাকাটি করবেন না। নানা কথা। শহরবানু বুদ্ধিমতী। সে বুঝতে পেরেছে— না খেয়ে মরেছে বললে তার স্বামীর অপরাধ হয়। এই দেশে না খেয়ে কেউ মারা যেতে পারে না। সেটা বেআইনি কাজ। তবে ডায়রিয়ায় মারা যাওয়া চলে। তাতে কোনো অপরাধ হয় না। শহরবানু সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সে না খেয়ে মারা যাবে না। কারণ আইন না মানলে অপরাধ হয়। মরার পরে শান্তি নেই। সে এবং তার তিন ছেলেমেয়ে, ইনশাল্লাহ, ডায়রিয়াতেই মরবে।

হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে

হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে কোনোরকম রঙ্গ করা আমার পক্ষে মুশকিল। কারণ আমি তাঁর ভক্ত। একেবারে গুণমুগ্ধ। কেন আমি হুমায়ূন আহমেদকে সমর্থন করি এ নিয়ে একটা প্রবন্ধ লেখা এবং আমার পক্ষে সোজা, কিন্তু রঙ্গব্যঙ্গ করা কঠিন। আমি কঠিন কাজটিই করছি। করছি ইচ্ছার বিরুদ্ধে। লেখাটা তাই উপভোগ্য হবার কোনো কারণ নেই।

হুমায়ূন আহমেদ ময়মনসিংহের লোক। ময়মনসিংহ এলাকার লোকজনের একটি অসুবিধা যে, তারা ও-কার এবং উ-কার গুলিয়ে ফেলে। মূলাক্ষেতে চোর ঢুকেছে—এ বাক্যটিকে তারা বলে মোলা ক্ষেতে চুর ঢুকেছে। আমাদের অঙ্ক স্যারের বাড়ি ছিল ময়মনসিংহে। তিনি শূন্যকে বলতেন জিরু। ফুটবল মাঠে এরা গুল দিয়ে থাকে।

হুমায়ূন আহমেদও এ-সমস্যা থেকে মুক্ত নন। তিনি ওঠা আর উঠাকে আলাদা করতে পারেন না। সূর্য পূর্বদিকে ওঠে। এই বাক্যটিকে তিনি লেখেন সূর্য পূর্বদিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উঠে। এ পর্যন্ত সহ্য করা যায়। উঠ > উঠা > ওঠা। কিন্তু সূর্য উঠে গেলে আমরা রওনা হলাম। এই বাক্যটি লিখতে গেলে কখনো কখনো (সবসময় নয়) হুমায়ূন আহমেদ লেখেন, সূর্য ওঠে গেলে আমরা রওনা হলাম। সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়—এ বাক্যটি হুমায়ূন আহমেদেরা লেখেন— সে কেন জলের মতো ঘোরে ঘোরে একা কথা কয়। এধরনের ভুল হুমায়ূন আহমেদের বইয়ের পাতায় পাতায় থাকে। আমি একটা বই নিয়ে একবার কাটতে শুরু করেছিলাম। প্রায় প্রতি পাতায় দুটো করে কাটা দাগ পড়ে গিয়েছিল। হুমায়ূন আহমেদ আমাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় লেখক। বাংলাদেশের মানুষেরা তাঁর বাক্যগঠন দিয়ে অনেকখানি প্রভাবিত হয়। তিনি এতো ক্ষমতাবান, অথচ এই সামান্য ভুলটি কেন তিনি ধরতে পারেন না। তসলিমা নাসরিন, নির্মলেন্দু গুণের বাড়িও তো ময়মনসিংহে। কই, তারা তো এই ভুলের শিকার হন না।

হুমায়ূন আহমেদ কি মহৎ লেখক ? আমার মনে হয় না। কারণ মহৎ লেখকদের রচনা দুই পৃষ্ঠার বেশি পড়া যায় না। ব্যাক কভার পড়েই বইটি যত্ন করে সাজিয়ে রাখতে হয়। কিন্তু হুমায়ূন আহমেদেরটা সহজে পড়ে ফেলা যায়। পড়তে খুবই ভালো লাগে। এধরনের লেখককে মহৎ ও প্রিয় বললে বিদ্বৎসমাজে কল্কে মুশকিল। জনপ্রিয় হবার কতগুলো পদ্ধতি আছে। রাজনীতি, ধর্ম ও সেক্স—জনপ্রিয় সাহিত্যের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। হুমায়ূন আহমেদের এই তিনটির কিছুই নেই। তবুও কেন তিনি জনপ্রিয় ? আমরা কারণগুলি তালিকাবদ্ধ করতে পারি।

এক. তিনি কখনো যুক্তাক্ষর ব্যবহার করেন না। করলে খুবই কম করেন কিংবা মজা করার জন্য করেন। যেমন : ইনি একজন ভদ্রলোক। বিশিষ্ট ভদ্রলোক। এই বিশিষ্ট শব্দটি তিনি ব্যবহার করেন মজা করার জন্যেই।

দুই. তাঁর বাক্য কখনো পাঁচ শব্দের বেশি হয় না। একজন সুন্দর, লম্বা, চিকন, ফরসা, লম্বাচুল, দীর্ঘকর্ণ, তিলবিশিষ্ট নারী আসছে। এই বাক্যটি হুমায়ূন আহমেদ কখনো এরকম লম্বা লিখবেন না। তিনি লিখবেন, একটা মেয়ে আসছে। লম্বা ধরনের মেয়ে। দেহটা চিকন। কানদুটো লম্বা। ধবধবে ফরসা। লম্বা চুল। কান বড়ো। মুখে তিল। মায়াবতী। বড়ই মায়াবতী।

বুঝতেই পারছেন, ক্লাস ওয়ানের সবুজসাথী বইয়ে এরকম বাক্য আমরা পড়েছি। মা। কলম। কলা। আমার মা। লাল কলম। লাল কলম ভালো। ইহা কলা। পাকা কলা। আমি কলা খাব। এর ফলে তাঁর বাক্য পড়তে অসুবিধা হয় না। আমাদের দেশে ক্লাস ওয়ান পাস লোকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ক্লাস টুতে অর্ধেক ছাত্র ঝরে যায়। এসএসসিতে যা থাকে এইচএসসিতে এসে তা অর্ধেক হয়ে যায়। গ্রাজুয়েট খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ক্লাস ওয়ান পাস লোকজন বই পড়ে না। পড়ে এসএসসি-এইচএসসির গ্রুপ। এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। কেউ জনপ্রিয় হতে চাইলে লিখতে হবে এদের টার্গেট করে। হুমায়ূন তাই করেন। সেক্স রাখেন কম। এক লাইনে। ছোট বোন বড়বোনকে জিজ্ঞাসা করবে—আপা, চুমু খেলে নাকি বাচ্চা হয়। ব্যাস, এই পর্যন্তই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তিন. বাঙালি আড্ডাবাজ। গল্প শুনতে ভালোবাসে। ধারাবাহিক কাহিনী নয়। শুধু গল্পের মজার অংশটি। ধরুন, আমি বিয়ের দাওয়াত খেতে গেলাম। স্ত্রীকে নিয়ে গেলাম না। ফিরে আসার পর স্ত্রী আমার কাছে জানতে চাইবে, কেমন হলো অনুষ্ঠান। আমি যদি তাকে বলি— রিকশাভাড়া করে গেলাম। ৫ টাকা ভাড়া দিলাম। গিফট প্যাকেট জমা দিলাম। খাবার দিলো, খেলাম। বউ দেখে চলে এলাম। এই গল্প শুনলে আমার প্রিয়তমা স্ত্রীও হাই তুলবে। কারণ এই গল্পের মধ্যে এমন কিছু ঘটনা নেই, যা গল্প হতে পারে। প্রতিদিন যা ঘটে, তার সবটা গল্প নয়। কোনো-কোনোটা গল্প। আমাদের বেশিরভাগ উপন্যাসে থাকে, বিশদভাবে বর্ণনাসহ পাখির বর্ণনা, পথের বর্ণনা, নদীর বর্ণনা। কিন্তু গল্প থাকে না। হুমায়ূন আহমেদ তা করেন না। আমার বিয়ে বাড়ির গল্পটা তিনি বলবেন এভাবে—খেতে বসেছি। এমন সময় বর সাহেব এসে আমাকে টেনে তুলল। পরের ব্যাচে খা। আড়ালে নিয়ে গেল। বলল, এই ব্যাচে শুধু কন্যাপক্ষ খাবে। ওরা বিয়েতে আমাদের যা খাইয়েছে। মুরগির মাংস শক্ত। নিশ্চয়ই মরা মুরগি। আমরাও ছাড়ার পাত্র না। বাজার থেকে মরা মুরগি অর্ডার দিয়ে আনিয়েছি। পাত্রীপক্ষ খাচ্ছে। টিট ফর ট্যাট। হা-হা-হা।

চার. এধরনের গল্প তার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় তিনটা থাকে। তিনি কখনো ধারাবাহিকভাবে গল্প বলেন না। আড্ডার গল্পগুলি একটার পর একটা জুড়ে দেন। সকালবেলা একজন লোক ঘুম থেকে উঠল। সে এরপর বাথরুমে যাবে। কিন্তু এর মধ্যেই হুমায়ূন আহমেদ একটা গল্প বলবেন। হয়তো বাথরুমে গিয়ে দেখা যাবে পেস্ট নেই। শেষ হয়ে গিয়েছে। কিনতে খেয়াল থাকে না। ইদানীং এরকম হচ্ছে। সবকিছু ভুলে যাচ্ছে লোকটি। একদিনের ঘটনা—বাথরুমে গিয়ে শাওয়ার ছেড়েছে। তারপর মনে পড়ল ভুল হয়ে গিয়েছে। কোট প্যান্ট জুতাই খোলা হয়নি।

পাঠক, খেয়াল করুন, সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজতে যাবার ফাঁকেই একটা গল্প। গল্প শুনতে কে না ভালোবাসে ? ব্যাস, পাঠক হুমায়ূন আহমেদের প্রেমে পড়ে যায়।

পাঁচ. হুমায়ূন আহমেদের চরিত্রগুলি সাধারণত নিষ্পাপ হয়। খুব খারাপ ধরনের লোকের মধ্যেও বেশকিছু সৎ গুণ থাকে। আমরা প্রতিদিনের জীবনে নানা বাজে জিনিস দেখতে দেখতে ক্লান্ত। সুতরাং পড়ার সময় একটু শান্তিতে থাকতে চাই। হুমায়ূন আহমেদ তাই ভালো লাগে। তার সব নারী অসম্ভব রূপবতী। তাদের চোখ মায়াকাড়া। কার না ভালোলাগে ?

ছয়. তাঁর বই কখনো ৬০ পৃষ্ঠার বেশি হয় না। এক বৈঠকে পড়ে ফেলা যায়। ঝামেলা কম। কিনতে টাকা লাগে কম। বহন করতে শক্তিক্ষয় কম।

সাত. তাঁর রসবোধ প্রবল। মাত্রাবোধ আরো প্রবল। কোথায় থামতে হবে তিনি জানেন। বেশিরভাগ লেখকই তা জানেন না। হুমায়ূন আহমেদের চরিত্র যখন রেপ করে, তখন বলে, আমি তোমাকে আদর করবো, দেখবে ভালোই লাগবে। ব্যাস, এই পর্যন্তই। পাঠক, এই দৃশ্যটা নাসরিন, মিলন, সৈয়দ হক, হুমায়ূন আজাদের হাতে পড়লে কী ঘটতো কল্পনা করতে পারেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাংলাদেশে আর যাদের বই বিক্রি হয় তাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই আমার আলাপ আছে। তসলিমা নাসরিন, ইমদাদুল হক মিলন, হুমায়ুন আজাদ, সৈয়দ শামসুল হক প্রত্যেকের সঙ্গেই। হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে নেই। কিন্তু আমি তার লেখা বেশ পছন্দ করি। আমি রম্যরচনা লিখতে চাই না, লিখতে চাই বিদ্রূপ রচনা। হুমায়ূন আহমেদকে নিয়ে বিদ্রূপ করাতে আমার মন থেকে সাড়া পাচ্ছি না। অল্পবিস্তর যা করলাম, তা বিদ্রূপ নয়। বিশ্লেষণ। আমার পাঠকেরা হতাশ হলেও কিছু করার নেই। কারণ, বাংলাদেশে আমার প্রিয়তম লেখক হুমায়ূন আহমেদ আর প্রিয়তম পত্রিকা উন্মাদ। এ-ছাড়া আমার প্রিয়তম খাবার হাওয়াই মিঠাই।

ইশ, কী সুন্দর শাড়ি

মাঝেমধ্যে মনে হয়, মেয়েরা নিজেরাই মুক্তি চায় তো ? নাকি তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ওপর মুক্তি জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে ?

যেমন ধরা যাক, সাজাগোজার ব্যাপারটা। নারীবাদী দু-চারটা ছোটখাটো লেখা পড়ে আমার ধারণা জন্মেছে, সোনার হাতে সোনার কাঁকন আসলে শৃঙ্খলের প্রতীক, পায়ে মল বাজানোর মূল উদ্দেশ্য নারীকে ঘরের মধ্যে বন্দি রাখা, সে-যেন ঘরের বাইরে না যেতে পারে সেজন্য একটা সতর্কতা-ধ্বনি সৃষ্টি করা। রূপচর্চার মধ্যদিয়ে তাকে সারাক্ষণ বোঝানো যে, তোমার কাজ আর কিছু নয়, পুরুষের মনোরঞ্জন করার।

কিন্তু আমার চারপাশের নারীবাদী, ভদ্রমহিলাবাদী, স্ত্রীবাদী, পুরুষবাদী, সমানাধিকারবাদী সবধরনের নারীদের আমি সারাক্ষণ মত্ত দেখি সাজসজ্জা, রূপচর্চা, পোশাক-পরিধেয়, ফ্যাশন, অলংকার নিয়ে আলোচনা করতে। আমি চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি ড. আহমদ শরীফের লেখা পরপর তিনটি বাক্য পাওয়া যাবে না হাইফেন ছাড়া, হুমায়ূন আহমেদের লেখা থেকে কেউ খুঁজে দিতে পারবে না একটিও সেমিকোলন এবং দুজন নারী পাওয়া যাবে না, যারা আধাঘণ্টা আলাপ করবেন; কিন্তু শাড়ি-গয়না, রূপচর্চা নিয়ে একটি কথাও বলবেন না। তসলিমা নাসরিনের ভক্তরা ক্ষেপে যাবেন নিশ্চয়ই। তসলিমা একবার শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করেছিলেন, ফিরে এসে কলাম লিখেছিলেন, না, ভদ্রমহিলাকে পছন্দ হলো না; শাড়ি-গয়নার আলাপ ছাড়া আর কোনো আলাপ নেই।

কিন্তু ওই তসলিমা একবার যশোর গেলেন। তখন তসলিমার খ্যাতি সবে শুরু হয়েছে, তিনি তখনো আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেননি। যশোরে একটা সাহিত্য সম্মেলন ধরনের অনুষ্ঠান ছিল, তসলিমা ঢাকা থেকে গিয়েছিলেন অতিথি হয়ে। ফিরে এলেন দু-চারদিন পর। সেটা '৯০ সালের দিকে। তসলিমা তখন সাপ্তাহিক পূর্বাভাসে কলাম লেখেন। যশোর থেকে ফেরার পরে তাঁর সঙ্গে পূর্বাভাস অফিসে দেখা। ঢাকার বাইরের সাহিত্য সম্মেলন নিয়ে আমি আগ্রহবোধ করলাম। তসলিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, কেমন হলো যশোর সফর ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তসলিমা জবাব দিলেন, দারুণ। অনেকগুলো শাড়ি নিয়ে এসেছি।

দারুণ ! খোদ তসলিমার যদি এই অবস্থা হয় অন্য মেয়েদের অবস্থা কী হবে কল্পনা করুন।

আমার নিজের ধারণা, একটা ভালো জামদানি শাড়ি কিংবা নতুন ডিজাইনের একসেট গয়নার বিনিময়ে যে-কোনো লৌহমানবী প্রধানমন্ত্রীকে পটিয়ে দুইশ কোটি টাকার কাজ বাগানো সম্ভব।

দুজন মেয়ে এক জায়গায় হলে কী ধরনের গল্প করে ? কী সুন্দর শাড়ি পরেছিস, ইমা, কোত্থেকে কিনলি ? কতো দাম ? আমিও পরশু একটা কিনেছি। দেখবি ?

শেক্সপিয়ারের মার্চেন্ট অফ ভেনিসের গল্পটা সবাই জানেন। বুক থেকে এক পাউন্ড মাংস কেটে নিতে পারবেন, কিন্তু এক ফোঁটা রক্ত যেন না পড়ে। এই শিক্ষাটা আপনি কাজে লাগাতে পারেন আপনার পারিবারিক জীবনে। আপনার স্ত্রীর খুব বেড়ানোর শখ। চলো না আমরা কলকাতা ঘুরে আসি, কিংবা চলো না একবার সিঙ্গাপুর যাই— প্রায়ই বলে থাকেন তিনি। আপনার আর সুযোগ/সময়/সামর্থ্য হয় না তাকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার। এই নিয়ে মান-অভিমান, নাকের পানি চোখের পানি। আপনি তাকে বলুন, শোনো, এবার আমি সত্যিসত্যি তোমাকে ইন্ডিয়া ঘুরিয়ে আনবো। তাজমহল দেখাবো, আজমীরশরীফ দেখাবো। তবে একটাই শর্ত—তুমি শপিং করতে পারবে না। ইন্ডিয়ার মার্কেট ঘুরে কাপড়-চোপড় কিনতে পারবে না।

কি, রাজি ?

না, আপনার স্ত্রী রাজি হবেন না। রক্তপাত ছাড়া যেমন মাংস কেটে নেওয়া যায় না, তেমনি কেনাকাটা না করতে পারলে আর বিদেশ যাওয়া কেন ? এই হচ্ছে মেয়েদের মনস্তত্ত্ব। কেউ বিদেশ ঘুরে এলে মেয়েরা তার কাছে জানতে চাইবে না সেখানকার নদনদী, আকাশ-পাহাড়, মিউজিয়াম-ভাস্কর্য-পুরাকীর্তির বর্ণনা, মানুষ-রাজনীতি-অর্থনীতির প্রসঙ্গ তো চির-অবান্তর; তাদের জানার বিষয় একটিই—কী কী নিয়ে এসেছো ? দেখি। বেড়িয়ে-আসা মহিলাও বিপুল উৎসাহে তার বাক্স-পেটরা মেলে ধরবেন। এই শাড়িটা এনেছি অমুক মার্কেট থেকে, এই দুলটা এনেছি...

সম্প্রতি প্যারিসের মুসলিম ছাত্রীরা মিছিল করেছে— তাদের ওড়না পরে স্কুলে যাওয়ার অধিকার কেড়ে নেওয়া যাবে না। তুমি তাকে পোশাকের ভারমুক্ত করতে চাইলে হবে কী, সে নিজেই নিজেকে সহস্র বন্ধনে জড়াতে চায়। ঈশ্বরগুপ্ত না কে যেন একটা লিখেছিলেন না... লোকে মেয়েদের সৌন্দর্য দেখতে গঙ্গার ধারে যায়, আর তিনি তাদের দুর্দশা দেখে হেসে মরেন, কাপড় সামলাতে যাদের সমস্ত শক্তি আর মনোযোগ নিঃশেষ হয়ে যায় ; তাদের আবার সৌন্দর্য কী ? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছিলেন : 'পুষ্প ছিল বৃক্ষশাখে' নারীর অপেক্ষায়, নারী তাকে চয়ন করে ধারণ করলো, তারপর ফুল হয়ে উঠলো সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ ফুলের চরিত্রটা এ কবিতায় ধরতে পারেননি বটে, তাকে অবমূল্যায়িত করেছেন, কিন্তু নারীর চরিত্রই তিনি ধরেছেন শতকরা একশ ভাগ। ফুল দেখলেই মেয়েদের হাত নিশপিশ করে, ছিঁড়ে খোপায় গুঁজে দিই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নারীকে সাজিয়ে-গুজিয়ে সুন্দর চিক্কণ করে তোলার জন্য কতো আয়োজন। সামান্য চুল, সেটার জন্য কতো পদের শ্যাম্পু; সিল্কি চুলের জন্য এগ প্রোটিন, রুক্ষ চুলের জন্য...ইত্যাদি। তারপর আছে কন্ডিশনার। তারপর সেটার আবার কতো ধরনের স্টাইল। বিউটি পারলার শত শত, চুল বেঁধে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। শুধু চুল বেঁধে দিয়েও যে-কেউ অন্নসংস্থান করতে পারে, তা নারীজাতি এ পৃথিবীতে এসেছে বলেই সম্ভব হয়েছে। তারপর আছে মাথায় ডিম ভাঙা, মসুর ডাল দেওয়া, আতপ চাল দেওয়া, লেবু টিপে দেওয়া, এটেল মাটি মাখা, মেহেদি দেওয়া, ডেটল দেওয়া, টক দই মাখা, কী নেই, যা মেয়েরা চুলের যত্নে ব্যবহার করে না ?

একটা অনুষ্ঠান মানে তো ছয়মাস আগে থেকে মেয়েদের ঘুম হারাম। কোনো শাড়ি পরবো, নাকি অন্যকিছু, জামদানি না কাতান, ওই শাড়ি এক অনুষ্ঠানে পরেছি, আরেকবার পরলে প্রেস্টিজ থাকে না, কী রঙের শাড়ি, সঙ্গে গয়না কিসের, টিপের রঙ কী হবে ইত্যাদি। সঙ্গের পুরুষটি ট্রাউজার কিংবা পায়জামায় পা গলিয়ে খালাস, 'কই বেরোও'। সঙ্গিনী বললেন, আর একটু। তিনি বসেছেন আয়নার সামনে। একটু একটু করে কমপক্ষে সাড়ে তিন ঘণ্টা। ইদানীং বিয়েবাড়ির দাওয়াত খেতে গেলে কনে আর দেখা হয় না। খাওয়াদাওয়া শেষ, কনে এখনো আসেননি, তিনি বিউটি পারলারে গেছেন সাজতে। সন্ধ্যা সাতটার দাওয়াতে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত কনে আসেনি, এমনও দেখেছি।

মেয়ে শিশুদের মধ্যেও এই এক প্রবণতা। খুব ছোট অবস্থাতেই সে লিপস্টিক ঠোঁটে ঘষবে। এটা কেন হয় ? বলবেন, মায়ের দেখে শেখে। ছোট্ট ছেলেটাও তো মাকে এটা করতে দেখে, তারা তো করে না। নাকি এক বছরের বাচ্চাও মা নারী আর বাবা পুরুষ—এটা বুঝে ফেলে। অন্যদিকে ছোট ছেলেরা অবাক হয়ে বাবার গালের শেভিংক্রিম দেখে, মেয়েরা সেটাতে তেমন কৌতূহল দেখায় না। তবে কি নারী নারী হয়েই জন্মায় ? নাকি, এই সমাজে তাকে নারী করে তোলে ? এই চিন্তাটা ইদানীং আমাকে পেয়ে বসেছে। পার্টি-ফ্যাংশানে আমি ছেলে আর মেয়েদের কথাবার্তা-চালচলন পর্যবেক্ষণ করি—পুরুষেরা রাজনীতি-ব্যবসা-খেলা-সমাজ-শিক্ষা নিয়ে কথা বলছে, আর মেয়েরা অবিকল বকে চলেছে শাড়ি-গয়না নিয়ে। তাদের মনোযোগ একটা ব্যাপারেই—কাকে কতো সুন্দর দেখাচ্ছে। এসব নিয়ে ভাবতে ভাবতেই একটা প্রস্তাবনা মাথা উঁকি দেয়। একটা ছেলে আর একটা মেয়েকে জন্ম থেকেই যদি সমাজবিচ্ছিন্ন করে রাখা যায়, তবে কি সে একই রকম প্রবণতা নিয়ে বড় হয়ে উঠবে ? বনের ফুল দেখে মেয়েটি হাত বাড়িয়ে দেবে, খোঁপায় গুঁজবে; বনফুলের রঙে রাঙাবে নিজের ঠোঁট ? নাকি সে অন্যরকম হবে ? পৃথিবীব্যাপী নারীবাদী জোয়ারের কালে এ প্রশ্নগুলোও বিবেচ্য হওয়া দরকার। নারীবিদ্বেষী, মেল-শভিনিস্টিক পিগ— এসব বিশেষণে ভূষিত হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে এই কথাগুলো পাড়াটা দরকার মনে করছি। কারণ সৌন্দর্য-চর্চাটা দোষের নয়, সেটা নকল হয়ে গেলেই মুশকিল। সমাজের লিঙ্গবিভাজন উঠেছে বলে, ইমা, কী সুন্দর শাড়ি বলে মেয়েরা একাই মরবে না—এটা অন্তত ধারণা করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করমালী সরকারের দলীয়করণ

তার পার্টির হাইকমান্ড তাকে নির্দেশ দিয়েছে দলের শক্তি বাড়াতে হবে। সব চাবি-পদগুলো দখল করতে হবে। সর্বত্র দলের লোক ঢোকাতে হবে। ঠিকাদারি কাজ দিতে হবে পার্টির লোকদের। এই নির্দেশ অবশ্যই মানতে হবে। এটা পার্টির ভবিষ্যতের জন্য জরুরি। ক্ষমতা। কোনো চিরস্থায়ী ব্যাপার নয়। তবে সেটা চিরস্থায়ী করার চেষ্টা সবসময়েই চালিয়ে যাওয়া কর্তব্য।

করমালী সরকার সাহেব পার্টি-অন্তপ্রাণ। পার্টিতে তিনি নতুন যোগ দিয়েছেন। পার্টির এই নির্দেশকে তিনি অলঙ্ঘনীয় মনে করেন। তিনি মহা উৎসাহে এই নির্দেশ পালন করে চলেছেন। ঝাঁপিয়ে পড়ো। যতো পারো দলের শক্তি বাড়াও। দলীয়করণ করো।

চ্যারিটি বিগিনস এট হোম। নিজের ঘর থেকে কাজ শুরু। তার দুটো মেয়ে আছে। তিনি জামাই খুঁজছেন। কিন্তু পাচ্ছেন না। তার কারণ তিনি নিজের দলের লোক ছাড়া জামাই বানাবেন না। কিন্তু নিজের দলে তিনি ভালো লোক পাচ্ছেন না। যে দেখতে সুন্দর তার চরিত্র ভালো না। চরিত্র ভালো হলে বংশ ভালো না। কেউ কেউ সন্ত্রাসী। যে নিজের শিক্ষককে পেটায়, সে বউও পেটাবে। ভারি মুশকিল। মেয়েদের বিয়ের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। তাদের মা প্রায়ই কান্নাকাটি করেন।

দুয়ারে ভিক্ষুক এসেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ওই মিয়া ভোট দিছো?

না, দেই নাই।

সামনে ভোট হইলে কারে দিবা?

দিমু না। দফায় দফায় ভোট হয়। আমাগো কী? আগেও ভিক্ষা করছি অহনও ভিক্ষা করুম। ভোট দিয়া লাভ কী?

করমালী সরকার ক্ষেপে গেলেন। বলে কী? 'সর্বহারা' নাকি? ভোটের আগে ভাত চাই।

তিনি বললেন, যাও, ভিক্ষা হবে না। আগে বলো, ভোট দিমু। ধানের শীষে ভোট দিমু। তাহলে ভিক্ষা পাবা। পুরা দশটাকা পাবা।

ভিক্ষুকটি তেরসা ধরনের। সে বললো, মিথ্যা কথা কইবার পারুম না। আমাগো ভোটের লিস্টিতে নাম নাই। ভোট নাই। ভোট দিমু ক্যামনে?

করমালী মনে মনে স্বস্তি পেলেন। ভাগ্যিস এই ভিক্ষুকের নাম ভোটার লিস্টে নেই। থাকলে এ ব্যক্তি ধানের শীষে ভোট দিতো না। ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট। 'মাফ করো' বলে তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন।

নিজের বাড়ির দারোয়ান, ঝি-ঠিকে ঝি, গাড়ির ড্রাইভার সব পদে তিনি নিয়োগ করেছেন পার্টির লোক। এসব ব্যাপারে তিনি তার লিডারকে রিপোর্ট দিলেন। 'কাজ ঠিকভাবেই চালিয়ে যাচ্ছি, লিডার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এতোকিছুর পরেও পার্টির নেতার কাছ থেকে তিনি ধমক খেলেন। লিডার ভীষণ ক্ষিপ্ত। 'আপনি কি পাগল নাকি ? আপনার নিজ পরিবারকে দলীয়করণ করতে আপনাকে কে বলেছে ? সরকারি পদে দলের লোক ঢোকান।'

করমালী সাহেব বিপদে পড়লেন। তিনি সরকারি লোক নন। সামান্য একজন ব্যবসায়ী মাত্র। তিনি কীভাবে সরকারি পদে দলীয় লোক নেবেন ?

তার এক শ্যালক আছে উকিল। ঝানু লোক। তিনি তার পরামর্শ প্রার্থনা করলেন।

শ্যালক সাহেব হেসে ফেললেন। দুলাভাই, আপনাকে কিছু করতে হবে না। দলীয়করণ হচ্ছে ভেজাল লবণ জলীয়করণের মতো, ও আপনাআপনিই ঘটে। পানি দিতে হয় না, লবণ নিজেই গলে পানি হয়ে যায়। আপনাকে দলীয়করণ কর্মসূচি সফল করতে এগিয়ে আসতে হবে না। আপনি কেবল এর সুফলগুলো ঘরে তুলুন। কাস্তে হাতে নেমে পড়ুন। ধান কাটো, গোলায় ভরো। ধান কাটো, গোলায় ভরো।

করমালী সরকার বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। শ্যালক সাহেব বলেই চলেছেন, ধরুন, আপনি একজন সরকারি ডাক্তার, পোস্টিং চাই, বদলি চাই, প্রোমোশন চাই, আপনাকে শরণাপন্ন হতে হবে ড্যাবের; না, এটা স্বীকৃত পেশাজীবী সংগঠন বিএমএ নয়, এটা হচ্ছে জাতীয়তাবাদী চিকিৎসকের অ্যাসোসিয়েশন, আপনার দরখাস্তে ড্যাবের নেতারা সুপারিশ করে দেবেন; এরপর আপনার কাজ হবে রকেটগতিতে। ড্যাবের সুপারিশ ছাড়া হবে না। ধরুন, আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর হতে চান, আপনাকে হতে হবে জাতীয়তাবাদী, এছাড়া আপনি নিযুক্ত হবেন না। আপনি টিভিতে শিল্পসাহিত্যের অনুষ্ঠান করতে চান ? জাতীয়তাবাদী হয়ে যান কোনো সমস্যাই হবে না।

'যতো স্বায়ত্তশাসিত একাডেমি আছে, তাতে নেয়া হচ্ছে জাতীয়তাবাদীদের, যতো সমিতি-সংগঠন আছে, ভেঙে দু-টুকরা করা হচ্ছে, যেমন—সাংসাদিকদের সংগঠন ; যতো নতুন নিয়োগ হচ্ছে তাতে অগ্রাধিকার দেয়া হচ্ছে জাতীয়তাবাদীদের; বড় বড় কাজ, ছোট ছোট কাজ সবই পাচ্ছে জাতীয়তাবাদীরা।' শ্যালক সাহেব তার উকিলি গতিতে লেকচার দিয়ে দিলেন।

করমালী সরকার অবিশ্বাসের চোখে তাকালেন। এতোকিছু যদি হচ্ছেই, তাহলে তিনি আর নতুন কী করতে পারেন ? তিনি অসহায় ভঙ্গিতে বললেন, তাহলে আমার কী করা কর্তব্য ?

সুযোগের সদ্ব্যবহার করা। আপনি ব্যবসায়ী মানুষ, আপনি বাগাবেন কাজ। সাপ্লাইয়ের বড় বড় দান মেরে দেন। এরপর আসেন পরোপকারে। আমার ভাস্তে একটা জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়েছে। আপনি মন্ত্রী ধরেন। ওর চাকরিটা দিয়ে দেন। আপনার স্ত্রী আমার আপার খুব শখ এমপি হবে। এ সিজনে তো হলো না, পরের সিজনে তাকে এমপি বানান।

আপনি নিজে কয়েকটা কমিটি-কমিশন-একাডেমির প্রধান পদ দখল করেন। জেলা ক্রীড়া পরিষদ, থানা অলিম্পিক কমিটি, ভাষা কমিশন— যেখানে যা পান, ঢুকে যান। এই তো সুযোগ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করমালী সরকার আসলে পার্টিতে যোগ দিয়েছেন অল্পদিন হলো। তারপরও তিনি জজ-ব্যারিস্টার নন, ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়েছেন মাত্র। এইসব পলিটিক্স তিনি ঠিকভাবে বুঝে উঠছেন না। মন্ত্রী সাহেব এসে বললো, পার্টির নতুন সদস্য সংগ্রহ অভিযান চলছে, আপনি আসেন। তিনি গেলেন। ফরম পূর্ণ করলেন। এরপর শপথ। হাত তুলে শপথ নিলেন, পার্টির আদেশ-নির্দেশ মানিয়া চলিবো। তিনি পার্টির হাইকমান্ডের নির্দেশ মেনে চলতে চান। কিন্তু এতোকিছু তিনি বুঝবেন কী করে ? বিসিএস পরীক্ষা কীভাবে হয়, সেখানে দলীয় লোক ঢোকানো যায় কিনা, তিনি তো তিনি, তার চোদ্দপুরুষের কেউই এটা বোঝেন না।

তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, যা বুঝি না, তা করবো না, যা বুঝি, তার মাধ্যমেই তিনি দলীয়করণের দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করবেন।

শ্যালক সাহেব চলে যাবার পর সেই রাতে তার ঘুম ভালো হলো না। খুব গরম। বর্ষাকাল, কিন্তু বৃষ্টি নেই। শেষরাতে বৃষ্টি এলো। তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন এসে হানা দিল। স্বপ্নে দেখলেন আজরাইল এসেছে। বলছে, ভেতরে ঢুকতে পারি?

তিনি বললেন, কেন ?

আজরাইল বললো, কাজ আছে।

কাজ ? কী কাজ ? কাজের জন্য এলে আগে নিজের দলীয় পরিচয় দাও ? তুমি কি আমাদের দল করো ?

না। আমি কোনো দল করি না। আমি নির্দলীয় ?

বলে কী ? নির্দলীয় ? কেয়ারটেকার ? গেট আউট; বের হও আমার ঘর থেকে।

ঘুম ভেঙে গেলো। তার বুকের বাঁ-পাশটা ব্যথা করছে তীব্রভাবে। তিনি মৃত্যুভয়ে কাতর হয়ে গেলেন। বললেন, ডাক্তার ডাকো।

স্ত্রী বললেন, কাকে ডাকবো ? ডা. সেন কে ?

না। মাথা খারাপ। জাতীয়তাবাদী ডাক্তার ডাকো। ড্যাব-এর অফিসে ফোন করো। চারশটা টাকা ভিজিট আমি যাকে-তাকে দিতে পারবো না। মরেও তখন সুখ আসবে না।

তার স্ত্রী ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। স্বামীর কথাবার্তা তিনি কিছুই বুঝছেন না।

যেখানে বাঘের ভয়

যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত্রি হয়। এটাই স্বাভাবিক। একবার রাত্রি নয়টার সময় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে দিয়ে যাচ্ছি। রিকশায়। দেখি একদল লুঙিপরা লোক একটা রিকশা ঘিরে ধরেছে। রিকশায় একজন চল্লিশোর্ধ্ব মহিলা। মেডিকেল হাসপাতালের সামনে। মহিলা কোনো বিপদে পড়েছেন ভেবে আমি রিকশাঅলাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বললাম, একটু ধীরে চালান, দেখি, ব্যাপারটা কী ? রিকশার গতি শ্লথ হতেই লোকগুলো আমাকে ঘিরে ধরলো। তাদের হাতে বড়ো দা। তারা আমাকে বললো, কী আছে, চটপট বের কর। আমি বললাম, তেমন কিছু নেই। ঘড়িটা নেন। পকেটে একশ' টাকা আছে। এইমাত্র ধার করেছি। দিয়ে দিচ্ছি। তারা এসব নিলো। এরপর আমার কোমরে ও শরীরের অন্য স্থানে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখলো, বাড়তি কিছু পাওয়া যায় কিনা। আর কিছু না পেয়ে তারা আমাকে ছেড়ে দিলো। যাওয়ার আগে আমার মূল্যায়ন করে গেলো, 'হারামজাদা'।

এই ঘটনায় আমার আর্থিক ক্ষতি তেমন নয়। কারণ ঘড়িটি ছিল শস্তা, দুশ' টাকার, সব মিলিয়ে হারালাম ৩০০ টাকা। কিন্তু যে বড়ো স্থায়ী ক্ষতিটা হলো, তা হলো আমার আত্মার স্বাধীনতার বিনষ্টি। রাত্রিবেলা চলাচল করতে ভয় পাই। রাস্তায় কয়েকজন লোক একসঙ্গে গেলেই রিকশাঅলাকে বলি, রিকশা ঘোরাও। সন্ধ্যার পর বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পারতপক্ষে যাই না। কিন্তু এমন প্রায়ই হয়, টিএসসি থেকে বেরুতেই সন্ধ্যা হয়। শহীদ মিনার এলাকায় গেলেই টের পাই, রাত্রি হয়ে এসেছে। মহা দুশ্চিন্তার ব্যাপার। এমন হচ্ছে কেন ? যেখানে ছিনতাইকারীর ভয়, সেখানেই রাত্রি হচ্ছে কেন ?

এই সমস্যার সমাধান পেয়ে গেছি। আসলে রাত্রি সর্বত্র হয়। যখন বাসায় থাকি তখনো হয়, যখন ১০/১২ জনের ভারি দলে থাকি তখনো হয়, যখন নিরাপদ স্থানে থাকি তখনো হয়। কিন্তু সে-সময় খেয়াল থাকে না। শহীদ মিনারের সামনে এলেই টের পাওয়া যায়, রাত্রি হয়েছে।

কিছুদিন আগের ঘটনা। সকাল ১০টায় এক জায়গায় যেতে হবে। পাঁচ মিনিট দেরি হলেও সর্বনাশ। খুব বড়ো ক্ষতি হয়ে যাবে। এমনিতেই রিকশায় যেতে লাগে ১৫ মিনিট। বেরুতে বেরুতে দেরি হয়ে গেলো। আর হাতে সময় আছে ১২ মিনিট। বাসার সামনে সবসময় রিকশা দাঁড়িয়ে থাকে। গিজগিজ করে। বেরিয়ে দেখি একটিও রিকশা নেই। হাঁটতে শুরু করলাম। একটা রিকশা পাওয়া গেলো। ভাড়া জিজ্ঞেস না করেই উঠে গেলাম। দেখা গেলো, জোয়ান রিকশাচালক, কিন্তু চালাচ্ছে খুবই ধীরে। এরমধ্যে একবার চেইন পড়লো। লেভেলক্রসিঙে এসে দেখা গেলো ট্রেন এসে গেছে। ট্রেন গেলো। তবু বাঁশ ওঠে না। ব্যাপার কী ? ডাবলক্রসিং। এবার একটা বিরাট মালগাড়ি যাবে। অগত্যা রিকশা ছেড়ে দিলাম। হেঁটে পেরিয়ে স্কুটার নিলাম। স্কুটার স্টার্ট নিচ্ছে। প্রথমবারে নিলো না। তিনটা স্টোক লাগলো স্টার্ট নিতে। তাড়াহুড়ো থাকলে এরকম হয়। শুধু আজকের কথা নয়। তাড়া থাকলে পথে কোনো-না-কোনো গ্যাঞ্জাম হবেই।

এটা কেন হয় ? এর উত্তর একই। রিকশার চেইন অন্যদিনেও পড়ে; কিন্তু তাড়া থাকে না বলে, সেদিকে খেয়াল থাকে না। পথে লেভেলক্রসিং থাকলে তা মাঝেমধ্যে পড়বেই, কিন্তু যেদিন হাতে সময় থাকে কম, উৎকণ্ঠা থাকে বেশি, সেদিনই খেয়াল হয়, বাঁশ দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আরো একটা বিষয় আছে। ধরা যাক, আপনার বা-পায়ের কনিষ্ঠা আঙুল কেটে গেছে। দেখবেন, বারবার ওই জায়গাটাতেই আঘাত লাগছে। বাচ্চার বল ছুটে এসে ওইখানেই গুঁতো দেবে, আপনার চলার পথে থাকা টেবিলের পায়াটি ওই আঙুলেই আঘাত করবে। এটা কেন হয় ? জবাব একটাই। শরীরের অন্য অংশেও গুঁতোটুতো লাগে, কিন্তু ক্ষতস্থানে লাগলেই সেটা টের পাওয়া যায়।

আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা প্রায়ই অভিযোগ করেন, সবসময় তার দলের সমালোচনা করা হয়। বিএনপি যখন জামাতের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ক্ষমতায় গেলো, তখন কেউ সমালোচনা করলো না। আর আওয়ামী লীগ যখন সংসদের ভেতরে জামাত-জাপার সঙ্গে ঐক্য গড়েছে, তখন চারদিকে হৈহৈ রব। শেখ হাসিনার এরকম মনে হওয়ার কারণ কী ? কারণ একটাই। বাংলাদেশের প্রগতিশীল সংবাদপত্রগুলোয় প্রতিদিন পাতার-পর-পাতা জুড়ে বিএনপি সরকার ও জামাত-জাপার যে সমালোচনা করা হয়, সেটা তার চোখে পড়ে না। জামাত-জাপার পচা শামুকে হাসিনার পায়ের যে আঙুলটি কেটে গেছে, সমালোচকদের ঘাগুলো সেখানে গিয়ে লাগছে। আসলে যেখানে বাঘের ভয়, রাত্রি শুধু সেখানেই হয় না, সারাটা পৃথিবী জুড়েই রাত্রি নামে, ব্যাঘ্রভীতি থাকলে সেটা টের পাওয়া যায় হাড়ে হাড়ে। এ কারণেই—

সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে আলাপকালে স্ত্রীর আবির্ভাব ঘটে।

আপনি নির্ধারিত মূল্যে জুতো কেনার পরদিনই বিরাট মূল্য-হ্রাসের ঘোষণা আসে।

টিভিতে ভালো অনুষ্ঠান থাকলে বিদ্যুৎ চলে যায়।

যেদিন সংবাদপত্রের প্রাইজবন্ডের রেজাল্ট থাকে সেদিন আপনার হকার কাগজ দিতে ভুলে যায়।

একটুখানি সর্দি লাগলে ফ্যানের ধীর ঘোরাও শরীরে এসে বিঁধে, কিন্তু যখন গরম লাগে তখন মনে হয়, এই ফ্যানে বাতাস হয় না।

হুমায়ূন আজাদের কবিতা অবলম্বনে বলা যায়, যেদিন আমি কলাভবনে কস্তুরীর সঙ্গে দেখা করতে যাবো, ছাত্রনেতা স্ট্যাবড হয়ে যায়, ক্লাস বন্ধ, আমাদের আর কোনোদিন দেখাই হয় না।

টাইম মেশিন হাতে বাঙাল-গালিভার

টাইম মেশিনের নামটা, আশা করি, আপনারা সবাই জানেন। খুবই সহজ যন্ত্র। মানুষের গতি যদি আলোর গতির চেয়ে বেশি করা যায়, তাহলে মানুষ সময়ান্তরে যেতে পারে। অতীতে যাওয়া তো নস্যি, ভবিষ্যতে যাওয়াটা ডালভাত। তেমনি এক টাইম মেশিনের সাহায্যে গালিভার নামের এক বাঙাল ভদ্রলোক ভবিষ্যত বাংলাদেশের উদ্দেশে রওনা হলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তিনি প্রথমে টাইম মেশিনের নীল বোতামটি টিপলেন। এটি অদূর ভবিষ্যতে যাবার বোতাম। সঙ্গে সঙ্গে টাইম মেশিন তাকে সেই সময়-খণ্ডে নিয়ে গেলো। গালিভার ছিলেন তার ড্রয়িংরুমে। সেখানে একটা টেলিভিশন সেট ছিল। নীল বোতাম টেপার ফলে কাল-বদল ঘটলো বটে, তবে স্থানবদল ঘটলো না। তার সামনে টেলিভিশনটা রয়েই গেলো। তিনি সেটা অন করলেন। ৮টার সংবাদ হচ্ছে। খবরে একজন মহিলা-প্রধানমন্ত্রীকে দেখানো হচ্ছে। ভদ্রমহিলা দেখতে একহারা, নাক লম্বাটে, চোখে চশমা। তার মাথায় আঁচল। তিনি গ্রামাঞ্চলে এক জনসভায় বক্তৃতা করছেন। বক্তৃতার বিষয়— 'হরতাল উন্নয়নের বাধা'।

গালিভারের মনে হলো—এটি তো সরকারি ভাষ্য। বিরোধীদলের ভাষ্যও জানা দরকার। বিরোধীদের বক্তব্য টিভিতে দেখানো হয় না। তাদের বক্তব্য ছাপা হয় বেসরকারি পত্রপত্রিকায়। তিনি একটা পত্রিকা হাতে তুললেন। এটি প্রধান বিরোধীদলের মুখপত্র দৈনিক দিনকাল। তাতে একজন নেত্রীর ছবি ছাপা হয়েছে প্রথম পাতায়। বড় অক্ষরে প্রকাশিত হয়েছে আপসহীন নেত্রীর আহ্বান—হরতাল পালন করে অগণতান্ত্রিক সরকারের সবকিছু অচল করে দিন। গালিভার দোটানায় পড়ে গেলেন। ব্যাপার কী ? তিনি ঘরের বাইরে পা রাখলেন। পাশের বাড়ির গেটে উকি দিলেন। এক লোক বেরুচ্ছে ঘর থেকে। তিনি তাকে বললেন, এক্সকিউজ মি. আমি কি আপনার সঙ্গে এক মিনিট কথা বলতে পারি ?

ভদ্রলোক বললেন, জি পারেন।

হরতাল সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কী ?

জি, ভালো প্রশ্ন করেছেন। ঠিক এ ব্যাপারটাই আমি ভাবছিলাম। এ এক বিরাট ধাঁধা। ধাঁধাটার জবাব আমি খুঁজছি। যে জবাব দিতে পারবে, তাকে নগদ এক লাখ টাকা দেবো।

গালিভার সবজান্তার হাসি হেসে বললেন, আপনার ধাঁধাটা কিন্তু আমি ধরে ফেলেছি।

এদেশে যে ক্ষমতায় যায়, সেই হরতালের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। আর যেই ক্ষমতার বাইরে থাকে, সেই হয় হরতাল প্রেমিক। প্রথমত একজন সামরিকজান্তা হরতালবিরোধী সাহিত্য গড়ে তোলেন। তিনি ক্ষমতাচ্যুত হবার পর তার দল ঠিকই হরতাল ডাকছে। আর হরতালের মাধ্যমে যারা তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে, ক্ষমতায় গিয়ে তারা এমন ভাব করেছে—এ-মা, হরতাল কী জিনিস, ও জিনিস আমরা চিনিই না। তারপরও সেই দলটিও ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে। ক্ষমতার বাইরে এসে তারাও হরতাল ডাকছে। এখন যারা ক্ষমতাসীন, তারা ভাবছে, হরতার-ফরতাল কেন আবার ? এই তো আপনার ধাঁধা, নাকি ?

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন। না, এটা তার ধাঁধা নয়। আমি আসলে জানতে চাইছি, তিনি বললেন, হরতাল শেষে সব সরকারই একটা প্রেসনোট দিয়ে থাকে। তাতে বলা হয়, অফিস-আদালতে উপস্থিতি ছিল স্বাভাবিক, কলকারখানা চলেছে ঠিকঠাক, রেল-বিমান-লঞ্চ ছেড়েছে সময়মতো। আবার সব সরকারই বলে থাকে—একদিন হরতাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হলে দেশের কোটি কোটি টাকা ক্ষতি। সরকারগুলোর এই দুই বিবৃতির মধ্যে জনগণ কোন্‌টা সত্যি বলে ধরে নেবে?

ধাঁধাটি শেষ করে উত্তরের অপেক্ষা না করে ভদ্রলোক বাইরে চলে গেলেন গেট খুলে।

গালিভার তার টাইম মেশিনের কমলা বোতামটি টিপলেন। তিনযুগ পরের বাংলাদেশে উপস্থিত হলেন তিনি। যে-বাড়ির সামনে তিনি ছিলেন সেটা এখন জরাজীর্ণ। তবে পথে খুবই ভিড়। বিচিত্র ধরনের যান আর মানুষের জটলা। গালিভার নড়ার ফুরসত পেলেন না। দেয়াল ঘেঁষে দাড়িয়ে রইলেন।

বাড়ির পাচিলে নানা দলের পোস্টার। তিনি অগত্যা সেসব পোস্টারের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

একটা পোস্টারে তিনটি ছবি। একটি ছবি একজন জেনারেল কাম প্রেসিডেন্টের, যিনি বহুকাল আগে এদেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। একটি ছবি তার বিধবা স্ত্রীর, যিনি এদেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। আরেকটি ছবি এদের বড়োছেলের। গালিভার মুচকি হাসলেন। পোস্টারের দিকে নজর পড়লো তার। এটিতেও তিনটি ছবি। এদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি, তার কন্যা আর তার নাতির ছবি। তিনি আবারো মুচকি হাসলেন।

কিন্তু অচিরেই তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। আরো পোস্টার। বাবা-মা আর ছোটছেলে। নানা, মা আর একমাত্র মেয়ে। সর্বনাশ। কতো পার্টি। তিনি অন্য একটি পোস্টারের দিকে তাকালেন। তাতে এক সাবেক সামরিক জান্তার তথাকথিত পুত্রের ছবি বাবার ছবির পাশে। পাশেই আরেকটা পোস্টার। তাতে লেখা ওই পুত্র আমাদের নেতার আসল পুত্র নয়। এই পোস্টারটি জাতীয় পার্টির (জাতীয়তাবাদী)। গালিভার হো হো করে হেসে ফেললেন। এবার তিনি সবুজ বোতাম টিপলেন। পৌছলেন আরো বছর পাঁচেক পরে। যে-বাড়ির সামনে তিনি ছিলেন, সেখানে এবার আর যানজট নেই। রাস্তাঘাট ফাঁকা ফাঁকা। তার বেশ ভালো লাগলো। সকাল সকাল মানুষ ছুটেছে অফিস-আদালতে (গালিভার এবার আর রাত ৮টার সময়বিন্দুতে পৌছাননি, পৌছেছেন সকালে)। তিনি একজন পথচারীকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাইজান, এখানটায় আগে খুব ভিড়টিড় হতো। আজ ভিড় নেই। ব্যাপার কী?

ব্যাপার আছে। আজ তো হরতাল। তাই রাস্তাঘাট ফাঁকা। লোকজন অফিস-আদালতে যেতে পারছে।

ও বাবা। এখনো বুঝি বিরোধীদল হরতাল ডেকেই চলেছে?

ভদ্রলোক হাসলেন। আপনি ভাই কোন্‌ দুনিয়া থেকে এসেছেন! এখন তো বিরোধীদল হরতালের বিরোধিতা করে আর সরকার হরতাল ডাকে।

বলেন কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জি ভাই। হরতাল না-ডাকা হলে রাস্তায় এতো জ্যাম থাকে যে, নড়াচড়ার উপায় থাকে না। রিকশার গায়ে রিকশা। প্যাসেঞ্জাররা সেই সারবাঁধা রিকশার পাদানীর উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নিজ গন্তব্যে যায়। এজন্য আবার রিকশাঅলাদের ভাড়া দিতে হয়। এছাড়া বাস-মিনিবাস-ট্রাক বেবির ঝক্কি তো আছেই। হরতাল না-ডাকলে রাস্তা-ঘাট অচল হয়ে পড়ে। সে-কারণেই সরকার প্রতিদিন হরতাল ডাকে। বিরোধীরা তাদের দাবিদাওয়া আদায় করার জন্য মাঝেমধ্যে হরতাল প্রত্যাহার করে নেয়। ভদ্রলোকের কথা শুনে গালিভার তাড়াতাড়ি একটা টেলিভিশন-সেটের সামনে গেলেন। খবর হচ্ছে। আজ সরকারের ডাকে দেশব্যাপী সফল হরতাল পালিত হয়েছে।

যাক, টিভি তাহলে হরতালের খবর দিলো। গালিভার আরাম বোধ করলেন।

গালিভার আবার তার টাইম মেশিনের বোতাম টিপলেন।

তিনি ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হলেন। তখন তার মনে পড়লো, কী রঙের বোতাম টিপেছেন, লক্ষ্য করা হয় নাই। দূর-ভবিষ্যতের বোতাম যে তাতে অবশ্য সন্দেহ নেই। এসব চিন্তা করতে করতে গালিভার পৌছলেন ভবিষ্যতের সেই কাঙ্ক্ষিত কালখণ্ডে। পড়লেন এক বুক পানিতে।

তার মানে আগের সেই জনবহুল এলাকাটি এখন জলমগ্ন।

দেখলেন গলাজলে দাঁড়িয়ে দুজন লোক উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় করছে। তিনি তাদের কাছে গেলেন।

তারা ঝগড়া করছে তো করছেই। তিনি তাদের ধাক্কা না দেওয়া পর্যন্ত তার দিকে কেউ ভ্রূক্ষেপও করলো না। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, ভাই, এখানে কোনো মানুষজন দেখি না কেন?

কারণ, তারা দুজন একসঙ্গে বললো, সবাই পালিয়েছে। নিরাপদ স্থানে চলে গেছে।

তা ভাই তোমরা দুজন এখনো গলাজলে দাঁড়িয়ে আছো কেন?

আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ফয়সালা করছি। ওটা ফয়সালা হয়ে গেলেই পালিয়ে যাবো।

কী সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়?

ও-মা, সেটাও জানো না। বিষয়টি হচ্ছে, আমরা বাঙালি না কি বাংলাদেশী।

দাওয়াত-আতঙ্ক

সেই জলাতঙ্ক রোগীটার কথা মনে পড়ছে। একবার আমি এক জলাতঙ্ক রোগীকে দেখেছিলাম। হাসপাতালে গেছি। ডাক্তারের সামনে বসে আছি। এমন সময় এক রোগী এলো। রোগী পানিকে ভয় পায়। ডাক্তার সাহেব বললেন, বাথরুমের ট্যাপটা ছেড়ে দাও। একজন গিয়ে বাথরুমের ট্যাপ ছাড়লো। পানি পড়ার শব্দ আসছে। রোগীটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চিৎকার করে উঠলো। ভয়ংকর চিৎকার। পানির শব্দ সে সহ্য করতে পারছে না। ডাক্তার সাহেব বললেন, একগ্লাস পানি আনো। পানি নিয়ে এলো একজন। তখন সেই ভয়ার্ত রোগীটির চোখমুখ যে কেমন হয়ে গেলো, সেই দৃশ্যের বর্ণনা দেওয়া আমার সাধ্যের বাইরে। ডাক্তার বললেন, কী কামড়েছে ? কুকুর, বিড়াল, বাদুড় ? আর কী, বাসায় নিয়ে যাও। আগে আসতে হতো। টাইম ইজ ওভার।

মৃত্যুমুখী সেই রোগীটির জন্য সেই সুদূর বাল্যকালে আমার খুব মায়া হয়েছিল। আহা বেচারা আর বাঁচবে না, সে আর কোনোদিন ভালো হবে না। পানিকে তার এতো ভয় ?

হাইড্রোফোবিয়ার ওই রোগীটির কথা মনে এলো নিজের অবস্থার কথা বিবেচনা করে। আমার নিজের মধ্যে একটা ফোবিয়া ঢুকে গেছে, দাওয়াত-ফোবিয়া বা নিমন্ত্রণ-আতঙ্ক। সবসময় ভয়ে ভয়ে থাকি, এই বুঝি আবার কেউ দাওয়াত নিয়ে এলো। অথচ ছেলেবেলায় দাওয়াত ব্যাপারটা আমার খুব পছন্দেরই ছিল। বেশ ভালো খাওয়া পাওয়া যায়। কিন্তু তেমন দাওয়াত খুব একটা আসতো না। বছরে দু-চারটার বেশি তো নয়ই। আব্বার সঙ্গে চলে যেতাম আমন্ত্রকদের বাসায়। খুবই উৎসাহ লাগতো। আব্বা বলতেন, 'তোমার দাদার একটা কলের গান ছিল, সাতগ্রামে আর কারো বাড়িতে গ্রামোফোন ছিল না বলে সাতগ্রামে যতো বাড়িতে বিয়ে হতো, আমরা দাওয়াত পেতাম; ছেলেবেলায় অনেক দাওয়াত খেয়েছি। কলের গানটা বগলে করে হাজির হতাম।

ছেলেবেলায় আব্বাকে খুব ঈর্ষা হতো। আব্বা কতো দাওয়াত খেয়েছেন, আমি কেন অতো দাওয়াত পাই না ? বিধাতা নিশ্চয়ই তখন অদৃশ্যে হেসেছেন। বড়ো হও, এখন দাওয়াত পাইবার জন্য যতোখানি কাঁদিতেছ, ভবিষ্যতে দাওয়াত না-পাইবার জন্য ততোখানি কাঁদিতে হইবে।

যে আত্মীয়ের সঙ্গে সারাবছর কোনো যোগাযোগ নেই, বছরে একদিন তিনি এসে হাজির। সঙ্গে ফ্রকপরা উত্তর প্রজন্ম। কাক্কু, কাক্কু, সোমবার আমাদের বাসায় এসো। আমার জন্মদিন। 'ও তাই বুঝি, তাহলে তো যেতেই হয়'। মুখে মধুর হাসি এনে জবাব। এদিকে কলজেতে ব্যথা শুরু হয়ে গেছে। এই এক কালচার শুরু হয়ে গেছে—জন্মদিন কালচার। ব্রিটিশরা বহু কিছু নিয়ে গেছে, দিয়ে গেছে রেলগাড়ির মতো বিশাল বিশাল বহু কিছু। বার্থডে কালচারটা তার মধ্যে সবচেয়ে বিশাল। তবে এতোদিন এই সংস্কৃতি ধামাচাপা ছিল। সেই ধামাটা ইদানীং আর থাকছে না। বাঙালি মধ্যবিত্তে শ্রেণীউত্তরণের দৌড় খুব ভালোভাবে শুরু হয়ে গেছে। বার্থডে না করলে আর প্রেস্টিজ থাকে না। রাত্রিবেলা বিমুখ স্ত্রীর অনুযোগ, হ্যাগো, টিংকু, রিংকু, সোনিয়া সবার বার্থডে হচ্ছে, আমাদের নাতাশার মুখটা ভার হয়ে থাকে, ও বলেছে, আম্মু, শুধু এইবার করো, আর কোনো বছর করতে হবে না। ওগো শুনছো, নাকি ঘুমুলে ? তাহলে এবার ওর বার্থডে পার্টিটা অ্যারেঞ্জ করি। চলেছে প্রেস্টিজ রক্ষার প্রতিযোগিতা। শাম্মির কেকের অর্ডার দেওয়া হয়েছে পূর্বানীতে, তাহলে নিম্মিরটা আসবে শেরাটন থেকে। এক কাঠি উপরে থাকা চাই। ও শুধু কলা চানাচুর খাইয়েছে, আমরা খাওয়াবো বিরিয়ানি। লাগাও প্রতিযোগিতা। দেখা যাক, কে হারে কে জেতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রতিযোগিতা কেবল কে কেমন খাওয়ালো, কতোজনকে খাওয়ালো, তার নয়, কে কী উপহার পেলো, তারও। অনুষ্ঠান শেষ। কিন্তু দুজন মেহমান কিছুতেই যাচ্ছে না। রুদ্ধশ্বাসে এ দুজনের বিদায় হবার অপেক্ষা। ওরা বারান্দা না পেরুতেই দরজা বন্ধ। সবাই মিলে গোল হয়ে রঙিন কাগজের মোড়ক খোরাক। ভেতরে কী দিয়েছে। এম্মা, এটা কোনো গিফট হলো! শালা হাড়কিপ্টে। কাক্কু হয়ে গেলেন শালা। 'কী দরকার ছিল এসব আনার', মুখে, অন্তরে এই। একটা পার্টি আয়োজনে কষ্ট অনেক, কিন্তু সব কষ্ট নাকি নিমিষেই দূর হয়ে যায় এই প্যাকেটগুলো খুলতে। তারপর এগুলোকে দু-ভাগ করো। ভালো উপহারসামগ্রীগুলো নিজেদের জন্য রেখে দাও, খারাপগুলো তোলা থাকলো সারাবছর অন্যকে উপহার দেওয়ার জন্য। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তো নিজেদেরও যেতে হবে প্যাকেট হাতে।

সব দেখেশুনে ভুগছি দাওয়াত-আততে। দাওয়াতের অসুবিধা কী কী ? কোনোই অসুবিধা নেই। খুবই আনন্দের ব্যাপার। প্রিয়জনের সঙ্গে মিলিত হওয়া যায়। (ছোট ফ্লাটে গাদাগাদি ভিড়, ফ্যানের হাওয়ায় ঘাম শুকোয় না, বসার জায়গা নেই, হাঁফ ছাড়ার অবকাশ নেই, সেখানে প্রিয়জনের সঙ্গে কথা বলবে কোন্ অতিবাচাল ?) তবে একটা বাস্তব সমস্যা আছে। প্রেজেন্টেশন কেনা। উপহারসামগ্রী। খালিহাতে দাওয়াতে যাওয়া যাবে না। কোনো উপলক্ষ ছাড়া দাওয়াত মানে কমপক্ষে দেড়কেজি সন্দেশ, অথবা দু-কেজি চমচম। দুশ টাকার ধাক্কা। দু-কেজি দইয়ের ওপর দিয়ে চালালে একশ' বিশ টাকায় সারা যাবে। কলকাতার লোকজন নাকি আধাকিলো মিষ্টি কিনে নিয়ে যায়। ওদের বাস্তব বুদ্ধি আমাদের চেয়ে ঢের ভালো বলতে হবে। মিষ্টি কেনায় তবু ঝামেলা কম। কিন্তু বিয়ে-জন্মদিন-বিবাহবার্ষিকীর দাওয়াত হলে কিনতে হবে যাকে বলে 'উপহার।' আন্তরিক উপহার। ডাবল ঝামেলা। প্রথমত সিদ্ধান্ত নিতে হবে– কী দেওয়া যায় ? বড়ো মৌলিক সমস্যারে ভাই। কী দেবেন ? নিজেদের পাওয়া পুরোনো প্যাকেটের ওপর দিয়ে সারতে পারলে আপনি মহাভাগ্যবান। তা না পারলে এই কঠিন বৈতরণী পার হওয়া রীতিমতো যুদ্ধের ব্যাপার। উপহার কেনার আগে আপনাকে অনেকগুলো দিক বিবেচনায় আনতে হবে। যেমন, কাকে দিচ্ছেন ? তার অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন ? কেরানির ঘরে গেলে কমদামি উপহার দিলেও চলবে; কিন্তু বসের ঘরে গেলে ওটা দামি হওয়া বিধেয়। কোন্ পক্ষ ? পিতৃপক্ষ নাকি শ্বশুরপক্ষ ? এর আগে আপনার পার্টিতে এরা কী এনেছিলেন ? খুব দামি কিছু নাকি যা হোক একটা কিছু ? এটা মাসের কতো তারিখ ? শুরুর দিকে নাকি শেষের দিকে ? সবদিক বিবেচনা করে আপনি বেরুলেন। শাড়ি বা গয়নার দোকানে যেতে হতে পারে, শার্টের দোকানেও। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যেতে হয় উপহার-বিতান, গিফট-স্টোর জাতীয় দোকানে। যেমন—ঢাকা নিউমার্কেটস্থ দুবাই মার্কেট। পুরো দু-ঘণ্টা ঘুরবেন বাজারে। দুশ টাকায় কোনোকিছু হয় না। যেটা হয় সেটা রঙিন কাগজে মুড়ে নিয়ে গেলেও প্রেস্টিজ থাকে না। ভানুর কৌতুকের মতো বলে ফেলতে পারে, এটা কী এনেছেন, ফুলদানি ? আচ্ছা আপনি এই লোয়ারক্লাস সারিতে বসে পড়ুন। আর যেটা আপনার চোখে পাতে দেওয়ার মতো মনে হচ্ছে, সেটার দাম ১২শ' টাকা। এই দাওয়াতের গ্রেড ১২শ' টাকার নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হায়রে মধ্যবিত্ত। দারুণ চালাচ্ছো। ভিতরে এক, বাইরে আর এক। তবু তার উৎসাহের কমতি নেই। পার্টি করতে হবে। বার্থডে পার্টি, ম্যারেজডে পার্টি। মাসে অন্তত ১৩টা পার্টি থাকে। কোনোটা বিয়ের, কোনোটা অন্য কোনো উপলক্ষের। কাউকে স্বর্ণালংকার, কাউকে কাপ-পিরিচ। গড়ে চারশ' টাকা। উপহার খাতে ৪২০০ টাকা। মাসের বাকিটা বাতাস খেয়ে বেঁচে আছি। এ অবস্থায় জলাতঙ্ক রোগীর মতোন আতঙ্ক পেয়ে বসতেই পারে। পুরোনো আত্মীয় হঠাৎ বাসায় এলেই ভয় লাগে। নিশ্চয়ই এসেছে দাওয়াত দিতে।

অগত্যা মিশনারি উৎসাহ নিয়ে নেমে পড়লাম বার্থডে পার্টির বিরুদ্ধে। সংগৃহীত তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে বার্থডে কালচার বাংলাদেশের মধ্যবিত্তের মধ্যে মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়েছে এই প্রজন্মের কালে। আমাদের পূর্ববর্তী প্রজন্মের অনেকেরই জন্ম তারিখেরই সঠিকতা নেই। এখন যেমন 'আজ শামসুর রাহমানের জন্মদিন' বলে সংবাদ ছাপা হয়, শামসুর রাহমানের বাল্যে যৌবনকালে তিনি নিজে এই দিবসটি উদযাপিত হতে দেখেননি। কিন্তু আমাদের পরের প্রজন্মে জন্মদিন না হওয়াটাই অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম। মধ্যখানে চিপায় পড়েছে আমার মতো যুবা-বয়েসী বৃদ্ধেরা। এরা ধরতেও পারছে না, ছাড়তেও পারছে না।

এইসব তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে পার্টি-কালচার বিরোধী হিসেবে নিজের একটা কুখ্যাতি অর্জিত হয়ে গেলো। অবশ্য সরাসরি যে খেতাবটি জুটলো, তা হলো 'খ্যাত।'

নিকটাত্মীয়ের ছেলের বার্থডে। দাওয়াত দেবে—নিশ্চিত হয়ে আছি। মাসের শুরুতে এ নিয়ে টাকাপয়সাও বরাদ্দ হয়ে গেছে। কিন্তু দাওয়াত আর আসে না। ব্যাপার কী ? ভুলক্রমে বাদ পড়ে গেছি হয়তো। টেলিফোন করে কুশল জিজ্ঞাসা। না, এ-কথা-সে-কথা বলে, দাওয়াত দেয় না। নির্ধারিত দিন এলো, চলে গেলো। আত্মীয়স্বজন সবাই দাওয়াত পেয়ে পার্টিতে হাজিরা দিয়ে এলো।

রাত্রিবেলা দুজনেরই মুখ গম্ভীর। বুকে দীর্ঘশ্বাস। এইভাবে সমাজচ্যুত হয়ে পড়লাম। হায়রে দাওয়াত। এ-যে পেলেও খারাপ, না-পেলেও খারাপ। এই অবস্থার নাম ত্রিশংকু অবস্থা, নাকি এই মানসিকতার নামই মধ্যবিত্ত ? রাতে একটা খুব বাজে স্বপ্ন দেখলাম। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। আয়নায় দেখা যাচ্ছে একটা শুয়োরের মুখ। স্বপ্নটার ব্যাখ্যা জানা দরকার। কার্ল মার্কসকে পেলে ভালো হতো। একটা প্রশ্নের উত্তর জানা দরকার। আমি বুর্জোয়া-সাংসদের মতো মর্যাদাটা অর্জন করলাম কিসে—জন্মদিন সংস্কৃতির মধ্যে পড়ে, না কি তাকে ঘৃণা করে ?

হিসাব মেলে না

'অবৈধ-অর্থ ব্যাঙ্কে জমা করলে জেল'

'চোরাচালান, মাদক ব্যবসা ও অবৈধ ব্যবসা ও অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ ব্যাঙ্কে জমা করলে তা' বাজেয়াপ্ত করা হবে। এই ব্যাঙ্ক একাউন্ট পরিচালনাকারীকে অন্যদিকে সাতবছর শাস্তি ভোগ করতে হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৪।

আমি ছিলাম একজন সামান্য ব্যাঙ্ক-ম্যানেজার। আমার ব্রাঞ্চের ছিল খুবই সুনাম। কর্তারা আমার ওপরে খুবই খুশি ছিলেন। কারণ আমার সেবার মান খুবই ভালো। আমার ব্যাঙ্কে লেনদেন হতো বেশি। লক্ষকোটি টাকা প্রতিদিন আমার ব্র্যাঞ্চে জমা হতো, ওঠানো হতো।

একদিন সকালে একটা সরকারি সার্কুলার এলো। সার্কুলারের বিষয় 'অবৈধ অর্থ ব্যাঙ্কে জমা করলে জেল।' খুবই আনন্দের খবর, খুবই মহৎ উদ্যোগ। দেশ অসৎ লোকে ছেয়ে গেছে। সৎলোকের কোনো স্থান নেই, সততার কোনো মূল্য নেই। সরকার দেশে দুর্নীতি, অবৈধ কারবার বন্ধ করতে চাইছেন। আমার কর্তব্য এই মহৎ উদ্যোগে সাড়া দেয়া।

সেদিন সকাল বেলাতেই একটা চেক এলো। একজন সচিবের ব্যক্তিগত একাউন্ট। অবশ্য তার স্ত্রীর নামে। তিনি কুড়ি লাখ টাকা ওঠাবেন। চেকটা ছেড়ে দিতে গিয়ে হঠাৎ মাথার মধ্যে ঝিলিক দিয়ে উঠলো। একজন সেক্রেটারি ২০ লাখ টাকা পেলেন কোথায়? এটা কি বৈধ না অবৈধ? চেকটা ছাড়া হলো না।

খানিক পরে টেলিফোন বেজে উঠলো। সেক্রেটারি সাহেব রিং করেছেন।

হ্যালো, ম্যানেজার সাহেব, স্লামালিকুম।

ওয়ালাইকুম আসলামাল।

একটা চেক পাঠিয়েছিলাম। ২০ লাখ টাকার চেক। হঠাৎ করে মেয়েটা জিদ ধরলো, গাড়িটা বদলাতে হবে। নিসান প্যাট্রোল কিনতে চায়। কী মুশকিল ছোটো গাড়িতে চড়লে নাকি মন ছোটো হয়ে যায়। হা-হা-হা।

তা তো বটেই। তা তো বটেই।

চেকটা ভাঙাতে দেরি হচ্ছে কেন? কোনো অসুবিধা?

না, না। অসুবিধা কী? এই তো ছেড়ে দিচ্ছি। তবে কথা কী, একটা হিসাব মেলাতে পারছি না।

হিসাব মেলাতে পারছেন না? তাহলে তো বেশ ঝামেলায় পড়েছেন। ব্যাঙ্কের চাকরি খুবই রিস্কি। আপনি এক কাজ করুন। এসি ছেড়ে দিয়ে আধঘণ্টা রুমের মধ্যে একা থাকুন। তারপর বজ্রাসন করুন। যোগ ব্যায়ামে মাইন্ড কনসেন্ট্রেটেড হয়।

থ্যাঙ্ক ইউ ফর দি সাজেশন। তবে কথা কি জানেন, আমার হিসাবটা মেলাতে আপনি আমাকে খানিক সাহায্য করতে পারেন।

কী রকম?

একজন সেক্রেটারি প্রথমে চাকরিতে ঢোকে সহকারী সচিব হয়ে। এখন সহকারী সচিবের মাসিক বেতন ৪৪০০ টাকা। বিশ বছর আগে যখন আপনি সহকারী সচিব হয়ে ঢুকেছিলেন বেতন নিশ্চয়ই দুই হাজার টাকার বেশি ছিল না। তারপর ধীরে ধীরে প্রমোশন হয়েছে, বেতন বেড়েছে। এখন সাকুল্যে কতো পান? নিশ্চয়ই পনেরো হাজারের বেশি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আপনি কী বোঝাতে চাইছেন ?

কিচ্ছু না। হিসাব মেলাচ্ছি। তার মানে আপনি ২০ বছরে গড়ে প্রতিমাসে কামাই করেছেন পাঁচ হাজার টাকা করে। এই পাঁচ হাজার টাকার এক পয়সাও ধরা যাক আপনি খরচ করলেন না, তাহলে আপনার বার্ষিক সঞ্চয় দাঁড়ায় ৬০ হাজার টাকা। তার মানে দশ বছরে ছয় লাখ আর বিশ বছরে বারো লাখ। সুদে-আসলে তা বিশ বছরে বিশ লাখ হতেই পারে। এখন আমার প্রশ্ন, এই বিশ বছরে আপনি কি হাওয়া খেয়ে বেঁচেছিলেন ? আপনার স্ত্রী-পুত্ররা কি হাওয়ার কাপড় পরে দিন কাটিয়েছে ? আপনার বাড়ির টিভিটা-ফ্রিজটা এলো কোথা থেকে ? আপনার দুইছেলে আমেরিকায় পড়ছে কার টাকায় ? বিশ লাখ টাকা আপনার বেতনের টাকা হলে আপনার দিন চালানোর টাকা এলো কোথা থেকে ? আর বেতনের টাকায় দিন চললে এতো টাকা জমলো কীভাবে ? তিন কেজি যদি মাংসের ওজন হয়, তাহলে বিড়ালের ওজন কই ? আর তিন কেজি যদি বিড়ালের ওজন হয়, তবে মাংসের ওজন কই ?

আমি বলেই চলেছি, অপর পক্ষ কখন যে টেলিফোন রেখে দিয়েছেন, জানি না। দুদিন পরে আমার বদলির অর্ডার চলে এলো। আমি অন্য ব্রাঞ্চে ট্রান্সফার হয়ে গেলাম।

সেখানে কাজকর্ম ভালোই চলছিল। একদিন সকালে দেখা আমার বাল্যবন্ধু চোঙা হাতেমালীর সঙ্গে। হাতেমালী আমার স্কুল বন্ধু। দেখতে অকারণ লম্বা বলে আমরা তাকে ডাকতাম চোঙা বলে। চোঙা পড়াশোনায় খুবই খারাপ ছিল। স্কুলের অঙ্কের স্যার তাকে বলতেন শাঁস নেই, তালগাছ। শুধুই লম্বা হয়েছে।

সেই চোঙার সঙ্গে অনেক দিন পর দেখা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। চোঙা তখন পলিটিক্স করছে। একদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চোঙার বক্তৃতা শুনলাম। যা ভেবেছি তাই, চোঙার মুখের দু-কোণা দিয়ে অনর্গল থুতু ঝরছে। কিন্তু কী করে জানি না, চোঙা বড় নেতা হয়ে গেলো। একসময় দেখা গেলো আমাদের চোঙা ইউনিভার্সিটির সবচেয়ে বড়ো ছাত্রনেতা। দেশে সরকারবিরোধী তীব্র আন্দোলন গড়ে উঠলো। আমার মতো অরাজনৈতিক মানুষও আন্দোলনে নেমে পড়লো। কিন্তু চোঙার দেখা নেই। লোকে বলাবলি করতে লাগলো সরকার চোঙাকে কিনে নিয়েছে। আন্দোলন সফল হলো। দেশে রাজনৈতিক পট বদলে গেলো। চোঙাকে আবার দেখা গেলো ক্যাম্পাসে। গলায় ফুলের মালা।

তারপর আজ বছর দুয়েক পরে চোঙাকে দেখছি। পরনে সিল্কের পাঞ্জাবি, গলায় সোনার চেইন। আমি বললাম, হাতেম আলী, তুমি আবার সোনার চেইন গলায় ঝুলিয়েছো কেন ?

চোঙা মোটা গলায় বললো, নেতার আদর্শ। আমার নেতাও গলায় সোনার চেইন পরেন কি-না। আমি ঘাবড়ে গেলাম।

চোঙা আমার সামনে বসে ওর ব্যাগ খুললো। ১৫ লাখ টাকার বান্ডিল। বললো, দোস্ত, টাকাগুলো জমা নিয়ে নাও। একটু তাড়াতাড়ি করো। আজই ঢাকার বাইরে একটা কলেজে বক্তৃতা দিতে যেতে হবে।

আমি বললাম, চোঙা, তুমি করছো কী এখন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চোঙা বললো, কেন, পরিটিক্স।

পলিটিক্স করে এতো টাকা ?

চোঙা বললো, বোঝো তো। এক নামে রাখা যায় না। তিন নামে রেখেছি। সামনে ইলেকশন। এবার ত্রিশ-চল্লিশ লাখ টাকার নিচে ইলেকশন করা যাবে না।

আমার মাথার মধ্যে আবার পোকাটা নড়ে উঠলো। একবার বদলি হলেই মাথা থেকে ভূত নামে না।

আমি বললাম, চোঙা, একদম ফেঁসে যাবে। অবৈধ টাকা ব্যাঙ্কে রাখলে জেল-জরিমানা হবে। তুমি অন্যকোথাও রাখো। তুমি আমার বাল্য বন্ধু।

চোঙা বিরক্তিভরে আমার দিকে তাকালো। যাবার সময় বললো, দোস্ত, মাথাটা কোনো ভালো ডাক্তারের কাছে দেখিয়ে নিও!

ব্যাঙ্ক পারফরম্যান্স দিনদিন খারাপ হতে লাগলো। লেনদেন নেই। ঠক বাছতে গাঁ উজাড়। অবৈধ অর্থ ছাড়া বড়লোক হওয়া যায় না। টাকা জমা পড়ে না। আমার বিরুদ্ধে নানা রিপোর্ট গেলো কর্তৃপক্ষের কাছে।

কয়েক দিন পর আমার চাকরিটাই গেলো চলে।

একা একা ঘুরি। বিড়বিড় করি। রাতে ঘুম হয় না। মনে হয়, হিসাব তো মিলছে না। পুরো বেতন জমালেও একটা নিসান প্যাট্রল হয় না একজন সেক্রেটারির। এরা চলছে কীভাবে ? একজন ছাত্রনেতা কী করে লাখ টাকার মালিক হয়, দুটো-তিনটে বাড়ি করে দু-বছরে ? শুধুই হিসেব করি, অঙ্ক কষি। অঙ্ক মেলে না।

আমার আত্মীয়স্বজন আমাকে ধরে নিয়ে গেলো পাবনায়।

এখানে বেশ ভালো আছি আমি। শুধু মাঝে মাঝে মাথাটায় কী যেন কিলবিল করে। হিসাব তো মিলছে না। অবৈধ টাকা না রাখলে ব্যাঙ্ক তো খালি হবেই। অবশ্য একটা সমাধান আছে। সৎ উপায়ে অর্থবান হওয়া। ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে শোধ না দেয়া। সেই টাকায় ভোগ এবং সঞ্চয়। কিন্তু তাতেও হিসেবের গোলযোগটা থেকেই যায়। ঋণ নেয়াটা হয়তো অসততা নয়, কিন্তু ফেরত না দেয়াটা ? মাথা ঝিমঝিম করে।

সন্ধ্যা হচ্ছে। আমি দাঁড়িয়ে আছি হাসপাতালের বারান্দায়। একঝাঁক পাখি পরিষ্কার আকাশে নীড়ে ফিরছে। সন্ধ্যা হলে সব পাখি ঘরে ফেরে। আমারও খুব ঘরে ফিরতে ইচ্ছে হচ্ছে। একটা সরকারি নিয়ম পালন করতে গিয়ে আমি ঘরছাড়া হলাম। বারবার খুব মনে পড়ছে স্ত্রী-পুত্রের মুখ। মনে হচ্ছে ছোটো ছেলেটার চিবুক ছুঁয়ে দিই। কিন্তু তা সম্ভব নয়।

নেই-রাজ্যের কাহিনী

ঘন জঙ্গল, আফ্রিকার। আকাশ অন্ধকার করা গাছ, পাতাগুলো এতো সবুজ আর ঘন যে, মনে হয় কালো। সূর্যের আলো মাটি পর্যন্ত পৌঁছায় কি পৌঁছায় না। সেই অগম্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বনের পথে লোকগুলো চলেছে। কেন ? কারণ, তাদের রাজ্য পরিচালনা করার জন্যে সরকার গঠন করতে হবে, কিন্তু লোক পাওয়া যাচ্ছে না। মহাসমস্যা। শেষে তারা ঘুমিয়ে পড়লো এক গাছের নিচে। গাছের ডগায় কথা বলছিল একজোড়া ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী। ব্যাঙ্গমা বললো, 'ব্যাঙ্গমী ও ব্যাঙ্গমী, বল্ তো, এরা সরকার গঠনের উপযুক্ত লোক পাবে কি পাবে না ?'

ব্যাঙ্গমী জবাব না দিয়ে আবদার করলো, তুই বল না! ব্যাঙ্গমা বললো, পাবে, তবে এখানে নয়, যেতে হবে সুদূর আফ্রিকার বনে। সেই ঘন জঙ্গলে বাস করছেন সরকার পরিচালনা করার জন্যে যারা যোগ্য তারা।

সেই লক্ষ্যে তারা চলেছে। তাদের একজন উপযুক্ত রাজ্যপ্রধান দরকার। যিনি সরকার পরিচালনা করতে পারবেন।

যেতে যেতে কতোজনের সঙ্গেই না তাদের দেখা হলো, কথা হলো, বৈঠক হলো, আলোচনা হলো, সংলাপ হলো। সব সংলাপই গেলো ভেস্তে।

যেমন দেখা হলো শিয়াল পণ্ডিতের সঙ্গে। তিনি তখন তার পাঠশালা পড়িয়ে ফিরছেন। লোকগুলো বললো, পণ্ডিত, ও পণ্ডিত। তুমি আমাদের মন্ত্রী হবে, আমাদের রাজ্যপ্রধান হবে। পণ্ডিত তো খুশিতে ডগমগ। বললো, নিশ্চয়ই। তবে ভাই আমার চরিত্র তেমন সুবিধার নয়। আমি কিন্তু এক কুমিরের ছা-কে সাতবার দেখাবো।

লোকগুলো বললো, কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের রাজ্যেও আমরা কতো দেখে আসছি। তুমি চলো আমাদের সঙ্গে, তোমাকেই আমরা রাজ্যপ্রধান বানাবো।

লোকগুলো সন্তুষ্টচিত্তে ফিরছে। পণ্ডিত তার বাঁধাছাঁদা সেরে লোকগুলোর সঙ্গে গল্প করছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমাদের ওখানে শিক্ষার অবস্থা কেমন ? কোনো সমস্যা নেই ?

তখন লোকগুলোর মনে হলো, আসল পরীক্ষাই তো করা হয়নি। শিয়াল পণ্ডিত আমাদের রাজ্য চালাতে পারবে কি-না সেটা তো দেখা দরকার। তারা বললো, না, শিক্ষার অবস্থা ঠিকই আছে। ছোটোখাটো সমস্যা তো থাকবেই। যেমন ধরো, কাগজের দাম বেড়ে গেছে। ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বন্ধ হবার যোগাড়। পাঠ্যপুস্তক ছাপানো যাচ্ছে না। নিউজপ্রিন্টের অভাবে সংবাদপত্রগুলো আধাআধি বেরুচ্ছে, কতগুলো বন্ধ হয়ে গেছে।

আর অন্যান্য প্রকাশনা ? শিয়াল পণ্ডিতের চোখেমুখে উদ্বেগ।

প্রকাশক সমিতি ধর্মঘট করছে। কাগজের দাম এতো যে ওরা বইপত্র বের করতে পারছে না।

শুনে শিয়াল পণ্ডিত গালে পা দিয়ে বসে পড়লেন। সর্বনাশ, সর্বনাশ— তার মুখ দিয়ে মাতম বের হতে লাগলো। এতো কঠিন সমস্যা, এতো বড়ো সমস্যা কাঁধে করে একটা রাজ্য চলছে কী করে, এখনই উপযুক্ত সমাধান বের করতে হবে— পণ্ডিত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

তখন লোকগুলো সবাই গোলটেবিল বৈঠকে বসলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শিয়াল পণ্ডিতকে দিয়ে আমাদের রাজ্য চলবে না, তারা বললো।

চামড়া পাতলা। সমস্যাকে সমস্যা মনে করে। আমাদের আরো মোটা চামড়ার রাজ্যনেতা দরকার।

তারা গেলো হরিণের কাছে। হরিণও রাজি হলো তাদের রাজ্যপ্রধান হতে। রাজ্যের পরিস্থিতি কী, সে জানতে চাইলো রাজ্যে কি শান্তি আছে ? আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভালো ? অপরাধ কম ?

লোকগুলো জবাব দিল, আছে মোটামুটি। তবে খুনখারাবি তো একটু হবেই। ছাত্র সংগঠনগুলো বন্দুক-লড়াই করে। আজ এখানে কাল ওখানে ছাত্র মারা যায়। আর আছে ফতোয়াবাজরা। কথা শেষ হবার আগেই শোনা গেলো হরিণের বিলাপ। হরিণ মনের দুঃখে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগলো। লোকগুলো বুঝে গেলো, হরিণকে দিয়ে তাদের চলবে না। ওরও চামড়া পাতলা।

তারা সিংহের কাছে গেলো।

সিংহ তখন পাঁচটা বাছুর দিয়ে ব্রেকফাস্ট করছে। লোকগুলো বলাবলি করলো, হ্যাঁ, এই হচ্ছে আমাদের রাজ্যের জন্যে উপযুক্ত শাসক।

সিংহ বললো, আমি হলাম গিয়ে রাজবংশের লোক। আমাকে দিয়েই হবে। কোনো সমস্যাই আমার কাছে সমস্যা নয়। এমনকি ক্ষুধাও নয়। আচ্ছা বলো তো তোমাদের রাজ্যের খাদ্য পরিস্থিতি কেমন ?

জবাব এলো, ভালো, তবে রাজ্যের কোনো কোনো অংশে একটু-আধটু খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। লোকজন না খেয়ে আছে, খাবার নেই, কাজ নেই।

শুনে সিংহ গম্ভীর হয়ে গেলো। তখনো তিনটা বাছুর অভুক্ত পড়ে আছে, কেবল দুটি সে খেয়েছে। সিংহ বললো, মনটা খারাপ হয়ে গেলো, আজ আর আমি কিছু খাবো না। তোমাদের রাজ্যে লোকেরা না খেয়ে আছে, আর আমি ভরপেট নাশতা করবো, তা হয় না।

লোকগুলো সিংহের কাছ থেকে বিদায় নিল। এরকম সংবেদী ত্বকের রাজ্যপ্রধান দিয়ে রাজ্য চলবে না। রাজ্য চালাতে গেলে গাত্রচর্ম পুরু হওয়া দরকার।

সবশেষে তারা হাজির হলো গণ্ডারের কাছে।

গণ্ডার তখন আধাশোয়া হয়ে ঝিমুচ্ছেন। দিবানিদ্রা তার অভ্যাস।

লোকগুলো বললো, আমাদের এক আর্জি আছে। আপনাকে আমাদের রাজ্যপ্রধান বানাতে চাই।

গণ্ডার শুনলো কি শুনলো না বোঝা গেলো না। লোকগুলো অপেক্ষা করতে লাগলো, কখন গণ্ডারের ঘুম ভাঙে।

ছয় ঘণ্টা পর গণ্ডার মুখ তুলে চাইলেন। কী ব্যাপার ?

বলছিলাম কী, আমাদের আর্জি আছে। আপনি অমাদের সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেবেন ?

আবার নীরবতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পুরো তিনদিন পরে গণ্ডার বললেন, হ্যাঁ, আমি রাজি।

তখন পরীক্ষা শুরু হলো। সমস্যাগুলো একে একে তার সমীপে পেশ করা হলো।

আমাদের রাজ্যে অনেক সমস্যা। কোন্‌টা আগে কোন্‌টা যে পরে বলবো!

নিউজপ্রিন্ট পাওয়া যায় না বলে সংবাদপত্রগুলো মরমর। হোয়াইট প্রিন্টও পাওয়া যায় না, দাম বেশি, সাপ্লাই কম। বইপত্র বের হচ্ছে না। ছাত্রছাত্রীরা রাস্তায় মিছিল করছে কাগজের দাবিতে।

গণ্ডার অবিকৃত মুখে জাবর কাটতে লাগলেন। সমস্যাটি তিনি শুনছেন কি-না বোঝা গেলো না।

রাজ্যের কোথাও কোথাও খাদ্যাভাব। লোকজন না খেয়ে আছে।

গণ্ডার আপন মনে জাবর কেটেই চলেছে, তার মনে-মুখে কোনো বিকার নেই।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস। এখানে-ওখান ছাত্রসংঘর্ষ। রক্তপাত। হত্যা। ঘরে ঘরে জবাই।

গণ্ডার গলা বাড়িয়ে দিলেন। তার সুখ লাগছে। এক বছর আগে একটা বুলেট মতন এসে বগলে কাতুকুতু দিয়েছিলো।

বিরোধীরা একের পর এক হরতাল ডেকে চলেছে। সংসদ প্রাণহীন। সমস্যার সমাধান হওয়া দরকার।

গণ্ডার চোখ বন্ধ করলেন। তার ঘুম পাচ্ছে। হাই উঠছে।

প্রশাসনে অচলাবস্থা। নানা সঙ্কট। পদোন্নতি নিয়ে বিরাট প্রশ্ন, বিশাল ঝামেলায় পেশাজীবীরা জুতো দেখাচ্ছে। গণ্ডারের নাক-ডাকার শব্দ আসছে।

তখন লোকগুলো সবাই মিলে শ্লোগান ধরলো, ভাত চাই, কাগজ চাই, কাজ চাই, বেতন চাই, প্রোমোশন চাই, ভোট চাই। বিশাল আওয়াজ। বনের সব পশুপাখি সেই শব্দে ভীত হয়ে বন ছেড়ে পালাতে লাগলো। কিন্তু গণ্ডারের ঘুমের কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি হলো না। লোকগুলো বোমা ফাটালো, আগুন জ্বালালো, কিন্তু তিনি রইলেন অবিচল।

তখন তারা সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলো।

আমাদের রাজ্য পরিচালনার জন্যে যে উপযুক্ত তাকে পাওয়া গেছে হুররে।

লোকগুলো গণ্ডারটাকে নিয়ে এলো নিজেদের রাজ্যে, নেই-রাজ্যে। ধুমধাম করে তার অভিষেক হলো। গণ্ডার-রাজের রাজত্বে প্রজারা সুখে-শান্তিতে দিন কাটাতে লাগলো।

গাছে গাছে হীরের ফল, নহরে নহরে উন্নয়নের জোয়ার।

একটি এনজিওর জন্মকাহিনী

আমাদের গ্রামের বাড়ি গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানার সাতানা বালুয়া গ্রামে। ১০টা ঘর নিয়ে আমাদের বাড়িটি। এর মধ্যে দু-ঘর স্বচ্ছল, জমি-জিরেত তো আছেই, চাকরি ব্যবসাও আছে। কিন্তু আট ঘরই অস্বচ্ছল, এর মধ্যে সাত ঘর ভূমিহীন, একেবারে সর্বহারা ভূ-শ্রমিক। ভিটেমাটি ছাড়া এদের আর কিছু নেই, নিজেদের হাল পর্যন্ত নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমি ঢাকায় থাকি, মোটামুটি সাহেব বনে গেছি। কিন্তু নিজের বাড়ির সাত সর্বহারা পরিবারের জন্য আমার মন কাঁদে। মন কাঁদে, কারণ খবর পেলাম, এবার পুরো আশ্বিন-কার্তিক মাস এরা প্রায় না খেয়ে ছিল। কাজ নেই, কম্ম নেই।

আমাদের ঘর থেকে একজনকে একবেলা ভাত খেতে দেয়া হলে সে লজ্জায় মাটির দিকে তাকিয়ে বলেছে, বুবু হামি কী কর‍্যা খাই, ঘরত ছোল-পোল না খায়া আছে।

এই বিবরণ আমি ঢাকায় বসে শুনেছি বটে, তবে রিপোর্ট নির্ভুল, কারণ রিপোর্ট পেয়েছি স্বয়ং আমার আম্মার কাছ থেকে। আম্মা আমাদেরই শরিকদের দুঃখ-কষ্ট অনাহারের এ বিবরণ তুলে ধরেছেন আমার সামনে। আমি আম্মাকে জিজ্ঞাসা করেছি—এ বছর অবস্থা এতো খারাপ হলো কেন?

আম্মা জবাব দিয়েছেন, কারণ এবার আবাদ হয় নাই বৃষ্টির অভাবে। কাজ-কাম নেই গরিব মানুষের। পরের দিকে বৃষ্টি হওয়ায় যে অল্প কটা জামিতে বিছন গাড়া (বীজ বপন করা) গেছে, সেটা উঠতেও দেরি আছে। আমি বললাম, আশ্বিন-কার্তিক মাসের আকালের সময় গরিব মানুষ বাঁচে কী করে?

প্রায় না খেয়ে থাকে। এছাড়া গাছ বেচে, বাঁশঝাড় থেকে বাঁশ চুরি করে, হাঁস মুরগি গরু ছাগল—যার যা আছে বেচে, ভ্যাসেকটমি-লাইগেশন করালেও কিছু পয়সা আর শাড়ি-লুঙি পায়, চুরি করে এবং অবশেষে বাঁচে না, মারা যায়। দেখিস না, ওই ঘরগুলোর কেউই চল্লিশ বছরের বেশি বাঁচে না, এই তো সেদিন তোর খোকন চাচার বাপ মরলো, পিন্টুর বাপ মরলো, জরিনা আর জরিনার মা তো কবেই মারা গেছে। আম্মার এ-কথা শুনে খেয়াল করে দেখলাম, আমার নিজবাড়ির সাত অভাবী পরিবারে চল্লিশোর্ধ্ব কেউই বেঁচে নেই, কথা সত্যি।

এই অভাবের বর্ণনা শুনে আমার প্রাণ কেঁদে উঠলো। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই সাত গরিব ঘরের প্রায় ৭০ জন মানুষকে সামনের বছরের আশ্বিন-কার্তিক মাসে সাহায্য করবো। সাহায্য মানে দান নয়। যেন এরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি।

মনে মনে হিসাব করলাম। সাতটি পরিবার। প্রতিটি পরিবারকে মাসে ১৫০০ টাকা করে দেয়া হবে। দু-মাসে দরকার হবে ২১,০০০ টাকা। এই টাকা শুধু শুধু দিলে এরা ভিক্ষুকে পরিণত হবে। দেয়া হবে ঋণ কর্মসূচির মতো করে। সঙ্গে দেয়া হবে বাঁশ বেত পাট তালপাতা। যেন এরা কুটির শিল্প করতে পারে। সেই শিল্পদ্রব্য বেচে এরা টাকা শোধ করবে। ব্যাপারটা খুবই সোজা। প্রতিমাসে দরকার দশ হাজার টাকা।

দশ হাজার দশ হাজার বিশ হাজার টাকা কেমন করে জোগাড় করা যায়?

আমার এক এনজিও বিশেষজ্ঞ বন্ধুর কাছে গেলাম। সে বললো, সেটা কোনো সমস্যা হলো? দে, তোর বিশ হাজার টাকার ফান্ড জোগাড় করে দিচ্ছি। ফরেন ডোনেশন পাবি। বিদেশী সাহায্য। ডলারে টাকা আসবে।

আমি বললাম, ডলার নিয়ে কী করবো? আমার তো দরকার মোটে বিশ হাজার টাকা। সে বললো, তুই একটা আস্ত গবেট। বিশ হাজার টাকা দরকার গরিব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মানুষদের। মানে টার্গেট পিপলদের। ওটা তো গরিব মানুষের পেটে যাবে। আবার ঘানি ঠিকমতো ঘোরানো হলে ওই টাকা বেরিয়েও আসবে। তুই ওই বিশ হাজার টাকা নিয়ে চিন্তা করিস কেন ? ছোটলোকদের কথা ভাবতে ভাবতে তোর নিজের চিন্তাও ছোট হয়ে গেছে।

সে বললো, আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিস। আমি তোকে একটা প্রজেক্ট প্রোপোজাল বানিয়ে দেবো। তুই ডোনারদের কাছে জমা দিবি। দেখিস কী থেকে কী হয়ে যাস।

দিন দুই পরে বন্ধুর বানানো আমার বিশ হাজার টাকার সংস্থানের জন্য প্রস্তুত প্রজেক্ট প্রোফাইলটি দেখলাম।

সে বুঝিয়ে বললো বিস্তারিত। ধর তুই তো আর গ্রামে যাবি না। তুই থাকবি শহরে। ঢাকায় মোহাম্মদপুর এলাকায় তোর একটা দোতলা অফিস লাগবে। তার ভাড়া মাসিক বারো হাজার করে বার্ষিক এক লাখ ৪৪ হাজার টাকা। টেলিফোন লাগবে, ইলেকট্রিসিটি বিল— নে, সব মিলিয়ে দুই লাখ। তুই তো একা একা অফিস করবি না। অফিসে কর্মচারী থাকবে, পিয়ন থাকবে। তাদের বেতন লাগবে। পাঁচজন কর্মচারী মাসে দু-হাজার টাকা বেতন ধরলে দশ হাজার। আরো এক লাখ চল্লিশ হাজার। তারপর ধর চেয়ার-টেবিল ইত্যাদি খাতে এক লাখ। তোর নিজের বেতন লাগবে। ধর প্রতিমাসে এক লাখ চল্লিশ হাজার করে বছরে ষোলো লাখ আশি হাজার। তুই মাঝে মাঝে গ্রামে যাবি, ফোর হুইল ড্রাইভ ছাড়া চলবে কী করে। একটা পাজেরো বা নিশান পেট্রল ধর আরো ষোলো লাখ। তোর প্রজেক্ট এরিয়ায় অফিস লাগবে, সেখানে কর্মচারী থাকবে। তাদের জন্য ধর একেবারে দশ লাখ।

আমি আমতা আমতা করে বললাম, মোট কতো হলো ? সে হিসাব করেই রেখেছিল, ইংরেজিতে তৈরি করা প্রজেক্ট প্রোফাইল, তাতে হলুদ মার্কার দিয়ে দাগ দেয়া মোট অঙ্ক, পঞ্চাশ লাখ টাকা মাত্র।

আমি বললাম, এর মধ্যে আমার গরিব মানুষকে দেবার জন্য বিশ হাজার টাকা আছে তো ?

সে বন্ধু হেসে বললো, আছে। তারপর আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললো, কি কম কম মনে হচ্ছে, বললে এক কোটি টাকার প্রজেক্টও বানিয়ে দিতে পারি। তবে প্রথম বছর প্রজেক্ট ছোট থাকাই ভালো। ও হ্যাঁ, পঞ্চাশ লাখ টাকার মধ্যে ধর আটচল্লিশ লাখ টাকাই তো তোর পেছনেই ব্যয় হবে, আপাতত তোকে কিছু ইনভেস্ট করতে হবে। দুটো রেজিস্ট্রেশন লাগবে, তার খরচাপাতি আছে সামান্য আর আমার পঞ্চাশ হাজার টাকা। তবে দোস্ত, ফান্ড জোগাড় হয়ে গেলে আমাকে তুই কনসাল্টেন্ট পোস্ট দিয়ে দিস। আমি আবার সমাজবিজ্ঞানে ডক্টরেট। গ্রামীণ সমাজে দারিদ্র্য নিয়ে আমার স্পেশালাইজেশন। তোর খুব কাজে লাগবে।

আমি মুষড়ে পড়লাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সে আমাকে উৎসাহ দিয়ে বললো, ভেঙে পড়ছিস কেন ? সামনের বছর প্রজেক্ট আরো বড় হবে। তোর কুটির শিল্প ঢাকায় বিপণনের জন্য শোরুম লাগবে। দেখিস আসাদ গেটে তোকে তিনতলা মার্কেট বানিয়ে দেবো।

আমার জ্ঞান হারানোর জোগাড়।

সে ব্যাপারটা ধরতে পারলো অবশেষে! তুই ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? মানে এতো টাকার ছড়াছড়ি দেখে। আরে ধুর বোকা। এ টাকা তো সাহেবরা দেবে। ওরা আমাদের কাছ থেকে শত শত বছর ধরে নিয়েছে, এখন একটু দিয়ে-থুয়ে হাত পরিষ্কার করতে চায়। আর তোর প্রজেক্টটা তো জেনুইন। গরিব মানুষের সরাসরি উপকার হবে। জানিস, ডোনাররা এদেশে উপন্যাস লেখার জন্যই ফান্ড দেয়, ফেলো নিয়োগ করে। কতো বিচিত্র টাইপ এনজিও আছে। হয়তো দেখবি কাক নিয়েও এনজিও আছে। কাক রক্ষা পরিষদ। কাক হচ্ছে পরিবেশের রক্ষক। কোনো ক্ষতিকর কীটনাশক না ছড়িয়েই কাক পরিবেশ রক্ষা করে। সুতরাং কাক বাঁচাও। হয়তো এরা পাঁচ কোটি টাকা নিয়ে শুধু কাক গুনছে।

আমি বললাম, কাক গোনা নিঃসন্দেহে একটা কঠিন কাজ। এতো কাক গুনতে পাঁচ কোটি টাকা লাগতেই পারে। তবে আমার বিশ হাজারী প্রজেক্টকে তুই যে পঞ্চাশ লাখ বানালি।

বন্ধুটি হেসে ফেললো। সে আমাকে চেনে। ইউনিভার্সিটির হল-জীবনে একদিন সে আমাকে দলে টেনেছিল। থ্রি কার্ড খেলবে বলে। খুচরো পয়সার খেলা। একটা বড় দান পেয়ে গিয়েছিলাম আমি। খুচরো পয়সার একটা স্তূপ আমার হয়ে গিয়েছিল। আমি সেই পয়সার স্তূপের দিকে তাকিয়ে দ্বিধান্বিত হয়ে বলেছিলাম, এ, ছি। এই পয়সা আমাকে নিতে হবে। অন্যের পয়সা। বন্ধুরা হেসে উঠেছিল।

আমার ছাত্রজীবনের বন্ধুটি আমার দিকে তাকিয়ে সেদিনের কথাটা পাড়লো। তারপর বললো, এনজিওদের পরিসংখ্যান মোটেও কঠিন কিছু নয়। এটা সহজ করে গেছেন মোল্লা দো পেঁয়াজা। সেই যে তিনি কাক গুনে দিয়ে বলেছিলেন, এক লাখ চল্লিশ হাজার কাক, বিশ্বাস না হয় গুনে দেখুন। বেশি হলে কাকদের আত্মীয়স্বজনেরা এখানে বেড়াতে এসেছে আর কম হলে অন্যত্র বেড়াতে গেছে। হা-হা-হা।

আমিও হেসে উঠলাম। অনেকটা এনজিও মার্কা হাসি। হাজার হোক একটা মহৎ কাজ করতে যাচ্ছি। প্রকল্পের না— উত্তরাঞ্চলে মঙ্গা দূরীকরণ। সঙ্গে সঙ্গে নিজের। ঢাকায় বাড়ি। ফোর হুইল ড্রাইভ। এনজিওদের গাড়ি আনতে আবার ট্যাক্স দিতে হয় না। তার মানে ওই টাকায় দুটো গাড়ি হবে। একটি আমার, অন্যটি আমার বৌয়ের। ওকেও একটা প্রজেক্টের ডিরেক্টর বানিয়ে দেবো। আমার দু-চোখে থই থই করছে স্বপ্ন। এনজিও মানে সরকারের খবরদারি নেই, কোনোরকম জবাবদিহিতা নেই, টাকার হিসাব কাউকে দিতে হবে না। বিদেশী টাকায় পাজেরো হাঁকিয়ে খদ্দর পরে টিনের গেলাসে পানি খেয়ে তৃপ্তির ঢেকুর। দারিদ্র্য দূর করছি। আসলে কি তাই ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বইকেনা

বই পড়া নিয়ে লিখেছিলেন প্রমথ চৌধুরী, বইকেনা নিয়ে সৈয়দ মুজতবা আলী। এই বিষয় নিয়ে নতুন করে লেখাটা দুঃসাহস। সেক্ষেত্রে অনুরোধে যে-ব্যক্তি ঢেঁকি গিলেছিলেন, তার অবস্থাটা কল্পনা করা ভালো। একটা আস্ত ঢেঁকি। একগ্লাস জল দিয়ে তিনি গিলে ফেললেন। 'একদা ছিল না জুতা চরণযুগলে'র শোক ভোলা তেমন কঠিন কিছু নয়, যদি 'পদ নাহি তার' ভদ্রলোকের দেখা মেলে।

সুতরাং এই দুঃসাহস। লেখার বিষয় বইকেনা। বইমেলায় প্রতিদিন আসে লাখ খানেক লোক। বই কেনে কয়জনে ? বইমেলায় এক ব্যক্তি মুরলী বেচে। মুরলী হচ্ছে একপ্রকার খাদ্য। মহাস্থানগড়ে এই খাবারটিকে বলা হয় কট্‌কটি। মুরলীঅলার কোনো স্টল নেই। রাস্তায় ফেরী করে বেচে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আজ কতো টাকার বিক্রি হলো ?' বারোশ' টাকার মতো— জবাব দিলেন তিনি। 'নদী' আমার এক প্রকাশক। তাদের স্টলে আমি জিজ্ঞেস করলাম একই প্রশ্ন। গা মুচড়ে তারা জবাব দিলেন, পাঁচশ' টাকা হয়নি এখনো। জবাব দেবার সময় মুখটা হয়ে গেলো বেগুনবেচা মুখ। 'বেগুনবেচা মুখ' একটা বাগধারা। কেন এই বাগধারার প্রচলন হলো আমি জানি না। সম্ভবত বেগুন তখন ছিল খুবই সস্তা আর চাহিদাহীন দ্রব্য। কেউ নিতে চাইতো না। মুখটা ইংরেজি পাঁচের (ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা পাঁচকে গালি দেওয়া ঠিক নয়) মতো করে বসে থাকতো বিক্রেতারা। ক্রেতারা আসতো, আর বেগুন ভেঙে দেখতো, কচি-টাটকা আর পোকামুক্ত কি না। তারপর না কিনেই চলে যেতো। এখন নিশ্চয়ই বেগুন বিক্রেতাদের সেই দুর্দিন নেই। একটা বেগুনীর দাম একটাকা। এখন তাই বাগধারাটা বদলে রাখা উচিত বইবেচা মুখ।

কার কথা বলবো ? বইয়ের কথা শুরু করা উচিত বউ দিয়ে। সঞ্জীব চট্টপাধ্যায় লিখেছেন, বই হচ্ছে বউয়ের মতো। তিনি অনেকগুলো মিল দেখিয়েছেন এ দুটিতে। আমি সেসব বলতে চাই না। কারণ যুগটা লরেনা ববিটদের। নিষ্প্রাণ বস্তুর সঙ্গে নারীর মিল দেওয়া মানেই তসলিমা নাসরিনকে কলামের বিষয় যোগানো। তবে এই পরামর্শটা আমি মনে করি জীবনের সবচেয়ে জরুরি পাথেয়— 'বই আর বউ কখনো ধার দিতে নেই। ধার দিলে ফেরত আসে না, ফেরত আসলেও আগের মতো থাকে না।'

আমার স্ত্রী খুবই বই-কাতর। আমি তাকে পছন্দ করেছিলাম তার পুস্তকপ্রীতি দেখে। নিজে তেমন পড়াশুনা করিনি, ভাবলাম, পড়াশুনাঅলা স্ত্রীই আমার জন্য উপযুক্ত। দুবাই ফেরত ওসি-ডিসিরা যেমন বিএ পাস বউ চায়, তেমনি। যারা বই পড়তে ভালোবাসেন, তাদের একটা বদঅভ্যাস হলো পাবলিকপ্লেসে জিজ্ঞাসা করা আপনি 'ওয়ার এন্ড পিস' পড়েছেন ? পড়েছি বললে বিপদ, কী জানি কী নিয়ে এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কাহিনী ? কী বলতে কী বলে ফেলবো কে জানে ? এরশাদ আমলের মহিলা সংসদ সদস্যরা যেমন বলেছিলেন, শিল্প-সাহিত্য ? হ্যাঁ, আমি খুব পছন্দ করি। কুটিরশিল্প তো আমার খুবই পছন্দ। কিংবা ভানুর কৌতুকের মতো, রবিগুরু কবীন্দ্রনাথ। কিংবা রক্তকবরী খুব ভালো উপন্যাস। এধরনের ক্ষেত্রে আমি এখন তাড়াতাড়ি এগিয়ে দেই বউকে— কোন্ বইয়ের কথা বলছেন ? সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র কাঁদো নদী কাঁদো ? আমার স্ত্রীর' সঙ্গে কথা বলুন, উনি এ-সম্পর্কে বলবেন। হোমার থেকে শুরু করে হুমায়ূন (কবির, আজাদ, আহমেদ, রাজীব...) এসব বিষয়ে উনিই আমার ঢাল। আগে ঢাল সামলান, পরে তরবারি। তো আমার এই পুস্তকপ্রাণা স্ত্রী বইমেলায় আসেন নিয়মিত, কিন্তু রাস্তা থেকে একাডেমির ভেতরে ঢুকতে চান না। বাইরে কতো কিছু, ভেতরে শুধু বই। রাস্তায় নানা ধরনের হস্তশিল্পজাত দ্রব্যাদি। যেমন ধরুন, মাটির ফুলদানি, কাচের চুড়ি, কিংবা চামড়ার হাতব্যাগ। মন তার বারবার চলে যায় এসব জিনিসে, চোখ তো যায়ই। বইমেলার কেনাকাটার উদ্বোধন তিনি করেছেন দুটি মাটির পাত্র কিনে।

গতকাল মেলায় এসেছিলেন এক বিখ্যাত প্রাক্তন ছাত্রনেতা। ব্যবসাপাতি করে এখন খুবই স্বচ্ছল তিনি। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ বই কেনা যায় ? আমি বললাম, মাহমুদুল হকের বই বের করেছে সাহিত্য প্রকাশ, কেনেন। উনি বললেন, সাহিত্য প্রকাশ তো মফিদুল ভাইয়ের, ওটা সৌজন্য সংখ্যা পাবো। বললাম, গাফ্‌ফার চৌধুরীরটা কেনেন, বললেন, সন্ধানীর বই, গাজী ভাই দেবেন। বললাম, শিশিরের কার্টুন কেনেন। বললেন, ওটা তো শিশিরই দেবে। এরপর তো তাকে আর পীড়াপীড়ি করা চলে না। বিনাপয়সায় পেলে কেই বা কিনতে চায় ?

এ বছর মেলায় মোট স্টলের সংখ্যা নশ'। মানে প্রায় দশ হাজার লোকের কাজ শুধু বিক্রি করা। সুতরাং এই দশ হাজার লোক বই কেনে না। কিনবো কেন, আমরাই তো বেচি ?

এরপর মেলায় যারা আসেন, তারা হলেন লেখক। এরা বেশিরভাগই পান সৌজন্যসংখ্যা। সুতরাং বইকেনার দরকার পড়ে না। সৌজন্যসংখ্যা না পেলে কি কিনতেন ? মনে হয় না। কারণ বেশিরভাগ লেখক অন্য কাউকে লেখক স্বীকার করেন না। 'আমি ছাড়া অন্য কেউ লিখতে জানে না কি ?' 'হুমায়ূন ? ও কী লিখবে ? ও তো বাংলা বাক্য শুদ্ধভাবে লিখতে জানে না। তসলিমা ? ও আর কতোদিন লিখবে ? ওর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সংখ্যা তো আর অনন্ত নয়, এরপরে আর কী নিয়ে লিখবে ?' এ মন্তব্য আমি নিজকানে শুনেছি এক বিখ্যাত লেখকের কাছ থেকে। এরপরে এক ধরনের লেখক আছেন, যারা অন্যের বই কেনেন না ঈর্ষায়। ওই লেখকের বই এক কপি বেশি বিক্রি হবে, মাথা খারাপ, আমার হাত দিয়ে আমি সেটা হতে দেবো ? আরেক লেখক আড্ডা দেন আজিজ সুপার মার্কেটে। তিনি একদিনও আসেননি বইমেলায়। কারণ, বাংলাদেশে এমন কোনো লেখক নেই, যার বই তিনি কিনতে পারেন। আছে নবীন-প্রবীণের দ্বন্দ্ব। নবীনেরা ভাবে, বুড়োরা শেষ হয়ে গেছে। প্রবীণেরা ভাবেন, নবীনেরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তো এখনো লেখক হয়নি। নবীনেরা ভাষাকে দুমড়ে-মুচড়ে নতুন কিছু করতে চায়, বুড়োরা তাদের কাছে অচ্ছুত। প্রবীণেরা ভাবে, ওসব কিম্ভুতকিমাকার জিনিস লেখার আগে ওদের উচিত শুদ্ধ বাংলায় চিঠি লেখা শেখা। আর আছে বিদেশী বইয়ের শেষ প্রচ্ছদ পড়ার ফল— নাক উঁচু রোগ। এদেশে কিছু লেখা হয় নাকি ?

আছে 'সবাই লেখক'— এ সমস্যা। সবাই বইয়ের জনক। কলাম দিয়ে বই। রিপোর্ট দিয়ে বই। একস্লিপ দিয়ে বই। কার্টুন দিয়ে বই। কথাকার্টুন দিয়েও বই। মে গড ব্লেস আস। যার সঙ্গে ধাক্কা লাগে সেই লেখক। খেলোয়াড় লেখক। অভিনেতা লেখক। অভিনেত্রী লেখক। গায়ক লেখক। রাজনীতিক লেখক। বাকস্বাধীনতার যুগ। লেখক ফুটবল খেলতে নামলে সবাই হাসবে, কিন্তু ফুটবলার লিখতে শুরু করলে কেউ মানা করবে না। অন্তত দশ হাজার বই বেরিয়েছে এবার। দশ হাজার লেখক। তাদের পরিবারে দশজন করে সদস্য। এক লাখ লোক লেখকের নিকটাত্মীয়। বই কিনবে কে? এছাড়াও সমস্যা আছে। অতিপ্রজননের সমস্যা। এক মেলায় এক লেখকের নতুন বই ভূমিষ্ট হয়েছে ডজনের হিসেবে। জমি বিক্রি করেও তো প্রিয় লেখকটির সব বই কেনা সম্ভব নয়। একটা কিনলে আঠারোটাই থাকে অকেনা। লেখকেরা বুদ্ধিমান না হলে কী হবে, ক্রেতারা ঠিকই বুদ্ধিমান।

বিশ টাকায় হাফপ্লেট চটপটি। প্রচুর বিক্রি হচ্ছে। ১২ টাকায় ভ্যানগগের চিঠি কিংবা এলিয়টের পোড়ো জমি। পড়ে আছে। বইয়ের আগে খাদ্য।

কেউ বই কেনে না। সবাই শুধু ঘোরে বইমেলায়। ফিরে যায় মুড়ি-মুড়কি কিনে। আর মেয়েদের গায়ে ধাক্কা খেয়ে তৃপ্তি পায়। বইয়ের আগে খাওয়া। এবং শোওয়াও।

আমার বন্ধু জাভিদ। সে নিজেও লেখক। একবার নিউমার্কেটে তার সঙ্গে দেখা। বললো, কী করছো ? বললাম, বই কিনছি।

সে ক্ষেপে গেলো, পতিতাগমনের পয়সা নেই, বই কেনো ? বই না কেনার এক হাজারটা কারণ জানতাম। এক হাজার এক নম্বরটা সেদিন জানলাম। খুব একটা পছন্দ হলো না।

কিন্তু ফ্রয়েড সাহেব নিশ্চয়ই খুশি হবেন। বিশটা গিনিপিগ। না খাইয়ে না শুইয়ে তাদের রাখা হলো অনেকদিন। এরপর ছেড়ে দেওয়া হলো খাদ্য ও বিপরীত লিঙ্গের সামনে। অর্ধেক গেলো খেতে, অর্ধেক গেলো শুতে। বই কিনতে কেউ তো গেলো না।

আমরা সবাই তো ফ্রয়েডের গিনিপিগই। বই কিনবো কেন ? কেবল খাবো আর শোবো। বইমেলাতেও যাই ওই দুই তাড়নাতেই।

জাতীয় তালপাতা কর্মসূচি

বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে সরকারের নতুন কর্মসূচির উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। জাতীয় তালপাতা কর্মসূচি। সম্ভবত দেশের একজন শহীদ রাষ্ট্রপতি এই কর্মসূচির স্বপ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সর্বপ্রথম দেখেছিলেন। দেশ তো এখন চলছে স্বপ্নেপ্রাপ্ত নানা ফর্মুলা অনুযায়ী। জাতীয় দৈনিকগুলোতে বিপুলাকার বিজ্ঞাপন ছাপা হয়—'এই মহৌষধি আমি কিরূপে পাইলাম। আমার পিতা মরহুম...স্বপ্নে দেখেন ইত্যাদি...। এইসব স্বপ্নেপ্রাপ্ত ওষুধ-বিষুধ দিয়ে সারে না, পৃথিবীতে এমন কোনো রোগ তো নেই, উপরন্তু যেসব রোগ পৃথিবীতে আদৌ আসেনি, সেসবও সেরে যায়। দেশের রাজনীতি এবং সরকারও চলছে তেমনি স্বপ্নজ নির্দেশ অনুসারে। সবকিছুই একজন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির স্বপ্নে দেখা ফর্মুলা।

এই যে আজ তালপাতা লিখন কর্মসূচি শুরু হচ্ছে, তার পেছনে যে মহামনীষীর স্বপ্ন বিদ্যমান, তাকে দিগ্বিদিকে বিপুলভাবে স্মরণ করা হচ্ছে।

জাতীয় তালপাতা কর্মসূচির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও উপযোগিতা বর্ণনা করেছেন জাতীয়তাবাদী প্রকল্পবিদগণ। এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে দেশে বিপ্লব ঘটে যাবে, বিপুলসংখ্যক বিদ্যার্থী তাদের লেখার কাজটি তালপাতায় সারতে পারবে, অফিসে-আদালতে নথিপত্র রাখা হবে তালপাতায়। ফলে দেশে কাগজের মতো বাজে বস্তুর জন্য যে কৃত্রিম সঙ্কট হয়েছে, তা দূর হবে। সবচেয়ে বড় কথা, তালপাতা কর্মসূচির ফলে বিদ্যার প্রসারে কিংবা সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচিতে ব্যাঘাত ঘটবে না, পাশাপাশি সংবাদপত্রে মিথ্যার অবাধ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। শহীদ প্রেসিডেন্ট যেমন নিজহাতে কোদাল ধরে খালকাটা বিপ্লব শুরু করেছিলেন, খাল কেটেই দেশের দারিদ্র্য প্রায় দূর করে ফেলেছিলেন, এই নতুন কর্মসূচি সেই আদিদর্শন থেকেই উদ্ভূত। দেশী প্রযুক্তির ব্যবহার, দেশের বিপুল কর্মশক্তি স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে কাজে লাগানোর দর্শন নতুন কর্মসূচিতেও প্রতিফলিত।

এই কর্মসূচির স্বপ্ন আদিতে শহীদ রাষ্ট্রপতি দেখলেও বর্তমান পর্যায়ে এটি আসে মাথামোটা মন্ত্রীর মাথা থেকে। অবশ টাকমাথা মন্ত্রী বিষয়টি ডুবিয়েই ফেলেছিলেন প্রায়। ঘটনাটি খুলে বলা যাক।

বৈধ আমদানি ও অবৈধ চোরাচালান হয়ে-আসা ভারতীয় দিয়াশলাইয়ের সঙ্গে বাংলাদেশী ম্যাচ ফ্যাক্টরিগুলো কিছুতেই পেরে উঠছিল না। কারণ দেশী ম্যাচের দাম পড়ে বেশি, এর তুলনায় আমদানি করলে খরচ পড়ে কম। এ অবস্থায় দেশে অনেকগুলো ম্যাচ ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যায়, অসংখ্য শ্রমিক বেকার হয়ে পড়ে। ম্যাচ ফ্যাক্টরির মালিক-শ্রমিকেরা দিয়াশলাইয়ের আমদানি ও চোরাচালানি বন্ধের আবেদন জানায়। কিন্তু তাতে কর্ণপাত করা যায়নি। কারণ দেশে চলছে মুক্তবাজার অর্থনীতি। চলছে অবাধ বাণিজ্যনীতি। বাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে পারলে শিল্পকারখানা চলবে, না হলে বন্ধ হয়ে যাবে, সরকারের কী করার আছে ? এ কারণে দেশী ম্যাচ ফ্যাক্টরিগুলো দেশে চাহিদার তুলনায় দ্বিগুণ উৎপাদনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও সরকার ম্যাচ আমদানি বন্ধ করেননি। এটা হচ্ছে নীতির প্রশ্ন, নীতির প্রশ্নে আপস নেই। টাকমাথা মন্ত্রীর এ ধরনের অবাধ আমদানি নীতির অধীনে দেশে নিউজপ্রিন্ট আমদানির অনুমতি দিয়েফেলা হয়েই যেতো হয়তো। টাকমাথা মন্ত্রী ব্যস্ত থাকেন আইএমএফ নিয়ে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দেশের ভালো-মন্দ তিনি বুঝবেন কী করে ? ঠিক সেই সময়ে এগিয়ে আসেন মাথা মোটা মন্ত্রী। তিনি বলেন, সর্বনাশ। নিউজপ্রিন্ট আমদানি অবাধ করে দিলে যে তথ্যের অবাধ প্রবাহও নিশ্চিত হয়ে যায় অনেকটা। তাহলে কি আর উপায় আছে ? আমরা না জাতীয়তাবাদী শক্তি, আমাদের রেডিও-টিভি যেমন ইচ্ছা তেমন চালিয়ে থাকি। এই দেশে নিউজপ্রিন্টের আমদানি অবাধ করে দেয়া হলে কতো ক্ষতি! টাকমাথা মন্ত্রী কিচ্ছু বোঝেন না, দূর ছাই।

কী রকম ক্ষতি ? মাথায় ঘোমটা মন্ত্রী জানতে চান।

অনেক ক্ষতি। প্রথম কথা, তখন আর সংবাদপত্রের ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। দ্বিতীয় কথা, আমাদের পক্ষের লোকজন পেট শুকিয়ে মারা যাবে। এই নিউজপ্রিন্টের পারমিট, কোটা—এইসব তো সেইসব পত্রিকাঅলারা বেশি পায়, যেসব পত্রিকা বের হয় খুব কমস্যংখ্যক কপি। যেমন দৈনিক শক্তি, সবুজ বাংলা। বাজারে যদি নিউজপ্রিন্টের দাম কম থাকে, তাহলে এরা এদের কোটা বাইরে বিক্রি করে কী করবে ? আজ বাজারে নিউজপ্রিন্টের দাম বেড়েছে, ভক্তকুল দুটো নিউজপ্রিন্ট বিক্রি করে দিয়ে দুটো পয়সা কামাচ্ছে, এটা বন্ধ করতে চাইছেন কেন ? তাছাড়া দেশি শিল্পের বিকাশ বলে একটা কথা আছে না ? নিউজপ্রিন্টের আমদানি, হোয়াইট প্রিন্টের আমদানি এসব চিন্তা বাদ দিন। দেশে নিউজপ্রিন্ট শস্তা হয়ে গেলে চোরাচালান হবে, বাইরে যাবে সুতরাং দাম বেশি রাখতে হবে। তাছাড়া কেবল নিউজপ্রিন্টের দাম বেড়েছে, তা তো নয়, হোয়াইট প্রিন্টের দামও বেড়েছে। দাম বেশি থাকলে সুবিধা। বইপত্র ছাপা হতে পারবে না। ফলে বেশি বেশি ছেলেরা পাস করতে পারবে না। বেকারত্বও কমে যাবে। আর বইপত্রে প্রায়ই মিথ্যা কথা থাকে। এসব পড়লে ছেলেপুলেদের মাথা গরম হয়ে যায়। এসবের প্রসার যতো কম হয়, ততোই ভালো।

তাহলে ২০০০ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা কর্মসূচির কী হবে ?

বিকল্প কর্মসূচি বের করতে হবে। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এসে গেছে। তালপাতা কর্মসূচি। এ এক বিপ্লব। ঘরে ঘরে তালগাছ লাগাও। তালপাতা কাটো। তালপাতায় লেখো। আমাদের ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনো।

নিউজপ্রিন্ট উৎপাদন বন্ধ করে দাও। দেশে সংবাদপত্রের কোনো দরকার নেই। জনগণ যেন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত হতে পারে, সেজন্য রেডিও-টিভি তো আছেই। হরতাল-ধর্মঘট-দুর্ভিক্ষ-অনাহারের খবরের কী দরকার ?

এই পর্যন্ত এক নিঃশ্বাসে বলে মাথামোটা মন্ত্রী চুপ করেন, নতুন উদ্ভাবনের আনন্দ তখন তার সাফ চোখেমুখে। কিন্তু টাকমাথা মন্ত্রী ঢোক গিলে বলেন, ফেডারেল চেম্বারের নতুন নেতারা এর বিরোধিতা করে বিবৃতি দেবেন না তো। ওই নির্বাচনে তো আমাদের প্রার্থীরা ভরাডুবি হয়েছে।

আরে, ওই সমস্যার সমাধান তো করেই রেখেছি, ওই ফেডারেল চেম্বারকেও দু-টুকরো করতে হবে। ডিইউজে নির্বাচনে হেরে যেমন পাল্টা ডিইউজে দাঁড় করানো হয়েছে তেমনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যাক, মাথামোটা মন্ত্রী বলে কথা। এই কর্মসূচি দলীয় কর্মসূচি বলে গৃহীত হয়েছে। দেশে শুরু হতে যাচ্ছে তালপাতার যুগ। শিগগিরই তালপাতায় স্বাক্ষর করে এই বিপ্লবের উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন মাথায় ঘোমটা মন্ত্রী। এরপর থেকে সংবাদপত্রগুলোও তালপাতায় বের হবে। এতে অনেক পত্রিকার সার্কুলেশনের কোনো পরিবর্তন হবে না। আগের মতোই এরা পাঁচ কপি পত্রিকা তালপাতায় লিখে ডিএফপিতে জমা দেবে, তথ্যমন্ত্রীকে উপহার দেবে। এরাই আবার বিএসপির নেতা হয়ে গাছেরটাও খাবে, তলারটাও কুড়োবে। তবে যতোদিন খুলনা নিউজপ্রিন্ট বন্ধ না হচ্ছে, ততোদিন এদের নিউজপ্রিন্টের কোটাও অটুট রাখা হবে, যাতে তারা কালোবাজারে কাগজ বিক্রি করে দিতে পারে। হঠাৎ করে এদের পেটের ব্যবসায় সরকার লাথি মারেনই বা কী করে?

স্যার নিনিয়ানের জুতা আবিষ্কার

স্যার নিনিয়ান স্টিফেন বারবার ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছেন। ঘড়িতে সময় ঠিক করে নিয়েছেন বাংলাদেশে নামার সঙ্গে সঙ্গেই। এখন পৌনে ১০টা বাজে। ১০টার সময় টেলিভিশনে খবর হবে। ইংরেজি খবর। বাংলাদেশে আসার পর এই তথ্যটিও তিনি সবার আগে জোগাড় করে নিয়েছেন, টিভিতে ইংরেজি খবর কখন প্রচারিত হয়। টিভিতে নিজের চেহারা তার দেখতে ভালোলাগে। এ বিষয়টি নিয়ে তার স্ত্রী অবশ্য প্রায়ই রসিকতা করেন। তিনি বললেন, তুমি আজই এসেছো, তেমন উল্লেখযোগ্য কোনোকিছু এখনো করোনি, এরই মধ্যে টেলিভিশনে তোমাকে কেন দেখানো হবে? টেলিভিশনের নিউজ তো বিউটি কনটেস্ট নয় যে তোমার চেহারা দেখাবে।

নিনিয়ান হেসে ফেললেন। তাকে একটু নার্ভাস দেখা গেল। স্ত্রীর এই রসিকতা অবধারিত। তিনি এসেছেন কোঁদলরত দুই মহিলার মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের আশায়; কিন্তু নিজের স্ত্রীর সঙ্গে এ জাতীয় সংলাপে তিনি সহজ নন। পৃথিবীর সব মহাপুরুষই নাকি স্ত্রীর চোখে এবং স্ত্রীর সামনে কাপুরুষ।

স্যার নিনিয়ান বললেন, আজ আমি আমার চেহারা দেখার জন্য টিভি দেখছি না। কারণ আজ আমি ভ্রমণক্লান্ত। ক্লান্ত মানুষকে টেলিভিশনে খুব কুৎসিত দেখায়। আমাকেও নিশ্চয়ই দেখাবে।

তার স্ত্রী শব্দ করে হাসলেন। বললেন, তোমাকে নিশ্চয়ই খুব সুন্দর দেখা যাবে। যে সুন্দর, সে সবসময়েই সুন্দর।

তারা উঠেছেন রাষ্ট্রীয় অতিথি-ভবন মেঘনায়। চারিদিকে জানা-অজানা নানা গাছ। কোন্ গাছে যেন নিশিফুল ফুটেছে। গন্ধ জানালার ভারি পরদা ঠেলে ঘরের ভেতরে আসছে। শরৎকাল। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া। পরিষ্কার আকাশ। ঘরের মধ্যেও প্রকৃতির প্রসন্নতা প্রসারিত। বাইরে শরতের অর্ধেক চাঁদ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দশটা বেজে গেল। টেলিভিশনে সংবাদ শুরু হয়ে গেল। প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মালয়েশিয়া সফর। বিস্তারিতভাবে সেসব দেখানো হচ্ছে। এরপর অন্য মন্ত্রীদের কার্যক্রম শুরু হলো।

মিসেস নিনিয়ান বললেন, ভুল চ্যানেলে দেখছি না তো ? এটা কি খবর ? এটা সম্ভবত বাংলাদেশ সরকারের কার্যক্রমের প্রচারমূলক কোনো অনুষ্ঠান। চ্যানেল বদলিয়ে দাও।

মিসেস নিনিয়ান রিমোট হাতে চ্যানেল বদলাতে লাগলেন। এই রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে ডিস সংযোগ নেই। ফলে এক বিটিভি ছাড়া আর কোনো অনুষ্ঠান স্ক্রিনে এলো না। ঝিরঝির দেখা গেল শুধু।

তিনি এটেন্ডেন্টকে ডাকলেন। বললেন, বাপু অনুগ্রহ করে দেখো তো, বিটিভি ধরিয়ে দিতে পারো কিনা।

লোকটি বললো, আপনারা যে অনুষ্ঠান দেখছেন, সেটিই বিটিভি।

তবে যে শুনলাম, দশটায় বিটিভিতে খবর হয়, সেটা হচ্ছে না কেন ? এর বদলে সরকারি অনুষ্ঠান হচ্ছে কেন ?

লোকটি বললো, হ্যাঁ, এটিই বাংলাদেশ টেলিভিশনের খবর।

প্রায় ১০ মিনিট খবর হয়ে গেছে। এখন বাজে ১০টা ১০। খবর সম্ভবত এখন শেষই হয়ে যাবে। ছোট একটা দেশ বাংলাদেশ। এদেশে কী বা এমন খবর থাকতে পারে ? বাইরে চাঁদ উঠেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে চাঁদের আলো দেখা যায়।

মিসেস নিনিয়ান লোকটিকে বলেন, সংবাদ আর কতোক্ষণ হবে ? লোকটি সবিনয়ে জানালো, আরো বিশ মিনিট হবে। আজকে তো আপনাদেরকেও টিভিতে দেখানো হবে।

মিসেস নিনিয়ান স্যার নিনিয়ানের দিকে তাকালেন। তার স্বামীর মুখ এ-কথা শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো, অনেক ধন্যবাদ তোমাকে। খুশিমনে এটেন্ডেন্টকে বিদায় দিলেন মিসেস নিনিয়ান। সত্যি সত্যি সংবাদে তাদেরকে দেখানো হলো। বিমানবন্দরে তারা বিমান থেকে নামছেন।

স্যার নিনিয়ান গম্ভীর হয়ে গেলেন। অথচ নিজের ছবি দেখে তার আনন্দিত হবার কথা। আসলে তার মনে এক প্রশ্নের উদয় হয়েছে। তাদের এটেন্ডন্টটি কী করে জানলো যে টিভি খবরে তাদের আগমন-দৃশ্য সত্যি সত্যি দেখানো হবে ? তিনি লোকটিকে আবার ডাকলেন।

প্রিয় বৎস, তুমি কি একটি প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দেবে ? তুমি কি অনুগ্রহ করে বলবে, আজ আমাদের টিভি সংবাদে দেখানো হবে, এই বিষয়টি তুমি নিশ্চিত হলে কী করে ?

জনাব, ভয়ে বলবো, নাকি নির্ভয়ে বলবো ?

তুমি নির্ভয়ে বলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জনাব, আমি জানি যে আজ বিমানবন্দরে আপনাদের স্বাগত জানাতে তথ্যমন্ত্রী ব্যারিস্টার নাজমুল হুদা উপস্থিত ছিলেন। আসলে টিভি ক্যামেরা সর্বদাই তাকে অনুসরণ করে থাকে। একারণেই আমি নিশ্চিত ছিলাম— তথ্যমন্ত্রীর পাশাপাশি আপনাদেরও দেখা যাবে।

স্যার নিনিয়ান দম্পতি এই বাংলাদেশী লোকটির বুদ্ধিতে চমৎকৃত হলেন।

দ্বিতীয় রাতেও স্যার নিনিয়ান সব কাজ ফেলে যথারীতি রাত ১০টায় টিভির সামনে বসলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, বিটিভি সংবাদের প্রায় সবটা জুড়েই থাকে সরকারের মন্ত্রীদের ও সরকারি দলের নানা কর্মসূচি। বিরোধীদলের কথা থাকেই না। আজ অবশ্য তার সঙ্গে বিরোধীদের বৈঠক ছিল। সে বৈঠকেও তারা এ বিষয়ে অভিযোগ করেছেন—টিভিকে পুরোপুরি সরকারি প্রচারযন্ত্র বানিয়ে ফেলা হয়েছে। বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার খুব কম। এদেশে সংবাদপত্র পাঠ করে এমন লোকের সংখ্যাও কম। তুলনায় টিভি খুবই শক্তিশালী। দেশের প্রায় ৪ কোটি লোক টিভি দেখে। অথচ টিভি পুরোপুরি সরকার নিয়ন্ত্রিত। প্রধানমন্ত্রীর ডেইলি লাইফ, মন্ত্রী-উপমন্ত্রীদের ভাষণ ছাড়া টিভিতে কিছুই দেখানো হয় না। আজকের খবরে তার প্রসঙ্গ এলো না। তিনি যে বিরোধীদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছেন সে-কথা বলা হলো। কিন্তু বিরোধীদলের পক্ষ থেকে কারা কারা উপস্থিত ছিলেন, তাদের নাম বলা হলো না। তিনি ভাবলেন, আগামীকাল লক্ষ্য রাখতে হবে সরকারি প্রতিনিধিদের নাম বলে কিনা। পরদিন সরকারি দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তার বৈঠক।

তৃতীয় রাতে নিনিয়ান-দম্পতি দেখলেন বিটিভি খবরে সরকারি প্রতিনিধিদলের নাম বলা হচ্ছে। বদরুদ্দোজা চৌধুরী, সালাম তালুকদার প্রমুখের নাম টিভিতে উচ্চারিত হলো।

কয়েকদিন এইভাবে বিটিভির নিউজ পর্যবেক্ষণ করে স্যার নিনিয়ান বুঝলেন— এদেশে নির্বাচনকে নিরপেক্ষ করতে হলে প্রথমে টিভিকে নিরপেক্ষ করতে হবে। সেটা কী করে সম্ভব ? নিনিয়ান খোঁজ-খবর নিয়ে জানলেন, '৯১-এর নির্বাচনের আগে-পরে বিচারপতি সাহাবুদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে টিভিতে মোটামুটি নিরপেক্ষতা বজায় ছিল। এর কারণ সরকার তখন নিরপেক্ষ ছিল। সরকার যা, টিভি তা। সরকার নিরপেক্ষ তো বিটিভি নিরপেক্ষ। সরকার বিএনপি তো বিটিভিও বিএনপি। তাহলে নির্বাচনের সময়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু সেটা হবে কিনা, নিনিয়ান জানেন না। তিনি এদেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা নন, সংলাপের ফেসিলিটিটর মাত্র। তত্ত্বাবধায়ক সরকার যদি হয়ও, হবে নির্বাচনের সময়।

আপাতত তিনি নিজে সঙ্কটের মধ্যে। টিভিতে তার নিজের চেহারা দেখার নেশায় তিনি বিটিভি নিউজ দেখতে বাধ্য। কিন্তু বিটিভির নিউজ খুবই বোরিং। এটা দেখা মানে এক হরাবল এক্সপেরিয়েন্স গ্যাদার করা। প্রতিরাত দশটায় টিভির সামনে বসে তার গায়ে জ্বর এসে যায়। শরীর কাঁপতে থাকে। তার স্ত্রী তার মাথায় বরফ দিয়েও মাথার উত্তাপ নামাতে পারেন না। তার ব্লাড প্রেসার বেড়ে যায়। হার্টবিট দ্রুত হতে থাকে। মহাকেলেঙ্কারি ঘটনা।

নিনিয়ান-দম্পতি প্রতি সন্ধ্যায় রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় ফিরেই চিন্তিত হয়ে পড়েন। আজ রাত দশটায় জ্বর থেকে কীভাবে রক্ষা পাবেন?

আজ সন্ধ্যায়ও তিনি এই চিন্তাতে মশগুল রয়েছেন। পৃথিবীর অন্যসব চিন্তা এখন তার কাছে ভিড়তে পারছে না। রাত দশটার টিভি খবরের কামড় থেকে কীভাবে রক্ষা পাওয়া যায়? নাজমুল হুদা নাকি আগেই বলে রেখেছেন, আমার টিভি আমি যে-রকম ইচ্ছা চালাবো, কার কী? সর্বনাশ।

এমন সময় তার মনে পড়লো তার এটেন্ডেন্টের কথা। এই বাঙালি লোকটি খুবই বুদ্ধিমান। তিনি তাকে ডেকে বললেন, কোনো বড় সমস্যার সমাধান কোনো সাধারণ মানুষ করেছে, এমন কোনো ঘটনা কি এদেশে কখনো ঘটেছে?

এ টেন্ডেন্টটি বললো, জনাব, আপনাকে আমি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কবিতার গল্প শোনাতে চাই। জুতা আবিষ্কার। রাজার পায়ে ধুলো লাগে। কী করা যায়? জ্ঞানী-গুণীরা সেমিনার করে। প্রথমে ঝাড় দিয়ে ধূলা দূর করার চেষ্টা হলো। সারা দুনিয়া ধূলিময় হয়ে গেলো। তখন আবার পানি সেচে সারা দুনিয়া কাদা করে ফেলা হলো। তারপর সিদ্ধান্ত হলো সারা দুনিয়া চামড়া দিয়ে মুড়ে দেয়া হবে। তখন এক গরিব অশিক্ষিত বুড়ো মুচি এলো রাজার দরবারে। বললো, হুজুর, সারাটা পৃথিবী ঢাকতে হবে না, নিজের চরণদুটো ঢাকুন। জুতো আবিষ্কৃত হলো।

নিনিয়ান গল্পটি শুনছিলেন মনোযোগ দিয়ে। হঠাৎ ইউরেকা বলে দৌড়ে ছুটে গেলেন স্ত্রীর কাছে। বললেন, সমাধা পেয়ে গেছি। জুতা আবিষ্কার। সারা দুনিয়া চামড়া দিয়ে মুড়তে হবে না, নিজের পা ঢাকো। বিটিভিকে নিরপেক্ষ করতে হবে না, নিজের টিভি সেটকে বিটিভি-মুক্ত করো। ডিশ এন্টেনা লাগাও।

স্যার নিনিয়ানের কথা উচ্চারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে ডিশ লেগে গেল।

নিনিয়ান রাত দশটা থেকে সোয়া দশটা পর্যন্ত জিটিভিতে ফিলিপস টপটেন প্রভৃতি হিন্দি নাচগানের অনুষ্ঠান দেখেন। সোয়া দশটায় একবার বিটিভি অন করেন। সেই সময়টাতে নিনিয়ান-সংক্রান্ত খবর এক নিঃশ্বাসে সংবাদপাঠক পড়ে ফেলে। তারপর আবার নিনিয়ান চলে যান স্যাটেলাইট প্রোগ্রামে।

তু চিজ বাড়ি হ্যায় মাস্তে মাস্তে।

তিনি বিনোদিত বোধ করেন।

হরবোলা, বহুরূপী

মানুষ যে বাঁদর নয়, মানুষ; এর একটা বড়ো কারণ তার অভিযোজন ক্ষমতা। খাপ খাইয়ে নেওয়ার পারদর্শিতা। এডাপটেশন পাওয়ার। যেন ঠিক শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। জলের মতোন। যখন যে পাত্রে রাখা যায়, সেই পাত্রের আকার ধারণ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এ অভিযোজনের যেমন প্রাগৈতিহাসিক ধারা আছে, আছে বিবর্তনের ব্যাপার-স্যাপার, তেমনি আছে ক্ষুদ্রতার প্রয়োগ, দৈনন্দিন ব্যবহার। আমাদের রোজকার জীবনেও প্রতিদিনই আমরা খাপ খাইয়ে নিচ্ছি পরিবেশের সঙ্গে। অবস্থানভেদে পাল্টিয়ে ফেলছি অবস্থা। অবস্থানের বদলের সঙ্গে সঙ্গে অবলীলায় বদলে যাচ্ছে আমাদের মানসিক অবস্থা, আচার-ব্যবহার।

আপনি যখন গাড়িতে উঠবেন তখন আপনার এক মনোভাব। সে যে গাড়িই হোক না কেন, বাস কিংবা ট্রাক, জিপ কিংবা কার। গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরে তাকাবেন উদাস ভঙ্গিতে, কিন্তু এই অভিজাত ঔদাস্য মিলিয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই; পাশের রিকশাটাকে মনে হবে এক পরম ঝঞ্ঝাট, চরম জঞ্জাল। ঢাকা শহরটাকে অচল করে রেখেছে এই বদমাশ রিকশাগুলো। স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে গালি বেরিয়ে যাবে আপনার বাগযন্ত্র থেকে। ঢাকা শহর থেকে রিকশা যে উঠিয়ে দেওয়া উচিত, এ বিষয়ে আপনি হবেন স্থিরসিদ্ধান্ত। আবার এই আপনি যখন রিকশায়, সামনে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড দুটো বাস, রাস্তা ব্লক করে রেখেছে মর্জিমাফিক; আপনার মনে হবে ঢাকা শহরটাকে পঙ্গু করে রেখেছে এই বাসগুলো। একটা গাড়ি আপনার গা ঘেঁষে শাঁই করে চলে যেতেই আপনি তার পশ্চাদদেশে তাকিয়ে মনে মনে একটা লাথি দেবেন; হারামজাদা, রাজপথ যেন হাইওয়ে, বাবার রাস্তা, চালাচ্ছে কি ? এদের জন্যই যতো এ্যাক্সিডেন্ট হয়।

একই লোক। দুই অবস্থানে তার দুই মানসিকতা। যতোদিন সে ছাত্র, তার রক্তে কী টগবগানি। দেশটা উদ্ধারের সমস্ত দায়িত্ব তার। ছাত্রছাড়া বাংলাদেশের রক্ষাকর্তা আর কেইবা আছে ? জ্বালো, জ্বালো, আগুন জ্বালো। এই ব্যক্তি যখন পরীক্ষায় পাস করে বেরুবে, দুইমাসও যেতে হবে না, বলবে, বাপরে বাপ, ইউনিভার্সিটির দিকে মানুষ যায় ? ওতো ভাতের হাঁড়ি, টগবগ করে ফুটছে। রণাঙ্গন। ছাত্রগুলো যে কী, কেন রে বাবা বাস পোড়াস ? সম্পত্তি নষ্ট করে কী লাভ ? আসলে ইউনিভার্সিটিগুলো হওয়া উচিত শহরের বাইরে, জঙ্গলের মধ্যে।

এ-এক আশ্চর্য জাদু। একই মানুষ ঘরে এক, বাইরে আরেক। মঞ্চে একরকম, নেপথ্যে অন্যরকম। অফিসে যা, সংসারে তার উল্টো। বস ডাকছেন। ইয়েস স্যার, স্লামালেকুম স্যার। ভাবী কী রকম আছেন স্যার? ভাবীর জন্য স্যার বড়ো বড়ো পাবদা মাছ কিনে রেখেছি, স্যার। স্যার আপনার শরীরটা দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে স্যার। চলুন স্যার আমার পরিচিত স্পেশালিস্ট আছেন। ঘরে এসে এই লোকের অন্য মেজাজ। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা তটস্থ। কেউ টুঁ শব্দটি করছে না। করার সাহস নেই। বৌ চোখে দেখে না। ডাক্তারের কাছে যাওয়া দরকার। এই দরকারি কথাটা বৌ স্বামীর কানে তোলার সাহস পাচ্ছে না। যা মেজাজ। এই চরিত্রই বাঙালির কমন চরিত্র। বাইরের লোক দেখলেই স্ত্রী গলে গলে পড়ছেন। রহিম ভাইয়া, করিম ভাইয়া, রাম বাবু, শ্যাম বাবু, মি. এক্স, মিসেস ওয়াই— সবাই মুগ্ধ। অমন মহিলা লাখে এক। মাখনের মতো ব্যবহার। ঘরে এসেই এই মহিলা হয়ে ওঠেন মার্শাল-ল এডমিনেস্ট্রটর। বাথরুমের মেঝে ভেজা কেন ? যাও, ঝাঁটা নিয়ে ঝেঁটিয়ে জল সরাও। চায়ের কাপে বিস্কুটের গুঁড়ো কেন ? ছোটলোকটা কে, চায়ে বিস্কিট ভিজিয়ে খায় ? হাবলু, এদিকে এসো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নীলডাউন, পাঁচ মিনিট হাঁটু ভেঙে দাঁড়িয়ে থাকো। কাল রাতে বিছানা ভিজিয়েছো। দিস ইজ টু মাচ। তোমাকে না কতোদিন বলেছি, বাথরুম সেরে বেডে যাবে। এরূপেরই সেরা রূপ পরকীয়ায়। নিজের স্ত্রীকে বাপ-মা তুলে গালাগাল করে ভদ্রলোক বসলেন টেলিফোন নিয়ে, বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে আকাশ অন্ধকার করে, পঙ্কজ মল্লিকের গান ছেড়ে দিয়েছি; ইশ, আজ শুধু কবিতা পড়তে ইচ্ছে করছে, হায় চিল সোনালি ডানার চিল এই ভিজে মেঘের দুপুরে, তুমি আর...। ওপাশ থেকে দীর্ঘশ্বাস। ইশ কতো রোমান্টিক। কতো রোমান্টিক, টেলিফোনের তারে ঝুলে বাঁদরের মতো একবার এ-ঘরে এলে বুঝতে! একই গালি, আরবি, ফারসি, হিন্দি, উর্দু, ইংরেজি, ফরাসি, স্প্যানিশ, জার্মান, সংস্কৃত ও খাঁটি বাংলায় কীভাবে উচ্চারণ করা যায়, ইনি শেখাতে পারতেন।

একটা মানুষই যে প্রতিদিন কতো চরিত্রে অভিনয় করে চলেছে। নিপুণ, সার্থক, অকৃত্রিম অভিনয়। যখন সে পুত্রবধূ তখন তার এক রূপ, যখন সে শাশুড়ি তখন তার আরেক। যেন এক দোকানের সেলস্‌ম্যান অন্য দোকানে ঢুকেছেন খদ্দের হয়ে। একটু আগেই ১০ টাকা দাম বাড়ানোর জন্য ইনি এক হাজারটা মিথ্যা বলেছেন। এবার তার চেষ্টা ১০ টাকা কমানো।

স্থান-কালের বদল ঘটলে পাত্র আপনাআপনিই বদলে যায়। চার টাকার রিকশা ভাড়া পাঁচ টাকা দিয়েছেন, কোনো দুঃখ নেই। চারশ' নব্বই টাকার কাপড় পাঁচশ' পঁচিশে কিনলেও আফসোস হচ্ছে না। কিন্তু বাসে উঠেই আপনার মানসিকতার বদল ঘটে গেছে। 'ভাড়া দেন।' 'পরে আসো।' 'পরে না, এখনই দেন'। 'দাও, আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা ফেরত দাও। '১০ টাকা বের না করেই আপনি বললেন। 'দেন, দিতাছি'। ১০ টাকা হাতবদল হয়ে গেলো। আপনি ফেরত পেলেন আট টাকা। পুরো পঞ্চাশ পয়সা কম। 'ওই মিয়া, মগের মুল্লুক পাইছো। দেড় টাকা ভাড়া দুই টাকা নিবা।' 'খুচরা নাই'। 'খুচরা নাই, ভাড়া নিবা না' দাও ফেরত ১০ টাকা'। লেগে গেলো। সমস্ত বাস দুই ভাগে বিভক্ত। দুটি পক্ষ। একদল কন্ডাকটরের পক্ষে, অন্যদল আপনার। কেয়ারটেকার সরকার নয়, অচলাবস্থার মূলে মোটে পঞ্চাশটি পয়সা।

আপনি যখন ভাড়াটে তখন আপনার এক স্বভাব। নতুন বাসায় ঢুকে প্রথম কাজ দুই টাকার পেরেক কেনা এবং হাতুড়ি বের করা। পোস্টার, ফটো ফ্রেম-আয়না, পেইন্টিং, শিকে, মশারি কতো কিছু ঝোলাতে হবে। আর বাড়িঅলা হওয়ার পর দেয়ালে পেরেক পড়ার আগেই আপনি বুক এগিয়ে দেবেন। কপালে ঠুকুন। কপালে ঠুকুন। এই চরিত্রই রাজনীতির মাধ্যমে হয়ে উঠেছে আমাদের জাতীয় চরিত্র। যখন বিরোধীদলে তখন এক সুর, যখন ক্ষমতায় তখন আরেক। খালেদা জিয়া বিএনপি নির্বাচনের আগে ওয়াদা করলো, রেডিও-টিভির স্বায়ত্ত্বশাসন দেওয়া হবে, বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিল করা হবে। ক্ষমতায় গিয়ে সব ভুলে গেছে তারা। বেমালুম। 'আমাদের টিভি, আমরা যেভাবে ইচ্ছা চালাবো, তোমাদের কী ? হরতাল-চ্যাম্পিয়ন বিএনপি এখন বলে— হরতাল খুব খারাপ। জনগণ হরতাল চায় না। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হরতালবিরোধী জাতীয় পার্টি এখন বেশ হরতালকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। হরতালে ক্ষতি কার ? সেই পোস্টারটির কথা জাপা এতো তাড়াতাড়ি ভুলে গেলো ?

অবস্থান বুঝে নিজেকে পাল্টাতে হয়— এই মন্ত্রই সাফল্যের চাবিকাঠি। আমি একজন বুদ্ধিজীবীকে জানি, তিনি পেশাদার প্রধান অতিথি। অনেক সময় জানেনও না এখন তিনি কোন্ পক্ষের মঞ্চে। পাশের জনকে ডেকে জিজ্ঞেস করেন, এই এরা কোন্ পক্ষ ? জাতীয়তাবাদী নাকি সমাজতন্ত্রী ? বাঙালি নাকি বাংলাদেশী ? তার পর আরম্ভ করেন তার বক্তৃতা। এই লোক যে ইহলোকে সাফল্যের চূড়ায় উঠবেন, কোনোই সন্দেহ নেই। এরকম যে পারে না, তার পক্ষে সফলতা কঠিন। স্নো এন্ড স্টিডি নেভার উইন দি রেস। স্টিডি হলে চলবে না। অস্থির হতে হবে। হরবোলা, বহুরূপী। যখন যার, তখন তার। অবস্থান অনুসারে অভিযোজন। এভাবেই মানুষ টিকে আছে। যোগ্যতমের উর্দ্ধতন। সারভাইভাল অব দি ফিটেস্ট।

প্লেগ : গজব ও মরিচ

বাংলাদেশের তিনদিকেই ভারত, সীমান্ত এমন উন্মুক্ত যে ভারত থেকে গরু না এলে আমাদের কুরবানি হয় না। সীমান্ত এলাকার লোকজন অনেক সময় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেবার জন্যেও এপার-ওপার করে। প্রায় সব নদী এদেশে এসেছে ভারত থেকে। সীমান্তে যতো বড়ো পাহারাই বসানো হোক-না কেন, অন্তত ইদুঁরের যাওয়া-আসা কেউ ঠেকাতে পারবে না। মানুষের যাওয়া-আসা, পণ্যের যাওয়া-আসাও বন্ধ হবে না, কারণ তাতে মারা যাবে হাজার হাজার মানুষ পরিবার পরিজনসহ, মারা যাবে সীমান্তরক্ষী বাহিনী, কাস্টমসের কর্মকর্তা-কর্মচারী, আরো অনেক রুই-কাতলা। এ অবস্থায় ভারতে যদি ছড়িয়ে পড়ে প্লেগ, বাংলাদেশে তার আগমন ঠেকানোর কোনো উপায় নেই। প্লেগ আসবেই অবধারিতভাবে।

কিন্তু আশ্চর্যের হলেও সত্য ভারত থেকে প্লেগ গেছে বৃটেনে, জার্মানিতে, শ্রীলঙ্কায়। কিন্তু বাংলাদেশে এখনো পর্যন্ত একজনও প্লেগ রোগীর সন্ধান পাওয়া যায় নাই। এ অবাক কাণ্ড কী করে সম্ভব হলো ? তা জানার জন্যে নিচের সংবাদটি পড়ুন।

প্লেগ থেকে পরিত্রাণের জন্য কাল বাদ-জুমা বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করুন।

মাওলানা এমএ মান্নান

মাওলানা মান্নান এক বিবৃতিতে বলেন : পবিত্র কোরআনের তাফসির ও হাদিস শরিফ অনুযায়ী আজ থেকে পাঁচ-ছয় হাজার বছর পূর্বে আল্লাহর প্রিয় নবীদের (আ.) সাথে সে-কালের লোকের নাফরমানী করার ফলে আল্লাহতালা কয়েকদিনের মধ্যে কয়েকটি সম্প্রদায়কে প্লেগ রোগ দিয়ে ধ্বংস ও নির্মূল করে দেন। এজন্যই এ প্লেগ গজব ও লানতের রোগ। তিনি বলেন, পবিত্র কোরআন ও হাদীসের ব্যাখ্যাকারীগণের বর্ণনা অনুযায়ী এই রোগ থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যে আল্লাহ নবীদের (আ.) মাধ্যমে তৎকালে তার নিকট তওবা ও দোয়া করার নির্দেশ দেন। বাংলাদেশ জমিয়াতুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মোদাছেরিনের সভাপতি সে-মতে সারাদেশের সম্মানিত আলেম-ওলামা, পীর মাশায়েখ, বুজুর্গানে দ্বীন, সকল মসজিদের ইমাম ও খতীব, সকল স্তরের মদ্রাসা মোদার্রেছীনের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন, যাতে তারা প্রতি জুমা বিশেষ করে আগামীকাল বাদ-জুমা সকল মুসল্লিকে নিয়ে তওবা ও ইসতেগার করে আল্লাহর কাছে বাংলাদেশকে এই রোগ থেকে হেফাজত করার এবং দেশের সার্বিক কল্যাণ, মঙ্গল ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য দোয়া করেন।

দৈনিক ইনকিলাব, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪

উপরোক্ত বিবৃতিতে সাড়া দিয়ে দেশে বিশেষ তওবা ও মোনাজাত করার কারণেই যে দেশে প্লেগ ঢুকতে পারেনি, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

হোমিওপ্যাথ কহে

এদিকে চট্টগ্রামের দুজন হোমিওপ্যাথ চিকিৎসক 'প্ল্যাগ প্রতিরোধে হোমিওপ্যাথ' শীর্ষক একটি রচনা সংবাদপত্রগুলোতে পাঠিয়েছেন। সেই রচনা থেকে দুটি লাইন: 'আমার কথা এই যে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী অঞ্চলের অধিবাসী যারা তরি-তরকারিতে নিয়মিত মরিচ খান তাদের প্লেগ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা অপেক্ষাকৃত কম বললেও চলে। তবে অত্যধিক মরিচ স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকরই বটে'।

মরিচ খাবার জন্যেও বাংলাদেশ বাসীগণ প্লেগ থেকে মুক্ত থাকতে পারেন।

কার পাপে ?

এদিকে, ভারতে এ পর্যন্ত প্লেগ রোগে বেসরকারি মতে ৩০০ জন, সরকারি মতে ৫৮ জন মারা গেছে। পৃথিবীতে প্রতিবছর ১০ লক্ষ শিশু হামে, ৩০ লক্ষ শিশু ডায়রিয়ায়, ৪ লক্ষ শিশু হুপিংকাশিতে, ৫ লক্ষ শিশু ধনুষ্টংকারে মারা যায়। এই শিশুরা মারা যায় কার পাপে ? বাংলাদেশেই প্রতিবছর কয়েক লক্ষ শিশু মারা যায় ডায়রিয়ায়, এই মাসুম শিশুদের মৃত্যু হয় কোনো গজবে ? বাংলাদেশে প্রতি ২০ মিনিটে একজন প্রসূতি মারা যায়, সেটা কোন্ লানত ? '৯১-এর ঘূর্ণিঝড়ে সরকারি প্রচারণায় এক লক্ষ বিশ হাজার থেকে তিনি লক্ষ মানুষের মৃত্যুর' কথা বলা হয়েছিল, যার মধ্যে অনেক শিশুও ছিল, তাদের ওপরে গজব নেমে এলো কেন ?

একটি প্রচলিত গল্প

একজন বৃদ্ধ বিয়ে করলেন এক তরুণীকে। স্ত্রীকে শোয়ার প্রস্তাব সরাসরি দেবার বদলে এবং শয্যাগ্রহণে স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করার আশায় তিনি বললেন, 'এসো, আমরা কাফের মারি'।

কাফের মারার প্রক্রিয়া তরুণীকে আমোদিত করলো। ভোর রাতে তরুণীর ইচ্ছে হলো আবার কাফের মারার। কিন্তু ক্লান্ত বৃদ্ধ তখন ঘুমে অচেতন। তাকে জাগিয়ে স্ত্রী বললো, হুজুর আসুন, আবার কাফের মারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বৃদ্ধের শরীরে আর তাকদ অবশিষ্ট নেই। তবু তিনি দ্বিতীয়বারের মতো কর্ম সম্পাদন করলেন। কিন্তু তরুণীর চাহিদা তাতে মিটলো না। সে বললো, হুজুর, আসুন আবার কাফের মারি। হুজুর তখন বললেন, কাফের সব মরে গেছে, আর নয়, এখন মোমিন মরা শুরু হয়ে গেছে।

অতএব সাবধান : প্লেগ চলে এলে কিংবা চলে আসার আগে দোয়াদরুদ পড়া ও মরিচ খাওয়ার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক প্রতিরোধব্যবস্থা গ্রহণ করুন। এক্ষেত্রে প্রফেসর নুরুল ইসলামের পরামর্শই অধিকতর গ্রহণযোগ্য।

সহজ ভাষা শিক্ষা

লিজ এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে, বছর তিনেক হলো। বাংলাদেশের একটি বেসরকারি ব্যাংকের বেশ সুনাম হয়েছে আমেরিকায়, লিজ সেই ব্যাংকের কার্যক্রমের বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে চায়। এখানে আসার আগে থেকেই বাংলাভাষা শেখার চেষ্টা করছিল সে, এখন মোটামুটি ভালোই রফত হয়েছে, আধো আধো বলতে পারে, মাত্রাটানা খাতায় সোজা করে বেশ লিখতে পারে, আর গরগর করে পড়তে পারে।

ভাষা শেখার সহজ উপায় হিসেবে সে নিয়েছে বাংলা সংবাদপত্র পাঠ। বাংলা সংবাদপত্র পড়লে বাংলা শেখাও হবে, আর বাংলাদেশের সমাজজীবন সম্পর্কেও জানা যাবে।

লিজের বয়স ২১ অথবা ২২। দেখতে সুন্দর। বিদেশিনীদের শরীরে যেমন ফাটা ফাটা দাগ থাকে ওর তেমন নয়। ত্বক মসৃণ। আজ সে পরেছে বাটিকের পাঞ্জাবি। গলার কাছে দুটো বোতাম খোলা। সে উপুড় হয়ে সংবাদপত্র পড়ছে। আমার চোখ কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। এর একটা কারণ আছে। সেদিন স্টারপ্লাস-এ রেমিংটন স্টিল দেখছিলাম। এই সিরিজটি বিটিভিতেও দেখানো হয়। এর নায়িকা লরা। সাংঘাতিক সুন্দরী। অবশ্য সুন্দরী বললে যতোটা ধারালো-রুক্ষ বোঝায়, লরা তা নয়। সৌম্য সুন্দরী। এক দৃষ্টিতে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। কিন্তু মুশকিল ঘটলো সিরিজটির সেদিনের পর্বে। লরা তার পরনের কাপড় সংক্ষিপ্ত করেছে। সে নেমেছে একটা বাথটাবে। উর্ধ্বাঙ্গ অনেকটাই দেখা যাচ্ছে। আমার পুলকিত বোধ করার কথা। কিন্তু আমি পুলকিত না হয়ে আঁতকে উঠলাম। একি ? লরার বুকের উপরটায় ছিটছিট কালো দাগ। বেশ বড় ধরনের কালো দাগ। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। কবি হলে 'চাঁদেও কলঙ্ক থাকে, লরার বুকে দাগ'— বলে একটা কবিতা লিখে ফেলা যেতো।

লিজ একমনে বাংলাদেশের সংবাদপত্র পড়ছে। ফ্যানের বাতাসে তার পাঞ্জাবির বুকের কাছটা উড়ছে। যতোটুকু দেখা যাচ্ছে, না কোনোরকম দাগ নেই। আদিগন্ত শুভ্রতা।

আমি তাকিয়ে আছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তদন্তটা শেষ হওয়া দরকার। পুরুষের প্রাচীনতম তদন্ত।

লিজ যে একটা প্রশ্ন তিনবার করেছে, সেদিকে আমার খেয়াল নেই।

এই, কবে তোমাদের দেশকে বিক্রি করে দিল ?

এই, কবে তোমাদের দেশকে বিক্রি করে দিল ?

এই, কবে তোমাদের দেশকে বিক্রি করে দিল ?

লিজের প্রশ্নের দিকে আমার মনোযোগ নেই। আমি তার রোমের সৌন্দর্য নিয়ে মত্ত। সোনালি রঙের একেকটি রোম। শরীরের সোনার সঙ্গে মিশে আছে। স্বপ্ন আর সৌন্দর্যের কোনো গূঢ় রহস্য থাকে একজন তরুণীর শরীরে ?

এই, তোমাদের দেশকে যে বিক্রি করে দিল, কীভাবে বিক্রি করলো ? ওজন করে, নাকি ভূমির পরিমাণ মেপে ?

লিজ উঠে এসেছে। আমার হাত খামচে ধরেছে। আমি সম্বিত ফিরে পেলাম।

লিজ, তুমি কি কিছু জিজ্ঞাসা করছো ?

দেখো না, পত্রিকায় কী লিখেছে! তোমাদের দেশ বিক্রি হয়ে গেছে। লিজ আমার হাতে জোরে চাপ দিয়ে বললো। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললাম। ওর মুখে উদ্বেগ। নতুন নতুন বাংলা শিখছে। না বুঝেই নানা ধরনের উদ্বেগ তাকে ভর করে। সেদিন সে আমাকে বলছিল, এই, আমাকে তোমাদের দেশের একটা বিখ্যাত খাবার কোনোদিন খাওয়ালে না কেন ?

কোন্ খাবার ?

চিলড বিন। হিমশিম। আমি সংবাদপত্রে পড়েছি। বিখ্যাত ব্যক্তিরাও হিমশিম খান। ডিকশনারিতে এর অর্থ দেখেছি। হিম মানে ঠাণ্ডা, চিলড। আর শিম হচ্ছে এক ধরনের সবজি, বিন। এই, আমি হিমশিম খাবো।

ওর এ প্রস্তাবের জবাব দেব কী ? আমি নিজেই হিমশিম খেতে লাগলাম।

ও এরকমই। কাজেই দেশ বিক্রির খবরে তেমন উদ্বিগ্ন হলাম না। নিশ্চয়ই এক কথা লেখা হয়েছে, লিজ অন্যকিছু বুঝেছে। কাগজটা টেনে নিলাম। ভোরের কাগজ। ৪ অক্টোবর ১৯৯৪। পেছনের পাতায় ডাবল কলাম নিউজ। 'দহগ্রাম আঙ্গরপোতায় শেখ হাসিনা। সরকার দেশকে ভারতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছেন।'

লিজের কণ্ঠ থেকে উদ্বেগ ঝরেই চলেছে— দেখলে ? কতো বড়ো খবর। সরকার দেশকে বিক্রি করে দিয়েছে। ভারত কিনে নিয়েছে। তোমাদের এখানে বুঝি দেশ কেনাবেচা হয় ?

আমি হেসে ফেললাম।

হাসছো কেন ? আমি কি ভুল বুঝেছি ? না। তুমি ভুল বোঝোনি। ঠিকই বুঝেছো। সংবাদপত্রে যা লেখা হয়েছে, তুমি তাই বুঝেছো।

কিন্তু তুমি হাসছো কেন ? এটা কি হাসির কথা ?

না, এটা হাসির কথা নয়। দেশ বিক্রি হয়ে গেলে সেটা কোনো হাসির কথা নিশ্চয়ই হতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাহলে ?

ব্যাপার হলো, দেশটা আসলে বিক্রি হয়ে যায়নি।

বলো কী ? শেখ হাসিনা কি তাহলে মিথ্যা বলেছেন ? একজন নেত্রী কি মিথ্যা বলতে পারেন ?

এই ব্যাপারগুলো লিজকে বোঝানো মুশকিল। আমাদের রাজনীতির পরিভাষা। দেশ কী করে বিক্রি হয়ে যায় ? এটা আসলে বিএনপির আওয়াজ। '৯১-এর নির্বাচনের আগে এই আওয়াজ করে খালেদা জিয়া জয়লাভ করেছেন। 'আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে দেশ বিক্রয় হইয়া যাইবে।' এবার হাসিনা সেই আওয়াজ করছেন। 'আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলে দেশ বিক্রয় হইয়া যাইবে।' এবার হাসিনা সেই আওয়াজ করছেন। সংবাদপত্রে সেসব মুদ্রিত হচ্ছে।

কিন্তু এসব বাক্যের অর্থ কী, তা কেউ ভেবে দেখছে না। সবাই বলে, সবাই শোনে, কেউ গা করে না। কেউ গা করলেই মুশকিল। যেমন হয়েছে লিজের বেলায়। নিজের দেশ থেকে হাজার হাজার মাইল দূরের একটা দেশ নিয়ে সে বিচলিত হয়ে পড়েছে।

নেতানেত্রীদের এসব বক্তব্যের শাব্দিক অর্থ করলে আসলেই মুশকিল। লিজ আমাকে পরশুদিনও একই বিপদে ফেলেছিল। সংবাদপত্রে সে এক নতুন খাবারের নাম পড়েছে। সেটা সে খাবে বলে জেদ ধরেছিল।

এই, আমাকে আজ একটা খাদ্য খাওয়াতে হবে।

খাদ্য খাওয়াতে হবে। খাওয়াবো। বলো, কী খাবার ?

বিসমিল্লাহ।

বিসমিল্লাহ। এটা আবার কী ধরনের খাবার ?

তুমি জানো না। রসিকতা করছো ?

না। এটা কি কোনো খাদ্যের নাম হতে পারে ?

পারে না বলছো ?

না। ঠিক জোর দিয়ে বলতে পারছি না। এদেশে অনেক ধরনের খাদ্যের নাম প্রচলিত, যেমন হালিম। এটা লোকেরও নাম, খাবারেরও নাম। যেমন, মনসুর। যেমন, মোরগ মোসাল্লাম। দাঁড়াও আমি অন্য কারো কাছে জিজ্ঞাসা করে নিই।

আমি টেলিফোনে খোঁজ নিলাম। মুরগির হৃৎপিণ্ডকে বলে বিসমিল্লা। লিজ মুরগির হার্ট খেতে চায়। এমা, লোকে যে চিকেন-হার্টেড বলবে।

যাক, আয়োজন করতেই হলো। সে-রাতেই। খাবার টেবিলে বসে বিসমিল্লাহ মুখে দিয়ে লিজ গম্ভীর হয়ে গেলো। খুব সাধারণ একটা খাবার। চিকেন হার্ট। তবে খালেদা জিয়া কেন এই খাবার নিয়ে চিন্তিত ? লিজ জিজ্ঞাসা করলো।

খালেদা বিসমিল্লাহ নিয়ে কবে কী বললেন ?

বলেছেন। সংবাদপত্রে লিখেছে। 'তারা এক হয়ে ইসলাম, গণতন্ত্র ও বিসমিল্লাহ খেয়ে ফেলতে চায়'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ আমারবই.কম

এই কথা শোনার পরে আমি হাসবো না কাঁদবো ? ১ অক্টোবর মানিকমিয়া এভিনিউয়ের বিশাল জনসভায় বেগম জিয়া আসলেই এই কথা বলেছেন। আমি নিজে বিটিভির খবরে দেখেছি। দেখে ভেবেছি, উল্টোপাল্টা কথা বলায় কেউ কম জানে না। ভেবেছিলাম খালেদা একটু কম বাজে বকেন। এখন দেখছি, তিনিও অর্থহীন বাগাড়ম্বরে বেশ এগিয়ে।

এখন লিজকে কী জবাব দেবো ? কিছুই বলার নেই। আমরা কেবল এই প্রার্থনা করতে পারি, হে বিসমিল্লাহের মালিক, তুমি নেতানেত্রীদের ভাষাজ্ঞান, রুচিজ্ঞান ও কাণ্ডজ্ঞানটা একটু বেশি করে দান করো।

শীত আসছে

শীত আসছে। ভাদ্র যাই যাই করছে। রমনা পার্কের পাশ দিয়ে সন্ধ্যায় রিকশায়। সেই গন্ধ। সেই শীত শীত বাতাস। মনটা উদাস হয়ে ওঠে। কোন্ সুদূর শৈশবের সন্ধ্যাগুলো মনে পড়ে যায়। এমনি করেই তো একটু একটু করে শীত নামতো। মাঠে স্যান্ডেল পরে হাঁটলে তলা ভরে যেতো শুকনো ঘাসে, ভিজে মাটিতে আর শিশিরে। বাসার সামনে সবজির বাগান। কোদাল দিয়ে কুপিয়ে ফুলকপি, বাঁধাকপির চারা লাগানো। কাল বিকেলে বালতিতে জল টেনে গাছের গোড়ায় ঢালা।

সকালবেলা চিকন চিকন রোদ এসে চোখে লাগতো। কিংবা বিভূতিভূষণের সন্ধ্যা। বাড়ির সামনে ছোটদের জটলা। কুলগাছের নিচে। ওই যে একটা রাঙা মতো হয়েছে। ঢিল ছোঁড়া চলেছে।

আহা, এই বাংলায় সেই শীত আসছে। শুধু সেই দিনগুলো নেই। শীত যে আবার আসছে এখন সেটা বাঙালি টের পাচ্ছে কিসে ? না, হরতালে-অবরোধে। লুনার কাল পরীক্ষা। টিউটোরিয়াল জাতীয় কিছু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের। খুবই মনোযোগী ভঙ্গিতে সে পড়ছে। হঠাৎ চিৎকার। আনন্দে, ভয়ে না দুঃখে, তদন্তটা করা দরকার। কারণ আবিষ্কার করা গেলো। কী ? আগামীকাল হরতাল। পরীক্ষা হবে না। লুনা আনন্দে নাচছে। পরীক্ষা কাল না হলে পরশু হবে। সুতরাং পড়তেও তোমাকে হবেই। লুনার মুখ শুকিয়ে গেলো। বললো, তা হোক, কাল তো হবে না। পরীক্ষা ব্যাপারটা পেছালে খুশি হয় না—পৃথিবীতে এমন একজন পরীক্ষার্থীও পাওয়া যাবে না। যে ফার্স্ট হয়, সেও ভাবে আরেকটু সময় পেলে রিভিশনটা ভালো মতো দেয়া যেতো।

পরের দিন সকালবেলা পত্রিকা হাতে নিয়ে লুনা আহলাদে নাচতে লাগলো প্রায়। শুধু আজ নয়, তিনদিনের হরতাল। হিপ হিপ হুররে। সে ব্যস্ত হয়ে পড়লো তিনদিনের হরতাল কর্মসূচি উদযাপন করতে। বড় আপা মেজো আপা তোমরা চলে এসো। বাচ্চা-কাচ্চাসহ। তিনদিন থাকবে। মহা ধুমধাম হবে। আজি কী আনন্দ আকাশে বাতাসে। আজ হরতাল, আজ হরতাল। আজ হিপ হিপ আজ হুররে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাঙালি মধ্যবিত্ত এমনিভাবে বুঝতে পারে শীত আসছে, আসছে আন্দোলনের কাল। আজ অর্ধদিবস। কাল পূর্ণদিবস। এরপর লাগাতার। প্রথম প্রথম লাগে মজা। ফান। বহুদিন দেরি করে ঘুম থেকে ওঠা হয় না। আজ একটু আরাম করে ঘুমুবো। দশটার আগে কেউ আমাকে ডাকবে না, নো ডিস্টারবেন্স, প্লিজ। বন্ধ দরজার গায়ে চিরকুট আটা। আটটায় ঘুম ভেঙে যায় অভ্যাসবশত। তবু বিছানায় বলপূর্বক গাত্র লেপন। আজ না হরতাল।

অফিসক্লান্ত, ক্লাসক্লান্ত মানুষের মনে এক বিশাল আনন্দের আমেজ। মাঝে মাঝে হরতাল না হলে ভালোলাগে ?

এই আনন্দ উদযাপনের কর্মসূচিতে থাকে ভিসিপিতে সিনেমা দেখা। ইদানীং অবশ্য কেব্‌লটিভির কল্যাণে ভিসিপি ছাড়াও সিনেমা দেখা চলে। কর্মসূচির অন্যান্য দিকের মধ্যে আছে পরিবারের সকলকে মিলে যাকে বলে 'গেট টুগেদার' সেটা সেরে ফেলা। সবাইকে তো একসঙ্গে পাওয়া যায় না। আজ দুপুরে একটু খিচুরি হয়ে যাক। এরপরে আছে 'টেলিফোনে জরুরি আলাপগুলো সেরে ফেলা। বছরের অন্যদিন যাদের কোথাও ধরা যায় না, হরতালের দিন নিশ্চিত তারা বাসায় আছেন, রিং করো, আলাপ সারো।

প্রথম প্রথম এমনি করে মহাসংবর্ধনা দেয়া হয় হরতালকে। তারপর শুরু হয় বিরক্তি। বাঙালি বিরক্ত হতে শুরু করে। আর কতো ভালোলাগে এই হরতাল। একঘেঁয়ে লাগছে। এদের কি কোনোই উদ্ভাবনী শক্তি নেই ? নতুন কোনো কর্মসূচি দিতে পারে না ? কাজ-কম্মো বন্ধ। ব্যবসাপাতির অবস্থা খারাপ। কেউ টাকা হাতছাড়া করছে না। ট্রান্সজাকশন নেই। সবচেয়ে বড় অসুবিধা, যানবাহন নেই। মানুষের প্রয়োজন কতো জরুরি আর বিচিত্র। রোগশোক তো আছেই। বিয়েশাদি। বিদেশগমন। ব্যবসা-বাণিজ্য। রিকশাঅলাদের দিন আনা।

বাঙালি ত্যক্ত-বিরক্ত-ক্ষিপ্ত হতে শুরু করে। সে-সময় হরতালে পিকেটার থাকে না। রাস্তায় একটা-দুটো রিকশাও বেরোয়। দু-একটা বাসও। সরকারও সুযোগ বুঝে বিবৃতি দেয়— জনগণ হরতাল প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। এমনি করে কার্তিক-অগ্রহায়ণটা যায়। তারপর আসে পৌষ-মাঘ। শীতটা জাঁকালো হয়ে পড়ে। তখনই আসে আন্দোলনের পৌষমাস। হরতালের ওপর বিরক্ত বাঙালির রাগ গিয়ে পড়ে সরকারের ওপর। না, এই সরকারকে আর ক্ষমতায় রাখা ঠিক নয়। ঝাঁপিয়ে পড়ো আন্দোলনে। আবার বিরোধীদের জমায়েত বড়ো হতে শুরু করে। হরতাল হয় সর্বাত্মক। ৪৮ ঘণ্টা, ৫৪ ঘণ্টা। সরকার প্রথমে নামায় বিডিআর, তারপর সেনাবাহিনী। আবহাওয়া ঠাণ্ডা, মাঠ গরম। এই ধাক্কা সরকার যদি সামলাতে পারলো, তো এই বছর নিশ্চিন্ত। চৈত্র এলেই বুঝতে হবে, না, শীত চলে গেছে। সরকারও টিকে গেছে। আবার সামনের বছর। শীত না-পড়া পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। এমনিই হচ্ছে বছরের পর বছর। নব্বইয়ের ১০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অক্টোবরের ঘেরাওয়ে আওয়ামী লীগ পাঁচ হাজার আর বিএনপি দু-জাহার লোক নিয়ে সচিবালয় ঘেরাও করেছিল। এরশাদ সাহেব হেসে ফেলেছিলেন। ৭০ লাখ লোকের শহরে মোটে ৭ হাজার লোকের ঘেরাও।

কিন্তু ওই হাসি শেষতক থাকেনি। জেহাদ প্রমুখ শহীদ হলেন। ফলোআপ কর্মসূচি এলো। সর্বদলীয় ছাত্রঐক্যের মিছিল শুরু হয়েছিল ২০ জন নিয়ে। পুলিশ বেধড়ক পেটালো। ব্যাস, ওই ২০ জনে যা আরম্ভ করলো, তার শেষটা ঠেকলো জনসমুদ্রে। '৯০-এর ডিসেম্বরের জনসমুদ্র।

কী দিয়ে যে কী হয়, বোঝা মুশকিল। বিরোধীরা সেই আশাতেই কর্মসূচি দিয়ে যাচ্ছে। মানুষ কখন নেমে পড়বে, বলা মুশকিল। যদি নামে, তাহলে আর পায় কে? কাঁদানে গ্যাসের ঝাঁঝ, মিঠেকড়া রোদ দিয়ে এবারের ভদ্র বিদায়, আশ্বিনের অভিষেক। শীত আসছে। বাঙালির আন্দোলনের মৌসুম। শরীরের জং এখনো কাটেনি। দু-চারটা ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হলে ওটা কেটে যাবে। তারপর নেমে পড়বে—জ্বালো জ্বালো আগুন জ্বালো।

আগুন না জ্বালালে শীতকালটায় তো মরতে হবে ঠাণ্ডাতেই।

বাঙালির কেব্‌ল-টিভি দর্শন

কোনো জিনিস যখন নতুন থাকে, তখন তার কদরই আলাদা। যেমন নতুন জুতো আর নতুন জামাইয়ের মুখ। খোকা একজোড়া নতুন কালো রঙের জুতো পেয়েছে। এতদিন সে পরেছে রঙিন জুতো। এই প্রথম পেলো কালো রঙের, বাবা-চাচারা যেমন পরে থাকেন। জুতোজোড়া কাগজের বাক্সে রেখে দেওয়া। খোকা একটু পরপর গিয়ে দেখে। ভাত খাবার মধ্যেও উঠে গিয়ে একবার দেখতে হয়। নতুন জামাইয়ের মুখও তেমনি বারবার দেখতে ইচ্ছে করে। খাবার স্যালাইন যেমন বারবার খেতে হয়। শাশুড়ি আড়াল থেকে আড়চোখে দেখে, শ্যালিকারা দেখে পূর্ণচোখে। সেজন্যই বোধহয় লোকে বলে, শালিদের শালীনতা নেই।

এই নতুন জিনিসের কদর ব্যাপারটা কেবল জুতো ও জামাইয়ের বেলায় নয়, প্রায় সবক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নতুন গোঁফ উঠলে নাকি ছেলেরা বারবার দাঁড়ায় আয়নার সামনে। মেয়েরা কী করে, আমি জানি না, আমার জানার কথাও না। ঢাকার শহরে এখন নতুন যে দ্রব্যটি নিয়ে মেতেছে তার নাম কেব্‌ল-টিভি। প্রথমে এসেছে সিএনএন আর বিবিসি। বাংলাদেশ টেলিভিশন ও-দুটো যখন সম্প্রচার শুরু করলো তখন অনেকেরই ডেইলি লাইফ পাল্টে গিয়েছিল। না, শোবিজটা দেখতেই হবে। ওই জ্বর দুদিনের। বিবিসি আর সিএনএন যে প্রতিদিন দিনভর অনুষ্ঠান দেখিয়েই চলেছে, কে রাখে খোঁজ? ভাগ্যিস টিভি যন্ত্রটা বউয়ের মতো নয়। তুমি আর আগের মতো আমাকে ভালোবাসো না—আগে তুমি আমাকে রোজ কতো আগ্রহভরে দেখতে, এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একবারও তাকিয়ে দেখো না— এমন অনুযোগ যে সিএনএন আর বিবিসির প্রোগ্রাম অন করলেই শোনা যেতো না হলে, সন্দেহ নেই। বরং অনুযোগটা আরো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতো এমনিভাবে— তুমি আর আমার দিকে তাকাবে কেন, আমার তো বয়স হয়েছে, এখন কতো নতুন নতুন ছুঁড়ি এসেছে, জিটিভি, এমটিভি...। এই সেই পুরোনো গল্প। সুয়োরানি আর দুয়োরানি। আগে অবশ্য সুয়োরানি ছিল টেলিভিশন, দুয়োরানি ছিল রেডিও। এখনকার হিসাবটা অন্যরকম।

বউয়ের সঙ্গে টেলিভিশনের মিলটা অবশ্য আমি দেইনি, দিয়েছেন শফিক রেহমান। তার গল্পটা এরকম :

এক ব্যক্তি এমন একটা সঙ্গী চায়, যে সবসময় বাধ্য ও অনুগত থাকবেই। যখনই চাওয়া যাবে তখনি সে বিনোদন জোগাবে। যখনই ইচ্ছে হবে, তখনি শোনা যাবে তার কথা। যখন বলা হবে— না, আর একটিও কথা নয়, কেবল ঘুম, সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়বে। যখন মনে হবে, একটু ইয়ে হওয়া দরকার, তখনই তাও শুরু হবে। কোনো না নেই, কোনো রা নেই।

এসব শর্ত লোকটি শোনালো তার পছন্দের পাত্রীকে।

মেয়েটি জবাব দিলো, আসলে তুমি কোনো মানুষ চাও না, তুমি চাও একটি টেলিভিশন। হ্যাঁ, এ গল্পের যে চাহিদাগুলো 'যখন যা, তখনই তা'—এটা পূরণ হওয়া সম্ভব তখনই, তখন আপনার থাকে ডিশ এন্টেনা অথবা কেবল সংযোগ। ইউরোপ আমেরিকায় নিশ্চয়ই অসংখ্য চ্যানেল, তার কোনোটাতে গান, কোনোটাতে নাচ, কোনোটাতে খাওয়া, কোনোটাতে শোওয়া। আমাদের ঢাকা শহরে অতোকিছু পাওয়া যাবে না, তবে যা পাওয়া যাবে তাই বা কম কী !

অতএব নাও কেব্‌ল লাইন। ডিশ নেওয়ার সামর্থ্য নেই, নাইবা থাকলো। বরং যারা আগেভাবে ডিশ নিয়ে ফেলেছে, তারাই এখন পস্তাচ্ছে—অতোগুলো টাকা! এখন তো মাত্র দুহাজার টাকা নগদ দিলেই ডিশের কানেকশন! মাসে কিছু চাঁদা দিলেই হলো! পাড়ার ভিডিও দোকানগুলো তাদের পড়ো পড়ো বাণিজ্য চাঙা করে ফেললো এই ডিশ-এর লাইন বেচে। সুতরাং আর বিলম্ব নয়। ফেলো টাকা, লাগাও কেব্‌ল। লেগে গেলো। হা-হা-হা-হা। গোলাম হাজির। হুকুম করুন মালিক। মালিকের হাতে রিমোট। বোতাম টিপলেই হলো। এই যে ভাই দেখেন, কোনো ঝামেলা নেই। এই টিপলাম চ্যানেল টু, এটা জিটিভি। চ্যানেল থ্রি, এমটিভি। এটা মেট্রো, এটা স্টার প্লাস, এটা প্রাইম স্পোর্টস, এটা পিটিভি। কী দেখবেন, বলেন।

আর এই হচ্ছে বিটিভি। চ্যানেল টিপলেই দেখা গেলো একজন দাঁড়িয়ে পল্লীগীতি গাইছে। খুবই সিরিয়াস ভঙ্গিতে। পা ফাঁক করা। ডান হাতটা ওঠানামা করছে। রোবট নাকি ? সঙ্গে সঙ্গে এমটিভি। দ্রিমি দ্রিমি দ্রাক দ্রাক। কিসে আর কিসে ? বুঝলেন আপা, আমার ছেলে তো বিটিভির অ্যাড না দেখলে খেতে চায় না। আমারটা আবার আপা বিটিভি দেখে না। ওর পছন্দ এমটিভি। দেখেন, দেখেন, বাবু কাঁদছে। এই দিলাম এমটিভি, দেখেন চুপ হয়ে গেলো। অতোটুকুন বাচ্চা। এখনি কী পাকা দেখলেন। মায়ের মুখে বিজয়ীর হাসি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এসবই হচ্ছে আজকাল ঢাকার মধ্যবিত্তের ঘরে ঘরে। সবচেয়ে প্রিয় জিটিভি। জনসভায় ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কড়া বক্তৃতা। এতো গরম বক্তৃতা যে, নেতা ঘেমে একাকার। ঘরে ঢুকেই দিলটা ঠাণ্ডা করা চাই। ছাড়ো জিটিভি। গানে আনজানে। মুক্তিআসন্ন ভারতীয় ছবির গান। গোবিন্দর সঙ্গে নাচছে কারিশমা কাপুর। দিলঠাণ্ডা নাচ। ভাগ্যিস গায়ে কাপড়চোপড় আছে। না হলে তো প্রেগনেন্ট হয়ে যেতো। সুবিমল মিশ্রের ভাষায়— এরচেয়ে ঢুকিয়ে দেয় না কেন ? বাবা-মা-ভাই-বোন পরিচারিকা মিলে অবলীলায় এই দৃশ্য দেখছে। মা, দেখেছো, মাধুরি হেয়ার স্টাইল চেঞ্জ করেছে। যা ফানি লাগছে। হি-হি-হি-। সবকিছুই ফানি। যে যেভাবে নিতে পারে।

পত্রপত্রিকাগুলো পিছিয়ে নেই। সবগুলো দেনিক জিটিভি-এমটিভি-স্টার প্লাসের প্রোগ্রাম ছাপছে। এদিকে ঘরে ঘরে শুরু হয়েছে এক নতুন লড়াই, কর্তৃত্বের লড়াই। বাংলাদেশে যেমন সরকার যার, টেলিভিশন তার বাবার, ঘরেও তেমনি—রিমোট যার টিভিস্ক্রিন তার। ছোটভাই দেখতে চায় প্রাইম স্পোর্টস ক্রিকেট দেখাচ্ছে। বোন দেখতে চায় জিটিভি, তেলেগু ফিল্ম চলছে। মা দেখতে চান বাংলাদেশ টেলিভিশন— ধারাবাহিক নাটকটা গতপক্ষে শুরু হয়েছে, প্রথম পর্বটা তার দেখা। রিমোট এখন বড়োভাইয়ের হাতে। বড়োভাইয়ের মেজাজটা একেবারে চড়া— যাকে বলে মিলিটারি মেজাজ। সুতরাং ক্ষমতা তো তিনিই প্রয়োগ করবেন। এ বাসায় গণতন্ত্রের কোনো স্থান নেই। পাশের বাসায় আছে। ওরা একটা সাপ্তাহিক তালিকা বানিয়েছে। বৃহস্পতিবার রাত নটায় বিটিভি। সোমবার রাত সাড়ে সাতটায় জিটিভি—গানে আনজানে। মঙ্গলবার...। ওরা ওই রুটিন তৈরি করছে সবাই মিলে বসে। অনেকটা তিন জোটের রূপরেখার মতো।

এ বাসায় এসব চলবে না। বড়োভাইয়া যা রাগী, কিছু বললে আস্ত টিভিটাই তিনতলা থেকে ফেলে দেবে। কেউ কোনো কথা বলছে না। বড়োভাই রিমোট ধরে আছেন। এমটিভি দিলেন। বিজ্ঞাপন চলছে। একটা বিজ্ঞাপনের অর্ধেকটা দেখলেন। নাহ্, বিজ্ঞাপন দেখবো কেন ? দাও জিটিভি। দিলেন। ফিল্ম হচ্ছে। প্রথম থেকে দেখতে হতো। আবার বদলালেন। এবার প্রাইম স্পোর্টস। ক্রিকেট দেখাচ্ছে। তেণ্ডুলকার ব্যাট করছে। ছোটভাই দম বন্ধ করে দেখছে। আবার বদল।

এবার স্টার প্লাস। ছোটটা ফুঁসছে, কিন্তু কিছু বলতে পারছে না। মা উঠে বললেন, যাই, রান্নাঘরটা ঘুরে আসি। ড্রয়িংরুমে এই রাজনীতি চলছে। বড়োভাই নির্বিকার। তিনি আবার চ্যানেল বদল করলেন। উত্তেজনা বাড়ছে।

এসবই 'প্রথম প্রথম'। একসময় এ উত্তেজনাও থিতিয়ে আসবে। ততোদিন এসে যাবে নতুন কোনো উত্তেজনা, হয়তো তখন সরাসরি দেখা যাবে ম্যাডোনার ইরোটিকা। আপাতত জিটিভি-এমটিভি নিয়েই মত্ত সবাই। তাতে লাভ হয়েছে নাজমুল হুদা ব্যারিস্টারের, বিটিভির স্বায়ত্তশাসনের দাবি লোকে আর মুখেই আনছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ইবলিশনামা

এক.

'বগুড়ায় সত্য উদঘাটিত হয়েছে। সকল প্রচারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে এবং আলেম সমাজকে হেয় প্রতিপন্ন করার সকল অপচেষ্টা বানচাল হয়ে গেছে। বগুড়ার মতো করে কুপ্রচারণার মাধ্যমে এমনিভাবেই আলেমদের হেয় করার অপচেষ্টা চলে। জানা গেছে, ইবলিশ শয়তান এখন তার সন্ত্রাসী দালালদের নতুন করে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে, তাদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করছে এবং সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে।'

বগুড়ায় একটি সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের জাল বোনা হচ্ছে,
ইনকিলাব রিপোর্ট,
দৈনিক ইনকিলাব, ১৭ এপ্রিল, ১৯৯৪ ইং।

দুই.

ইবলিশ শয়তান ইদানীং বেশ মুটিয়ে গেছেন। শরীরে মেদ জমে যাচ্ছে। শয়তান, অবাক হয়ে মাঝেমধ্যে তাকিয়ে থাকেন নিজের শরীরের দিকে; আগুনের তৈরি শরীর, কিন্তু মেদ জমছে কীভাবে। আল্লাহর কুদরত, বোঝা বড়ো ভার!

তবে মেদ জমার কারণটা ইবলিশের অজানা নয়। ইদানীং তার কাজকর্ম কমে গেছে। বাড়তি খাটাখাটুনি নেই। শয়তানী আজকাল তাকে আর তেমন করতে হয় না। মানুষেরাই যা শয়তান।

তাছাড়া টেকনোলজি আধুনিক হয়েছে। আগে ইবলিশ আর তার চ্যালা-চামুণ্ডাদের দুনিয়ার আনাচে-কানাচে ঘুরতে হতো, মানুষের রক্তের ভেতের প্রবেশ করে কুপ্ররোচণা জোগাতে হতো। ইদানীং আর অতোটা পরিশ্রম করতে হয় না। শারীরিকভাবে উপস্থিতি হতে হয় না এখানে-সেখানে। কাজটা সহজ করেছে টেলিভিশন।

ধরা যাক; বিল ক্লিনটন টিভিতে একটা বক্তৃতা দেবে। ওই সময় ক্লিনটনের শরীরে সওয়ার হলেই হলো! সারা দুনিয়ার ঘরে ঘরে সহজেই পৌছানো যায়। শয়তানের শরীর আগুনের তৈরি। আগুন মানে তাপ এবং আলো। অর্থাৎ ইলেক্ট্রন, প্রোটন, অর্থাৎ শয়তানীর কোয়ান্টাম মেথড। এই মেথডটা অবশ্য ইবলিশের নিজের আবিষ্কার নয়। তার এক চ্যালার আবিষ্কার। চ্যালাটা বেশ শিক্ষিত। বোস্টন ইউনিভার্সিটির এক ছাত্রের মস্তিষ্কের কোষে লেপ্টে থেকে পিএইচডি করেছে পদার্থবিজ্ঞানে। ডক্টরেট শয়তান। শাবাশ! এ-নিয়ে অবশ্য ইবলিশ শয়তানের একটু হীনমন্যতাবোধও আছে। নিজের সাগরেদরা সবাই এমএ-বিএ পাস করছে, তিনি আজো তেমনি অকাটমূর্খ থেকে গেলেন। তাতে অবশ্য তেমন কিছু আসে যায় না। ইবলিশ জন্মেছেনই এক অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে। যে-কোনো কারো রক্তের ফোঁটায় ফোঁটায় তিনি প্রবাহিত হতে পারেন। একই সঙ্গে হাজার মানুষের দেহে ঢুকে যেতে পারেন। আল্লাহতালা তাকে এই ক্ষমতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দান করেছেন। আগে তো আর তিনি শয়তান ছিলেন না। ছিলেন পরহেজগার ফেরেশতা। ফেরেশতা হয়ে মাটির মানুষকে সেজদা করতে তার রুচিতে বাধলো। প্রেস্টিজের ব্যাপার। স্বর্গ ত্যাগ করা চলে, কিন্তু প্রেস্টিজ পাংচার হতে দেয়া যায় না। তিনি আদমকে সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানালেন। আল্লাহতালা তার বেয়াদবি বরদাশত করলেন না। হাজার হোক, আদম তার অতি পেয়ারের বান্দা। তিনি ইবলিশকে শয়তান বানিয়ে দিলেন। কিন্তু ক্ষমতাহীন শয়তান নয়, অতি ক্ষমতাধর। ইবলিশই এই বর চেয়ে নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, হে আল্লাহ, আপনি আপনার স্বর্গ থেকে আমাকে বঞ্চিত করেছেন, কিন্তু একটি বর আমি আপনার কাছে চাই। আমি মানুষের রক্তে রক্তে শিরায় শিরায় পৌছবার ক্ষমতা চাই। আল্লাহতালা দয়াময়। তিনি এই আর্জি মঞ্জুর করলেন।

গোড়ারদিকে মানুষের সংখ্যা ছিল কম। কাজেই সকলের রক্তের কণায় কণায় ইবলিশ পৌছতে পারতেন। তেমন অসুবিধা হতো না। পরে মানুষ যখন বেড়ে গেলো, তখন ঠিক করলেন এজেন্ট নিয়োগ করবেন। আল্লাহতালা তার এই কর্মেও বাধা দিলেন না।

মহা উৎসাহে ইবলিশ লোকাল এজেন্ট নিয়োগ শুরু করলেন। মানুষের জন্মহার যে-হারে বেড়ে যেতে লাগলো, তাতে লোকাল এজেন্টেও কুলালো না। তখন শুরু হলো শয়তানির কোয়ান্টাম মেথড।

তবে ইদানীং শয়তানের উপরেও কেউ কেউ শয়তানি শুরু করেছে। একশ্রেণীর জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ কোয়ান্টাম মেথড নিয়ে মানুষের ভাগ্যের বদল ঘটাচ্ছে। ভাগ্যবদল হচ্ছে আসলে নিজেদের। মানুষ এই হারে শয়তান হয়ে উঠলে ইবলিশ অচিরেই বেকার হয়ে যাবেন। যা-তা অবস্থা। ইবলিশের শরীরে যে মেদের সঞ্চার হয়েছে তার কারণ এখানেই নিহিত।

ইবলিশ শুয়ে ছিলেন একটা রেলওয়ে ইঞ্জিনের বয়লারে। কয়লার ইঞ্জিন। গম গম করে কয়লা পুড়ছে। লালে লাল। ইবশিল তার উপর শরীর বিছিয়ে শুয়ে আছেন। আগুনের শরীরে লাগছে আগুন। বড় আরাম। দুনিয়ার এতো আরাম ছেড়ে কেইবা স্বর্গে যেতে চায়। আরামে শয়তান সম্রাটের ঘুম এসে গেলো। টু-টু-টু-টু। পেজারে কল আসছে। জরুরি বার্তা। ইবলিশ বিরক্তিবোধ করলেন। এই আরামের মুহূর্তে আবার কোথায় কী ঘটলো ?

তিনি পাশ ফিরে বললেন, কী ব্যাপার, এখানে চলে এসো। আমি এখন উঠতে পারবো না।

তার এক চ্যালা হন্তদন্ত হয়ে বয়লারের ভেতরে ঢুকে পড়লো। সর্বনাশ হয়ে গেছে স্যার। ইবলিশ বিরক্তিবোধ করলেন। শয়তানের আবার সর্বনাশ কী ? সর্বনাশ হয় পরহেজগারের।

কী হয়েছে তাই বলো।

আমাদের গোপন তথ্যাদি সব ফাঁস হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কী যা-তা বলছো ? আমাদের কোনো তথ্য ফাঁস হতে পারে না। ডকুমেন্ট রেখে আমরা কোনো পরিকল্পনা করি না।

কিন্তু স্যার, ফাঁস হয়ে গেছে।

তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। খুবই দুঃখজনক। এই প্রথম কোনো শয়তানের মাথা খারাপ হলো।

স্যার, আপনি একটু বাইরে আসেন। আপনাকে দেখাই। দেখলেই আপনি বুঝবেন।

এখানেই দেখাও।

এখানে স্যার দেখানো যাবে না। আগুনে পুড়ে যাবে। একটা কাগজ স্যার।

খুবই বিরক্তভাবে ইবলিশ বেরিয়ে এলেন। তার চ্যালাটি তার হাতে একটি দৈনিক পত্রিকা ধরিয়ে দিল। দৈনিক ইনকিলাব। তিনি খবরটি পাঠ করলেন :

> 'জানা গেছে, ইবলিশ শয়তান এখন তার সন্ত্রাসী দালালদের নতুন করে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে, তাদের সংঘবদ্ধ করার চেষ্টা করছে।'

ইবলিশের হাত কাঁপতে লাগলো। স-র্ব-না-শ। এই নিউজ ফাঁস হলো কী করে ? রিপোর্টটি লিখেছেন ইনকিলাবের জনৈক রিপোর্টার। নাম গোপন রাখা হয়েছে।

তিনি তাড়াতাড়ি ইনকিলাবে ফোন করলেন।

ভাইজান, আপনারা যে লিখেছেন, জানা গেছে, ইবলিশ শয়তান সন্ত্রাসী দালালদের কুপ্ররোচণা দিচ্ছে, এই রিপোর্টটি খুব ভালো হয়েছে। ভাইজান, এটা জানলেন কীভাবে ?

নিউজের সোর্স মানে সংবাদের উৎস প্রকাশ করতে আমরা বাধ্য নই।

ওপ.শ থেকে টেলিফোন রেখে দেয়া হলো।

ইবলিশ হতভম্ব। তিনি কী করছেন, না করছেন, বেটারা জানতে পারলে কীভাবে?

ইবলিশ নিজে ঘটনার তদন্তভার হাতে তুলে নিলেন। ইনকিলাবের সাংবাদিকদের রক্তের কণায় কণায় নিজেকে সঞ্চারিত করলেন। সবার মনের কথা পাঠ করলেন। সব পাঠ করে তার মাথা হেট হয়ে গেলো। লজ্জায় তার মাথা কাটা যেতে লাগলো। তার চোখ বেয়ে দরদর করে পানি বেরুতে লাগলো। তিনি দু-হাত তুললেন খোদার দরবারে। ইয়া পরওয়ার দিগার, তুমি আমাকে শয়তানদের সম্রাট বানিয়েছিলে। আমাকে শক্তি দিয়েছিলে সবমানুষের রক্তে রক্তে পৌছার। আমিই সেরা শয়তান, এই গর্বে আমি ছিলাম অস্থির। কিন্তু আজ দেখতে পাচ্ছি আমার চেয়েও বড় শয়তান আছে। আমি মানুষের মনের গহীনে প্রবেশ করার ক্ষমতা রাখি, কিন্তু ইনকিলাব ভবনে তুমি এমন একজনকে বসিয়েছো, যে আমার মনের গোপন খবরটি পাঠ করতে জানে। তুমি আমার গর্ব চূর্ণ করেছো। আমার চেয়েও বড় শয়তান তুমি মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেছো।

এই ফরিয়াদটি ইবলিশ করলেন একাকী নিভৃত গোপন জায়গায়। কিন্তু 'গাই মাওলানা' সেটি জেনে ফেললেন নিজের চেম্বারে বসেই। অপূর্ব শয়তানি হাসিতে তার মুখ ভরে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'যৈবতী কন্যার মন'

এক.

'গণকের কথায় বিশ্বাস করে প্রেমকাতর এক যুবক এখন জেলহাজতে। ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় তামিলনাড়ুর বাইশ বছরের যুবক গঙ্গাধরনকে এক জ্যোতিষী বলেছিল যে, ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর কন্যা প্রিয়াংকার বয়স কুড়ি পেরুলে সে তার স্ত্রী হবে। আর এই ভবিষ্যদ্বাণী বিশ্বাস করে নিরক্ষর ওই গ্রাম্য যুবক পাঁচ হাজার মাইল পথ পাড়ি দিয়ে প্রিয়াংকাকে প্রেমনিবেদনের জন্যে নয়াদিল্লিতে গান্ধী পবিবারের বাসভবনের সামনে ঘোরাফেরার সময় ২৮ এপিল ১৯৯৪ পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।' এএফপি। প্রিয়াংকা প্রেমীর মন্দ কপাল, *ভোরের কাগজ, ১ মে, ১৯৯৪।*

দুই.

ভোরবেলায় প্রিয়াংকার ঘুম ভেঙে যায়। খুব মিষ্টি একটা স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি। বেড়াতে গেছেন এক মনোহর জায়গায়। সবুজ পাহাড় ঘেঁষে সমুদ্র। সমুদ্রের শাদা ফেনা আছড়ে পড়ছে সবুজ পাহাড়ের পায়ে। দূরে সমুদ্রের বেলাভূমিতে দাঁড়িয়ে পা ভেজাতে ভেজাতে তিনি দেখছেন সেই দৃশ্য।

পৃথিবীটা এতো সুন্দর!

মুগ্ধতায় প্রিয়াংকার চোখে জল এসে যায়। ঠাণ্ডা বাতাসে তার চুল ওড়ে, তার পরনের কাপড় লেপ্টে থাকে শরীরের সঙ্গে, বাতাসের বিপরীতে। তার কী যে হয়! দূর দিগন্ত থেকে কে যেন তাকে ডাকে, প্রিয়া...। চোখের জল মুছে তিনি সেদিকে তাকান।

তার শরীর কেঁপে ওঠে।

এবার শব্দ আসে পাহাড়ের ওপার থেকে। প্রিয়...

তার হৃৎপিণ্ড কাঁপতে থাকে।

প্রিয়াংকার ঘুম ভেঙে যায়।

তিনি পড়ে থাকেন বিছানায়। তার শুয়ে থাকতে ভালোলাগে। তার একা থাকতে ভালোলাগে। একা একা আপন মনে ভাবতে ভালোলাগে। তার স্বপ্ন দেখতে ভালোলাগে। স্বপ্নের ওপার থেকে কে তাকে ডাকে?

কী মেঘমন্দ্র স্বর!

পাহাড়ের গায়ে বাজে তার প্রতিধ্বনি— প্রি-য়া।

ব্রেকফাস্টের টেবিলে তিনি আজ বসেন, সবার শেষে, একা। পত্রপত্রিকা পড়তে তার ভালোলাগে না, কিন্তু আজ কী মনে করে তিনি দৈনিক পত্রিকা হাতে তুলে নেন।

সংবাদটিতে তার চোখ আটকে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তার প্রেমে পড়ে এক যুবক পাড়ি দিয়েছে পাঁচ হাজার মাইল। গঙ্গাধরন নামের তামিল এই যুবক বিশ্বাস করেছে জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী। জ্যোতিষী বলেছে—প্রিয়াংকার বয়স কুড়ি হলে সে স্ত্রী হবে গঙ্গাধরনের।

প্রিয়াংকার গলায় খাবার আটকে যায়।

যা জ্যোতিষীর কথা সত্যি হয়ে যায়। সব জ্যোতিষী নিশ্চয়ই ভুয়া নয়। যদি এমন হয়, এই জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ গণনা নির্ভুল। গল্পে পুরাণে এমন তো কতোই হয়। রাখালের সঙ্গে বিয়ে হয় রাজকুমারীর! অবশ্য সেসব গল্পের শেষে আবিষ্কৃত হয়, এই রাখাল আসলে সত্যিকারের রাখাল নয়। ভাগ্যদোষে হারিয়ে যাওয়া রাজকুমার। যদি এমন হয় যে, গঙ্গাধরন সে-রকম কিছু!

কী এক বিচিত্র অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন প্রিয়াংকা।

প্রাতঃরাশের টেবিল ছেড়ে তিনি চলে আসেন তার একাকী নিজস্ব ঘরটিতে!

তার দুচোখ জুড়ে কান্না। তার শরীর উথলে ওঠে কান্নার দমকে।

গঙ্গাধরনের কথা তিনি ভাবতে বসেন গঙ্গাধরন হয়ে।

রোদজর্জর বৃষ্টিথরথর শীতকাতর একটি গ্রাম। তার পথে পথে ধুলো, মাঠে মাঠে কৃষকের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের ফসল আর গাছগাছালির নিচে মানুষের সাধ্যমতো ঘরবাড়ি। ঘর না বলে পূর্ণকুটির বলাই সঙ্গত। সেইসব ঘরে বছরের পর বছর, জীবনের পর জীবন পার করছে সহজসরল খেটে-খাওয়া মানুষেরা।

এমনি এক পূর্ণকুটিরে বেড়ে উঠেছে গঙ্গাধরন। জন্মের পর তার মুখ দেখে এক সন্ন্যাসী বলেছিল—এযে রাজকপাল। এ ছেলের কপালে রয়েছে রাজকন্যে।

সেই ছেলে ধীরে ধীরে বড়ো হয়েছে। সন্ন্যাসীর সে-কথাও সবাই ভুলে গেছে। কিন্তু তার মা ভোলেননি। ছেলেকে সবসময় রেখেছেন চোখে চোখে, আদরে আদরে। পাখির মা যেমন ছানাকে আগলে রাখেন ডানার নিচে, তেমনি যত্নে। স্নেহের ছায়ায়।

ছেলের মধ্যে পাগলামির কোনো লক্ষণ তিনি দেখেননি।

একদিন গ্রামে এলো এক জ্যোতিষী। সবার অদৃষ্ট সে বলে দিতে পারে, হাত দেখেই। গঙ্গাধরনের শখ হলো সেও হাত দেখায়। কিন্তু জ্যোতিষী বিনামূল্যে হাত দেখেন না। ভাগ্যগণনার জন্যে তাকে দিতে হয় তিনকেজি চাল আর একটাকা ছয়আনা। এতো টাকা সে কোথায় পাবে!

গঙ্গাধরন ধরলো তার মাকে।

মা, দিতেই হাবে। তিন রাত আর হাঁড়ি উঠবে না চুলোয়—এ-কথা জেনেও মা তিনকেজি চাল তুলে দিলেন গঙ্গাধরনের হাতে।

গঙ্গাধরন আগেই জোগাড় করেছে একটাকা ছয়আনা।

সে চললো জ্যোতিষীর কাছে।

হাত দেখে চমকে উঠলেন জ্যোতিষী। এ-যে রাজকপাল। এর ভাগ্যে যে-লেখা রাজকুমারী!

অনেক হিসেব কষে জ্যোতিষী হাসিমুখে বললেন, গঙ্গাধরন, তুমি রাজ-জামাতা হবে। প্রিয়াংকা হবে তোমার স্ত্রী। প্রিয়াংকার বয়স শুধু কুড়িতে পড়লেই হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রিয়াংকা। কী সুন্দর নাম। প্রিয়াংকার একটা ছবি গঙ্গাধরন একবার দেখেছিল খবরের কাগজে, তার মনে পড়ে। কী সুন্দর মুখ। ভরাট। মেদহীন। এ না হলে রাজকন্যে!

দিন পাল্টে গেলো গঙ্গাধরনের।

শয়নে-স্বপনে-জাগরণে-নিদ্রায় গঙ্গার তখন এক চিন্তা, প্রিয়াংকা।

পৃথিবীর কোনো পুরুষ কি পৃথিবীর কোনো নারীকে এরচেয়ে বেশি ভালোবেসেছিল ? গঙ্গা তার পূর্ণকুটিরের ভেতরটা ভরিয়ে তুললো প্রিয়াংকার ছবি দিয়ে। অজপাড়াগাঁ। সেখানে কি আর প্রিয়াংকার ছবি মেলে এতো সহজেই ? অতিকষ্টে পত্রিকা জোগাড় করে সযত্নে পাতা ছিঁড়ে সে টাঙিয়ে রাখে। ছোট্ট একটা রঙিন ছবি সে একটা পলিথিনের প্যাকেটে পুরে সবসময় রাখে বুক পকেটে। বুকের মধ্যে শব্দ হয় ধুকধুক। সেই শব্দ মিশে যায় প্রিয়ার ছবির সঙ্গে। গঙ্গাধরন গেয়ে ওঠে হিন্দি সিনেমার গান—তু মেরা জান হ্যায় তু মেরা জীবন হায়।

প্রিয়াংকার জন্মদিনক্ষণ সব মুখস্থ গঙ্গার। পাড়ায় বেরুলেই লোকে চিৎকার করে—ওই রে ইন্দিরা মাজীর নাত-জামাই যায়। গঙ্গা হাসে। আর কটাদিন। এই তো আমার প্রিয়া কুড়িতে পড়লো বলে। কুড়ি বয়সে পা দিলেই সে যাবে নয়াদিল্লি, যেখানে তারই জন্যে অপেক্ষা করছে তার প্রিয়তমা।

প্রিয়াংকার বয়স যখন কুড়িতে পড়ে, তখন অধীর হয়ে পড়ে গঙ্গা। প্রিয়া, আমি আর পারছি না। তোমাকে না দেখলে আমি বাঁচবো কী করে। সবকিছু মনে হচ্ছে বড়ো অর্থহীন। আজ থেকে তুমি যে আমার।

প্রিয়ার সামনে গিয়ে না দাঁড়ালে সে কী করে বুঝবে, আমিই তার সেই কাঙ্ক্ষিত পুরুষ, কুড়িটি বছর যে-পুরুষের জন্যে প্রিয়া প্রেম-ভালোবাসা মমতায় ধরে রেখেছে, গড়ে তুলেছে তার দেহমন।

আমি যবো দিল্লিতে।

অস্থির হয়ে ওঠে গঙ্গা

লোকে বলে, দিল্লি দূর অস্ত। হোক। কতো আর। পাঁচ হাজার মাইল। কী আর এমন। গঙ্গা তৈরি হয়।

মায়ের টিনের বাক্স থেকে সে চুরি করে দুই কুড়ি রুপি আর একখানি রূপার নথ। বছরখানিক ধরে তিলে তিলে পরিশ্রম করে সে জমিয়েছে একশ কুড়ি রুপি, তাতো আছেই।

রওনা হয় সে।

মাইলের পর মাইল হাঁটে। পৌঁছে গঞ্জের হাটে। সেখান থেকে আরো কুড়ি মাইল হাঁটলে রেলস্টেশন। একে-ওকে জিজ্ঞাসা করে সে স্টেশনে পৌঁছায়। সরাসরি ট্রেন নেই নয়াদিল্লিতে যাবার। পাঁচ হাজার মাইল চাট্টিখানি কথা নয়। কতো রাত স্টেশনের প্লাটফরমে না খেয়ে কাটিয়ে দেয় সে। অচিরেই তার পকেটের টাকা ফুরিয়ে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কোনো স্টেশনে এসে চেকার তাকে নামিয়ে দেয় টিকেট না থাকায়। অনেক দীর্ঘ অচেনা প্রতিকূল পথ পেরিয়ে নয়াদিল্লিতে যখন সে পা রাখে, তখন তার পেটে প্রচণ্ড খিদে। গত তিনদিন সে শুধু জল খেয়ে আছে। পা আর চলে না। চোখ কোটরের মধ্যে, বাইরে থেকে দেখা যায় না। মাথার চুল উস্কো-খুশকো। কাপড় ময়লা চিটচিটে। কিন্তু তার কোনোদিকে খেয়াল নেই। তার লক্ষ্য একটাই। প্রিয়াংকার সামনে একবার দাঁড়াতে পারলেই হলো। একবার চোখে চোখ রাখতে পারলেই হলো। প্রিয়া নিশ্চয়ই চিনতে পারবে তাকে। চিনবে তার স্বপ্নে-দেখা রাখাল কুমারকে। এ-লোক সে-লোককে জিজ্ঞাসা করে গঙ্গা ঠিকই হাজির হয় গান্ধী পরিবারের বাসভবনের সামনে। ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে সে। একপাও নড়া চলবে না। কে জানে কখন দেখা দেবে তার স্বপ্নের দেবী!

এভাবে কতোক্ষণ কে জানে। তার হুঁশ হয় তখন, যখন তার হাতে হাতকড়া পড়ে।

প্রিয়াংকা আর ভাবতে পারেন না। তার দুচোখ ভেসে যায় জলে। তার মনে হয়, যাই, একবার গঙ্গাধরনকে দেখা দিয়ে আসি। গিয়ে বলি, ভাই, তুমি ফিরে যাও, যা হবার নয়, তার পেছনে তুমি ছুটো না। ওই জ্যোতিষী তোমাকে ঠকিয়েছে। আমি কেন তোমাকে বিয়ে করতে যাবো ? এসো আমার সঙ্গে এসো। কী হাল করেছো চেহারার। প্রিয়াংকার ইচ্ছে হয় গঙ্গাধরনকে বাসায় ডেকে এনে খাওয়ান। তারপর ট্রেনের টিকেট কেটে তুলে দেন তার হাতে। কিন্তু এসব কিছুই করা হয় না। জীবনটা তো হিন্দি ফিল্মে নয়।

হিন্দি ফিল্ম হলেও এখনটা সম্ভব হতো না। দর্শকের বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করা যেতো না।

কাঁদতে কাঁদতে প্রিয়াংকা ঘুমিয়ে পড়েন। অসময়ের ঘুম। স্বপ্ন এসে ভর করে তার দুচোখে। ভারি উদ্ভট স্বপ্ন।

প্রথমে আসে রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড। বলে, প্রিয়াংকা তুমি যাও গঙ্গাধরনের কাছে। তার সঙ্গে শূন্যহাতে এক বস্ত্রে যাও তামিলনাড়ুর গ্রামে। কেবল তাহলেই তুমি বাঁচবে। আততায়ীর বুলেট থেকে। দেখো না, আমি লেডি সিম্পসনের জন্যে সিংহাসন ত্যাগ করেছি। এরপর আসেন হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। দেখো, প্রেমের জন্যে আমি কী করিনি ? কতো কলঙ্ক রটেছে, এসবে কি আমি দমেছি কখনো ?

তারপর আসেন আরেকজন। দেখো, আমি বলেছি, আমার মন্ত্রিত্ব যদি ম্যাডাম কেড়ে নিতে চান, তিনি নিতে পারেন। আমার কোনো আপত্তি নেই। ম্যাডামের কথা আমার কাছে অলঙ্ঘনীয়। কিন্তু আমি ওই মহিলাকে ভালোবাসি। আমি তাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছি। সত্য বটে, আমার প্রথম স্ত্রীকেও আমি খুবই ভালোবাসি। বড়ো বড়ো প্রেমের কাহিনীগুলো সবসময়ই পরকীয়া হয়। যাহোক, আমি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দেবো, তবু আমার ভালোবাসাকে অপমানিত হতে দেবো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আপনি কে ? আপনাকে তো চিনলাম না। প্রিয়াংকা জানতে চান।

আমার নাম আকবর। বাংলাদেশের মন্ত্রী আকবর...

পরিচারিকার ডাকে প্রিয়াংকার ঘুম ভেঙে যায়। মুঘল সম্রাট আকবর কেন বাংলাদেশের মন্ত্রী হতে যাবে, প্রিয়াংকা বুঝতে পারেন না।

তার মনমেজাজ আসলেই ভালো নেই। কেউ তা বোঝেন না।

কুড়ি বছরের এক কুমারী নারীর মতিগতি কেই বা বুঝতে পারে।

টেম্পো ভ্রমণ

টেম্পো। ইংরেজিতে এমন একটা শব্দ আছে বটে, যার মানে 'লয়' 'তাল'। বাঙলায় সেটা হয়ে গেছে এক অপরিহার্য যানবাহন। টেম্পো। আমাদের নাগরিক সভ্যতার অঙ্গ। উৎপত্তিস্থল ধোলাইখাল। প্রথমে একেকটি টেম্পো দেখতে ছিল হেলিকপ্টারের মতো। ব্যতিক্রম শুধু হেলিকপ্টরের তিন নম্বর চাকাটা থাকে পেছনে, টেম্পোরটা সামনে। তারপর দিনে দিনে প্রযুক্তির ক্রমোন্নয়ন। এখন টেম্পো জিনিসটা বেশ চলনসই আকার নিয়েছে।

ভিতরে তিনটি বেঞ্চি। তিন-চারে ১২টা সিট। ১২ জন বসিবে। সামনে ড্রাইবারের সিটে দু'পাশে দুজন। মোট ১৪ জন। ঢাকার ট্রাফিক পুলিশ নতুন নিয়ম করেছে। ড্রাইভারের পাশে কেউ বসতে পারবে না। এতে সড়ক দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকে। অন্যথায় ৫০০ টাকা জরিমানা। এখন পথে চলতে গিয়ে দেখবেন, ড্রাইভারের দু-পাশে কোনো মানুষ নেই। তার বদলে বসে আছেন ট্রাফিক পুলিশ সাহেব। তিনি একস্থান থেকে অন্যস্থানে যাবেন ডিউটিতে বা ডিউটি সেরে। পয়সা খরচ করে যাবেন নাকি ? খুব ভালো নিয়ম হয়েছে। ট্রাফিক পুলিশ সাহেবরা খুব খুশি। টেম্পোর-স্কুটারের চালকের দু-পাশ এখন সর্বদাই খালি পাওয়া যাচ্ছে। উঠে পড়লেই হলো।

আজিমপুর থেকে মিরপুর যাবো। টেম্পোর আশায় দাঁড়িয়ে আছি। বাসে মিনিবাসে ভাড়া কম। কিন্তু ভিড় বেশি। সিট পাওয়ার নিশ্চয়তা নেই। সর্বোপরি সারাটা পথ থামতে থামতে যাবে।

মিরপুর থেকে টেম্পো আসে আজিমপুরে। এসে খালি হয়। মুহূর্তেই ভর্তি হয়ে যায়। তারপর আবার যাত্রা শুরু। আমি দাঁড়িয়ে আছি। একটা টেম্পো এলো। খালি হচ্ছে। তার পেছনে দরকার দু-ধারে লাইন ধরে দাঁড়িয়ে আছে আরোহণ উন্মুখ জনতা। ছোট দরজা। মাথা নিচু করে খানিকটা হাঁটতে হয়। তারপর ছোট্ট লম্ফ। এ হচ্ছে নামার কসরত। নামতে সময় লাগে। ততোক্ষণে আরোহীরা দোরগোড়ায় জ্যাম বাধিয়ে ফেলে। আমি ভাবছি, ভিড় একটু কমুক। আস্তেধীরে উঠবো। আমার কোনো তাড়া নেই।

টেম্পোটা মুহূর্তেই ভরে গেলো। তারপর দিলো ছুট। বুঝলাম, চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স। সারভাইভাল অফ দি ফিটেস্ট। আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লড়তে হবে। এর পরেরটাতে কেউ নামার আগেই সিঁড়িতে পা রাখবো। পরের টেম্পো এসে গেলো। এই এক মজা। থামতেও হবে না, ঘামতেও হবে না। অবিরল ধারা। কোনোই বিরাম নেই। দৌড়ে গেলাম। লোকজন নামছে। সন্তান কোলে এক মহিলা। প্রচণ্ড ভিড় দোরগোড়ায়। এমন সময় আরেকটা টেম্পো এলো। ডাইরেক্ট মিরপুর, ডইরেক্ট মিরপুর। মনে দ্বিধা কাজ করতে শুরু করলো। এটার লাইনে থাকবো, নাকি পরেরটাতে যাবো। স্লো এণ্ড স্টিডি উইনস দ্য রেস। এটাতেই থাকো। মন বলছে। ওদিকে বিবেক গান ধরেছে, সিট খালি, মিরপুর, সিট খালি, মিরপুর। ঝোঁপ বুঝে কোপ মারো। বিবেকের দংশন। কিছুলোক ওই টেম্পো অভিমুখে দৌড় শুরু করে দিয়েছে। আমিই বা দেই না কেন ? ভিড় ঠেলে ওইটার উদ্দেশে দৌড় ধরলাম। পৌছাতে পৌছাতে লালবাতি জ্বলে উঠলো। হাউস ফুল। এজন্যই লোকে বলে দুই নৌকায় পা দিতে নেই। মন শান্ত রাখো।

এবার কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছি। একটাই টার্গেট করবো, সেটাতেই উঠবো। আরেকটা আসছে। পেছনে আরেকটা। পরপর দুটো। পেছনেরটা, মনে মনে জীবনের লক্ষ্য স্থির করলাম।

পেছনেরটা অন্য যাত্রীরা লক্ষ্য করেনি। আমিই সর্বাগ্রে পেছনের হাতল ধরতে সমর্থ হয়েছি। একে একে ১২ জন নেমে পড়লো এবার আমার ওঠার পালা। ভিড়ের উপরে শরীরের ভার ছেড়ে দিলাম। এক ধাক্কায় সোজা ভিতরে। নামতে সুবিধা হবে ভেবে দরজার কাছে সিটে বসলাম। টেম্পোর হেলপার চিৎকার করছে, আগে বাড়েন, আগে বাড়েন। আ মরণ। তুই বাড়। আমার পক্ষে বাড়াবাড়ি করা সম্ভব নয়। এক্সেসিভ এনির্থিং ইজ ব্যাড। হেলপারটা বাইরে থেকে খোঁচা দিচ্ছে। আগেই বসতে হবে। সম্মুখভাগে। কী আর করা। সামনের দিকে গেলাম। ফাঁকা সিটে একাই উপবেশন। দরজার গোড়ায় ভিড়। একসঙ্গে ৬ জন লটকে গেছে। মুহূর্তেই এক ঝাক্কিতে দেখি বসে আছি ঢেঁকির মাথায়। টেম্পোর মাথা উপরে উঠে গেছে। জান দেহের বাইরে। কলিজায় পানি নেই। চোখ বন্ধ কর দু-হাতে দু-পাশের রড ধরে ঝুলে আছি। উর্ধ্বারোহণটা তেমন কষ্টের না। কিন্তু পতনটা খুবই ভয়ঙ্কর হলো। একযোগে লোকগুলো টেম্পোর হাতল ছেড়ে দিলো, সটাং করে মর্ত্যে নেমে এলাম। নিজের ওজন মুহূর্তের জন্য হারিয়ে মনে হলো—এই শেষ।

যাক, মাটিতে ফিরে এসেছি। এবার একজন একজন করে উঠছে। একজন মহিলা উঠলেন। মধ্যত্রিশ বয়েস। চাকরিজীবী হবেন। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ। দরজার পাশ ঘেঁষে দুজন দুই বেঞ্চিতে বসে আছে। তিনি সেই দুজনের দিকে তাকালেন। একজনকে বললেন, ভাই একটু সরে বসুন। আমি এখানটায় বসবো। ভদ্রলোক কোনো কথা না বলে সরে বসলেন। তাকে মনে হলো তিনি সম্মানিত বোধ করছেন। ভদ্রমহিলা প্রথমে নিজের ভ্যানিটি ব্যাগটি রাখলেন। তারপর বসলেন নিজে। মধ্যখানে ব্যাগটি পরদা রক্ষা করে চলেছে। চারজনের সিট। তিনজনেই ভরে গেছে। একজন লোক মোটামতো। আরেকজন উঠলো। তার বসার জায়গা দরকার। তিনি ক্ষিপ্তকণ্ঠে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বললেন, এই ছোঁড়া, সিট কই ? হেলপার ছেলেটি কম বয়সী। সে বললো, চাইপা বসেন। চারজনের সিট। চাইপা বসেন। ভদ্রমহিলা গজগজ করছেন। আর কতো চাপবো ? হেলপার বললো, ব্যাগ কার ?

একজন বললো, লেডিসের।

: আপা, ব্যাগ তোলেন।

ভদ্রমহিলার মাথায় স্কার্ফ। একটা চুলও দেখা যাচ্ছে না। বড়োই পর্দানশীনা। পরপুরুষের ছোঁয়া লাগলে তার যে কবীরা গুনাহ হবে—সন্দেহ নেই। তিনি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। বোঝা যাচ্ছে, ডেলি প্যাসেঞ্জার।

: হয় ব্যাগ তোলেন, না হইলে সিটভাড়া দেওন লাগবো। চাইর চাইর আট টাকা, বুইঝা দেখেন।

ভদ্রমহিলা বুঝে দেখেছেন। চার টাকা। বাপরে বাপ। অনেক টাকা। কতো টাকা বেতন পান কে জানে। বিপ্লবী বামপন্থী কবি-লেখক প্রতিষ্ঠিত এনজিওতে একজন এমএ পাস মহিলাকর্মী বেতন পান ১৭০০ টাকা। এ মহিলা কতো পান, আল্লাহ জানেন। প্রতি বেলা ৮ টাকা যাতায়াত খরচ দিলে প্রতিমাসে ৫০০ টাকা শুধু এ খাতেই। সম্ভব নয়। ভদ্রমহিলা ব্যাগ কোলে তুলে নিলেন। আল্লাহ নিশ্চয়ই এ অপরাধ ক্ষমা করবেন। অনিচ্ছাকৃত অপরাধ।

টেম্পো ছেড়ে দিয়েছে আধাপোকা তেলের ঝাঁঝ চোখে এসে লাগছে। আমার চোখজ্বালা করতে শুরু করলো। যদি কোনো পরিবেশ-সংস্থা টেম্পোর ধোঁয়া পরীক্ষা করতো— এই যান মনুষ্যনগরীতে চলার পারমিশন পেতো না। বমি বমি লাগছে। চিপার মধ্যে সাইজ হয়ে বসে আছি। পেছনমুখো হয়ে। একটা সুবিধা। রিকশাগুলোর সম্মুখভাগ দেখা যাচ্ছে। মাঝেমধ্যে দেখা দিচ্ছে সুন্দর মুখ, একটা-দুটো। হুড তোলা তরুণ-তরুণী। বিনে পয়সায় বিনোদন।

টেকনিক্যালের মোড়ে এসে টেম্পো অর্ধশূন্য হয়ে পড়লো। আমার বেঞ্চে আমি একা। দুজন তরুণী উঠলো। বেশ দেখতে। আমার পাশেই বসতে হবে। আল্লাহতালা অসীম দয়াময়। ওরা বসলেন। চারজনের সিট। পাশে একজনের পরিমাণ জায়গা খালি। আমি সংকোচে সরে আসছি। আরেকজন উঠে এলো। সুদর্শন তরুণ। আমার আর তরুণীদ্বয়ের মধ্যবর্তী শূন্যস্থান পূরণ করে ফেললো। ফিল ইন দ্যা ব্ল্যাংকস। প্রকৃতি শূন্যতা সহ্য করতে পারে না। আমি আবার বাইরের নগরশোভা দেখায় মনোনিবেশ করলাম।

বিশ্বপেয়ালা পদগোলক প্রতিযোগিতা

অধ্যাপক যখন কবি হন, তখন তাকে কী বলবো ? অধ্যাপকের 'অ' নিয়ে 'কবি'র সঙ্গে যুক্ত করলে দাঁড়ায় অ-কবি। বেশির ভাগ কবি-অধ্যাপক সম্পর্কে আমার এই ধারণা।

কেবল একজন ছাড়া। এই শহরে একজন অধ্যাপক আছেন যিনি অসম্ভব ভালো কবিতা লেখেন। তাঁকে আমি খুব পছন্দ করি। প্রায়ই তাঁর বাসায় যাই। তাঁর গল্প শুনি।

কথক হিসেবেও তিনি খুব ভালো। তাকে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করি তার বাংলাপ্রীতির জন্য। তিনি তাঁর বাক্যে একটিও ইংরেজি শব্দ উচ্চারণ করেন না। এমনকি নিতান্ত বাধ্য না হলে আরবি ফারসি উর্দু শব্দও তিনি ব্যবহার করেন না। ম্যাচ-বাক্স চাইতে হলে বলেন, দিয়াশলাইয়ের বাক্স হবে ? বাথরুম পেলে জিজ্ঞাসা করেন, শৌচাগারটি কোথায় ?

সেদিন তাঁর বাসায় গেছি। নানা প্রসঙ্গে কথা হতে লাগলো। তারপর এলো বিশ্বকাপ প্রসঙ্গে।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর বিশ্বপেয়ালা পদগোলক প্রতিযোগিতার কী খবর? আমি বললাম, সব খবরই তো স্যার আপনিই রাখেন। আপনিই বলুন।

এখন তো দ্বিতীয় পর্ব চলছে। এরপর সিকি চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা। তোমার কী মনে হয় ? ব্রাজিল কি যুক্তরাষ্ট্রকে হারাতে পারবে ?

জি, পারবে। আমার তাই মনে হয়।

তাহলে তো ভালোই।

তবে আমার মনে হচ্ছে রেফারিংয়ের মান খুব খারাপ।

হ্যাঁ, বিচারকরা খুব খারাপ বিচার করছে। রেখামানবেরাও খুব খারাপ রায় দিচ্ছে।

রেখামানব মানে লাইন্সম্যান। আমার বুঝতে একটু সময় লাগলো। তবে আমি মজা পেয়ে গেলাম। এই ভদ্রলোক ফুটবলের প্রতিটি টার্ম বাংলা করছেন। মজার ব্যাপার। তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললাম, দেখেন। বেলজিয়ামকে পেনাল্টি কিক দেয়া হলো না।

হ্যাঁ, ওই দণ্ড-মারটি তাদের পাওনা ছিল।

হ্যাঁ, ওই অফসাইডগুলোও এরা ঠিকভাবে ধরছে না। ইটালি একটি গোল দিয়েছে অফসাইড থেকে।

হ্যাঁ, অপপার্শ্ব ঠিকভাবে ধরা হচ্ছে না। এবার অপপার্শ্ব বিষয়ে নিয়মকানুন বদলানো হয়েছে। ব্যাপারটা ঠিক হয়নি।

তিনি এবার এলেন গোল প্রসঙ্গে। এবার গোল বেশি হচ্ছে। তিনি বললেন : এবার লক্ষ্য বেশি হচ্ছে। এটা ভালো লক্ষণ। রোমারিও বেশ ভালো 'লক্ষ্য' দিচ্ছেন। তবে সেরা লক্ষ্যটি করেছে সৌদিআরব।

স্যার, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, ফ্রি কিক থেকে এবার বেশ গোল হচ্ছে ?

হ্যাঁ মুক্তমার থেকে বেশ 'লক্ষ্য' হচ্ছে।

কর্নার থেকেও হচ্ছে।

কোণা থেকে হচ্ছে। তবে কম।

এবার যে লালকার্ডের ছড়াছড়ি সে-সম্পর্কে কিছু বলুন।

হ্যাঁ, এবার লালপত্র বেশি দেখানো হচ্ছে, হলুদপত্রও দেখানো হচ্ছে বেশি। কিন্তু এতে লাভ কিছু হচ্ছে না। অন্যায় তো কমছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আর সব খেলা দেখতে পাচ্ছেন। লোডশেডিং হচ্ছে না।

আর বলো না। বিদ্যুতের ভারলাঘবের কারণে কাল আমার খেলা দেখাই মাটি হয়েছে। খেলা সবে শুরু হয়েছে। সবে কেন্দ্র হলো। এমন সময় বিদ্যুৎ চলে গেলো।

ম্যারাডোনা প্রসঙ্গে কিছু বলুন।

মারাডোনা মাদকনিরীক্ষায় ধরা পড়েছেন। তিনি মাদক নেবেন, এতে আমার দুঃখ নেই, কিন্তু দুঃখ এই যে, তিনি ধরা পড়ে গেলেন। তবে তিনি ভালো খেলতেন। তিনি শুধু ভলো আঘাতকারী ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন খেলা-নিমার্তা।

আঘাতকারী মনে হয় স্ট্রাইকারের বাংলা। বাপস। এতো বাংলা শুনে মনে হলো মস্ত ভুল হয়ে গেছে। এই অধ্যাপককে এতোদিন স্যার বলে এসেছি। এটা অন্যায়। তাকে বাংলা কোনো সম্বোধনে ডাকা উচিত ছিল।

আমি বললাম, জনাব, মোটের ওপর এবারের বিশ্বকাপের মান নিয়ে আপনি কি আশাবাদী ?

তিনি ক্ষেপে গেলেন। জনাব ? জনাব মানে কী ?

স্যারের বাংলা করলাম জনাব।

জনাব মোটেও বাংলা শব্দ নয়।

তবে কি মহোদয় বলবো ?

তিনি বিরক্তিবোধ করলেন। বললেন, না আমাকে সবসময় 'স্যার, বলেই ডাকবে।

বিশ্বকাপ রঙ্গ–২

বাংলাদেশ ফেনসিডিলসেবী সমিতি এক বিবৃতিতে বলেছে: 'আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ নিয়মিত ফেনসিডিল সেবন করে আসছি এবং ফেনসিডিলের মধ্যে থাকা এফিড্রিন আমাদের শরীরে কোনো ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে পারেনি। অথচ এই এফিড্রিন সেবনের দায়ে বিশ্বকাপ ফুটবল থেকে ম্যারাডোনাকে বহিষ্কার করা হয়েছে, যা কেবল ম্যারাডোনার অপমান নয়, বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ ফেনসিডিলসেবীর ভাবানুভূতি ও আবেগের প্রতি চরম আঘাত। আমরা ফিফার সভাপতি হ্যাভেলাঞ্জের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করছি। যদি কেউ হ্যাভেলাঞ্জের মুণ্ড এনে দিতে পারে, তবে তাকে নগদ পঞ্চাশ হাজার টাকা দেয়া হবে।'

বিবৃতিদাতা এই বিবৃতি রচনার আগে কয় বোতল ফেনসিডিল সেবন করছেন, তা জানা যায়নি।

বাগধারার আধুনিকীকরণ

যুগ পাল্টাচ্ছে। পাল্টাচ্ছে জীবনযাপনের রীতি। কিন্তু বাংলাভাষার বাগধারাগুলো রয়ে গেছে যথাপূর্বং সাবেকি। ফলে আমরা বাগধারা ব্যবহার করছি, সেসবের অর্থ না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বুঝেই। যেমন ধরুন, আমরা বলে থাকি, জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা। আমাদের রাজনীতিবিদরা ছাত্রসমাজের হাতে অস্ত্রতুলে দিয়ে তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। এখন যদি জিজ্ঞাসা করি, ছিনিমিনি শব্দের অর্থ কী ? আমার ধারণা বেশির ভাগ মানুষই এর অর্থ বলতে পারবেন না। এই খেলাটা হচ্ছে পানিতে ঢিল ছোড়ার খেলা। কলসির কোণা, আমাদের গ্রামে যাকে বলে খোলা, পানিতে প্রায় সমান্তরালভাবে ছোড়া হলে ওটা দুই-তিন-চারবার লাফ দিয়ে থাকে। এই খেলাটাই ছিনিমিনি খেলা। আমরা ছোটবেলায় এ খেলা অনেক খেলেছি। কিন্তু আজ ঢাকার কেজি স্কুলে পড়া বালকটিকে এ খেলার মর্ম বোঝানো কঠিন। কাজেই ছিনিমিনি খেলা বাগধারাটি বদলানো দরকার। এর বদলে প্রবর্তিত হতে পারে জীবন নিয়ে টেবিল টেনিস খেলা। পিংপং বলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে জীবনের। এটা এখন আমাদের জীবনে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। জীবন নিয়ে ইয়ো ইয়ো খেলাও চালু করা যেতে পারে। যেমন বলা হয় সোনার পাথরবাটি, কিংবা কাঁঠালের আমসত্ত্ব। আমাদের বর্তমানকালের ছেলেরা পাথরবাটিও চেনে না, আমসত্ত্বও চেনে না। সুতরাং এ বাগধারাটি তাদের জন্য তেমন লাগসই নয়। বরং বলা যেতে পারে গরম কোল্ড ড্রিঙ্কস। গরম কিন্তু কোল্ড। সোনা কিন্তু পাথর। দারুণ।

আমরা প্রায়ই বলি ভীমরতি। অথচ আমরা কি জানি ভীম কবে কার সঙ্গে কোন্ রতিক্রিয়ায় অংশ নিয়েছিলেন ? জানি না। তাহলে বুড়ো বয়সে কারো শরীরে হরমোনের চাঞ্চল্য দেখা দিলে আমরা কী বলবো ? বলা যেতে পারে 'এরশাদ—রতি'।

একটা বাগধারা আছে। সোনায় সোহাগা। সোনায় সোহাগা দেয়া হলে সোনা নাকি উজ্জ্বল হয়। সোহাগা পদার্থটি কী, আমি জানি না। মেয়েরা বা স্বর্ণকাররা জানে হয়তো। কিন্তু আমার মনে হয় এ বাগধারাটি বদলিয়ে করা যেতে পারে ভেজা ঠোটে লিপশাইনার।

'উড়ো খই গোবিন্দয় নাম'। এক ব্রাহ্মণ নাকি যাচ্ছিলেন ট্রেন দিয়ে। কাপড়ের পুটলিতে খই। অন্য যাত্রীদের সামনে খাবেন কী করে ? জানালা দিয়ে মুখ বের করে খই খেতে শুরু করলেন। কিন্তু বাতাসের ঝাপটায় সব খই গেল উড়ে। তখন কী আর করা। বামুন বললেন, গোবিন্দ গোবিন্দ, সব খই তোমার চরণে নিবেদন করলাম। এই বাগধারার শানে নযুলও বর্তমান প্রজন্মের জানা নেই। এটারও আধুনিকীকরণ দরকার। আমার প্রস্তাব 'ড্র হয়ে যাওয়া লটারির টিকেট ভিক্ষুককে দান।'

তীর্থের কাক। এদেশে এ যুগে তীর্থই কোথায় আর সেই কাকই বা কোথায় ? এই বাগধারার বিকল্প হতে পারে 'মার্কিন ভিসাপ্রার্থী।'

শম্বুক গতি মানে শামুকের গতি। এটাও অনেকে জানেন। সুতরাং এর বদলে আমরা ব্যবহার করতে পারি ফাইল-গতি। অফিস-আদালতে কাজের ফাইলগুলো যে গতিতে নড়াচড়া করে আর কী!

আদার ব্যাপারিরা ইদানীং জাহাজের খবর রাখে তো বটেই, জাহাজের মালিকও বনে যায়। ব্যবসায়ীদেরই তো যুগ এখন বণিপুঁজির। তাই আদার ব্যাপারি, জাহাজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

খবর—এ বাগধারা এখন অচল। এটার বদলে বাগধারা হতে পারে বাংলায় পাস করে জাহাজের খবর ?

অরণ্যে রোদন— বাগধারাটির কথা বিবেচনা করুন। দেশের এখন অরণ্য কোথায়? একটা দেশে বন থাকা দরকার শতকরা ২৫ ভাগ, আমাদের দেশে এখন সেটা শতকরা ১০ ভাগে নেমে এসেছে। তাছাড়া অরণ্যে কান্নাকাটি করলে কেউ না কেউ শুনবেই। কাঠুরেরা শুনবে, চোরাকারবারিরা শুনবে, শান্তিবাহিনী শুনবে, নিদেনপক্ষে 'বনবাসে রূপবান, ছবির আউটডোর শুটিংয়ের লোকজনরা শুনবে। এই অচল বাগধারাটি বদলে বেশ একটা বৈজ্ঞানিক বাগধারা রাখা যায়, চন্দ্রে রোদন। চাঁদে বাতাস নেই। সুতরাং কেউ শুনবে না।

মাছের মায়ের পুত্রশোক নেই, এটা কি আমরা হলফ করে বলতে পারি ? আমরা কি মাছদের ভাষা বুঝি ? সেক্ষেত্রে আমরা এই বাগধারাটি আধুনিক করে তুলতে পারি এভাবে— জননেতার শোক জ্ঞাপন।

নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা—এই প্রবাদটিও বদলে রাখা উচিত। কারণ ইদানিং কেউ আর উঠানে নাচে না। নৃত্য এখন হয় মঞ্চে কিংবা ফ্লোরে। সুতরাং এই প্রবাদটি বদলে রাখা যায়—জিততে না পারলে সূক্ষ্ম কারচুপি।

বিড়াল তপস্বী বা বকধার্মিক। এর বদলে সহজেই ব্যবহার করা যায় 'ধর্মীয় রাজনৈতি, খয়ের খাঁ কে ছিলেন ? নিশ্চয়ই কোনো লোক আবুল খয়ের খান। খুবই বড়ো তেল-দাতা ছিলেন। তিনি নেই, কিন্তু রয়ে গেছে তার খ্যাতি। এ ব্যাক্তির বদলে আমরা আনোয়ার জাহিদ, শাহ মোয়াজ্জেম, প্রমুখের নাম বাংলা বাগধারার মধ্যে যুক্ত করতে পারি।

আমরা কথায় কথায় বলি শাক দিয়ে মাছ ঢাকা। এটার বদলে আমরা চালু করতে পারি 'প্রেসনোটের ব্যাখ্যা।'

অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করি কথাটি এখন আর তেমন কার্যকর নয়। অল্পবিদ্যারাই বরং চারদিকে সাফল্যের মুখ দেখছে। সুতরাং এটা বদলে রাখা দরকার 'নাইন পাস কার্যকরী'।

ছেলের হাতের মোয়া অবশ্যই বদলানো দরকার। এ জামানার ছেলেরা কি আর মোয়া বলবে ? এর বদলে হতে পারে, ছেলের হাতের চুইংগাম।

তাসের ঘরের বদলে সহজেই রাখা যায় সোভিয়েট ইউনিয়ন। আর বালির বাঁধের বদলে কমিউনিস্ট পার্টি। ঘরের শত্রু বিভীষণ। এ যুগে বিভীষণের কদর নেই। বরং বলা উচিত, ঘরের শত্রু মুশতাক। চোরের মার বড় গলার বদলে ফ্রিডম পার্টির গলাবাজি বেশ মানিয়ে যায়।

রাঘব বোয়াল-এর মানে কী ? রঘু বংশোদ্ভূত বোয়াল। এসব পুরান-টুরানো এখন কে মন রাখে ? এর বদলে বলা যেতে পারে, ঋণখেলাপি। যেমন ধর্মের ষাঁড়ের বদলে বলা যায় ম. মান্নান। তবে ননীর পুতুল বাগধারাটি বদলানোর দরকার নেই। কারণ আমরা ননীও চিনি, পুতুলও চিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জনৈক অভিকের দিনকাল

টিটি টুই টুই। খুব চমৎকার কণ্ঠে শিস দিচ্ছে একটা পাখি। কী পাখি ? মৌটুসী। মেয়েলি কণ্ঠে জবাব। এই পর্যন্ত একটা স্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভেঙে যায় অভিকের। চালধোয়া পানির মতন আলো বাইরে। ভেতরে তারই আভা আসছে মাত্র। জানালা নেই। একটা গবাক্ষ আছে দেয়ালের মাথায়, ছাদের গা ঘেঁষে। সেই গবাক্ষ ফুঁড়ে আলো এসে জাফরিকাটা নকশা ফেলেছে ছাদে। জেলখানার ছাদ। তার মধ্যে আলোর আল্পনা। প্রকৃতির এখানে প্রবেশ নিষেধ, তবুও আলো এসে পড়েছে, নিষেধ ভেঙে। গবাক্ষপথে। গবাক্ষ শব্দের অর্থ কী ? গো+অক্ষ। গরুর চোখ। কতোদিন আগে পড়া, তবু মনে আছে। ভোলেনি অভিক। এসএসসি-ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে যা পড়েছিল সব মনে আছে। ওই সময়ে তার পড়াশোনাটা হয়েছিল প্রথম মানের। ক্লাসের ফার্স্ট বয়। যাকে বলে ভালো ছাত্র— তাই ছিল সে।

একটা চড়ুই পাখি ঢুকে পড়েছে ঘরটায়। কিচিরমিচির ডাকছে। পাখিটা কতো স্বাধীন। ইচ্ছে করলেই কারাগারের দেয়াল অতিক্রম করতে পারে, অনায়াসে। অথচ মানুষ পারে না।

ঘরের মেঝেতে তার সহবন্দিরা ঘুমুচ্ছে। একটু পরে উঠতে হবে। অভিক তাড়াতাড়ি উঠে পড়েন। সবার আগে ঘুম থেকে ওঠাটা জরুরি। তাহলে বাথরুম সারা যায়। সে-এক কেলেঙ্কারি ব্যাপার কারাগারের প্রাকৃতিক কর্ম করা। এটা ভাবতেই চায় না অভিক। সকাল সকাল পত্রিকাটা নিয়ে উবু হয়ে বসেন তিনি। দৈনিক পত্রিকা। তার পত্রিকা পাবার কথা নয়। তবে কথা না থাকলেই তো হলো না। প্রতিটা নিয়মের আছে ব্যতিক্রম। কারাগারের ভেতরে আছে আরেক সামাজিক বিভাজন। এখানে বন্দিদের মধ্যে তার অবস্থান উপরের দিকে। কয়েকজন বন্দি আছে তার খেদমতগার। তারা তার পা টিপে দেয়। ফাই-ফরমায়েস খাটে।

অভিক সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি। বিচারে তার সাজা হয়েছে। এ সরকার তাকে কারাগারে আটকে রেখেছে। কিন্তু তিনি এখনো শহীদ জিয়ার আদর্শে বিশ্বাস করেন। ধরা পড়ার আগে ফেরারি-জীবনে তিনি অনেকবার সাক্ষাৎকার দিয়েছেন বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়। তিনি বলেছেন, আমাকে অন্য কেউ নয়, স্বয়ং শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান রিক্রুট করেছেন। আমি তার আদর্শের প্রকৃত অনুসারী। জিয়ার সৈনিক হিসেবে তিনি কারাগারের বাইরে সুবিধা করতে পারেননি বটে, কারাগারে সুবিধা পেয়েছেন। তাকে সাধারণ কয়েদিদের চেয়ে আলাদা মর্যাদা দেয়া হয়। কাগজে কলমে ডিভিশন নয়, অলিখিতভাবে জেলখানায় তিনি ভালোই আছেন। পত্রিকা পর্যন্ত পান।

আজকের পত্রিকাটা দেখে তার মনটা খারাপ হয়ে যায়। এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্ট হয়েছে। প্রথম পাতায় কৃতি ছাত্রদের ছবি। বাবা-মায়ের সঙ্গে। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জীবনের লক্ষ্য কম্পিউটার প্রকৌশলী হওয়া। আমি হতে চাই মহাকাশ বিজ্ঞানী। আমি চিকিৎসক। আমি শিক্ষক। একেকজন কৃতি ছাত্রের জীবনের লক্ষ্য একই রকম। কতো আশা তাদের চোখেমুখে।

এমন দিন আমারও ছিল। আপন মনে বিড়বিড় করেন অভিক। এসএসসি ও ইন্টারমিডিয়েট দুটো পরীক্ষাতেই এমনি কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন তিনি। সাংবাদিকেরা ভিড় করেছিল তার বাসায়। অল্পবয়েসের অভিক তাদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন। কী দিয়েছিলেন, কে জানে।

তোমার প্রিয় খাবার কী ? জানতে চেয়েছিল একজন। দুধের সর বলেছিলেন তিনি। ছেলেবেলায় দুধের সর খাবার জন্যে বিড়ালের মতো রান্নাঘরে ঘোরাফেরা করতেন। প্রথম পরত সর পড়তেই তুলে নিতেন তিনি। হাসি-কান্না, স্বপ্ন-আনন্দময় তার শৈশব। ছিলেন তিনি বইপাগল। যেখানে যা ছাপার অক্ষরে পেতেন, তাই পড়তেন। যশোর বোর্ডে সম্মিলিত মেধা তালিকার অন্যতম সেরা ছাত্র অভিক।

তোমার জীবনের লক্ষ্য কী ? জানতে চেয়েছিলেন একজন সাংবাদিক । কী জবাব দিয়েছিলেন তিনি ? এতোদিন পর তার মনেও পড়ছে না। জীবনের লক্ষ্য ছোটবেলায় ঠিক করেছিলেন, প্রকৌশলী হবেন। তারো আগে ভাবতেন, বৈমানিক হবেন। এসএসসি পরীক্ষার রেজাল্টের পর বললেন, বৈজ্ঞানিক হবো। ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্টের পর বললেন দেশের সেবা করতে চাই। কাগজে তার ছবি বেরুলো বরিশাল শহরে হৈচৈ। একেকটা কাগজে ছবি বেরুচ্ছে— সেসব কাগজ কিনে আনা। ফাইলে খবরগুলো গুছিয়ে রাখা। কী সব আনন্দের দিনই না গিয়েছে।

অবশ্য এই ভালো রেজাল্টের পেছনে আছে তাদের পারিবারিক ঐতিহ্য। তাদের সব ভাইবোনই লেখাপড়ায় ভালো। আজ সবাই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। একমাত্র তিনিই আজ কারাগারে।

নাশতার লাইনে দাঁড়াতে হবে। রুটি আর খোসাসমেত ডাল। খেতে ভালোলাগে না। আজ আর তার খেতে ইচ্ছে করছে না। মন ভার হয়ে আছে।

সেইদিনের কথা মনে পড়ছে। কলেজে চিঠি এলো, প্রেসিডেন্ট কৃতি ছাত্রদের সঙ্গে দেখা করতে চান। কলেজের পিয়ন এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেলো। ভাইস প্রিন্সিপাল তাকে খামটি ধরিয়ে দিলেন, বললেন, বাবা, আমি দোয়া করি, যেন আরো বড়ো আমন্ত্রণ আসে তোমার জীবনে। তুমি আরো বড়ো হও। আরো নাম করো।

ঢাকায় এলেন। বিকেলে বঙ্গভবনে তাদের অনুষ্ঠান। কৃতি ছাত্রদের সংবর্ধনা। সংবর্ধনা দেবেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট। ঠিক সময়ে পরিষ্কার কাপড়চোপড় পরে তিনি হাজির হলেন বঙ্গভবনে। সামনের সারিতে বসলেন। প্রেসিডেন্ট আসার আগে ঘরটায় স্প্রে করা হলো। কী স্প্রে করা হয়েছিল, তখন বোঝেন। এখন মনে হচ্ছে মরটিন-ইরোসল জাতীয় কিছু হবে। তখন তিনি ভেবেছিলেন—দামি সুগন্ধী কিছু। ফরাসি পারফিউম।

প্রেসিডেন্ট এলেন। চোখে কালো চশমা। তেমন লম্বা নন। স্বাস্থ্য পেটানো। একটা-দুটো গোঁফ শাদা। সামনের আসনে বসলেন। চেয়ারে বসেই কথা বলছেন। খুবই স্মার্ট প্রকৃতির লোক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তোমাদের কারো কিছু বলার আছে ? টাঙ্গাইলের এক ছেলে দাঁড়ালো। বললো, ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় করা হচ্ছে কেন ?

শাহ আজিজুর রহমান শিক্ষামন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীও। তিনি জবাব দিলেন। বললেন, আল্লাহতালা কেন নবী (দ.)-কে আরবে পাঠালেন। অন্ধকার এলাকাতেই নূর পাঠাতে হয়। ঐ কারণেই যশোর-কুষ্টিয়া সীমান্তে ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় হবে। চমৎকার যুক্তি। অভিক মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

প্রেসিডেন্টের বক্তৃতা শুরু হলো। তিনি চেয়ারে বসেই বক্তৃতা দিলেন। সানগ্লাসটা খুলেছেন। চোখ তার চিকচিক করছে। তিনি বললেন, এই দেশটা এমন থাকবে না। দেশটার চেহারা পাল্টাবেই। তিনি একটা আঙুল মাথার উপর ঘোরাতে লাগলেন। অভিকের মনে হলো এক স্বপ্নদ্রষ্টার সামনে তিনি বসে আছেন। লোকটা একটা উন্নত দেশের স্বপ্ন দেখছে।

বক্তৃতার পর চা পান। দুধ চিনি আলাদা রাখা। কেটলিতে লিকার। অভি কাপে দুধ-চিনি নিয়ে লিকার নিলেন। তার পাশে একটা ছেলে দুধও নিল, লেবুও নিল। অভিক হেসে ফেললেন।

এমন সময় প্রেসিডেন্ট এলেন। তার কাঁধে হাত রাখলেন। বললেন, নাম কী ? এদেশটা গড়ার ভার তোমাদের মতো ভালো ছেলেদের নিতে হবে। তুমি আমাদের সঙ্গে কাজ করো, ইয়ংম্যান। তার পরের ঘটনা সবার জানা।

অভিক ছাত্রদলে যোগ দিলেন। কতোকিছু ঘটে গেলো। হাতে কলমের বদলে একসময় উঠে এলো আগ্নেয়াস্ত্র। ক্ষমতার বদল হলো। তিনি স্বৈরাচার-বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। একসময় নিজেই হয়ে উঠলেন। চক্রান্তের অংশ নব্বইয়ের শেষদিকে। তার অস্ত্রের নল ঘুরে গেলো। তিনি হয়ে উঠলেন ছাত্র-জনতার প্রতিপক্ষ। ডা. মিলন মারা গেলেন। কতো ঘটনা।

আজ তিনি কারাগারে। শহীদ জিয়ার সৈনিক আজ কারাগারে। একসময়ের কৃতি ছাত্র। আজ সন্ত্রাসের দায়ে শাস্তি ভোগ করছেন। পত্রিকার পাতায় কৃতি ছাত্রদের মুখের দিকে তাকালেন অভিক। কী নিষ্পাপ একেকটি মুখ। জ্যোতিষ্মান। তার নিজের মুখেও একদিন ফুটতো এরকমই কৃতিত্বের আর বুদ্ধিমত্তার আলো।

অভিকের মনে হলো আবার তিনি ফিরে যান সেই ইন্টারমিডিয়েটের দিনগুলোতে। কেবল পড়া আর পড়া। রেজাল্ট ভালো করার উত্তেজনা। নতুন করে শুরু করেন জীবন। লিখে-পড়ে-গবেষণা করে মানবজাতি, দেশ, সভ্যতার পেছনে অবদান রাখেন। তার তো তাই করার কথা।

কিন্তু তা সম্ভব নয়। জেলখানার কঠিন দেয়াল চারদিকে। এই দেয়াল হয়তো একদিন অপসারিত হবে, কিন্তু নিজের চারিদিকে যে অদৃশ্য দেয়াল গড়ে উঠেছে— তা ভাঙা সম্ভব নয়। অভিকের চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে।

কৃতি ছাত্রদের ছবির দিকে ঝাঁপসা চোখে তাকিয়ে অভিক বললেন, ব্রাদারস, কংগ্রাচুলেশনস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জাগ্রত জনতা

১.

অজ্ঞাত পরিচয় এক লোক রবিবার জাতীয় সংসদের সামনে উড্ডীন জাতীয় পতাকা নামিয়ে ফেলেছে। সেখানে টানিয়ে দিয়েছে ভিন্ন ধরনের এক পতাকা। ৬-৪ সাইজের শাদা রঙের এই অদ্ভুত পতাকার মাঝখানে রয়েছে কমলা রঙের চাঁদ-তারা। পতাকার একদিকে আরবি এবং অপরদিকে ইংরেজিতে লেখা 'আউযুবিল্লাহির রাহমানির রাহিম, বিছমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসুল আল্লাহ।' সংবাদ পেয়ে সংসদ ভবনের নিরাপত্তা কাজে নিয়োজিত পুলিশ এই পতাকাটি নামিয়ে ফেলে।

দৈনিক জনকণ্ঠ, ৬ জুন ১৯৯৪।

২.

রে মূর্খ পুলিশ, রে শয়তানের দল, রে পাপিষ্ঠ, রে গুনাহগার, তোরা ইহা কী করিলি। চাঁদ-তারা পতাকা নামাইয়া ফেলিলি। কলেমা খচিত নিশান নামাইয়া ফেলিলি। 'বিসমিল্লাহ' নামাইয়া ফেলিলি। উহা তোরা কী করিলি রে। ভোটের আগে বিএনপি বলিয়াছিল, নৌকায় ভোট দিলে দেশে 'বিসমিল্লাহ' থাকিবে না, দেশ হইতে বিসমিল্লাহ উঠিয়া যাইবে। আর সেই তোরা 'বিসমিল্লাহ' খচিত নিশান নামাইয়া ফেলিলি। এতো বড় স্পর্ধা তোদের। এতো দুরাত্মা তোরা! কলেমার অবমাননা করিলি ! বিসমিল্লাহ অবমাননা করিলি।

তোরা কি জানিস কী প্রকারে এ পতাকা সংসদ ভবনের সর্বোচ্চ শিখরে উত্তোলিত হইলো? অমন সুরক্ষিত স্থানে সংরক্ষিত স্থানে কী প্রকারে কোনো মানুষ ঢুকবে, যেখানে একটি কাকপক্ষীও ঢুকতে সাহাস পায় না। তোরা দেখিয়াছিস, টুপি মাথায় পাঞ্জাবি-লুঙি পরিহিত মাঝবয়সী এক' লোক সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় এই পতাকা উড়াইয়াছে। তোরা কি বিশ্বাস করিস, সে কোনো আদম সন্তান ? রে মূর্খ, সে মানুষ নহে। তাহার দেহ মাটির তৈরি নহে। তার শরীর আগুনের তৈরি। ওই ব্যক্তি আসলে এক জ্বীন। জ্বীন না হইলে কেহ ওই দুর্গম স্থানে পতাকা লইয়া প্রবেশ করে ? ওই জ্বীন কাহাদের পক্ষে কাজ করিয়াছে তাহা কি তোরা বুঝিতে পারিতেছিস না ? তাহার পক্ষে আছে দেশব্যাপী সংগঠিত শরীরী শক্তি। তাই তো তাহার পক্ষে সম্ভব হইয়াছে মুহূর্তে উড়িয়া গিয়া ওই নিশান উড্ডয়ন করা। নতুবা কোনো মনুষ্য শরীরের পক্ষে কি তাহা সম্ভবপর ছিলো ? ইহা করা হইয়াছে আল্লাহর ইচ্ছায়।

তোরা কি দেখিতে পাইতেছিস না যে, শরীরী এবং অশরীরী জ্বীনেরা সারা বাংলাদেশে ইনকিলাব শুরু করিয়াছে। একটার পর একটা ফতোয়া দেওয়া হইতেছে। ধর্মদ্রোহী লেখিকা তসলিমা নাসরিনের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরওয়ানা জারি হইয়াছে। জনকণ্ঠের কার্যালয়ে যাহারা হামলা করিয়াছে, তাদের মধ্যেও মনুষ্যরূপী জ্বীনবাহিনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ছদ্মবেশে তৎপর ছিলো। সারাদেশে এই যে এতো ফতোয়া দেওয়া হইতেছে, তাহা হঠাৎ বাড়িয়া গেলো কেন ? কারণ পুরা বাংলাদেশের উপরেই জ্বীনের আছড় পড়িয়াছে। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা ছাড়া উপায় নাই ?

অতএব হে পুলিশ সাবধান। হে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছাহেব সাবধান। অচিরেই আমরা আদালতে মামলা ঠুকিবো। পুলিশ কর্তৃক ইসলামী পতাকা নামাইয়া ফেলায় আমাদের ধর্মীয় অনুভূতি আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছে। পুলিশ কর্তৃক কলেমা তৈয়ব খচিত নিশান নামানোর মাধ্যমে ১২ কোটি মুসলমানের ঈমান-আকিদার ওপর হামলা করা হইয়াছে।

অতএব হে মুসলমান ভাই বেরাদারগণ, আসুন আমরা সিএমএমের আদালতে পুলিশ, সরকার আর বিরোধীদলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করি। ১২ কোটি মুসলমানের দেশে ইসলামের এই অবমাননা আমরা সহ্য করিবো না। দৈনিক ইনকিলাব আমাদের সঙ্গে থাকিবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের সঙ্গে থাকিবেন কিনা ইহা তাহার অগ্নিপরীক্ষা। তাহার পুলিশই ইসলামী পাতাকা নামাইয়াছে। ইহার দায়িত্ব তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে। তরবারি প্রস্তুত রাখুন। জেহাদি জোশ অটুট রাখুন। আওয়াজ তুলুন— ইসলামের অবমাননা সহ্য করা হইবে না। নারায়ে তকবীর, আল্লাহ আকবর।

ব্যবস্থা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী আমার প্রিয় লেখকদের অন্যতম। তার কারণ তার স্পষ্ট অবস্থান, বক্তব্যের অনড়তা। তিনি সবসময়েই বলেন, ব্যবস্থাই আসল। একবার ঢাকার ফুটবল লীগে বিদেশী ফুটবলারদের নিয়ে কলাম লিখলেন তিনি, বললেন, ফুটবল এখন টাকার কাছে বন্দি, এর কারণ ব্যবস্থা। সম্প্রতি তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিলো ম্যারাডোনার এফিড্রিন কেলেঙ্কারি সম্পর্কে। তিনি বললেন, এজন্যে দায়ী ব্যবস্থা। অসুস্থ ব্যবস্থাই ম্যারাডোনাকে মাদকাসক্ত করে তুলেছে।

ব্যবস্থাই যে আসল, সেটা অবশ্য আমি বুঝেছি আমার শৈশবে। শৈশবে একবার ভয়ানক কোনো অন্যায় করে ফেলি। আম্মা ক্ষেপে যান। এতো খেপে যান যে, আমাকে প্রহার করতে তিনি ভুলে যান। বলেন, আসুক তোমার বাবা, দেখি, তিনি কী ব্যবস্থা নেন।

আব্বা এসে ব্যবস্থা নেবেন, এ-কথা শুনেই আমার মুখ শুকিয়ে যায়। ব্যবস্থা ব্যাপারটা যে মোটেই সুখপ্রদ নয়, সে-সম্পর্কে একটা ধারণা জন্মে যায়।

ব্যবস্থা যে কেবল অপরাধী বালকের পিঠের উপর দিয়ে যায়, তা নয়, মাঝেমধ্যে কাম্যও হতে পারে। খুব প্রয়োজন টাকার। ডাক্তার দেখাতে হবে, এক্সরে, প্যাথোলজিকাল রিপোর্ট, ওষুধ। কিংবা জরুরি প্রয়োজন অস্ত্রোপচারের। টাকার দরকার। বাসায় টাকা নেই। মা কাঁদছেন। বাবা বেরুলেন, দেখি কোনো ব্যবস্থা করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পারি কিনা! সকালে গেলেন। ফিরলেন বিকেলে। উদ্বিগ্ন মা হাতে পাখা নিয়ে এগিয়ে গেলেন, কোনো ব্যবস্থা হলো ?

বাবা বললেন, হয়েছে। মায়ের মুখে হাসি। অবশ্য বিকল্প ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছিলেন। গয়নাগাটিগুলো ঝেড়েমুছে রেখেছেন। যাক, গয়নায় হাত পড়লো না। কন্যাদায়গ্রস্ত মা রাতের খাবার বাবার পাতে তুলে দিয়ে বললেন, মেয়ের বয়স হচ্ছে, একটা ব্যবস্থা করো। মায়ের কাছে আবার নিয়মিত খোঁজ নিচ্ছে অতিউৎসাহী পাড়ার গার্জেনরা, কোনো ব্যবস্থা হলো ?

বাংলাভাষায় এই এক শব্দ—ব্যবস্থা। এই এক শব্দ দিয়ে যে আমরা কতোকিছুর ব্যবস্থা করছি। ডাক্তার প্রেসক্রিপশন দেন। আমরা বলি ব্যবস্থাপত্র। কী কী প্রেসক্রাইব করলেন ? বাংলায়, কী ব্যবস্থা দিলেন ? আবার সিস্টেমের বাংলাও ওই ব্যবস্থাই। ঢাকার পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা খারাপ। বিদ্যুৎ ব্যবস্থা শোচনীয়। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি চাই। সেদিন একটা বাংলায় লেখা সমাজবিজ্ঞানের পাঠ্য বইয়ে দেখলাম সিস্টেমেটিকালির বাংলা করেছে, 'সুব্যবস্থিতরূপে'। সর্বনাশ। এই বাংলা পড়ে ছাত্রছাত্রী কী বুঝবে, মা সরস্বতীও বলতে পারবেন না।

আবার একশনের বঙ্গানুবাদও ব্যবস্থা। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিন। পদক্ষেপের বিকলপ শব্দও এই ব্যবস্থাই। দরখাস্তের উপরে মন্ত্রী সাহেব সুপারিশ করলেন, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হইলো। দেখা গেলো, আবেদনকারীর চাকরি হয়ে যাচ্ছে। ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে।

শুধু ব্যবস্থা বিষয়ে বাংলা ব্যবস্থা ব্যস্ত নয়, তাকে আবার ম্যানেজমেন্টের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। ব্যবস্থাপনা। ব্যবস্থাপক। মহাব্যবস্থাপক। আমাদের 'ব্যবস্থা' এখানে মহাব্যস্ত। গিন্নীরা যেমন ব্যস্ত হন গিন্নী নিয়ে, মুরুব্বীরা করেন মুরুব্বীপনা, আমাদের ব্যবস্থা ব্যস্ত ব্যবস্থাপনা নিয়ে।

ব্যবস্থা আসলে ব্যস্ত বিভিন্নভাবে। ব্যবস্থা নেয়া যায়, ব্যবস্থা দেয়া যায়, ব্যবস্থা করা যায়, ব্যবস্থা রাখা যায়। বাসটির বা সিনেমা হলটির আসন-ব্যবস্থা ভালো। আবার বলা হয়, মহিলাদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা আছে। ভিআইপিদের জন্যে সাধারণত আলাদা ব্যবস্থা থাকে। যেমন বিয়েবাড়িতে গিয়ে দেখলেন বরের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। মানে তার জন্যে আস্ত মুরগি বা খাসী আসছে। তার মানে ব্যবস্থা খাওয়াও যায়।

ব্যবস্থা। বি+অবস্থা। বিশেষ অবস্থাই ব্যবস্থা। সেটারও বিশেষণ থাকতে পারে। বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হোক। মানে বিশেষ বিশেষ অবস্থা নেয়া হোক। আমার এক বন্ধু আছে, সে বাংলায় ডক্টরেট। ব্যবস্থা মানে যে বিশেষ অবস্থা সেটা তার মাথা থেকে কখনো যায় না। সে-কারণেই সে ব্যবস্থা আর অবস্থা গুলিয়ে ফেলে। সেদিন সে বলেছে, ব্যবস্থা কেরোসিন। আবার হয়তো বললো, পেটের ব্যবস্থা ভালো নয়। মনের ব্যবস্থা খারাপ। বাংলায় বিশেষভাবে 'জ্ঞ' হওয়ায় তার এই অবস্থা।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী স্যারকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি নিশ্চয়ই বলবেন, আমার বন্ধুটির এ অবস্থার জন্যে ব্যবস্থাই দায়ী। প্রচলিত ব্যবস্থা তাকে ডিগ্রি দিয়েছে, কিন্তু শিক্ষিত করেনি। জীবনে ব্যবস্থার কোনো শেষ নেই। জীবনের পরেও দরকার ব্যবস্থা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমি তো মরে গিয়েই বাঁচলাম। যারা বেঁচে আছেন তারা বুঝুন। একহাতে চোখ মুছে অন্যহাতে ব্যস্ত হতে হবে তাদের, উঠি, মুর্দার ব্যবস্থা করি। সৎকার বা শেষকৃত্য। সমাহিত করো, কিংবা পুড়িয়ে দাও। ফাইনাল ব্যবস্থা।

ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে কিন্তু মুশকিল। অব্যবস্থা। সর্বনাশ। অনুষ্ঠান থেকে এসে আপনি বর্ণনা দিচ্ছেন, ভালো হয়নি, চরম অব্যবস্থা। দেশজুড়ে এখন অব্যবস্থা। এ-কথা উচ্চারিত হলেই মনে হয়। সর্বনাশ, মার্শাল-ল আসবে না তো ?

সে-কারণে বলি ব্যবস্থাই আসল।

মওসুমের ওয়াজ

দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৭ আগস্ট, ১৯৯৪

জামায়াতে ইসলামীর আমীর গোলাম আযম বলেন, ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাগণ শোষণ জুলুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। তিনি বৃহস্পতিবার রাতে বগুড়ায় জাগ্রত মুক্তিযোদ্ধা পরিষদের সদস্যদের উদ্দেশে বক্তৃতা করছিলেন।

আবদুল কাদের মোল্লা বলেন, স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে মুক্তিযোদ্ধাগণ বিরাট কাজ করেছেন।

এখন এই যুক্তিযোদ্ধা সম্মেলনের একটি কল্পচিত্র : মুক্তিযোদ্ধা জোগাড় করা কোনো ব্যাপার নয়। প্রচুর সার্টিফিকেটঅলা মুক্তিযোদ্ধা আছে চারপাশে। ১৬ ডিসেম্বরের পরাজয়ের পর কতোজনই সার্টিফিকেট কেনাবেচা করেছে। অতি সহজেই একটা জাগ্রত মুক্তিযোদ্ধা পরিষদ গঠন করা হলো।

বগুড়ায় তার সম্মেলন। প্রধান অতিথি অধ্যাপক গোলাম আযম। বিশেষ বক্তা কাদের মোল্লাসহ অন্যান্য রাজাকার নেতৃবৃন্দ। সম্মেলনে উপস্থিতি তেমন বেশিকিছু নয়। সবাই জানাশোনা। চিহ্নিত জামায়াতী। তাদেরকেই মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে হাজির করা হচ্ছে। সম্মেলন শুরু হয়ে গেলো। আবদুল কাদের মোল্লা বক্তৃতা করছেন। অতি বিখ্যাত রাজাকার। বুদ্ধিজীবী খতম জেহাদের বীর মুজাহিদ। তিনি বললেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে মুক্তিযোদ্ধারা বিরাট কাজ করেছেন।

পেছনের একজন 'মুক্তিযোদ্ধা' দর্শকসারিতে উঠে দাঁড়ালো। কিছু বলতে চায়, স্বেচ্ছাসেবকরা তাকে ঘাড়ে ধরে বসিয়ে দিতে উদ্যত হলো। বেশ ধস্তাধস্তি অবস্থা। সভায় গোলযোগের আশঙ্কা। গোলাম আযম সাহেব বললেন: 'ওকে বলতে দিন।'

দর্শকসারিতে দাঁড়িয়ে ওই মুক্তিযোদ্ধাটি বললো, এসব আপনি কী বলছেন ?

মুক্তিযোদ্ধা আবার কী জিনিস ? আমরা আবার কবে থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের মুক্তিযোদ্ধা বলতে শুরু করলাম ? ওরা তো দুষ্কৃতকারী। '৭১ সালে ওদের তো আমরা দুষ্কৃতকারী নামেই গালিগালাজ করতাম। মুক্তিযোদ্ধা শব্দটা উচ্চারণ করলেই তো পাজামা নষ্ট হবার উপক্রম হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই প্রতিবাদী 'মুক্তিযোদ্ধা'টি একটি ফাইল বের করলো।

তাতে '৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের গোলাম আযম সাহেবরা কে কী বলছেন, তা লেখা আছে। সেই ফাইল দেখে লোকটি বললো, ১৯৭১ সালের ২ ডিসেম্বর দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়েছে অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেবের ভাষণ, অধ্যাপক সাহেব মুক্তিবাহিনীকে শত্রুবাহিনী আখ্যা দিয়ে বলেন, তাদেরকে মোকাবেলার জন্যে রাজাকাররাই যথেষ্ট। ১৭ জুন অধ্যাপক সাহেব বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, দুষ্কৃতকারীরা এখনো তাদের ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত রয়েছে। তাদের লক্ষ্যই হচ্ছে জনগণের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ানো এবং বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিস্থিতিকে দীর্ঘায়িত করা।

এই দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কৃতিকে আজ ভালো কাজ, বিরাট কাজ বলা হচ্ছে। এর মানে কী ? স্বয়ং অধ্যাপক সাহেব এখানে উপস্থিত আছেন। তার সামনেই তার কথায় বিরোধিতা করা হচ্ছে। এর ব্যাখ্যা চাই।

কাদের মোল্লা হেসে ফেললেন। বললেন, বুঝেছি। বসেন। বলছি।

'৭১-এ মুক্তিযোদ্ধারা ছিল বলেই তো আমরা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে পেরেছি। '৭১-এর জুন মাসে আমাদের বক্তব্য ছিল, 'দুষ্কৃতকারীদের মোকাবেলা করার উদ্দেশে দেশের আদর্শ ও সংহতিতে বিশ্বাসী লোকদের হাতে অস্ত্র সরবরাহ করতে হবে। অধ্যাপক গোলাম আযম সাহেব এ আবেদন জানান। তাতে কাজ হয়। রাজাকার, আলবদর, আলশামস গড়ে ওঠে। আমরা হাতে অস্ত্র পাই। যা খুশি করার অধিকার পাই। জেহাদে অংশ নেবার সুযোগ পাই। কেউ শহীদ হয়ে বেহেশতের টিকেট পাই, কেউ গাজী হয়ে দুনিয়ায় যা খুশি করার লাইসেন্স পাই। মালে গণিমত লাভ করি। বেদ্বীন বুদ্ধিজীবীদের কতল করার অধিকার পাই। সুযোগ পাই। এসব পেলাম কাদের অছিলায়! না, এই মুক্তিযোদ্ধাদের অছিলায়। বলেন, তাহলে মুক্তিরা বিরাট কাজ করছে কিনা ?'

বিদ্রোহী 'মুক্তিজোদ্ধা'টি সন্তুষ্ট হয়ে বসে পড়লো।

এরপর অধ্যাপক গোলাম আযমের ভাষণ। গোলাম আযম বললেন, মুক্তিযোদ্ধাগণ শোষণ জুলুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন, ইসলামের বিরুদ্ধে নয়।

সেই মাথামোটা 'মুক্তিযোদ্ধা'টি আবার উঠে দাঁড়ালো।

গোলামের নজর পড়লো তার উপর; তিনি বললেন, আপনার যা জানতে ইচ্ছা হয়, আপনি নির্ভয়ে বলুন।

'মুক্তিযোদ্ধা'টি বললো, হুজুর, এসব কী বলছেন আপনি। আপনিই না ১৯৭১ সালে ১ সেপ্টেম্বর বলেছিলেন, 'কোনো ভালো মুসলমানই তথাকথিত বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থক হতে পারে না।' ১২ আগস্ট ১৯৭১ দৈনিক সংগ্রামে আপনার যে বক্তব্য ছাপা হয়েছে তা হলো: 'তথাকথিত বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থকরা ইসলাম, পাকিস্তান ও মুসলমানের দুশমন'। আপনি ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১-এ আরো বলেছেন, 'পাকিস্তান যদি না থাকে তাহলে জামায়াতকর্মীরা দুনিয়ায় বেঁচে থাকার কোনো সার্থকতা মনে করে না। ১৯৭১-এর ৭ এপ্রিল আপনি পূর্ব পাকিস্তান জামায়াতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ইসলামীর নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এক যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারীদের কোনো স্থানে দেখামাত্র খতম করে দেবে। সেদিন মুক্তিযোদ্ধাদের বলেছেন, ইসলামের শত্রু, আর আজ বলছেন তাদের লড়াই ইসলামের বিরুদ্ধে ছিল না— বড়ো ধান্ধা লাগছে। এই ধাঁধার অর্থ বুঝতে পারছি না। আপনি কি এই ব্যাপারটি একটু বুঝিয়ে বলবেন ?

ব্যাপারটি অতি সহজ। ওয়াজ করতে হয় মওসুম বুঝে। শীতকালের ওয়াজ শীতকালে গ্রীষ্মকালের ওয়াজ গ্রীষ্মকালে। ১৯৭১ সালে আমরা বলেছি মুক্তিযোদ্ধারা ইসলামের শত্রু। ১৯৯৪ সালে আমরা বলছি মুক্তিযোদ্ধারা ইসলামের শত্রু ছিল না। কারণ ১৯৭১ সালে মুক্তিযোদ্ধা বলতে যাদের বোঝাতো, তারা ছিল আমাদের জাতশত্রু। আর এখন মুক্তিযোদ্ধা সেজেছেন আপনি। বলুন, আপনাকে কি আমি ইসলামের শত্রু বললে আপনি খুশি হবেন ?

মনোজ্ঞ জাদু প্রদর্শনী

আমাদের শহরে এক জাদু প্রদর্শনী হবে। দিকে দিকে সাড়া পড়ে গেছে। চারদিক এই এক আলোচনা। এক নাম-না-জানা জাদুকর জাদু দেখাবেন এই শহরে।

দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়লো— বিশাল জাদু প্রদর্শনী। একজন বিশিষ্ট জাদুকর দেখাবেন এই জাদু। টিভিতে হরহামেশা বিজ্ঞাপন প্রচারিত হতে লাগলো প্রখ্যাত জাদুশিল্পীর একক জাদু প্রদর্শনী। ফলে আমাদের কৌতূহল গেলো বেড়ে। নির্ধারিত তারিখের আগেই সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেলো। হাউজফুল। তার ওপর টিকেট ব্লাক হতে শুরু করলো। প্রচার হয়ে গেলো, এই ম্যাজিশিয়ান এক নতুন জাদু দেখাবেন।

যাবো ভাই, সপরিবারে, এমন জাদু তো আর কোনোদিন হয়নি, বলাবলি করতে লাগলো লোকে।

আমার বৃদ্ধা দাদীমার বয়স আশি, তিনি বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না; এমনকি প্রাকৃতিক কর্মগুলোও সারেন বিছানাতেই; তারও মহাউৎসাহ। বলেন, সবাই যাবে, আর আমি একা একা বিছানায় শুয়ে থাকবো। তোরা আমার জন্যে একটা সিক বেড দেখ। অসুস্থ লোকের পরীক্ষা দেবার জন্যে যদি বেড দেয়া যায়, অসুস্থ লোক কেন জাদু দেখতে পারবে না। অতি যৌক্তিক কথা।

এলো সেই কাঙ্ক্ষিত দিন। আমরা সবাই গেলাম জাদু দেখতে। বিকেল থেকেই পুরো এলাকা লোকে লোকারণ্য। পুলিশবাহিনী হিমশিম খাচ্ছে নিরাপত্তা দিতে গিয়ে।

অডিটোরিয়ামের ভেতরে লোক গিজগিজ করছে। এয়ারকন্ডিশন ঠিকভাবে কাজ করছে না। গরম লাগছে। স্টেজ অন্ধকার। ভেলভেটের পরদাঘেরা। পরদা উঠছে না। লোকজন তবুও বিরক্ত হচ্ছে না। এও এক ম্যাজিক। সবাই মোহগ্রস্ত। কেউ টু শব্দ করছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অবশেষে পরদা উঠলো। বিসমিল্লাহির রাহমানুর রাহিম। সবাই উৎকণ্ঠিত, উৎকর্ণ। ফাঁকা স্টেজ। অতঃপর এলেন সেই কাঙ্ক্ষিত প্রতীক্ষিত জাদুকর। সিল্কের পোশাক। মাথাও সিল্কের কাপড় দিয়ে ঢাকা। ম্যাজিশিয়ান, সবাইকে 'সুবেচ্ছা' জানালেন। একটু ফিসফিস শব্দ হলো। উচ্চারণ ভালো না।

এরপর শুরু হলো জাদু প্রদর্শনী। জাদুর নাম 'মেটরফোসিস।' বাংলায় 'রূপান্তর। একটা কাচের গ্লাস। তার মধ্যে বালি। ম্যাজিশিয়ান সেটা একটা কালো কাপড় দিয়ে ঢাকলেন। বাঁ হাতে গ্লাস ধরা। ডানহাতে জাদুর কাঠি। ফুস মন্তর ফুস মন্তর ফুস। ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি। কালো কাপড় সরিয়ে দেয়া হলো। ওমা! একি। বালি গেলো কই ? গ্লাসের ভেতরে চকলেট।

দর্শকদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেলো। একটা মোটাসোটা শিশু বলে উঠলো আম্মু, আমাকে এই ম্যাজিকটা শিখিয়ে দাও। আমি বালি থেকে চকলেট বানাবো। আশেপাশের দর্শকরা হেসে উঠলো একযোগে।

এবার একটা রুমাল। রুমালটা ঢেকে ফেলা হলো একটা ফাঁক হ্যাট উপুড় করে দুজন অতি সাহসী দর্শক মঞ্চে উঠে পরীক্ষা করে এলো, না হ্যাটের মধ্যে কিছু নেই। তারপর ম্যাজিশিয়ান হাসলেন, জাদুময়ী হাসি। জাদুর কাঠি নড়ছে। এক, দুই, তিন। হ্যাট তোলা হলো। এমা, একটা আস্ত খরগোশ গুঞ্জন। হাততালি। পরের আইটেম এটা সিরিজ আইটেম। একটার পর একটা চলতেই থাকবে।

একটা বাক্স। কাচের বাক্স। চৌকোণা। সম্পূর্ণ ফাঁকা। সবাই দেখলো ফাঁকা। দুজন দর্শক গেলো মঞ্চে। হ্যা, সত্যি সত্যি ফাঁকা। এরপর ওটাকে ঢাকা হলো একটা কালো স্কার্ফ দিয়ে। মিউজিক হচ্ছে। দেশাত্মবোধক গান। কালো স্কার্ফ সরানো হলো। কাঁচের বাক্স কোথায় ? নেই। তার জায়গায় একটা ভাঙা সুটকেস। হাততালি। হাততালি। সুটকেস খোলা হলো। ভেতরে কিছু নেই। স্যুটকেস বন্ধ করা হলো। আবার নড়ে উঠলো জাদুর কাঠি। আতাপাতা হা হা। সুটকেসের ভেতরটা বদলে যা। যে-কথা সেই কাজ। সুটকেস খুলে দেখা গেলো বেরিয়ে আসছে একজোড়া ছেঁড়া গেঞ্জি। ভাঙা সুটকেসের ডালা বন্ধ হলো আবর। মুহূর্ত খানিকের শ্বাসরুদ্ধকর অপেক্ষা। তুকতাক, ধুকধাক। ফুস মন্তর ফুঁ। সুটকেসের ডালা খুলে গেলো, আপনাআপনিই বেরিয়ে গেলো, একটা অলঙ্কার সেট। জাদুকর দাবি করলেন, এটা নকল নয়, ইমিটেশন নয়, আসল হীরার সেট। ৯০ লাখ টাকার মতো দাম।

এই জাদুটা তেমন জমলো না। লোকে ভাবলো-এ চাপা। যা, এতো দামি হীরের গয়না এই ভাঙা সুটকেস থেকে কি বেরুতে পারে ?

এরপর জাদুকর সুটকেসের ভেতরে হাত দেন। আর বের করেন নানা জিনিস। বেরিয়ে এলো ফুলের গয়না, সোনার গয়না সেট, শাড়ির সেট, বিমানের টিকেট, রয়াল স্টুডিও কালেকশন নামের ডিনার সেট, দেড় ডজন স্যুটের প্যাকেট।

তারপর একে একে বেরুলে শ খানেক টেলিভিশন। সেই টেলিভিশনগুলো একটি অন করা হলো, দেখা গেলো মালকাবানু সিনেমার গান বাজছে, ছায়াছন্দ অনুষ্ঠানে—মালকাবানুর দ্যাশেরে, বিয়ার বাদ্য আল্লাহ বাজেরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তারপর নীরবতা। সব চুপচাপ। স্টেজে মায়াময় আলো। দর্শকরা নিঃশ্বাস ফেলছে না। কোত্থেকে ভাসতে ভাসতে মঞ্চে এলো এক বিশাল কার— টয়োটা ক্রাউন ডিলাক্স। তালি। তালি। তালি। মুখরিত চারদিক। হর্ষধ্বনি। হুই হুই।

সবশেষ আইটেম। এবার শোনা গেলো সমুদ্রের গর্জন। পেছনের পরদায় সমুদ্রের ছবি। এবার সকলকে হতবাক করে দিয়ে মঞ্চের উপর এলো এক বিশাল জাহাজ। ভাঙা সুটকেস থেকে আস্ত জাহাজ। মানুষ তালি দিতে গেলো ভুলে।

শেষের পরেও শেষ থাকে। এবারের আইটেমটা সেই শেষের পরের শেষ। একটা আদম সন্তানকে ঢোকানো হলো একটা বাক্সের মধ্যে। কাঠের বাক্স। এখানে-সেখানে ছিদ্র। বড়ো বড়ো তরবারি ঢুকিয়ে দেয়া হলো সেই ছিদ্রপথে। সবাই আর্তনাদ করে উঠলো। সর্বনাশ। ও যে মারা যাবে। বাক্সের ঢাকনা খোলা হলো। না, মারা যায়নি মানুষটি। তবে বদলে গেছে। ছিলো মানুষ, হয়ে গেছে আস্ত একটা গাধা, স্টেজময় সেই গাধাটা ভ্যাস ভ্যাস করে ছুটে বেড়াতে লাগলো।

জাদুকর হাসতে লাগলেন। দিগ্বিজয়ীর হাসি। ভাবখানা, দেখো বাঙাল, তোমাদের কেমন গাধা বানালুম।

জাদু প্রদর্শনীর এখানেই সমাপ্তি। সবাই বেরিয়ে এলো। বলাবলি করতে লাগলো, খুব ভালো জাদু। জুয়েল আইচের চেয়ে ভালো। গিসি সরকারের চেয়ে সুন্দর। বড়ই সুন্দর। আমরা মুগ্ধ, একেই বোধহয় বলা হয় 'মনোজ্ঞ'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাজা যায় রানি আসে

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬
রচনাকাল : ১৯৯৪ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৯৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একটি চেয়ারের আত্মকাহিনী

আমি একটা চেয়ার। সামান্য চেয়ার। অন্য সব চেয়ারের মতোই প্রাণহীন, তবুও আমি অসামান্য অসাধারণ।

আমি কেমন করে অসাধারণ হয়ে উঠলাম সেই কাহিনীটি বলি।

পড়ে ছিলাম নদীর ধারে, এক খণ্ড গুঁড়ি হয়ে, অযত্নে, খোলা আকাশের নিচে। নদীচরা পাখিরা এসে বসতো আমার গায়ে, দুদণ্ড জিরোতো, জলোচ্ছ্বাস। ডাঙার মায়া ছেড়ে আমি ভাসতে লাগলাম অথৈ দরিয়ায়। ভাসছি তো ভাসছিই। এমন সময় দূরে তাকিয়ে দেখি জলে ভাসছেন এক আদম সন্তান। তারপর দুজনে ভাসতে লাগলাম। আমি প্রাণপণে সরে এলাম ডাঙার দিকে। অতঃপর ভিড়লাম তীরে। তিনি বলছেন, হে কাষ্ঠখণ্ড, তুমি আমার যে উপকার করেছো, তাতে আমি খুশি হয়েছি খুবই। তুমি আমার কাছে তিনটি বর চাও।

আমি বললাম, হে সাধু, কোনো-কিছুর আশায় আমি আপনার উপকার করিনি। তবু আমি আপনার কাছে বর চাইবো। এই কাষ্ঠজীবন আমার ব্যর্থ হবার পথে। আপনি আমাকে একটা সুদৃশ্য চেয়ারের মর্যাদা দিন।

তিনি বললেন, মঞ্জুর। তুমি হবে এক সুদৃশ্য আসন।

আমি বললাম, আর আমাকে এই বর দিন যেন সবাই আমাকে পেতে চায়।

তিনি বললেন, মঞ্জুর। এবার তোমার শেষ বরটি চাও।

আমি বললাম, হে সাধু, আমাকে এমন বর দিন যেন যেই আমার শরীরের আসীন হয়, সেই আমার মায়ায়, মোহে পড়ে যায়। সে যেন ছাড়তে না চায়।

সাধু হেসে বললেন, তথাস্তু। বড়ো রাজনৈতিক জিনিস চেয়েছো। তোমার এক নম্বর প্রার্থনা শুনে আমি ভাবলাম—তোমাকে কোনো কাষ্ঠশিল্পীর হাতে তুলে দিলেই হলো, সে যত্ন করে তোমাকে একটা সুদৃশ্য আসনে পরিণত করবে। তোমার দ্বিতীয় বর শুনে মনে হলো, চেয়ার জিনিসটি সবসময়েই কাম্য। এটা তেমন কঠিন কোনো চাওয়া নয়।

এদেশের বাসে-ট্রেনে সবাই বসবার জন্যে একটা সিট চায়। এদেশের সিনেমা হলে, থিয়েটারে একটা আসনের জন্য লাইন দেয় কতোজন। এদেশে স্কুল-কলেজে সর্বত্র শুধু সিট নেই আওয়াজ। সুতরাং সবার কাম্য একটা চেয়ারের মর্যাদা দেয়া তেমন কঠিন কিছু নয়। কিন্তু সর্বশেষ চাওয়াটা চেয়েই তুমি মুশকিলে ফেললে। দেখো, বাসের সিট, ট্রেনের সিটের মূল্য গন্তব্যে পৌছলেই যাত্রীর কাছে ফুরিয়ে যায়। স্কুলে-কলেজে কেউ একই আসনে পরপর দুবছর বসতে চায় না। কিন্তু সেই চেয়ারই চিরকাম্য, যে চেয়ার ক্ষমতার। ক্ষমতার চেয়ারের জাদুই এই, যে একবার তাতে বসেছে, সে তার আর কখনো ছাড়তে চায় না। ক্ষমতার চেয়ারে আসীন ব্যক্তি দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারে না, ওই চেয়ারে অন্য কেউ বসেছে। ঠিক আছে, তোমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তেমনি এক মহা আকর্ষক চেয়ারের জীবনই আমি দান করবো কিন্তু একটি শর্তে, তোমার মোহে পড়বে সবাই কিন্তু তুমি কারো মোহে পড়তে পারবে না। কৃতজ্ঞতায় আমাকে আপ্লুত সাধু অন্তর্হিত হলেন।

আমি পড়ে রইলাম সেই জলার ধারে। সেখান থেকে আমাকে তুলে নিয়ে গেলো একদল কাঠব্যবসায়ী। চালান করে দিল কাঠের গোলায়। সেখানে স-মিলে আমার বুক চিরে চিরে তৈরি হলো তক্তা আর বার। তারপর ট্রাকে উঠে আমার রাজধানী যাত্রা। অচিরেই আমি বিক্রি হয়ে গেলাম এক সরকারি নথিভুক্ত ঠিকাদারের কাছে। তিনি দেশের সেরা শিল্পীর নকশা দিয়ে সেরা মিস্ত্রিদের কাজে লাগিয়ে রূপ দিলেন এক মোহনীয় মজবুত সিংহ-চিহ্নিত আসনের। পৃথিবীর সবচেয়ে নরম আর সবচেয়ে আকর্ষণীয় গদি দিয়ে মুড়ে আমাকে পাঠানো হলো রাজধামে।

সেখানে গিয়েই আমি বুঝলাম আমার কদর। এ মুলুকের সবচেয়ে কাম্যবস্তুতে আমি পরিণত হয়ে গেছি। আমি মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম সেই সাধুকে; যিনি আমাকে দুর্লভ সৌভাগ্য দান করেছেন। এক জীবনে কতো কী দেখলাম। শুধু আমাতে আসীন হবার জন্য কতো প্রতিযোগিতা। কতোজন বললো, চেয়ারের প্রতি আমার কোনোই মোহ নেই। এসেছি নিতান্তই দুদণ্ডের জন্যে, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে আমি চলে যাবো। সেসব শুনে আমি মনে মনে হেসেছি। বাপু হে মনুষ্য সন্তান, ষড়রিপুর বশ তোমরা, খুব তো বড়ো বড়ো কথা বলছো, দুদিন যেতে দাও, দেখবো, কার মুখে কোন্ কথা ফোটে। আমি শুধু অভ্যাসবশে আমার শরীরটাকে আরেকটু ঢলো করে তুলেছি, তাতেই একেকজনের অবস্থা খারাপ। আর কি আমায় কেউ ছাড়তে চায়? শুধু আমার মোহে কতো হত্যা, কতো ষড়যন্ত্র ! দিবারাত্র কতো মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, কতো সাজানো প্রহসন! কতো গণভোটের নামে নিজহাতে বাক্স করা, হৈ হৈ রৈ রৈ!

যেই আমাতে বসেছে, সেই মরেছে। না, না, হাসির কথা নয়, দু-দুজন তো আমাকে ছেড়েছে কেবল জীবনটা চলে যাবার পর। আরেকজনের কথা বলি। তিনি ছিলেন বৃদ্ধ মানুষ। ইদানীং যে এর মুখে ওর মুখে শুনি, তিনি আমাকে ছেড়েছেন স্বেচ্ছায়, সে-কথা শুনলে আমি শুধু হেসেই মরি। আমার কাছে একবার এসে আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়া এতো সোজা নয়। ওই বৃদ্ধও আমাকে ছাড়তে চাননি। শেষবার আমার কাঁধ ছুঁয়ে যে কতো কেঁদেছিলেন, তার সাক্ষী শুধু আমিই।

এরপর যিনি এলেন, তিনি আমাকে পেয়ে যেন সবকিছু পেয়ে গেলেন। আমার প্রেম এমনি সর্বনাশ যে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পাইয়ে দেয়। কতো কাণ্ডই না ঘটালেন সেই লোক। বুড়ো বয়সে সন্তান পেলেন, কবিতা লিখলেন—সবকিছুর প্রেরণা তো আমিই।

আহা, ভদ্রলোক আমাকে কিছুতেই ছাড়তে চাননি। চাইবেন কী করে, আমার যে আছে সাধুর বর, কেউ কি একবার আমার স্পর্শ পেলে আমাকে ছাড়ার কথা কল্পনা করতে পারে ? তিনি নানা চেষ্টা করেছিলেন, কতো লোককে ব্যবসা দিয়েছেন—সেসবের কি ইয়ত্তা আছে। কিন্তু তিনি কিছুতেই চিরদিন থাকতে পারলেন না। তাকে যেতেই হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এখন যিনি আছেন, তিনি খুবই ভালো। তার মতো কাউকে আমি এর আগে পাইনি। সত্যি বলতে কী, তার সঙ্গে এখন আমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছে। তিনিও এখন আমাকে ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারবেন না, আমিও বোধহয় তাকে ছাড়া একদণ্ডও থাকতে পারবো না। এটা অবশ্য আমার জন্য খুবই খারাপ চিন্তা। আমার জন্মই তো হয়েছে একজনের পর আরেজনকে বরণ করার জন্য।

আমার বুকে কি কেউ চিরদিনের মতো ঠাঁই পেতে পারে ? তবে ইনিও শক্ত খুব। আমার প্রতি তার ভালোবাসা একেবারেই নিরঙ্কুশ। তিনি বলে দিয়েছেন, তিনি ওই বুড়োটির মতো নন যে, কেউ বললেই তিনি সুড়সুড় করে আমাকে ছেড়ে দেবেন।

এসব কথা শুনলে অবশ্য আমার কান্না পায়। গদিআঁটা কাঠের চেয়ার হলেও তো আমারও হৃদয় বলে পদার্থ আছে, নাকি! আহারে, এনাকেও আমাকে একদিন ছেড়ে দিতে হবে। আমার কপালটাই যে এমন, আমার বুকে কেউ চিরকাল থাকতে পারে না। আমার খুব খারাপ লাগছে সেদিনের কথা ভেবে। কী হবে! আমার কিন্তু খুব কান্না পাচ্ছে। আমি চাই উনি যেন আমার বুকে চিরস্থায়ী হন। যেন কোনোদিন আমাকে তার ছেড়ে যেতে না হয়। এজন্য যা করতে হয় তিনি যেন করেন। কারো কথাতেই যেন কর্ণপাত না করেন। দশের কী হলো তাতে তার কী! সব গোল্লায় যাক, রসাতলে যাক, শুধু উনি যেন থাকেন।

ইশ, বললেই হলো, অন্য কাউকে এসে বসাবে তিন মাসের জন্য। ওই সময়টা আমার একদম ভালো লাগে না। এর আগে একজন এসে আমার বুকে অন্তর্বর্তীকালের জন্য বসেছিলেন, তিনি যেন কেমন, আমার প্রতি কোনোই মায়া-মহব্বত দেখাতেন না। এমন লোক আমার একদম অপছন্দ। আবার সবাই মিলে তেমন একজনকে ধরে আনতে চায়। ছেলের হাতের মোয়া আর কী ! চেয়ার একবার ছেড়ে দিলে কেউ আবার ফেরত পায় ? যতোসব অবাস্তব দাবি!

এসব কথা যখন ভাবছি, তখনই দেখি একটা ঘুনপোকা ধীরে ধীরে আমার দিকে এগুচ্ছে! সর্বনাশ। ও সাধু, আমি কী পাপ করলাম ? আমার শরীরে ঘুন বাসা বাঁধছে কেন ? ও সাধু, দিব্যি দিচ্ছি আমি কারো মোহে পড়বো না। সবাই আমার মোহে পড়বে আর আমি থাকবো নির্লিপ্ত। ও সাধু, ক্ষমা করো।

ঘুনপোকাটি তবুও এগিয়ে আসছে। হায়, আমার কি শেষ পরিণতি তবে এই রাজধামের ভাগাড়! সেখানে আরশোলা, ইঁদুর, মাকড়সার সঙ্গে অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে পরিবেশে পরিত্যক্ত কর্মহীন অবসর জীবনযাপন করতে হবে আমাকেও ?

গোলাপ মিয়ার বাবা বাড়ি ফিরেছে

গোলাপ মিয়ার বয়স চার কী পাঁচ। তার কোমরে ঘুঙুর বাঁধা কালো সুতোয়। সে যেখানেই যায়, আওয়াজ ওঠে টুংটুং। শীতকাল। একখানা লুঙি দুভাঁজ করে তার গলা থেকে পা পর্যন্ত শরীর ঢেকে পরানো। গোলাপ মিয়ার হাতদুটো আড়াল করে রেখেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই লুঙিখানা, সকালবেলার গা কাঁপানো শীতে ছোট্ট শরীরটায় ওম সঞ্চার করতে সে দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির খুলিতে, এখানে রোদ পোহাচ্ছে এই বাড়ির শিশু ও বৃদ্ধরা।

গোলাপ মিয়া এই বিহান বেলার সমাবেশের সবচেয়ে কনিষ্ঠ সদস্য। কিন্তু কথাবার্তায় পাকা।

গোলাপ তার পার্শ্ববর্তী সাত বছরের সাবেরকে বললো, দ্যাখ, মুই বিড়ি ফুঁকতোছো। ধুমা (ধোঁয়া) বারাইতেছে।

সে মুখ থেকে ধোঁয়া বের করলো। শীতকালে মুখের গরম বাতাস বের করে দিলে জলীয়বাষ্প শাদা ধোঁয়ার মতোই দেখায়। সাবের বললো, তুই বিড়ি খাইতেছিস, আর মুই খাও সিগেরেট।

গোলাপ হেরে যাওয়ার পাত্র নয়। বুদ্ধিতে এবং কথায় এই শিশুটির সঙ্গে কেউ পেরে ওঠে না।

সে বললো, কী খাইতেছিস, বুঝবার পারো নাই, জোরে ক।

সাবের বললো, সিগারেট।

গোলাপ বললো, কী খাইতেছিস, আরো জোরে ক, বুঝি না।

সাবের এবার চেঁচিয়ে উঠলো, মুই সিগেরেট খাইতেছোঁ।

ইতিমধ্যে গোলাপ পাশে-বসা দাদাস্থানীয় এক মুরব্বি ব্যক্তির হাত ধরে টেনে সাবেরের কথার দিকে কান ফিরিয়েছে। এই ব্যক্তি ক্ষেপে গেলেন। এতোটুকুন ছেলে বলে কী, আমি সিগারেট খাচ্ছি! তিনি উঠে গিয়ে সাবেরের কান ধরে টানতে লাগলেন। সাবের চিৎকার করে কেঁদে উঠলো।

গোলাপ হেসে উঠলো হি হি করে। বৃদ্ধ সাবেরের পিঠে গোটা দুয়েক কিল বসিয়ে দিয়ে ছেড়ে দিলেন তাকে।

গোলাপ তার পিছে লাগলো, সাবু মিয়া, সিগারেট খাবার নন ?

সাবের বুঝতে পেরেছে সকালবেলায় তার মার খাবার কারণ এই গোলাপ। সে তেড়ে এলো গোলাপের দিকে। গোলাপ দৌড় ধরলো। তার কোমরের ঘুঙুর বাজতে লাগলো ঝুমঝুম করে। পিছে পিছে ছুটতে লাগলো সাবের। ছোট্ট গোলাপকে ধরে ফেলতে সাবেরের বেশি সময় লাগলো না।

গোলাপ বললো, সাবের ভাই, মোক ছাড়ি দ্যাও, নাইলে বাপ ফিরি আসলে কিন্তু বন্দুক দিয়া গুলি করি দেমো। বাপ মোর কিন্তুক আজই আসবে।

সাবের গোলাপকে ছেড়ে দিলো। গোলাপের বাবা আনসারবাহিনীর সদস্য। তার বন্দুক আছে। তাকে ভয় না পেয়ে কোনো উপায় নেই।

গোলাপের বুকটা গর্বে উঁচু হয়ে উঠলো। সে বললো, বাপ মোর ঢাকা থাকি অনেক কিছু নিয়া আসবে, তোমাকে দেমো।

দুজনের ফের ভাব হয়ে যেতে সময় লাগলো না। গোলাপ তার বাবার গল্প শোনাতে লাগলো সাবেরকে। তার বাবার ভয়ে যে ঢাকার সবাই তটস্থ থাকে, রাস্তায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যেই তার বাবাকে দেখে, সেই সালাম দেয়—সেসব সে বললো নিজের কল্পনা মিশিয়ে। তার বাবার যে অনেক টাকা, সেসব টাকা খরচ করারও তেমন দরকার হয় না, কারণ দোকানে দোকানে সবাই তার বাবাকে বিনা পয়সায় জিনিসপত্র দিয়ে দেয়, গোলাপ এই ব্যাপারগুলো সাবেরকে বিশদভাবে বুঝিয়ে দিলো।

রোদ বেড়ে উঠছে। পেটের মধ্যে খিদেও বেশ মোচড় দিচ্ছে। গোলাপ মিয়া বাড়ির অন্দরের দিকে দৌড় ধরলো। তার কোমরের ঘুঙুরে শব্দ উঠলো টুং টুং টুং টুং।

গোলাপ তার মাকে পেলো দুবাড়ি পরের অবস্থাপন্ন কৃষকের ঢেঁকিপাড়ে। অগ্রহায়ণ মাস। পুরোদমে কাটামাড়ি চলছে। তার মা সেখানে ঢেঁকিতে ধান ভানছেন। ওই বাড়িতে আজ পিঠে বানানো হবে।

গোলাপ মাকে বললো, মা, ভুখ লাগছে।

মায়ের চোখটা ছলছল করে উঠলো। এতো বেলা হলো তার ছেলেটাকে তিনি কিছুই খেতে দিতে পারেননি। ভেবেছিলেন সকালে এ বাড়িতে পিঠা বানানো হলে তিনি যা পাবেন, অর্ধেকটা ছেলের জন্য নিয়ে যাবেন। কিন্তু এখনো আটা কোটাই শেষ হলো না। অবশ্য এদিকে এদের চুলোয় পিঠা হচ্ছে। গরম গরম ভাঁপা পিঠা। সবার খাওয়া হয়ে গেলেই না তার পাতে আসবে।

গোলাপের মা ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। হুবহু বাপের মতো চেহারা। আহা, বেচারা। বাপ ঢাকায় না জানি কতো সুখে আছে। আর তার বউ অন্যের বাড়া বানছে আর ছেলেটা এতো বেলা হলো না খেয়ে।

তুই ঘরোত যা, মুই আসতেছোঁ—মা ছেলেকে নিজের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। আরো খানিক পরে দুটোপিঠা টিনের শালায় নিয়ে তিনি ফিরলেন।

পিঠা খেতে খেতে গোলাপ বললো, তার মনে হচ্ছে, তার বাবা আজই ফিরবে। মা এ-কথার জবাব দিলেন না। ছেলেটা কথা বলে বেশি। বেশ বুদ্ধিমান হয়েছে। ছেলেটাকে তিনি দুবেলা খাবার দিতে পারেন না ঠিকভাবে। আগে যখন ওর বাবা বাড়িতে ছিল, তখনো অভাব ছিল, তবে এতোটা নয়। তারপর ওর বাবা চাকরির ইন্টারভিউ দিলো। আনসারবাহিনীর চাকরি। তখন থেকেই তাদের মনে দেখা দিলো নতুন আশা। হয়তো আর অভাব থাকবে না। গ্রামে তাদের বাড়িতে গৌরব গেলো বেড়ে। এ বাড়ির একজন আনসার হয়েছে। সবাই বেশ সমীহ করতে শুরু করলো তাদের। ট্রেনিং হলো। ট্রেনিংয়ের সময় গোলাপের বাপ লিখলো, গোলাপের মা, কিছুদিন কষ্ট করো, ট্রেনিং শেষ হইলেই তোমাদিগকে লইয়া আসিবো।

ট্রেনি শেষ হলো। কিন্তু গোলাপের বাপ তাদের নিয়ে যেতে পারলো না। বরং নিজেই মাঝেমধ্যে বাড়ি এসেছে পরনে লুঙি, পায়ে পুলিশের জুতা।

গোলাপের মা তাকে বলেছে, আপনে এতো বড় চাকরি করেন, কতো টাকা মাহিনা পান, আর ছাওয়াল নিয়া মুই নাখায়া থাকো, এটা কেমন কথা ?

গোলাপের বাপ হেসেছেন। মলিন হাসি। সেই হাসির আড়ালে ঢেকে রেখেছেন মনের দুঃখ। গোলাপের মাকে বুঝতে দেননি—কতো কষ্টে আছেন তিনি। ৪৫ টাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রতিদিনের বেতন, ৪ টাকা উৎসব ভাতা। এটা পান যেদিন কাজ থাকে। প্রতিদিন কাজ থাকলেও মাসে বেতন ১৪০০ টাকার বেশি হতো না। আর এখন কোনোদিন কাজ থাকে, কোনোদিন থাকে না। কোনো মাসে হয়তো ৭ দিন কাজ পাওয়া গেলো, সে মাসে ৩০০ টাকা জুটলো। এই টাকায় নিজের ভরপেট খাওয়া হয় না। বাড়িতে কী টাকা পাঠাবে ? আর বউ-ছেলেকে আনা তো আকাশকুসুম কল্পনা মাত্র।

ছেলে বাপকে জিজ্ঞাসা করেছে, বাপো, তুমি বাঘ মারিবার পারেন।

হ্, বাপ, পারি।

ছেলে অবাক হয়ে গেছে। কয়টা বাঘ মারছেন ?

দুইশটা ?

ছেলেকে তিনি বলেননি, বাঘমারা নয়, তার কাজ গরুর ঘাস কাটা।

স্বামীর কথা ভাবতে ভাবতে গোলপের মায়ের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। তিনি আঁচলের আড়ালে মুখ লুকোলেন। কিন্তু তা ছেলের দৃষ্টি এড়ালো না। গোলাপ বললো, মা, তুই বাপের জন্য কান্নাকাটি করতেছিস ? চিন্তা করিস না, মোর মন ডাকি কইতেছে ব'লে আইজকায় বাপ ঢাকা থাকি চলি আসবে।

গতকাল মাত্র একটা চিঠি এসেছে গোলাপের মায়ের কাছে ঢাকা থেকে। গোলাপের বাবা লিখেছেন চিন্তা না করতে। লিখেছেন তাদের বাহিনীতে নানা ঘটনা ঘটছে। শিগগিরই অনেক কিছু নিয়ে বাড়ি ফিরবেন। সন্ধ্যার সময় গোলাপ ছিল কুল গাছটার নিচে, পাকা কুল কুড়োচ্ছিল খুঁজে খুঁজে।

এমন সময় সাবের এসে খবর দিলো, গোলাপ, তোর বাপ আসি গেছে।

গোলাপ দৌড়তে লাগলো। ঝুমুর ঝুমুর। তার মনে হলো পুলিশের মতো পোশাক পরে কাঁধে বন্দুক নিয়ে তার বাবা ফিরছেন।

সে গিয়ে প্রথমে বন্দুকটা একটু নেড়েচেড়ে দেখবে।

কিন্তু গোলাপ গিয়ে দেখলো বাড়ির ভেতরে লোক গিজগিজ করছে। সবাই তার বাবাকে ঘিরে আছে।

সংবাদপত্র থেকে

'আনসার বিদ্রোহ দমনের সময় শফিপুরে নিহত আনসার আলী মর্তুজার লাশ কাফনবিহীন উলঙ্গ রক্তাক্ত অবস্থায় তার গ্রামের বাড়ি রংপুরের গঙ্গাচড়া থানার দক্ষিণ কোলকন্দে পাঠানোর বিষয়ে আনসারবাহিনীর ডিজি কিছু জানেন না বলে তিনি ভোরের কাগজ-এর প্রশ্নের উত্তরে জানান। (৮ ডিসেম্বর ১৯৮৪)

প্রিয় পাঠক, উপরের ফ্যান্টাসির সঙ্গে শেষের খবরটুকুর কোনো সম্পর্ক নেই। বেগম জিয়া যে বলেছেন, তিনি সাত্তার নন, তাঁর এ বক্তব্যের সঙ্গেও উপরের ফ্যান্টাসির কোনো সম্পর্ক নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাংলা একাডেমী ফ্যান্টাসি

মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ সাহেব নিরাপোস ধরনের মানুষ। অবৈধ সবকিছুর বিরুদ্ধে তিনি সোচ্চার, সক্রিয়। গতবছর এই বইমেলায় বাংলা একাডেমী চত্বরে এমনকি মুক্তিযোদ্ধা ছাত্র কমান্ড/নির্মূল কমিটির অনুমোদিত স্টল সরানোর জন্য তিনি অনশন করেছেন, পরে জাহানারা ইমাম এসে তার অনশন ভঙ্গ করান। এ বছরও তিনি নিরাপোস। এবার তার কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করা। বইমেলায় রমজান মাসের পবিত্রতা-পরিপন্থী কোনো কিছু করতে তিনি দেবেন না। এজন্য বাংলা একাডেমী বইমেলায় সবার আগে যা করা হয়েছে, তা হলো একাডেমীর মঞ্চ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পর্ব বাদ দেয়া। গান-বাজনার মতো হারাম, বেশরিয়তি কর্ম বাংলা একাডেমী মঞ্চে হতে পারে না। আলোচনা চলতে পারে—ওটাতো হারাম নয়, কিন্তু গান ? নাউযুবিল্লাহ। নাচ ? আস্তাগফেরুল্লাহ। নাটক ? তওবা, তওবা। প্রতিবছর বইমেলায় বিপুল দর্শকের উপস্থিতিতে মঞ্চজুড়ে যা হয়েছে, এবার তা হতে পারে না। হতে দেয়া যায় না। শুধু কি হারাম নৃত্যগীতচর্চা বন্ধ করা ? না। এরপরের প্রধান চিন্তা মানুষকে তারাবির নামাজ পড়ার সুযোগ দেয়া। সে-কারণে সিদ্ধান্ত হলো—মেলা বসবে বেলা ১০টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত। বাদ মাগরেব মেলা বন্ধ। কিন্তু পাবলিক নির্দেশ মানছে না। প্রথম দিনটা কোনোমতে মেনে নেয়া গেলো। দ্বিতীয় দিনে মেনে নেয়া যায় না। সন্ধ্যার পরে একাডেমীর ফটক বন্ধ করে দেয়া হলো। তোরণে পুলিশ। কঠিন প্রহরা। না, কাউকে ঢুকতে দেয়া হবে না। সারাদিন রোজা রেখে ইফতারি সেরে যে সম্প্রতি এসেছিল মেলায় বই কিনবে বলে, ভেতরে ঢুকতে পারলো না, রাস্তা থেকেই ফিরে গেলো। কিন্তু তাতে কী ? সন্ধ্যার পর গাউসিয়া খোলা, নিউমার্কেট খোলা ? তা হোক। ওখানে বেশরিয়তি কাজ চলতে পারে, একাডেমীর পাক চত্বরে তা হতে দেয়া যাবে না। বাংলা একাডেমীর এই পবিত্রতাপ্রীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এক নওজোয়ান লেগে পড়লো—আর কীভাবে বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে রমজানের পবিত্রতা রক্ষা করা যায়। সেই যুবক দেখা করলো হারুন-উর-রশিদের সঙ্গে।

হুজুর, আমার কতোগুলো সুপারিশ আছে। আপনি কি বিবেচনা করবেন ?

ছেলেটি একটি কাগজ এগিয়ে দিলেন মহাপরিচালক সমীপে। মহাপরিচালক কাগজটি পড়লেন।

সুপারেশনামা

১। যেহেতু প্রাণীর ছবি আঁকা শরিয়তের বরখেলাপ, সেহেতু প্রাণীর ছবি আঁকা সম্বলিত সকল পুস্তক একাডেমীর বইমেলা হইতে অপসারণ।

২। উন্মুক্ত স্থানে আওরত-জেনানাদের আনাগোনা শরিয়তের লংঘন ও পর্দাপ্রথার বিরোধী। সুতরাং বইমেলায় মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধকরণ।

৩। দুপুরে জোহরের নামাজ ও সন্ধ্যায় মাগরিবের নামাজের জামাতে যাহাতে সকল মুসলমান বাধ্যতামূলকভাবে উপস্থিত হয়, তাহা নিশ্চিত করা। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সময় স্টল ও একাডেমীর অফিস বন্ধ রাখুন এবং লাঠিহাতে বিশেষবাহিনী মোতায়েন করুন। তাহারা প্রত্যেক মুসলমানকে জামাতে হাজির হইতে বাধ্য করিবে। মেলার প্রধান ফটকে 'একুশ মানেই মাথা নত না করা' ব্যানারের স্থলে 'রমজান মাসের পবিত্রতা বজায় রাখুন' লেখা ব্যানার ঝোলানো।

৪। ভবিষ্যতে 'অমর একুশে গ্রন্থমেলা'র বদলে 'মাহে রমজান কেতাব মাহফিল' আয়োজন করা।

এই তালিকাটি আরো দীর্ঘ। এই পর্যন্ত পড়ে হারুন-উর-রশিদ সাহেব থামলেন। তারপর যুবকের দিকে তাকালেন। এই যুবককে ঘাটানো ঠিক হবে না। তিনি বললেন, আপনি ইফতারের সময় আসুন। আমরা একসঙ্গে ইফতারি করবো। আর আপনার 'সুপারেশনামা' আমার কাছে থাক। এটা আমার দরকার হবে। এটা আমার বিবেচনার মধ্যে রইলো। যুবকটি বিদায় নিলো।

হারুন-উর-রশিদ সাহেব সুপারেশনামাটি গোটাটা পড়লেন, তারপর যত্ন করে রেখে দিলেন। খুবই জরুরি কাগজ। এই সরকারের আমলে এই কাগজটির দরকার নেই কিন্তু ভবিষ্যতে দরকার হতে পারে। কে কখন ক্ষমতায় যায়, বলা তো যায় না। এবার এই যে তিনি এতো সোচ্চার হয়েছেন, সক্রিয় হয়েছেন রমজানের পবিত্রতা রক্ষায়, এটা তাকে করতে হচ্ছে কৌশলগত কারণে। উওপর থেকে চাপ আসছে। এবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পর্যন্ত মেলার পরিসর ছোট করার জন্য চাপ এসেছে। বিশ্ববিদ্যালয় তাদের রাস্তা ব্যবহার করতে দেবে না। শেষে ছাত্রসংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতাদের হস্তক্ষেপে মেলার পরিসর বাড়লো। এখন যদি তিনি রমজানের পবিত্রতার পক্ষে অবস্থান না নেন, তাহলে হয়তো বইমেলাই করতে দেয়া হবে না। কিংবা নানা ধরনের সমালোচনার বাণ নিক্ষিপ্ত হবে। তারচেয়ে কৌশলী হওয়া ভালো। একূল ওকূল দুকূলই রক্ষা। কিন্তু এভাবে আর কতোদিন ? এভাবে ছাড় দিতে দিতে যদি এমন হয়, একদিন দেখা গেলো বাংলা একাডেমীর নাম বদলে তাহজিব তামুদ্দুন একাডেমী রাখা হয়েছে, সেদিন কী হবে ?

নিজেকে খুব অসহায় মনে হলো হারুন-উর-রশিদ সাহেবের। তিনি তার শরীরের ভার ছেড়ে দিলেন মহাপরিচালকের চেয়ারটিতে। ক্লান্তি, বড়ো ক্লান্তি! ক্লান্তি আমায় ক্ষমা করো প্রভু। রবীন্দ্র সঙ্গীতের লাইন এসে পড়লো তার মুখে। তিনি তাড়াতাড়ি জিভ কাটলেন। চারদিকে তাকালেন। কেউ শুনে ফেলেনি তো ?

অবাক বইপাঠ

এক.

ভদ্রলোক ঘরে নেই। ফেব্রুয়ারি মাস। বইমেলা জমে উঠেছে। নিশ্চয়ই বইমেলায় গিয়েছেন। বাড়ির পরিচারককে জিজ্ঞেস করলাম, কিরে, সাহেব কোথায় গিয়েছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তার জবাবে আমার আন্দাজের সমর্থন মিললো। লাইব্রেরিতে গেছে। বই আনতে।

কাগজের প্যাকেট হাতে তিনি ফিরলেন।

জিজ্ঞেস করলাম, কী বই আনলেন ?

বললেন, 'হাম আপকে হ্যায় কোন্। লেটেস্ট। মাধুরী আর সালমান খান।'

আমার আক্কেল গুড়ুম। তবে যে শুনলাম লাইব্রেরিতে গেছেন, বই আনতে।

'ঠিকই শুনেছো। লাইব্রেরিতেই তো গিয়েছিলাম। ভিডিও লাইব্রেরিতে। বইই তো আনলাম। লেটেস্ট হিন্দি বই।'

এরপর আর কথা চলে না।

দুই.

শ্যালক বললো, দুলাভাই, বিশটা টাকা হবে ?

কেন, কী করবে ?

বই কিনবো।

শ্যালকবাবু বইমেলায় গেলো।

ফিরে এলো একটি লুডু হাতে।

এই তোমার বই ? দুলাভাই শুধালেন।

জি। পুস্তকের সংজ্ঞা জানেন না ?

দুই মলাটের মধ্যে ছাপা কাগজকে বই বলে। সংজ্ঞা অনুযায়ী লুডু একটা আদর্শ বই।

তিন.

দু-বন্ধু এসেছে বইমেলায়। জীবনে এই প্রথম তাদের বইমেলায় আগমন। বইমেলায় এসে কিছু না কিনে ফেরাটা ঠিক নয়। চল বই কিনি, একজন বললো। না ভাই, আমি বই চিনি না, কিনে বাসায় নিয়ে গিয়ে দেখবো ঠকে গেছি। সেদিন জাপানি কাপড় মনে করে একটা দেশী কাপড়ের প্যান্টপিস কিনে নিয়ে গেছি।

আরে ধুৎ। আমার সঙ্গে আয়। এমন বই কিনে দেবো, দেখবি একেবারে ফার্স্ট ক্লাস।

তারা বইয়ের স্টলে গেলো। পারঙ্গম বন্ধুটি বললো, ভাই, দেখান দেখি আপনাদের লেটেস্ট কী কী বই এসেছে ?

আপনি কী বই নেবেন, উপন্যাস, গল্প, নাকি প্রবন্ধ ? দোকানির জিজ্ঞাসা।

এখন লেটেস্ট চলছে কি, তাই বলেন। ক্রেতার পাল্টা জবাব।

বিক্রেতা বুঝে ফেললেন, ভদ্রলোক একেবারে আপটুডেট। গতকালের বইটিও তিনি পড়ে ফেলেছেন। সদ্য-আসা একটা বই তিনি এগিয়ে দিলেন—এটা আজই এসেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দাম কতো ?

দোকানি দাম বললেন।

আনাড়ি বন্ধুটি তখন চালু বন্ধুটির হাতে চিমটি কাটছে—মনে হয় ঠকাচ্ছে, চল অন্য কোনো দোকানে দেখি।

তারা অন্য দোকানে গেলো। ভাই এবার মেলায় কোন্‌টা চলছে খুব বেশি ?

আমাদের হালফ্যাশনের একটি বই চাই। লেটেস্ট মডেলের।

চার.

রহিম সাহেব বইয়ের খুব যত্ন করেন। এ বইয়ের একটি পাতাও তিনি ছিঁড়তে চান না। চান না যে-বইটি শেষ হোক। তবু যে-কোনো বই একসময় শেষ হয়ে যায়। তখন তিনি হন্যে হয়ে একটা নতুন বই আনান। এই বই হচ্ছে পাসবই—ব্যাংকের পাসবই।

পাঁচ.

পিংকি ইদানীং খুব পুস্তকপ্রেমিক হয়ে উঠেছে। প্রায়ই সে ছোটভাইকে পাঠায় পাশের ফ্লাটে, বই দিয়ে। ছোটভাই ও-বাসা থেকে আরেকটা বই নিয়ে আসে। চলছে বইয়ের আদান-প্রদান। একদিন ধরা পড়ে গেলো সবাই। পিংকির বইয়ের ভেতর আসলে থাকে চিঠি।

ছয়.

বই সম্পর্কে তোমার মনোভাব কেমন ?

বই। ওতো মাথায় করে রাখি।

বলো কি ?

হ্যাঁ। একেবারে আভিধানিক অর্থেই মাথায় করে রাখা। আমার বালিশ নেই। আছে একটা ডিকশনারি। তা মাথার নিচে দিয়ে রোজ রাতে ঘুমিয়ে পড়ি।

সাত.

আপনি কি কোনো লেখককে চেনেন ?

হ্যাঁ, চিনবো না কেন ? আমার পাড়াতেই তো একজন লেখক থাকে। শুধু লেখক নয়। লেখকদের নেতাও। দলিল লেখক সমিতির সাধারণ সম্পাদক।

আট.

চল যাই মেলায়, বই দেখি।

চল।

দেখেছিস ? ওই বইটা ?

কেমন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রচ্ছদ তো খুবই ভালো। হোয়াইট প্রিন্টে ছাপা।

গদ্য না কবিতা ?

কবিতা, কবিতা।

কোন্‌টারে, কোন্ বইটা। আমি এদিকটায় একটা চকচকে প্রচ্ছদ দেখে ফলো করলাম, না, একেবারে বাজে বই, নিউজপ্রিন্ট।

এটা একটা আস্ত ডিকশনারি। তুই জিতেছিস মনে হচ্ছে। কোন্ বইটা।

ওই যে লাল সালোয়ার-কামিজের পাশে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, চুলকাটা। ওইটা। নে, জোরে হাঁট। কি ফিগার দেখেছিস, পুরো চার ফর্মা।

গুরুর দয়ায় আজ যা দারুণ বই আসছে মেলায়।

সামুদ্রিক ফ্যান্টাসি

রেডিওতে খবরটা শুনে আমরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম। অগ্নিদ্বীপের আগ্নেয়গিরিটা জেগে উঠেছে। লাভা উদগীরণ শুরু হয়েছে। দ্বীপের ১০ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে যেই যাবে, তার আর জীবিত ফিরে আসার সম্ভাবনা নেই। ওই দ্বীপের গাছপালা সব মরে গেছে ইতিমধ্যেই। পাখিরা পালিয়ে গেছে। যারা পালাতে পারেনি, তাদের অগ্নিদগ্ধ লাশ ভাসছে সমুদ্রের পানিতে। পোড়া মাংসের গন্ধে ওই দ্বীপের বিশ কিলোমিটার দূরের বাতাসও ভারি হয়ে আছে। অগ্নিদ্বীপ এখন পরিণত হয়ে গেছে মৃত্যুদ্বীপে।

আমরা জাহাজবাসীরা, খবরটি শুনে আঁতকে উঠলাম সঙ্গত কারণেই। আমাদের জাহাজের গতিপথ ওই অগ্নিদ্বীপের কাছ ঘেঁষে। অগ্নিদ্বীপের দু-কিলোমিটার পাশ দিয়ে যাবে আমাদের জাহাজ। এরকমই ঠিক হয়ে আছে। অগ্নিদ্বীপের আগ্নিয়গিরিগুলো এতোদিন পর্যন্ত ছিল মৃত। সহসাই এগুলো জেগে উঠেছে। এখন একমাত্র উপায় জাহাজের গতিপথ বদলানো। আর মাত্র ১০ কিলোমিটার গেলেই আমাদের জাহাজ ঢুকে যাবে আগ্নেয়গিরির পরিধির মধ্যে। দূরবীন লাগিয়ে আমরা দেখতে লাগলাম আগ্নেয়গিরির ধোঁয়া, আগুন। সব দেখা যাচ্ছে। গনগনে আগুন। লাল মেঘের মতো। দূরবীনের লেন্সে সব স্পষ্ট। বাতাসে ভাসছে ছাই। আমাদের জাহাজের সঙ্গে এসে জমছে সেই ছাইকণা। জাহাজের কাপ্তেন একজন বুড়ো। রেডিওতে বারবার সতর্কবাণী পাঠ করা হচ্ছে। অগ্নিদ্বীপের আশপাশে কোনো জাহাজ যেন না যায়, সাবধান বাণী উচ্চারণ করা হচ্ছে। একগুঁয়ে বুড়োর পাশেই একটা রেডিও। তিনি নিজেও এই সতর্কতা বাণী শুনছেন। সুতরাং চিন্তার কিছু নেই। জাহাজের মাথা নিশ্চয়ই ঘোরানো হবে। তাতে পথের দৈর্ঘ্য কিছুটা বাড়বে। গন্তব্যে পৌছতে দেরি হবে। হয়তো সঙ্কট দেখা দেবে খাদ্যের, পানীয়ের। তবুও পথ পরিবর্তনটা জরুরি। এটাই এখনকার কর্তব্য। জেনেশুনে আগ্নেয়গিরির লাভার নিচে জীবন সঁপে দেয়া যায় না। কেউ দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পারে না। ১২ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলো। জাহাজ বিপদসীমার প্রায় কাছাকাছি। এখনই জাহাজের গতিপথ বদল করা দরকার। কিন্তু একগুঁয়ে বুড়ো তা করছেন না।

জীবন বাঁচানো ফরজ। আমরা জাহাজের যাত্রীরা একটা সভা আহ্বান করলাম। সভায় গরম গরম বক্তৃতা হলো। সবাই উৎকণ্ঠিত। সবার মধ্যে জীবন বাঁচানোর আকুলতা। একটা কমিটি গঠিত হলো। ঠিক হলো এই কমিটি যাবে একগুঁয়ে বুড়োর কাছে। তাকে বুঝিয়ে বলবে আসন্ন বিপদের কথা।

কমিটির সদস্যরা কাপ্তেনের কাছে গেলো। তাকে জানালো তাদের দাবি। এক দফা, এক দাবি—অবিলম্বে জাহাজের গতিপথ বদলাও। অগ্নিদ্বীপের কাছ থেকে জাহাজ সরাও। যাত্রীদের প্রাণ বাঁচাও। এই 'দাবিনামা পেশ' কর্মসূচি সফল হলো। নেতৃবৃন্দ এক বিবৃতিতে কর্মসূচির সাফল্যে সকলকে অভিনন্দন জানালেন।

কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হলো না। জাহাজের কাপ্তেন 'একগুঁয়ে বুড়ো' জাহাজের দিক বদল করলেন না। জাহাজ ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে অগ্নিদ্বীপের দিকে। বাতাসে ভাসছে অগ্নিগিরির ছাই। শ্বাস নেয়া কষ্টকর হয়ে পড়েছে। সমুদ্রের পানি ঘোলা। মৃত পশুপাখির লাশ পানিতে। এখন আর দূরবীন লাগছে না, খালি চোখেই দেখা যাচ্ছে অগ্নিদ্বীপের আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত। লাল আগুন, কালো ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে আকাশে।

জাহাজের মাথা ঘোরাতেই হবে। কাপ্তেনের হাতে সব ক্ষমতা, কেবল তিনিই পারেন এই সম্মিলিত মৃত্যু থেকে আমাদের রক্ষা করতে।

সংগ্রাম কমিটি আরো কঠিন কর্মসূচি দিলো। ঠিক হলো, কাপ্তেনের কানের কাছে সবাই মিলে স্লোগান দেওয়া হবে।

বিপুল জমায়েত হলো কাপ্তেনের রুমের পাশে। স্লোগান উঠলো—জাহাজের গতিপথ বদলাতে হবে। এক দফা, এক দাবি।

আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলো। জাহাজের গতিপথ বদলানোর আন্দোলন। পরের কর্মসূচি—যার সঙ্গে দেখা হবে কাপ্তেনের, সেই কাপ্তেনকে চিৎকার করে বলবে—জাহাজের মুখ ঘোরাও। অগ্নিদ্বীপের কাছ থেকে জাহাজ সরাও।

আমাদের জাহাজে যারা ছিলেন কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষক, শিল্পী–তারা সুযোগ পেয়ে বক্তৃতাবাজি শুরু করলেন। একদল বললেন, সংগ্রাম কমিটি যা করছে,তা সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক। জাহাজের কাপ্তেনের বিরুদ্ধে কোনোরকমের কর্মসূচি দেয়া গণতন্ত্রসম্মত নয়। এটা জাহাজের বিধিবিধানের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

জাহাজের যাত্রীরা বুদ্ধিজীবীদের এসব কথামালায় দ্বিধাবিভক্তিতে ভুগতে লাগলো। এত বড়ো একটা বিপদ, জাহাজের কাপ্তেন কি তা বোঝেন না ? নিশ্চয়ই তার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে। নিশ্চয়ই তিনি জাহাজের ভালোই চান। নিশ্চয়ই তিনি এমন কোনো পথ চেনেন, যাতে পথও সংক্ষিপ্ত হয়, খাদ্যপানীয়ের সঙ্কট এড়ানো যায়, আবার অগ্নিগিরির লাভার নিচে পড়ে জীবনও না দিতে হয়। কেউ কেউ এ ধরনের কথা ভাবতে লাগলো। বাকিরা বললো, আর সময় নেই। এখন মুক্তির পথ একটাই—একগুঁয়ে বুড়োর' অপসারণ। তাকে তার পদ ছাড়তে হবে। এরপর জাহাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চালাবে 'সংগ্রাম কমিটি'র মনোনীত ব্যক্তিরা। সংগ্রাম কমিটি তাদের দাবির সমর্থনে আন্দোলন তীব্র করে তুললো। সারা জাহাজ জুড়ে তীব্র বিক্ষোভ সংগ্রাম।

জাহাজের ছিলেন এক প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ। তিনি সচরাচর কোনো কথা বলেন না। তিনি এবার মুখ খুললেন। তিনি জাহাজের সবাইকে ডেকে পাঠালেন। সকলে তার সামনে সমবেত হলো।

প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ বললেন, উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ। আপনাদের আজ আমি ডেকেছি একটা মূল্যবান কথা বলার জন্য। আপনাদের অবগতির জন্য আমি একটা জরুরি কথা বলতে চাই। তা হলো এই সংগ্রাম কমিটি অজ্ঞ।

সকলে স্তম্ভিত হয়ে গেলো। প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ এ-কী শোনালেন। 'একগুঁয়ে বুড়ো' যেখানে সবাইকে মারতে বসেছে, সেখানে অজ্ঞ হলো সংগ্রাম কমিটি ? এই একগুঁয়ে বুড়োর তো উচিত ছিল বহু আগেই জাহাজের গতিপথ বদলানো, এজন্য সংগ্রাম কমিটি গঠন করারই দরকার ছিল না। সমুদয় অচলাবস্থার জন্য তো ওই 'একগুঁয়ে বুড়ো'ই দায়ী। তাহলে প্রাজ্ঞ কেন সংগ্রাম কমিটিকে দায়ী করছে ?

উপস্থিত জমায়েত থেকে একজন বললো, হে জ্ঞানতাপস, আপনি কেন সংগ্রাম কমিটিকে অজ্ঞ বলছেন। জাহাজিদের আন্দোলনের ফলে শিশু ও রোগীদের যে অসুবিধা হচ্ছে, সে-বিষয়ে এই কমিটি অজ্ঞ বলে ?

প্রাজ্ঞ বললেন, না।

জাহাজের গতিপথ বদলানো হলে জাহাজের খাদ্য ও পানির অভাব দেখা দেবে, সংগ্রাম কমিটি সে-বিষয়ে অজ্ঞ বলে ?

প্রাজ্ঞ বললেন, না।

জাহাজে আন্দোলনের ফলে জাহাজের সামাজিক শৃঙ্খলা বিনষ্ট হচ্ছে, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে, সংগ্রাম কমিটি এ বিষয়ে অজ্ঞ বলে ?

প্রাজ্ঞ বললেন, না।

যাত্রীদের বিয়ে, জন্মদিন ও অন্যান্য অনুষ্ঠানের তারিখ পেছাতে হচ্ছে, সংগ্রাম কমিটি এ বিষয়ে অজ্ঞ বলে ?

প্রাজ্ঞ বললেন, না।

তাহলে ? তাহলে কেন আপনি সংগ্রাম কমিটিকে 'অজ্ঞ বলছেন ?

কারণ সংগ্রাম কমিটি জানে না, এই জাহাজের কাপ্তেন বধির। তিনি কানে শোনেন না। সংগ্রাম কমিটি তার কাছে গিয়ে যা বলেছেন, তিনি সেসবের কিছুই শোনেননি। তিনি রেডিওর সতর্কতা বাণীও শোনেননি। এমনকি মিছিলের উচ্চকণ্ঠ সমবেত স্লোগানও তিনি শোনেননি। সংগ্রাম কমিটি অজ্ঞ, কারণ তারা এই মূল্যবান তথ্যটি জানেন না। তারা একজন বধিরের কানে তাদের দাবি পৌছানোর জন্য কথামালার আশ্রয় নিয়েছেন। একই ধরনের কর্মসূচি দিয়েই চলেছেন।

'অজ্ঞ' আর কাকে বলে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দারুণ এক সেমিনার!

আবেদ আলী ঘুম থেকেউঠে দেখে সর্বনাশ, সাড়ে আটটা বেজে গেছে। নয়টায় তাকে পৌঁছতে হবে সেমিনার হলে। পাঁচতারা হোটেলের বলরুমে সেমিনার। যে-সে কথা নয়। খুব বড়ো ধরনের সেমিনার। এ ধরনের সেমিনারে উপস্থিত থাকতে পারাটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। এই সৌভাগ্য আবেদ আলীর কপালে জোটার কথা নয়। সেমিনারটি জাতীয় দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের জন্যে বিষয়-সংক্রামক বাধির সংবাদ পরিবেশন। সেমিনার ফর দি এডিটরস অন ইনফেকশানস ডিজিজেস। তার পত্রিকার সম্পাদক দেশের বাইরে। তিনি দায়িত্ব দিয়ে গেছেন বার্তা সম্পাদককে। বার্তা সম্পাদকের অসুখ। তিনিও সেমিনারটিতে হাজির হতে পারবেন না। কেউই যাবে না, যখন এ সিদ্ধান্ত হতে যাচ্ছিল, তখন আবেদ আলী এগিয়ে এসেছে।

আমি যাই ?

তুমি যাবে ? আচ্ছা, যাও। কেউ না যাবার চেয়ে তোমার যাওয়া ভালো।

এভাবে অতিশয় জুনিয়র এক রিপোর্টার হয়েও আবেদ আলীর সুযোগ এসেছে এতো বড়ো সেমিনারে হাজির হবার।

সকাল নটায় সেমিনার। আবেদ আলী রিপোর্টার মানুষ। এতো সকালে ঘুম থেকে ওঠা তার অভ্যাস নয়। সে সচরাচর ঘুম থেকে ওঠে সকাল এগারোটায়। নয়টার সেমিনারে যেতে হলে কমপক্ষে সাড়ে সাতটায় ঘুম থেকে ওঠা দরকার। শেভ করতে হবে, গোসল করতে হবে। আবেদ আলীর হাতে সময় কম। সে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকলো। তাড়াহুড়া করতে গেলে নানা ধরনের ঝঞ্ঝাট বাধে। আবেদ আলীরও বাধতে লাগলো। শেভ করতে গিয়ে চিবুকের কাছটা কেটে গেলো। ইস্ত্রি করা শার্ট বের করে পরতে গিয়ে দেখলো বুকের কাছে একটা বোতাম নেই। নয়টা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি। এখন আর নাশতা করার সময় নেই। নাশতার টেবিলে চা। চা না খেয়ে বেরুলে চোখ থেকে ঘুম যাবে না। যে কাজটা আবেদ আলী কখনো করে না, আজ তা করতে হলো। সে পিরিচে ঢেলে চা ঢকঢক করে খেয়ে নিলো কয়েক নিমিষে।

হোটেলটা আবেদ আলীর বাসার খুব কাছেই। চার টাকায় রিকশায় যাওয়া যায়। হাতে সময় মোটে তিন মিনিট। আবেদ আলী ঝুঁকি নিতে নারাজ। সে একটা স্কুটারে উঠে বসলো। পকেটের বিশ টাকা হাতে নিয়ে রাখলো। এক মিনিটেই সে পৌঁছে গেলো হোটেলের সামনে। হাতে এখনো দুমিনিট আছে। আবেদ আলী হাঁফ ছাড়লো। যাক, এখন ধীরে ধীরে ঢোকা যাবে। দেরি হয়নি মোটেই। বলরুমের সামনে গিয়ে সে অবাক। এখনো কেউ আসেনি। দুজন কর্মচারী ধরনের লোক একটা ব্যানার টাঙাচ্ছে। ব্যানার দেখে আবেদ আলী আশ্বস্ত হলো। না, সে ঠিক জায়গাতেই এসেছে। ব্যানারে সেমিনারটির উদ্যোক্তাদের নামও লেখা। তিনটি প্রতিষ্ঠান মিলিতভাবে আয়োজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করেছে এই সেমিনারের। এক. স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্য সংস্থা। এটি স্বাস্থ্য-বিষয়ক এনজিওদের সমন্বয়ক সংস্থা। দেশের একটি প্রধান এনজিও। দুই. জাতীয় তথ্য বিভাগ। এটা তথ্য-বিষয়ক সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং তিন. সোর্ড ফাউন্ডেশন। এটা হচ্ছে একটি দাতা সংস্থা। খুবই বড়ো ধরনের দাতা সংস্থা। দেশের এনজিওগুলোর অনেক প্রকল্পের টাকা যোগান দেয় এরা। আবেদ আলী অভিভূত হয়ে গেলো। কত্তো বড়ো সেমিনার! তিন বড়ো প্রতিষ্ঠান মিলে আয়োজন করছে এ সেমিনারটি! যা-তা কথা! একটা এনজিও, আরেকটা এনজিওর বাবা। ডোনার এজেন্সি। হবেই না বা কেন ? সংবাদপত্রের এডিটরদের সেমিনার। যেমন-তেমন করে আয়োজন করলে কি আর চলে!

সাড়ে নয়টা বাজে! তবু ময়দান ফাঁকা। উদ্যোক্তাদের একজন-দুজন কেবল আসছেন। আবেদ আলী কাউকেই চেনে না। সে অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো। শেভ করতে চিবুক কেটে ফেলেছে। জায়গাটায় নিশ্চয়ই দাগ হয়ে গেছে। রক্ত শুকানোর দাগ। আবেদ আলী বুঝতে পারলো না তার বসা উচিত নাকি দাঁড়িয়ে থাকা উচিত। বিশাল টেবিল। চারদিকে গোল করে চেয়ার সাজানো। শখানেক চেয়ার হবে। পাঁচতারা হোটেলের উর্দিপরা পরিচালকরা ব্রেকফাস্টের ট্রলি ঠেলছে। চায়ের আয়োজন হচ্ছে। দশটা বাজে। সেমিনার শুরু হতে এখনো বেশ বাকি—বোঝা যাচ্ছে। সম্ভবত এখনো বক্তারাই আসেননি। আবেদ আলীর খিদে পাচ্ছে। একজন-দুজন করে কর্মকর্তা ধরনের লোক আসছে। তারা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করছে। আবেদ আলী এদের কাউকে চেনে না। কেবল জাতীয় তথ্য-বিভাগের প্রধানকে সে চিনতে পারলো। দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকদের কেউ এখনো আসেননি। কোনো রিপোর্টারও আসেনি। রিপোর্টাররা এলে তার ভালোই লাগতো। সবাই তার বন্ধু মানুষ, পরিচিত, বিভিন্ন সভা-সমিতি অনুষ্ঠানে দেখা হয়। কোনো রিপোর্টার এলে তার একাকিত্বটুকু ঘুচতো। এইমাত্র এলেন শহিদুর রহমান। সাপ্তাহিক বিগত যৌবনের সম্পাদক। শহিদ সাহেব এসে চারদিকে তাকিয়ে পরিস্থিতি বুঝে নিলেন। বললেন, আজ আমার খুব তাড়া, আমি থাকতে পারবো না। তিনি বিদায় নিলেন। একমাত্র সম্পাদকটিও চলে গেলো। শালা। আবেদ আলী বললো মনে মনে।

এগারোটা বেজে গেছে। সকালবেলার ঘুমটার জন্য আবেদ আলীর আফসোস হতে লাগলো। ব্রেকফাস্ট সাজানো একটা বড়ো টেবিলে। সবাই সেই টেবিলে গেলেন। আবেদ আলীও। পাঁচতারা হোটেলের ব্রেকফাস্ট। খুবই কঠিন জিনিস। আদবের সঙ্গে ভক্ষন করা উচিত। আবেদ আলী যথাযোগ্য মর্যাদায় টিস্যু পেপার দিয়ে ধরে একটা চিকেন পেটিসে কামড় দিলো। সাড়ে এগারোটা বেজে গেলো নাশতা শেষ হতে। সেমিনার শুরু হতে যাচ্ছে। গোলটেবিলটা ঘিরে সবাই বসে পড়ছে। অল্পকজন লোক। এতো বড়ো টেবিলের চারদিক পূর্ণ হচ্ছে না। একজন উদ্যোক্তা বললেন ফাঁক ফাঁক করে বসতে, যাতে লোক বেশি দেখা যায়। নিজ নিজ নাম লেখার জন্য মার্কার কলম আর আইডেন্টিটি কার্ড বিলি করছে একটি মেয়ে। অন্যরাও নিজের নিজের নাম ঝুলিয়েছে। অনুষ্ঠান ঘোষণার জন্য আনা হয়েছে টেলিভিশনের একজন অভিনেত্রীকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সেমিনার শুরু হয়ে গেলো। প্রথমে বললেন একজন টেকো মাথা ডাক্তার। সংক্রামক ব্যাধি বিষয়ে তিনি খুবই মূল্যবান বক্তব্য রাখলেন। মাঝেমধ্যে প্রজেক্টরে স্লাইড দেখালেন। তারপর বললেন একজন এনজিও নেতা। ইনি স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্য সংস্থার কর্ণধার। বয়স চল্লিশের বেশি নয়। ভালোই বললেন ভদ্রলোক। কলেরা, ডায়রিয়া আর পেটের পীড়ার পার্থক্য বোঝালেন। এইডস বিষয়ে সংবাদপত্রের ভূমিকা কী হওয়া উচিত—বেশ দক্ষতার সঙ্গে বোঝালেন তিনি।

প্রায় দেড়টা বাজে। এসি চলছে। শীত শীত লাগছে। আবেদ আলীর বাথরুম পাচ্ছে। ওঠাটা অভদ্রতা হবে ভেবে সে বসেই রইলো। এমন সময় সেমিনার কক্ষের বন্ধ দরজা ঠেলে ঢুকলেন একজন। গাজী বদিউর রহমান। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। টেলিভিশনে আইন বিষয়ক অনুষ্ঠানে প্রশ্নের জবাব দিয়ে ইনি দেশে খ্যাতিমান হয়েছেন। বদিউর রহমান এসে বসলেন আবেদ আলীর পাশের আসনে। বক্তৃতা শুরু হবার আগে সবাইকে একটা করে চামড়ার ব্যাগ দেয়া হয়েছে। তার ভেতরে সেমিনারের কাগজপত্র। শাদা খাতা। বল পেন আর আছে এক প্যাকেট কনডম। প্যানথার। উপস্থিত সকলকে এইডস বিষয়ে সচেতন করার জন্যই বোধহয় কনডমের প্যাকেট দেয়া হয়েছে। বদিউর রহমান ব্যাগ খুললেন। কাগজপত্র বের করলেন। প্যানথারের প্যাকেটটাও বেরিয়ে এলো। তিনি আবেদ আলীকে জিজ্ঞাসা করলেন—এটা কী ?

আবেদ আলী লজ্জা পেলো। কিন্তু স্মার্টনেস দেখানোর জন্য অবিচলিত গলায় বললো—কনডম।

বদিউর রহমান বোধ করি উত্তরটা শুনতে পাননি। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন– এটা কি ?

ভারি মুশকিল। একটু দূরেই দুজন মহিলা বসে আছেন। এদের পাশে জোরে কনডম শব্দটা আবেদ আলী উচ্চারণ করে কী করে ? 'অনারেবল এডিটরস'। এবার বক্তৃতা করতে উঠেছেন দাতা সংস্থা সোর্ড ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি। বিদেশী মানুষ বাংলা জানেন না। তিনি ইংরেজিতে বক্তৃতা দিচ্ছেন। সম্পাদকদের উদ্দেশে বক্তৃতায় তিনি বোঝাচ্ছেন—সংবাদপত্রে সংক্রামক ব্যাধি সংক্রান্ত খবর, ফিচার, লেখা কীভাবে ছাপা হলে জনগণের উপকার হবে। আবেদ আলী চারদিকের লোকগুলোর বুকের ব্যাজের দিকে তাকালো। প্রত্যেকের নাম পড়া যাচ্ছে। এদের মধ্যে একজনও সম্পাদক নেই। দৈনিক ইত্তেফাকের কেউ নেই। ইনকিলাবের কেউ নেই। জনকণ্ঠের কেউ নেই। ডেইলি স্টারের কেউ নেই। কোনো প্রথম শ্রেণীর পত্রিকারই কেউ নেই। সোর্ড ফাউন্ডেশনের এই বিদেশী প্রতিনিধি সে-কথা জানেন না। তিনি জানেন না এখানে যারা উপস্থিত তারা হলো উদ্যোক্তা-প্রতিষ্ঠান দুটির লোকজন। আর পিয়ন পর্যন্ত বসে আছে ডেলিগেট সেজে।

বক্তৃতা শেষ হলো। দুটো বেজে গেছে। টেবিলে টেবিলে দুপুরের খাবার দেয়া হয়ে গেছে। এবার ভোজনপর্ব। খাবার আছে তিন ধরনের। পোলাও, শাদা ভাত আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নানরুটি। মাছ, মাংস, কাবাব বিভিন্ন পদের। চিংড়িও আছে। আবেদ আলী রুটি খেলো। অনেকে রুটি, ভাত, পোলাও একই প্লেটে নিয়ে খাচ্ছে। আবেদ আলীর হাসি পেলো। খাও, বাঙালি খাও। পাঁচতারা হোটেলের খাবার। কত্তো টাকা বরাদ্দ হয়েছে এই সেমিনারের জন্য আল্লা মালুম। একটা বলরুম সারাদিনের জন্য ভাড়া করতে কতো লাগে কে জানে ? প্রায় একশো জনের দুবেলার খাবার। রুটি খেয়ে আবেদ আলী হাত বাড়ালো পুডিং আর আইসক্রিমের দিকে। কোল্ডড্রিংকের বোতল শেষ করে আবেদ আলী উঠে পড়লো। নাহ্ এবার বেরুনো যাক।

ফিরতে ফিরতে আবার আবেদ আলীর মাথায় এলো অঙ্কের হিসাব। কতো টাকা বাজেট ছিল এই সেমিনারের পেছনে। যতোই যাক, তোমার কি আবেদ আলী ? নিজেকেই বললো সে। তার কিছু যায় আসে না। এরকম সেমিনার হয় বলেইতো কতোলোক খেয়ে-পরে বেঁচে আছে। কতো এনজিও চলছে। কতোলোকের কর্মস্থান হচ্ছে। কতোলোকের দুবেলার অন্ন জুটছে। কতোলোক ফোর হুইল ড্রাইভ গাড়ি চালাচ্ছে। এসবের বিরুদ্ধে ভাবা অন্যায়। আবেদ আলী ঠিক করলো—সে এই সেমিনারের বিরুদ্ধে একটি কথাও লিখবে না।

হোটেলের বাইরে এসে সে ঢেঁকুর তুললো। পেটে পাঁচতারা হোটেলের খাবার। নেমকহারামি বলতে একটা কথা আছে। তার পক্ষে নেমকহারামি করা সম্ভব নয়। তার পক্ষে এ-কথা সম্ভব নয় যে—দেশের একটি বড়ো এনজিও, একটি বড়ো বিদেশী দাতা সংস্থা ও একটি বড়ো তথ্যপ্রতিষ্ঠান আয়োজিত সেমিনারে একজন সম্পাদকও উপস্থিত ছিলেন না। অথচ সেমিনারটি ছিলো সম্পাদকদের জন্যে।

কীভাবে মরবেন ?

আপনি তো মরেই খালাস। তারপর ঝড় যাবে যারা বেঁচে আছে তাদের ওপর দিয়ে। কীভাবে মরলো ব্যাটা ?

একটা কমন কথা হলো—হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। শুনে ডাক্তাররা হাসে। হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ না হয়েও কেউ কেউ মারা যায় তাহলে ? মৃত্যু তবে বলে কাকে ? সমস্তটা দেহ অচল, চোখবন্ধ, কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই, তবু লোকটা আছে। কারণ বুকের মধ্যে বেজে চলেছে—ধুকপুক, ধুকপুক। ওই ছোট্ট কলটি তার পাম্প করার কাজ বন্ধ করে দিলো, তো ইন্নালিল্লাহ...।

তবে কথা হলো, শুধু মরলেই হলো না, কীভাবে মরলো—সেটাও মুখ্য।

একটা খবর পড়ে শোনাই। ভোরের কাগজ, ৩ জানুয়ারি, ১৯৯৫।

'শীতের কবল থেকে বাঁচতে আগুনের আশ্রয় নিয়েছিল সে কিন্তু সে আগুন তাকে বাঁচতে দেয়নি। গত রোববার ভোররাতে গুলিস্তান হলের সামনে আগুন পোহাতে গিয়ে কাপড়ে আগুন ধরে গেলে ২৫ বছর বয়স্ক অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃত্যু হয়। এ ব্যাপারে মতিঝিল থানা কর্মকর্তা জানান, মহিলার মস্তিষ্ক বিকৃতি ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওই মহিলা মারা গেছেন, আল্লাহ তার ভালো করুন, তিনি বেঁচে গেছেন। কিন্তু এই সমাজ, এই রাষ্ট্র তাকে না-ও ছাড়তে পারে। মরেছেন তা বুঝলাম, কিন্তু মহিলা মরলেন কীভাবে ? তিনটি কারণ পাওয়া যাচ্ছে। শীতে, আগুনে, মস্তিষ্ক বিকৃতিতে। দেশে এখন দারুণ কনকনে শীত বইছে। শৈত্যপ্রবাহ। তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর ৪ ডিগ্রি কমে গেলেই বরফ। মানুষ মরতে শুরু করেছে। ভোরের কাগজ-এ ৭ জন, কনকণ্ঠে ৪০ জন শীতে মরেছে। এই সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। সরকার বলবে—না, শীতে একজনও মরেনি। শীতে যদি একজনেরও মৃত্যু ঘটে তাহলে সরকারের বদনাম। কাপড় দিতে পারেনি, আশ্রয় দিতে পারেনি—ব্যর্থ সরকার। তাই সরকার বলবে, না, একজনও শীতে মরেনি—সুতরাং গুলিস্তানের ওই মহিলাও শীতে মারা যায়নি। বিরোধী দল বলবে, এই সরকার এমন ব্যর্থ যে ওই মহিলা তিনবার মারা গেছেন, প্রথমে মরেছেন শীতে, দ্বিতীয় দফায় মরেছেন আগুনে এবং তৃতীয় দফায় মরেছেন মস্তিষ্ক বিকৃতিতে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানাবে সরকার—না, শীতে মরেনি। আগুনে মারা যায়নি। আগুনে মারা গেলে অগ্নিনির্বাপক বিভাগের দুর্নাম—তারাও বলবে, না, আগুনে মরেনি। আর পুলিশ বলছে, সে মারা গেছে মস্তিষ্ক বিকৃতিতে। দেশের মানসিক চিকিৎসা বিভাগ, ভবঘুরে নিরাময় কেন্দ্র সেক্ষেত্রে ফেঁসে যায়। একজন বিকৃত মস্তিষ্ক মহিলা ভোররাতে রাস্তায় ঘুরছে, ওরা করলো কী ? ওরা একযোগে প্রতিবাদ করে উঠবে—না, ওই মহিলার মোটেই মস্তিষ্ক বিকৃত ছিল না। আমরা যারা সংবাদপত্রে কিংবা পরিসংখ্যান বিভাগে কাজ করি, তারা বলবে—এ বছর জানুয়ারিতে শীতে মারা গেছে একজন, আগুনে মারা গেছে একজন আর মানসিক রোগে মারা গেছে একজন। একজন মহিলা তিনজন হয়ে যাবেন।

মৃত্যু ও মৃতব্যক্তিকে নিয়ে এই রসিকতা নির্মম হয়ে যাচ্ছে। পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই বিরক্ত হতে শুরু করেছেন। কিন্তু আমাকে দোষ দিয়ে লাভ কী ? ক্যাম্পাসে একজন ছাত্র যখন লাশ হয়ে যায়, তখন প্রধান বিবেচনা কী দাঁড়ায়—ছেলেটি মারা গেলো কিসে—পুলিশের গুলিতে ? প্রতিপক্ষের গুলিতে ? নাকি আত্মঘাতী হামলায় ? তিন ধরনের মতবাদই বাতাসে ছড়াতে থাকে। উত্তরাঞ্চলে যখন খাদ্যাভাব দেখা দেয়, তখন সংবাদপত্র বলতে শুরু করে—খাদ্যাভাবে ১৫ জনের মৃত্যু। সরকার বলে, হতেই পারে না, খাদ্যাভাবে এদেশে একজন মানুষকেও মরতে দেয়া হবে না। ওরা সবাই মারা গেছে ডায়রিয়ায়। যেন ডায়রিয়ায় মারা গেলে মৃত্যু কোনো ক্ষতিকর বিষয় নয়, শোকাবহ ব্যাপার নয়, অনাহারে মারা গেলেই একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়াতো।

কীভাবে আপনি মারা গেছেন, সেটা যেমন একটা ব্যাপার, কোথায় মারা গেছেন, ব্যাপার সেটাও। দুই থানার মধ্যবর্তী স্থানে একবার মারা গিয়ে দেখুনই না, কী টানা-হেঁচড়াটা হয়। ওই থানা বলবে, লাশ আমার না, ওদের। ওরাও বলবে, আমার না, ও-পারের ভাবছেন, থানা-পুলিশের কী দরকার ? সরাসরি কবরে নামিয়ে দিলেই হলো। আপনি তো মরেও অতিসরল থেকে গেলেন মশাই, নিয়মকানুন কিছুই জানেন না, অপঘাতে মরবেন অথচ থানা-মর্গ না হয়েই কবরে যেতে চান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তবে ভাই যেভাবেই মরুন না কেন, আততায়ীর হাতে মরবেন না। কারণ ওভাবে মরলে আপনি কেবল নিজেই মারা পড়বেন না, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই মারা পড়বে। সংবাদপত্রে নানা কিসসা-কাহিনী বেরুবে। আপনার সঙ্গে যতো মহিলার পরিচয় ছিল, বেরুতে শুরু করবে। আপনার কোনো মহিলার সঙ্গেই পরিচয় ছিল না। আপনার ছোটভাইটি একবার পাড়ার লিসা-মিশা-দিশাকে একটা চিঠিও কি দেয়নি ? ওটিই হবে হত্যাকাণ্ডের মূল রহস্য, কূল-কিনারা উদ্ধারের চাবিকাঠি। এই দুনিয়াটা যে কতো বড় দোজখ হতে পারে, আপনার নিকটাত্মীয়রা বুঝবেন। পাড়া-পড়শিরা আত্মপ্রসাদ অনুভব করবেন—ব্যাটা এমন ভিজে বেড়ালের মতো চলাফেরা করতো, মনে হতো ফেরেশতা, ছি ছি, তলে তলে এতো কিছু, পাড়ার নাম আর বাইরের মানুষের কাছে উচ্চারণ করার উপায় আছে ?

কাজেই মৃত্যুর মুহূর্ত ঘনিয়ে আসার আগেই ঠিক করুন—কীভাবে মরবেন। মরতে তো আপনাকে হবেই। না খেয়ে মরতে পারেন, ডায়রিয়ায় মরতে পারেন। বন্যায় মরতে পারেন, খরায় মরতে পারেন। সড়ক দুর্ঘটনায় মরতে পারেন, লঞ্চডুবিতে মরতে পারেন। আততায়ীর গুলিতে মরতে পারেন, ক্রসফায়ারে মরতে পারেন। পরিচারিকার হাতে মরতে পারেন, মরতে পারেন অভ্যুত্থানে-বিদ্রোহে-বিপ্লবে, সংঘাতে-সংঘর্ষে। মরার বহু উপায় আছে। 'খুন হবার দু-রকম পদ্ধতি' ফরহাদ মজহারের অনুবাদে (তরজমায়) আমরা পেয়েছি লাতিন আমেরিকান বিপ্লবী কবি রোকে ডাল্টনের কবিতায়। ওই কবিতার বিষয়—খুন আপনাকে হতেই হবে। দু-রকম পদ্ধতি আছে অপনাকে খুন করার। আপনিই বেছে নিন কোন্‌টি নেবেন।

এদেশটাও তাই। বলা হচ্ছে, শীতে মারা গেছে চল্লিশ-পঞ্চাশ-একশজন। কিন্তু আমাদের নেতৃপর্যায়ে তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। ঢাকায় বসে কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ দাঁত বের করে বলছেন—এখন যে যেভাবেই মারা যাক না কেন, দোষ হবে শীতের। যেমন আশ্বিন-কার্তিক মাসে সব দোষ হয় খাদ্যাভাবের। আমরা এই যুক্তি মেনে নিয়ে দায়মুক্ত বোধ করি। কিন্তু যদি বলি মৃতদের মধ্যে প্রায় অর্ধেকই শিশু। ওই শিশুরা যেভাবেই হোক মরেছে এতে তো কোনো সন্দেহ নেই। হয় তারা শীতে মরেছে, নয় তো তারা অসুখ-বিসুখে মরেছে। কিন্তু পাঁচ-ছয়-সাত বছরের একটা শিশু রোগে-শোকেই বা মরবে কেন ? আমরা না তাকে ২০০০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্য দেবো ?

যদি সে মারা যায়, পুষ্টিহীনতায়, সে কেন ভুগবে অপুষ্টিতে ?

বিষয়টা গুরুগম্ভীর হয়ে গেলো। বাদ দিন এক শীতে মরলো, কে মরলো আয়ু ফুরিয়ে যাওয়ায়, আমাদের কী ?

আমাদের কিছু যায় আসে না হয়তো, সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোর অনেক কিছু এসে যায়। নিচের খবরটি পড়ুন :

'নিহত দুব্যক্তি ট্রেনযাত্রী ছিলেন না'

...প্রকাশিত সংবাদের প্রতি রেল-প্রশাসনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। প্রকাশিত সংবাদে সোমবার নরসিংদীর বিনিশপুর রেলক্রসিংয়ের ব্যারিকেড ভেঙে একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দ্রুতগামী বাস ঢাকা থেকে সিলেটগামী জয়ন্তিকা আন্তঃনগর ট্রেনে সর্বশেষ বগিকে ধাক্কা দিলে ট্রেনযাত্রী মিসেস জেমিনিকা ও জনৈক কোলম্যান মারা যান বলে তথ্য দেয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে নিহত জেমিনিকা (২৯) ও কোলম্যান (২০) ট্রেনের সঙ্গে সংঘর্ষে পতিত বাসটির যাত্রী ছিলেন, জয়ন্তিকা ট্রেনের নয়। (খবর বিজ্ঞপ্তির) দৈনিক জনকণ্ঠ, ৪ জানুয়ারি, ১৯৯৫)

মানুষ মরে যায়, যাবার সময় সরকার ও তার কর্মচারীদের জন্য ঝামেলা রেখে যায়। তাদের এসব ঝামেলা দূর করতে কতো বিজ্ঞপ্তি, কতো প্রেসনোট, কতো ব্যাখ্যা রচনা করতে হয়। সুতরাং বেঁচে থাকতে থাকতেই সিদ্ধান্ত নিন, কীভাবে মরবেন, ট্রেনে না বাসে, জলে না ডাঙায়, ঘরে না পথে, অনাহারে না ডায়রিয়ায়, শীতে না অপুষ্টিতে।

অতিথি পাখিদের কে বাঁচাবে ?

এই পাখির ঝাঁকটি বেশ বড়। এসেছে সাইবেরিয়া থেকে। সাইবেরিয়ায় এখন খুবই ঠাণ্ডা। কোনো প্রাণীর পক্ষে সেই বরফের দেশে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। বাঁচার আশায় তারা পাড়ি জমালো দক্ষিণের দিকে। দক্ষিণে বাংলাদেশ নামে একটি দেশ আছে। সুজলা-সুফলা এক দেশ। যন্ত্রসভ্যতা সে-দেশটিকে এখনো কলুষিত করতে পারেনি। সেখানকার হাওর-বাওর-বিল-ঝিলগুলো এখনো পাখিদের বিচরণের উপযুক্ত। চলো আমরা বাংলাদেশে যাই—বললো নেতা পাখিটি। শত শত মাইল উড়ে পাখিরা এসে পৌছলো বাংলাদেশে।

ভালোই ছিল তারা। চমৎকার নীল আকাশ। সবুজ গাছপালা, শান্ত জলাশয়। কার না ভালো লাগে ? খুশিতে পাখির ঝাঁকটি গান গাইতে লাগলো মনের আনন্দে।

কিন্তু চিরদিন কারো সমান যায় না। এই পাখির ঝাঁকটির প্রবাস-জীবনেও এলো বিভীষিকা। এই জলাশয়ে আনাগোনা দেখা দিলো শিকারিদের। প্রথমে পাতা ফাঁদ। একটি-দুটি পাখি প্রতিদিন নিখোঁজ। সন্ধ্যায় যখন তারা ফিরে আসে বড় জঙ্গলটিতে, দেখা যায় কারো সঙ্গিনী আসেনি, কারো ভাই হারিয়ে গেছে। প্রতি সন্ধ্যায় কান্নার রোল।

দলনেতা পাখির ঘুম হারাম হয়ে গেলো।

এরপর দেখা যেতে লাগলো নতুন উপদ্রব। বন্দুকধারী শিকারি এলো এই জলাশয়ে। গুলির শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো আকাশ-বাতাস। একেকটা গুলি এসে বিদ্ধ করে একেকটা পাখির বুক, লুটিয়ে পড়ে তার নরম শরীরখানি, রক্তে ভেসে যায় জলমাটি, পাখার ঝাপটে আর্তনাদে এক করুণ আবহ নেমে আসে—এমনি ঘটতে লাগলো প্রতিদিন। স্বজন হারানো পাখির আর্তনাদে প্রতিদিন বিদ্ধ হতে লাগলো নেতা পাখিটির হৃদয়। এই দেশে থাকা আর নিরাপদ নয়, ভাবলো নেতা পাখিটি। কিন্তু যাবে কোথায় ? তাদের জন্মভূমিতে ফিরে যাওয়া এখন অসম্ভব, কেননা সেটি ঢেকে গেছে তুষারে। তাছাড়া সে আজ তিনবছর হলো এই দেশে আসছে, অন্য কোনো দেশ সে চেনে না, জানে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নেতা পাখিটি ঠিক করলো—এদেশে থেকেই সে একটা বিহিত করবে, পাখিদের জীবনের নিরাপত্তা ফিরিয়ে আনবে।

নেতৃপক্ষীটি জানতে পারলো, এদেশে পাখি শিকার করা আইনত নিষিদ্ধ, সে ঠিক করলো, দেখা করবে এলাকার প্রশাসনিক কর্মকর্তার সঙ্গে। যেই কথা সেই কাজ। সে তার শুভ ডানায় ভর করে চললো কর্তাটির বাসভবনে। গিয়ে দেখলো কর্তাটি খুবই ব্যস্ত। কারণ ঊর্ধ্বতন জনৈক কর্মকর্তা তার বাসায় এসেছেন এলাকা পরিদর্শনে। তার আপ্যায়নের প্রস্তুতি চলছে। সে খুবই দুঃখের সঙ্গে শুনতে পেলো দুই অফিসারের কথোপকথন।

আপনি চিন্তা করবেন না স্যার, আপনার জন্য খুবই উত্তম খানাপিনার ব্যবস্থা করেছি। না, না, খাওয়াদাওয়া নিয়ে ব্যস্ত হবেন না। শুনেছি আপনাদের এখানে নাকি ভালো বালিহাঁস পাওয়া যায়। আর কী শিকার পাওয়া যায়?

সব পাওয়া যায় স্যার। বিল ভরা শুধু পাখি আর পাখি। আপনি বলুন স্যার, কিসের মাংস আপনি খাবেন?

নেতা পাখিটা বুঝলো, রক্ষক যেখানে ভক্ষক, সেখানে সুবিচার চেয়ে কোনো লাভ নেই।

এরপর সে গেলো একজন এনজিও নেতার কাছে। বললো, স্যার, আপনি আমাদের বাঁচান। কেবল আপনিই পারেন পাখিদের প্রাণ রক্ষা করতে।

এনজিও কর্তাটি বললেন, আমরা কারবার করি মানুষ নিয়ে। বিশেষ করে তৃণমূল পর্যায়ের গরিব মানুষ নিয়ে। পাখিদের সমস্যা নিয়ে আমি কীভাবে প্রজেক্ট বানাবো?

নেতা পাখিটি বললো, কেন স্যার, আপনাদের পরিবেশ বিষয়ে কোনো প্রজেক্ট নেই? পরিবেশ রক্ষায় আমরা পাখিরা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করি। আমরা প্রতিদিন যতোগুলো ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ খেয়ে ফেলি, ওষুধ ছিটিয়ে তা মারতে হলে পুরো পৃথিবীর পানি ও মাটি দূষিত হয়ে পড়বে। মাছ, গাছ, শ্যাওলা, গুল্ম সব মারা যাবে। পাখিরা আছে বলেই পৃথিবী এখনো মানুষের বাসযোগ্য আছে। এনজিও নেতাটি বললেন, দি আইডিয়া। নতুন প্রকল্প : পাখি নিধন বন্ধ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি। আমি দ্রুত ডোনারদের কাছ থেকে বাজেট আনছি। পাখিদের অবশ্যই বাঁচাতে হবে। তুমি চলে যাও ভাই নেতা পাখি। মনের সুখে ঘুরে বেড়াও। সুদিন আসন্ন।

দুদিন পরে নেতা পাখিটি একটা সেমিনারের দাওয়াত পেলো। এনজিওটি একটা সেমিনারের আয়োজন করেছে বড় এক হোটেলে। পাখি নিধন বন্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা শীর্ষক সেমিনার। নেতা পাখিটি হাজির হলো সেই সেমিনারে। এলাহি কাণ্ড। বাংলায় ও ইংরেজিতে কতো কথা হলো। বক্তৃতা শেষে মধ্যাহ্নভোজন। সেমিনার খুব ভালো হলো। সন্দেহ নেই। এনজিও নেতাটি পাখিটিকে বললেন, ভায়া, চিন্তা করো না। তোমাদের দুঃখের দিন শেষ হলো বলে। যা ফান্ড জোগাড় হয়েছিল, এই সেমিনারের পেছনে তা ব্যয় করলাম। আবার যদি ফান্ড পাই, তো আবার প্রোগ্রাম দেবো। তুমি নিশ্চিন্তে প্রজেক্ট এরিয়ায় ফিরে যাও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নেতা পাখিটি কী বুঝলো, সেই জানে, সে ফিরে এলো তার দলের কাছে। তার মনে আশা, বুঝি মানুষের মধ্যে সচেতনতা এসেছে, তারা আর পাখি শিকার করবে না।

লক্ষ লক্ষ টাকার সেমিনারে উচ্চারিত আপ্তবাক্যের প্রতি বুড়ো আঙুল দেখিয়ে শিকারিরা তাদের পাখি শিকার অব্যাহত রাখলো। যথারীতি শিকারিদের ফাঁদে পড়ে, গুলি খেয়ে মারা পড়তে লাগলো পাখিরা।

নেতা পাখিটিও ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। সে তার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখলো। সে ঢাকায় গেলো। সাক্ষাৎপ্রার্থী হলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। মন্ত্রী তখন ভীষণ ব্যস্ত। তাকে সময় দিতে অস্বীকৃতি জানালেন। পরে এক জামাতি এমপিকে ধরেকয়ে সে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট জোগাড় করতে সমর্থ হলো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তার বক্তব্য গভীর মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন। তিনি তাদের সমস্যাটা আন্তরিকভাবে উপলব্ধি করতে সমর্থ হলেন। তিনি বললেন, এটা কোনো সমস্যাই নয়। আমি পাখিদের প্রাণ রক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবো। দেশে পাখিদের প্রাণ রক্ষার আইন আছে। পাখি ধরা এদেশে বেআইনি। আছে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা। আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করাই যাদের কাজ।

পাখি নেতাটি আবেগে কেঁদে ফেললো। আহা, কী সাধু ব্যবস্থাই না এই দেশে রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠলো।

সে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। এদেশের পুলিশি ব্যবস্থাটা সে নিজের চোখে ভালোভাবে দেখে যেতে চায়। এদেশের পুলিশ হাওরে-বাওরে অবৈধ পাখি শিকারিদের নিবৃত্ত করতে যে সত্যি পারঙ্গম, তা দেখে সে আশ্বস্ত হতে চায়।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বাসা থেকে বেরিয়ে সে দেখা পেলো এক কাকের। এই কাকটি ও শহরের পুরোনো বাসিন্দা। নেতা পাখিটি কাকটিকে বললো তার অভিলাষের কথা, সে যে ঘুরে ঘুরে পুলিশদের সব প্রতিরোধব্যবস্থা দেখতে চায়, সেই কথা।

কাকটি তাকে সঙ্গে নিয়ে পুরো ঢাকা শহরের পুলিশদের দেখালো। পুলিশদের মধ্যে তখন দারুণ প্রস্তুতি চলছে। কাঁদানে গ্যাস, ঢাল, দাঙ্গাগাড়ি, লাঠি, বন্দুক নানা কিছু নিয়ে তারা মহড়া দিচ্ছে। এতো কিছু দেখে নেতা পাখিটি নিশ্চিত হলো, যাক, এদেশের পুলিশ খুবই শক্তিশালী, খুবই সংগঠিত, খুবই প্রশিক্ষিত, খুবই তৎপর। সে সঙ্গী কাকটিকে বললো, দেখে খুব ভালো লাগলো। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মিথ্যা আশ্বাস দেননি তাহলে, এদেশের পুলিশ নিশ্চয়ই অতিথি পাখিদের প্রাণ রক্ষায় সমর্থ হবে। কাকটি হো হো করে হেসে উঠলো এই বিদেশী পাখিটির কথায়।

কী ব্যাপার, তুমি হাসছো কেন ? অতিথি পাখিদের নেতা জিজ্ঞাসা করলো।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তোমাকে তোমাদের প্রাণ রক্ষার আদেশ দিয়েছেন নাকি ? তাহলে তোমাকে একটা খবর পড়ে শোনাই। রাজধানী ঢাকায় শুক্রবার (২৪ ডিসেম্বর ১৯৯৪) খুন হয়েছে দুজন। খিলগাঁয়ের তিলপাপাড়ায় খুন হয়েছে তমাল রেজা। মগবাজারের নয়াটোলায় খুন হয়েছে সেলিম (৪০)। বুধবার পূর্তভবনের সামনে খুন হয়েছে ঠিকাদার সবুজ চৌধুরী দাস। বৃহস্পতিবার খুন হয়েছে পান্থপথে অজ্ঞাতনামা যুবক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

খবরের কাগজের একটা কুড়িয়ে পাওয়া ঠোঙ্গা থেকে পড়ে শোনালো কাকটি। তারপর বললো, এর অগে খুন হয়েছে ঈশা, খুন হয়েছে বুয়েটের অধ্যাপক।

তুমি এক কাজ করো, কাকটি বললো ওই অতিথি পাখিটিকে। তুমি আবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে যাও। তাকে জিজ্ঞাসা করো, যেদেশের পুলিশ-প্রশাসন মানুষকে বাঁচাতে পারে না খুনিদের হাত থেকে, সেদেশের পুলিশ-প্রশাসন অতিথি পাখিদের বাঁচাবে কী করে?

পাখিটি অবাক হয়ে গেলো। তাহলে এই বিপুল পুলিশবাহিনী কিসের জন্য? তার কণ্ঠে জিজ্ঞাসা আছে, এদেরও দরকার আছে। আগামী দিনগুলোতে ঢাকায় থাকলে তুমি নিজচোখেই দেখতে পারবে পুলিশ কতো কাজে লাগে।

সর্বজান্তা নাগরিক কাকটি বলে চলেছে।

শীতের খা খা দুপুরে সেই কাকের কণ্ঠস্বর বেজে চলেছে অশুভ সঙ্কেতের মতো কা–কা–কা।

মূত্র থেরাপি

সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে তাপসের মাথা খারাপ হবার যোগাড়। এতো বড় একটা ঘটনা ঘটে গেছে তাদের গ্রামে, অথচ সে জানে না। চাকরিটা বুঝি এবার সত্যি সত্যি গেল। চাকরি অবশ্য এখনো না-থাকার মতোই। সে কলকাতার একটি বাংলা কাগজের মফস্বল প্রতিনিধি। একটা পরিচয়পত্র পেয়েছে, আইডেন্টিটি কার্ড, এই পর্যন্ত বেতন-ভাতা কিছুই পায় না। তবে আগামী বছর থেকে একটা মাসিক ভাতা তার পাবার কথা।

তাপস ছেলেটা ভালো। এখনো তরুণ, সংসারের ঝামেলা এখনো কাঁধে চাপেনি। ফলে আদর্শ, নীতি, মূল্যবোধ, অঙ্গীকার ধরনের শব্দগুলোকে এখনো মনে করে মূল্যবান। এই তরুণ-সাংবাদিকটি এই পেশাকে গ্রহণ করতে চায় চ্যালেঞ্জ হিসেবে। পশ্চাদপদ মফস্বলের অভাব-অভিযোগের খবরগুলো তুলে ধরতে চায় সবার সামনে, সাংবাদিকতাকে সে নিতে চায় মানব-মঙ্গলের হাতিয়ার হিসেবে। তবে এসবের সঙ্গে ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষও কাজ করে তার মধ্যে। সে হতে চায় নামিদামি ডাকসাইটে এক সাংবাদিক, যার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বজোড়া। এজন্য প্রাণান্তকর পরিশ্রম করে সে; নিজের এলাকার কোনো সংবাদ পাঠাতে ব্যর্থ হয় না। এজন্য তাদের পত্রিকার মফস্বল সম্পাদক ও বার্তা সম্পাদক খুবই খুশি তার ওপর। কিন্তু আজ সকালে স্থানীয় কাগজের একটা খবর পড়ে সে পড়লো আকাশ থেকে। 'মঙ্গলবারি পাত, শত শত রোগীর আরোগ্য লাভ। ঘটনার স্থান তাদের গ্রামে। এ গ্রামের এক কৃষকবাড়ির উঠানে হঠাৎ করে জল পড়তে শুরু করে। তখন আকাশে গনগন করছিল সূর্য, মেঘের ছিটেফোঁটাও ছিল না আকাশে। কোনোই কারণ নেই, হঠাৎ ঝমঝম করে জল পড়ে সেই কৃষকের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উঠানে। পড়বি তো পড়, মাটিতে নয়, টিনের চালে নয়, কৃষকবউ কী কারণে যেন উঠানে রেখে দিয়েছিল একটা গামলা, সেই গামলায় পড়ে এই মঙ্গলবারি। আর উঠানে খেলছিল জন্ম থেকে খোঁড়া কৃষকের চার বছরের শিশুপুত্রটি। কয়েক ফোঁটা জল পড়ে তার মাথাতেও। ওমা, অমনি তার খোঁড়া পা ভালো হয়ে যায়, দিব্যি দৌড়াতে থাকে সে। কৃষকবউ তখন উঠানে কাজ করছিলেন, এই দৃশ্য দেখে তিনি অবাক হয়ে যান।

শিশুটি তার মাকে বলে, মা দেখো, আকাশ থেকে দেবতারা জল দিয়েছেন আর আমার খোঁড়া পা ভালো হয়ে গেছে।

কৃষক-বধূ তাড়াতাড়ি করে গামলাটি ঘরে নিয়ে যান। এখন এই গামলায় নলকূপের জল মিশিয়ে সবাইকে বিলিবন্টন করা হচ্ছে। সেই অলৌকিক জলপানে নানা ধরনের জন্মরোগের উপশম ঘটছে। রাতারাতি এই কৃষকবাড়িটি পরিণত হয়েছে তীর্থে। শতলোক পাত্রহাতে জল নেবার জন্য ভিড় জমিয়েছে এই কৃষক-কুটিরে। জনপ্রতি ১০ রুপি করে নেয়া হচ্ছে এই মঙ্গলবারির খানিকটার বিনিময়ে।

খবর পড়ে প্রথম বিশ্বাস হতে চায়নি তাপসের। যাহ্! এটা হতেই পারে না। এ ধরনের কতো খবরই তো বের হয় সংবাদপত্রে। এক ছাগলের তিন মাথা। আমগাছ থেকে অবিরাম জল। জাতিস্মর শিশু। বোঁটাঅলা ডিম। মাছের গায়ে আয়াত। এটাও সে ধরনের কোনো আজগুবি খবর।

কিন্তু যদি এই খবরটা সত্য হয়! স্থানীয় পত্রিকায় বেরিয়ে গেছে, কলকাতার পত্রিকায় এখনো বের হয়নি। কিন্তু কলকাতার অন্য কোনো দৈনিকে যদি বেরিয়ে যায়, আর তাদের পত্রিকাটি যদি সেই খবর থেকে বঞ্চিত হয়, তাহলে তার চাকরিটাই চলে যাবে। তার মাসিক ভাতা পাবার সম্ভাবনাটাও হয়ে যাবে তিরোহিত। না, এই খবরকে অগ্রাহ্য করা যায় না।

তাপস বেরিয়ে পড়লো। এই কৃষকের বাড়িটি খুঁজে বের করতে তার মোটেও বেগ পেতে হলো না। কারণ ইতিমধ্যে বাড়িটি বিখ্যাত হয়ে গেছে। লোকজন সত্যি সত্যি সেখানে যাচ্ছে; দূর-দূরান্ত থেকেও আসছে মানুষজন!

ঘটনাস্থলে গিয়ে তাপসের চক্ষু চড়কগাছ হবার যোগাড়। বিশাল শামিয়ানা টাঙানো হয়েছে। তার নিচে দূরাগত ক্লান্ত মানুষজন অপেক্ষা করছে। থানা থেকে পুলিশ এসেছে শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য। চায়ের দোকান বসে গেছে তিনটি। গ্রাম পঞ্চায়েতের লোকজন এসে গেছে। এই বাড়িতে আসার রাস্তাটা মেরামত করা হচ্ছে। সাংবাদিক এসেছে, সাংবাদিক-তাপসকে দেখা মাত্র বেশ একটা রব উঠলো। তাকে বেশ সমীহ করেই বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো। যে শিশুটির খোঁড়া পা ভালো হয়ে গেছে তাকে বসিয়ে রাখা হয়েছে একটা চৌকির উপরে। শিশুটির গায়ে নতুন পোশাক। তাপসের মনে হলো শিশুটি আর তার মায়ের একটা সাক্ষাৎকার নেয়া দরকার। সে শিশুটির কাছে গেল ভিড় ঠেলে।

তোমার নাম কী।

আমি ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তোমার পা ভালো হলো কী করে ?

জল খেয়ে।

জল খেয়ে, না জল মাথায় পড়ায় ?

জল খাইও, মাথায়ও মাখি।

তোমার পা কি খোঁড়া ছিল ?

এই প্রশ্নের জবাব অবশ্য পাওয়া গেল না। কারণ প্রচণ্ড ভিড়। ছেলেটির কাকা তাপসকে ডেকে নিয়ে গেলেন আড়ালে। বললেন, সাংবাদিক বাবু, ভালো করে লিখে দেবেন। বাড়ির ঠিকানা আর ছবি ছাপবেন। ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। দেখুন, লোকজন সুচিকিৎসা পাচ্ছে আবার আমাদেরও ভাগ্য ফিরছে। আপনারা গ্রামের সাংবাদিক, এই পুণ্যে নিশ্চয়ই আপনাদেরও পুণ্য হবে।

স্থানীয় লোকেরা অবশ্য এই জলকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করলো। কেউ বললো, এটা স্বর্গীয় অমৃত। কেউ বললো, এটা দেবতার আশীর্বাদ বারি। কেউ বললো, এটা বৃষ্টিপাত মাত্র।

তাপস তাড়াতাড়ি করে ফিরলো। ঘটনাটা লিখে ফেলা দরকার। সে সংস্কারমুক্ত মানুষ, কিন্তু এই খবরটি লেখার সময় সে যথেষ্ট আবেগ সঞ্চার করেই লিখলো। শুধু তাই নয়, শিশুটির সাক্ষাৎকার আর তার মায়ের সাক্ষাৎকার সে একটু বিশদ করলো। শিশুপুত্রের খোঁড়া পা নিয়ে মা আগে কী কী মুশকিলে পড়েছিলেন, তারপর হঠাৎ করে ভালো হয়ে যাওয়ায় তার কী রকম আনন্দ হচ্ছে সেটা সে লিখলো নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে, খানিকটা বাৎসল্যরস জুগিয়ে। লেখার পরে পাঠ করতে গিয়ে সে নিজেই ভক্তিরসে শিহরিত হলো—লেখাটা এতো ভালো হয়েছে যে, যে-কোনো অবিশ্বাসীও যদি এটা পাঠ করে, সে বিশ্বাস ফিরে পেতে বাধ্য হবে।

লেখাটা সে পাঠালো তার কাগজে। পরদিন সেটা ছাপাও হলো যথারীতি। দেশে হইচই পড়ে গেল। কেবল রয়টারের জনৈক সংবাদকর্মী খবরটি পাঠ করে নিজের পাঠানো একটা খবর বের করলো ফাইল থেকে। খবরটি নিম্নরূপ :

ভারতীয় সাবেক মন্ত্রীর বেসামাল কাণ্ড!

কলকাতা থেকে বোম্বেগামী ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি বিমানের সকল যাত্রীকে স্তম্ভিত করে দিয়ে ভারতের সর্বজন শ্রদ্ধেয় এবং প্রবীণ এক সাবেক মন্ত্রী বিমানের জরুরি নির্গমন দ্বারের সামনের চলাচল পথটিতে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেন। (ভোরের কাগজ, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫)

রয়টারের সাংবাদিক তাড়াতাড়ি একটা প্রতিবাদপত্র লিখে কলকাতার দৈনিক পত্রিকার বার্তা সম্পাদকের নিকট লিখে পাঠালেন। বার্তা সম্পাদক মনোযোগ দিয়ে প্রতিবাদপত্রটি পড়লেন। তখন তার দৃষ্টি আকৃষ্ট হলো রয়টারেরই পাঠানো অন্য একটি খবরের প্রতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মূত্রপানের মাহাত্ম্য

বিশেষ চিকিৎসার অংশ হিসেবে নিজমূত্র পান করে একজন রোগী সাধারণ সর্দিজ্বর থেকে শুরু করে ক্যান্সার পর্যন্ত বহু রোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন। ভারতীয় চিকিৎসক একে, ঠাকুর এ-কথা বলেছেন। দি ওয়াটার অফ লাইফ ফাউন্ডেশনের পরিচালক। ডা. ঠাকুর জানান, তার চিকিৎসা পদ্ধতিতে অনশন ও খাদ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। 'অটো ইউরিন থেরাপি' নামে পরিচিত ঠাকুরের চিকিৎসা পদ্ধতিতে ইদানীং অনেকেই আগ্রহী হয়ে উঠেছেন। রয়টার। (ভোরের কাগজ, ৮ মার্চ ১৯৯৫)

এদিকে বাংলাদেশের সংবাদপত্রে এই ইউরিন থেরাপির খবর প্রকাশিত হবার পরে এখানকার চিকিৎসকরাও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন।

মূত্র থেরাপি নয়

ভারতীয় ডাক্তারদের মূত্র থেরাপির ধারণা নাকচ করে দিয়েছেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট চিকিৎসকরা। জাতীয় অধ্যাপক নূরুল ইসলাম বলেছেন, সাধারণভাবে মূত্রের উপাদান এবং দেহ থেকে নির্গত মূত্রে বিজ্ঞানীরা যে উপাদান পেয়েছেন তা শরীরের জন্য ক্ষতিকারক বা উপকারী—কোনোটাই নয়। (ভোরের কাগজ, ১৮ মার্চ ১৯৯৫)

সর্বশেষ

বাংলাদেশের সেরা চোরাচালানি, বিশিষ্ট সমাজ-সেবক, ব্যাংক ডিফল্টার, কোটিপতি মি. কাউডি দেশের সমস্ত মূত্রালয়গুলোর মূত্র সংগ্রহ করা, ড্রামে পোরা ও ভারতে পাচার করার প্রস্তুতি নেবার জন্য তার অফিসকে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, গরুর বদলে ইলেক্ট্রনিক্স দ্রব্যের জায়গায় মূত্র সরবরাহ করে আমরা আমাদের অর্থনীতিকে চাঙা করবো। মূত্র থেরাপির এটাই হবে সবচেয়ে বড় সুফল।

ঈদ রঙ্গ

ঈদ যে এসে গেছে, তা আপনি বুঝবেন কী করে? আকাশে চাঁদ দেখে? না, ও দায়িত্ব এখন জাতীয় চাঁদ দেখা কমিটির। সামরিক শাসকদের আমলে উপরাষ্ট্রপতিদের কাজ ছিল না তেমন, তাঁরা দিনের বেলা কড়িকাঠ গুনতেন আর রাত্রিবেলা গুনতেন তারা। অবশেষে তাদেরকে এক বিশাল কাজ দেয়া হলো। চাঁদ দেখা। না, নিজেদের দেখতে হয় না। সারা দেশ থেকে জেলা প্রশাসকরা টেলিফোন করেন, কোথাও চাঁদ দেখা গেছে কিনা তার ভিত্তিতে চাঁদ দেখা কমিটি সিদ্ধান্ত নেন, কবে ঈদ, কাল না পরশু। ঈদ যে আসছে সেটা আপনি আর চাঁদ দেখে বোঝেন না। তাহলে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রথম বার্তাটা আপনি পাবেন 'বখশিশ দেন স্যার' আবদারে। রিকশাঅলা ৭ টাকা ভাড়ার জায়গায় পুরো ১০ টাকা রেখে দিয়ে বলবে, ঈদের বাজার স্যার, বখশিশটা দেন স্যার।

ঈদের আগমনী বার্তার আর কীভাবে ধ্বনিত হতে থাকে। মার্কেটে মার্কেটে জ্বলে ওঠে লাল-নীল আলো, গাউছিয়া-গুলিস্তান-মৌচাকে লেগে যায় অমোচনীয় যানজট আর পাওনাদারের ঘোরাফেরা যায় বেড়ে।

ঈদের আগমনী-সংকেত আপনি পেতে পারেন ট্রাফিক পুলিশদের দিকে লক্ষ্য রেখেও। যদি দেখেন ট্রাফিক পুলিশগণ হঠাৎ অতি কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠেছে এবং ঘন ঘন রিকশা, বেবিট্যাক্সি, ট্রাক ও অন্যান্য যানবাহন আটকাচ্ছে, বুঝবেন সামনে ঈদ। সবারই সাধ-আহ্লাদ আছে, ট্রাফিক পুলিশেরও আছে।

কিংবা যদি দেখেন হঠাৎ করে কাপড়ের দোকানগুলোতে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে, বুঝবেন, সামনে ঈদ। ঈদ তো সবার, তার জন্য বর্ধিত বাজেটও জোগাড় করতে হয় সবাইকেই—চোরকেও, সাধুকেও।

তবে ঈদের আগমনী-সংকেত সবচেয়ে স্পষ্টভাবে বেজে ওঠে গিন্নীর মেজাজে। রমজান মাস মানেই ডালের বাজার, পিঁয়াজের বাজার গরম, দিন গরম, সঙ্গে সঙ্গে গরম গিন্নীর মেজাজ। তাঁর মেজাজ চড়তে চড়তে যেদিন সপ্তম অতিক্রম করে পৌছায় অষ্টমে, আপনি নিশ্চিত হয়ে যেতে পারেন ঈদ এসে গেছে। টিভি ছাড়লেই শোনা যাবে ফাংশনাল নজরুল সঙ্গীত—ও মন রমজানের ওই রোজার শেষে এলো খুশির ঈদ।

কেবলই কি রোজার শেষে ? এর আগে আপনাকে আরো অনেকগুলো কঠিন পরীক্ষা পার হতে হয়নি ? এই পরীক্ষাগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম হচ্ছে গিন্নীকে কিছু একটা ঈদ উপহার গ্রহণে রাজি করানো। কাকে কী দিতে হবে তিনি তালিকা প্রস্তুত করেছেন, তাতে আপনার বেতন-বোনাস সবই তিনবার শেষ হয়ে গেছে, সে যাই হোক না কেন, নিজের বেলায় তিনি অত্যন্ত সংযমশীল, না থাক, আমাকে কিছু দিতে হবে না। এই মহান আত্মোৎসর্গসূচক আশ্বাসে যে কর্তা পটেছেন, ঈদের দিনটিতে নিশ্চিত তার ওপর দিয়ে প্রবল বেগে ঘূর্ণিবার্তা বয়ে যাবে। আর যে কর্তা চালাক, তিনি জানেন, এটা হলো বৈতরণীর প্রথমপর্ব। এটা পার হতে হবে। তাঁকে কিছু-একটা নিতে রাজি করাতে হবে। দ্বিতীয় পর্ব সেই কিছু-একটা জিনিসটা কী ? শাড়িও হতে পারে, গাড়িও হতে পারে, গয়নাও হতে পারে। যার যেমন সাধ্য। বৈতরণীর তৃতীয় পর্বে রয়েছে—সেই নির্ধারিত উপহারটি স্ত্রীর পছন্দমতো ক্রয় করা। আপনি নিজে কিনে এনে যদি স্ত্রীকে সারপ্রাইজ দিয়েছেন তো মরেছেন, নির্ঘাৎ লেগে যাবে লঙ্কাকাণ্ড। কারণ দ্রব্যটি তাঁর পছন্দ হবে না। আর সেই ভারটা যদি বুদ্ধিমানের মতো স্ত্রীর ঘাড়েই অর্পণ করতে পারেন তো আপনার ঋক্কি কমে গেলো অনেকাংশে। তখন তিনিই সামলাবেন। প্রথমবার তিনি যাবেন বাজার বুঝতে। দ্বিতীয়বার যাবেন যাচাই করতে, কিন্তু কিনে আনবেন এবং ঠকবেন এবং পস্তাবেন। তৃতীয়বার যাবেন সেটা বদলাতে। গিয়ে দেখবেন—বিক্রিত মাল ফেরত নেয়া হয় না। চতুর্থবার আবার যাবেন এবং এবার দাম-টাম দিয়ে ভালো জিনিসই কিনে আনবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আনবার পর দেখবেন—তার এই ভালো জিনিস ঘরে ঘরে; কেননা দোকানি যেটা লেটেস্ট বলে চালিয়েছে, সেটা আসলেই লেটেস্ট বলে উঠেছে সবার গায়ে গায়ে। এরপর গিন্নীর মেজাজ অষ্টম থেকে চড়ে যদি নবমে, কাউকে কি দায়ী করা যায় ? ঈদের প্রথম বলি তাই কর্তা নিজে।

শেষ বলি কিন্তু গিন্নী। আপনি তো সাহেব আদ্দির পাঞ্জাবি পরে ফুরফুরে হয়ে ফ্যানের বাতাস খাচ্ছেন আর কোনো একটা ঢাউস ঈদ সংখ্যা হাতে নিয়ে বিছানায় গড়াচ্ছেন। তার ধকলটা কী গেছে, আপনি বুঝবেন কী করে ? তিনি তিন রাত ধরে ঘুমোন না, সংসারের কাজ কি কম ? চাদর-পর্দা সব ধোওয়া, শুকানো, ইস্ত্রি করা; ঘরদোর ঝাড়-মোছ করা এবং অবশেষে সারারাত মশলা পিষে পিঁয়াজ কেটে বাটনা বেটে ঈদের জন্য প্রস্তুত হওয়া। আপনি তো হ্যাঁগো, দ্যাখো কে এসেছে বলে লেজ গুটিয়ে ছুট দিলেন ঘরের এক কোনে, মুখে অমায়িক হাসি এনে তাদের আপ্যায়ন করতে হয় ঐ গিন্নীকেই। এতো খাবার। সেসব বারবার গরম করা, ঠাণ্ডা করার ঝক্কিও তো কম নয়। ঈদ আসে এদেশে আনন্দ নিয়ে, কিন্তু এ পুরুষবাদী সমাজ সে আনন্দের পুরো মাসুল তুলে নেয় নারীদের কাছ থেকে।

ঈদের তৃতীয় বলি কে ? হ্যাঁ, অনিবার্যভাবে বিটিভির আনন্দমেলার উপস্থাপক। প্রতিবছর একজনকে রামপুরায় উৎসর্গ করা হয়। তারা তিনমাস খেটেখুটে অমানুষিক পরিশ্রম করে একটা অনুষ্ঠান দাঁড় করান দশকরা হাসবে এ আশায়, শেষপর্যন্ত সেটা লোক-হাসানো অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। গতবছর আমরা বলি দিয়েছি একজন সম্পাদককে, এবার দিচ্ছি একজন ডাক্তারকে, মে গড ব্লেস হিম।

ঈদের আরেক সেট বলি আছে। সেটা নিয়ে রসিকতা করা ঠিক হবে না। কারণ আমি নিজেই ঈদে রাজধানী ছেড়ে বাড়ি যাচ্ছি। ঈদের ছুটি শেষে সংবাদপত্রগুলো যেদিন প্রথম বের হয়, তার অনিবার্য শিরোনাম—সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৭, লঞ্চডুবিতে ৫২। সুতরাং এ নিয়ে রসিকতা না করে আসুন গম্ভীর স্বরে বলি, 'মা, আমার ছুটি হয়েছে, আমি বাড়ি যাচ্ছি। এক বাঁও মেলে না, দুই বাঁও মেলে না।'

ঈদের বাড়ি যাওয়া মানেই এক বিশাল ঝক্কি। প্রথমত টিকিট পাবেন না, বাসের না, ট্রেনের না, লঞ্চের না। তারপরও যেতেই হবে।

বছরের এই একটা দিন বাড়ির সবাই একত্রিত হওয়া। বুড়ো বাবা-মা, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ। ঈদের-আগে পরে দুদিন তাই ঢাকা শহর ফাঁকা, বিরান মরুভূমি। আপনি-আমি ঈদে বাড়ি যাই দেখা করতে আর রাজনীতিবিদরা যান দেখা দিতে। সব মন্ত্রী মিনিস্টার চলেছেন গ্রাম অভিমুখে। সামনে ইলেকশন। ভাইসব, আপনারা ভালো আছেন তো ? বিগত চারটি বছর ভালো ছিলেন তো ? আপনাদের কথা বড়ো মনে হয়েছে রে ভাই, কিন্তু সময় পাই নাই। দেশের কতো কাজ।

'বছরের তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন এই একটা দিনের জন্য কতো অপেক্ষা'! এ-কথা শুনে সংসার অভিজ্ঞ মানুষ নিশ্চয়ই হাসছেন, এখনও বালকই রয়ে গেলে বালক! না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বুড়োরা যে সারাবছর ঈদের জন্য অপেক্ষা করেন না, সেটা জানি, তবু বলি, করে। আপনি করেন না, কিন্তু কাপড়-পোশাক-জুতোর ব্যবসায়ীরা করে। লেখকরা প্রকাশকরা যেমন দিন গোনে বইমেলার জন্য। বছরে একবারই তো ব্যবসা। ঢাকা এখানে সেখানে বড়ো বড়ো মার্কেট। সারাবছর সেগুলোয় ঘুঘু চরে। এক রমজান মাসের ব্যবসাতেই তাদের বছরের লাভ উঠে যায়। পাবলিক গলা বাড়িয়ে প্রস্তুত, কাটো। আরো একদল লোক অপেক্ষা করে ঈদের জন্য—সিনেমাঅলারা। ঈদে সিনেমা মুক্তি দেয়া মানেই অর্ধেক নিশ্চিত। তারপরও চিত্রতারকাদের টেনশন। লোকে হলে যাচ্ছে তো ?

কিন্তু সবচেয়ে বড়ো টেনশন ঘরে ঘরে। বাড়িভর্তি মানুষজন। যে যেখানে ছিল একত্রিত হয়েছে। মেজোর ছেলে গ্লাস ভাঙছে, ছোটোর মেয়ে আরেকটার লিপস্টিক সরিয়েছে। বৌয়ে-বৌয়ে, ননদে-জায়ে, ভাবিতে, কখন কোথায় যে লেগে যায় ? কিংবা হয়তো স্রেফ শাড়ি পছন্দ হয়নি বলেই বউ কথা বলছে না বরের সঙ্গে।

ঈদের আরেক উপাদান টিভির বিশেষ অনুষ্ঠান। যার যা ঘোরাফেরা সব সন্ধ্যার মধ্যেই সেরে ফেলে। বিকেলে একঝাঁক খোকাখুকি নেচে-গেয়ে শিশুদের অনুষ্ঠান করছে, দেখার দরকার নেই। সন্ধ্যায় গান। তাও বাদ দেয়া চলে। তারপর বিশেষ নাটক। আমজাদ হোসেনের না হলে সেটা দেখা অবশ্য কর্তব্য। হুমায়ূন আহমেদ হলে তো কথাই নেই। বাড়ির সবাই মিলে বসে আছে টিভির সামনে। নাটক চলার সময় কলিংবেল বেজে উঠবেই। কিন্তু দরজা খুলতে যাবে কে ? আমি যাবো না, আপনি যাবেন না। বাকি থাকে কাজের মেয়ে। হুমায়ূন আহমেদের নাটক। মাথা খারাপ। কোনো কাজের মেয়ে টিভি সেটের সামনে থেকে নড়বে না। পাবলিক দেখবে আর হাসবে। হাসবে আর বলবে, না, আগের মতো ভালো হচ্ছে না। মানুষ মাত্রেরই এই কমন সাইকোলজি—কোনোকিছুই আগের মতো ভালো লাগে না। তার ওপর রাত সাড়ে এগারোটায় যখন আনন্দমেলা থামিয়ে শুরু হয় 'খবর' ও 'নিউজ'; আর দেখতে হয় ক্ষমতাসীনদের করমর্দনের দৃশ্য, তখন কিযে মনে হয়, মুখ খুলে বলার মতো নয়। ক্লান্ত শরীরে আনন্দমেলা শেষ করে মনের মধ্যে বেদনা জন্মে—আহা, বেচারা উপস্থাপক, এভাবে বলি হয়ে গেলো!

দিন ফুরিয়ে আসে। চোখ জড়িয়ে আসে ঘুমে। শরীরে ব্যথা। ঘুমুতে যাবার আগে মনে আফসোস, ঈদটা শেষ হয়ে গেলো। আবার ফিরতে হবে—কর্মক্ষেত্রে/স্কুলে/কলেজে। আবার সেই পুরোনো ঘানি। উফ্। এই ছুটিটা যদি শেষ না হতো!

মানুষের এসব আশা পূর্ণ হয় না। ছুটি ফুরিয়ে আসে। জীবন আবার সচল হয়। শুধু শূন্য পকেটের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, পুরো মাসটা তো পড়ে আছে সামনে। এই মাসটা কাটাবো কী করে ?

হায়, গনি মিয়া, তুমি কেন মূর্খের মতন কাজ করিলে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঈদের জামা

ফ্যান্টাসির জগৎ বড়ো রঙ্গের জগৎ, রঙ্গপ্রিয় পাঠক, কল্পজগৎ ছেড়ে আসুন এই মর্ত্যের মাটিতে। ঈদে অনেকেই শহর ছেড়ে গ্রামে গিয়েছিলেন, রাজধানী ছেড়ে মফস্বলে, ঘরমুখো মানুষের ভিড়ে বাসে-ট্রেনে-লঞ্চে যে জায়গা ছিল না—সেটা টের পেয়েছেন আশা করি।

কিন্তু দেখুন নালবি বেগম শোভাকে। সবাই যখন ঢাকা ছেড়ে গ্রামে যাচ্ছিল, তিনি হয়েছেন উল্টোমুখো, তিনি উল্টো গ্রাম ছেড়ে রওনা হয়েছিলেন ঢাকার দিকে।

নালবি বেগম শোভার বয়স ৩১।

৩১-এ আমাদের নারীরা কৈশোরই ত্যাগ করে না, অনেকের বিয়েই হয় না। মা বলেন, মাম্মি, এবার বিয়ে-থা করো। আমরা একটু নাতি-নাতনির মুখ দেখি। তোমার বয়সে আমার ১৬ বছর বয়সী মেয়ে হয়ে গিয়েছিল, আর তোমার নানি তো ৩১-এ এসে নাতনির মুখই দেখেছিলেন।

মায়ের কথায় মেয়ে হাসে। মা, তুমি যে কী বলো না। আমি এখন আমর পিএইচডি থিসিস নিয়ে বড় ব্যস্ত। এসব বিয়ে-টিয়ে নিয়ে ভাবার ফুরসত কই আমার?

ফুরসত হচ্ছে না বলে বয় ফ্রেন্ডরাও উৎকণ্ঠিত নয়। এই তো বেশ যাচ্ছে সময়-ডেট করে, লং ড্রাইভে গিয়ে, দরকার হলে আউটিঙে গিয়ে। কিংবা ওর বাইরে আমাদের যে মেয়েটি একত্রিশে পটাপট দুটো নিয়ে লাইগেশন করে ফেলেছে, এখন রূপচর্চা-মাধুরী দীক্ষিত-গাউসিয়া-নিউমার্কেট করেও তার এতোটাই অবসর যে তলপেটের চর্বি বেড়ে বেড়ে বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। সে এখন নিজের নাভি নিজে চুলকাতে পারে কিনা সন্দেহ।

কিন্তু দেখুন নালবি বেগমকে, এই একত্রিশেই দুই-দুটো সন্তান। অথচ শরীর এখনো ভেঙে পড়েনি। মুটিয়ে মিল্কভিটাও হয়ে যায়নি। এর কারণ, তিনি থাকেন কাজের মধ্যে। সারাদিন যায় তার পরিশ্রমে। কতো কাজ—ধানভানা, ধানঝাড়া, ধানসিদ্ধ করা, গোয়াল পরিষ্কার করা, রান্নাবান্না পাকশাক, ধোয়া-মোছা, লেপা, সেলাই-ফোঁড়াই, ছেলেপুলে সামলানো, শাকসবজির ক্ষেতে পানি দেওয়া, খুড়পি চালানো, হাঁস-মুরগির পেছনে লেগে থাকা—বাংলাদেশের নারীদের কাজের কি কোনো শুমার আছে?

তবু অভাব যায় না নালবি বেগম শোভার। তার স্বামী রুস্তম আলীও বড় পরিশ্রমী মানুষ। ক্ষেতিকামে রোজগার কম দেখে কারবারে নেমেছে। গ্রামে গ্রামে ফেরি করে মশলা বেচে। ব্যবসা করতে মূলধন লাগে, রুস্তম সেটা পাবে কই?

নালবি বেগম শোভা বলেছিলেন, 'সবুজের বাপ, খালিখালি, আইত(রাত) নাই, দিন নাই চিন্তা করেন। অতো চিন্তা করেন কিসক (কেন), মোর নোলকখান বেচ্যা কারবারত খাটান'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রুস্তম আলী বড় ভালোবাসা করেন নালবি বেগমকে। তিনি রাজি হননি। মশলার কারবারের পুঁজি তিনি কষ্টে-সৃষ্টে জোগাড় করে ফেলেছিলেন। তাদের বড়ছেলে সবুজের বয়স এগারো। এতোদিনও মহব্বত কমেনি তাদের। তবে বড় অভাব।

গাইবান্ধা জেলার পলাশবাড়ি থানার জামিরা গ্রাম। অভাব এই গ্রামের চিরসঙ্গী।

আকাল আর মঙ্গা বাহে-ক্যাংকা কর‍্যা যে কার্তিক মাস যায় বাহে—হামরা সে-কথা কুলা কবার পারমো না।

অভাবের কথা সাবালক মানুষরা বোঝে, কিন্তু চ্যাংড়া-প্যাংড়া তো কিছুই বোঝে না। বুঝতে চায় না। রমজানের শুরুতেই নালবির দুইছেলে জেদ ধরেছে ঈদে জামা কিনে দিতে হবে। 'নাল (লাল) অঙের (রঙের) নয়া পিরান কিনা দ্যাও।'

কী মুশকিল!

নালবি বেগম শোভা বললেন সবুজের বাপকে। 'ছেলেপুলে জেদ ধরিছে, নয়া পিরান কিন্যা চায়।'

রুস্তম আলী বললেন, 'ছোলের জেদে জেদ ?' এরপর কথা চলে না। ছেলেদের মন খারাপ, নালবি বেগমের মন আরো খারাপ। তিনি মনে মনে আল্লাহকে ডাকেন। আল্লাহকে ডাকলে ফল হয় হাতে হাতে। হাদীস শরিফের কথা। নালবি বেগম ছোটোকালে মাদ্রাসায় পড়েছেন, আমপারা পড়তে জানেন। একবার ঈদে বিবি ফাতেমার (রা.) খুব মন খারাপ, কারণ ছেলেদের নতুন জামাকাপড় দিতে পারেননি। হযরত ফাতেমা জায়নামাজে বসলেন, দুহাত তুললেন আল্লাহর দরবারে। হে আল্লাহ, তুমি দয়া করো, তোমার ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতা নড়ে না। ডাকতে জানলে আল্লাহ তাকে ফেরান না। নতুন জামা নিয়ে এক ব্যক্তি হাজির হলো তাঁর দুয়ারে।

নালবি বেগম শোভার ডাকেও বোধহয় আল্লাহতালার সাড়া মিলছে। কারণ গ্রামের এ-ঘর ও-ঘর থেকে শোনা যাচ্ছে এক সুখবর। কোনোরকম ঢাকায় পৌছলেই আর চিন্তা নাই, ঢাকায় খালি টাকা ওড়ে, তাই নয় সেখানকার বড়লোকরা খুবই বড়লোক। তারা ঘরে ঘরে শাড়ি-লুঙি,নগদ টাকা নিয়ে বসে আছে। অঢেল টাকা-কড়ি, জিনিসপত্র। কিন্তু নেবার লোক নেই। কোনোরকমে একবার ঢাকায় পৌছতে পারলেই হয়।

শুনে শোভার বড়ছেলে জেদ ধরেছে, 'ঢাকাত যামো, ঢাকাত যামো।'

পুরো গ্রামের গরিব ঘরগুলোতে মোটামুটি সাড়া পড়ে গেছে। ঢাকাত যায়া জাকাত নেমো।

সবুজ, নালবি বেগম শোভার ছেলে, নামেই সবুজ, কিন্তু সবুজ রঙ তার তেমন পছন্দ নয়, সে খুশিতে লাফাচ্ছে। 'একটা নাল অঙ্গের পিরান কোলে (কিন্তু) হামাক দেওয়া নাগবে।'

তো গ্রামের আরো অনেকে মিলে ঢাকার উদ্দেশে রওনা দিলেন নালবি বেগম শোভা। সঙ্গে তার শাশুড়ি রহিমন বিবি (৬৫), তার শ্বশুরের চাচাতো বোন খোদেজা বেগম (৪২), আর শিশুরা, এমনি অনেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রথমে পায়ে হেঁটে পলাশবাড়ি, সেখান থেকে লোকাল বাসে চড়ে গাইবান্ধা। এই বাসে যাওয়ার জন্য জনপ্রতি ছয় টাকা করে খরচা করতে হলো। এরপরে আর চিন্তা নেই। গাইবান্ধায় ঢাকার ট্রেনে উঠে পড়লেই হলো।

রেলগাড়ি দেখে নালবি বেগম শোভা তো অবাক। কিন্তু তারো চেয়ে অবাক তার দুইছেলে। সবুজ খানিক পরপর বলতে লাগলো, 'ঢাকাত গেলে মা হামাক চিড়িয়াখানাত নিয়া যাওয়া নাগবে।' ট্রেনে ঠাসাঠাসি, গাদাগাদি ভিড়। সবাই মিলে বগির মধ্যে মেঝেতে বসে যাওয়া, প্রাণান্তকর অবস্থা। তবু নালবি বেগমের মন খারাপ হয়নি। ঢাকায় পৌঁছলেই তো কতো কিছু পাওয়া যাবে।

ঢাকায় তারা নামলেন কমলাপুর স্টেশনে। সেখান থেকে লাইন ধরে গাট্টি-বোচকাসহ হাঁটতে হাঁটতে মতিঝিল কলোনি। কলোনির দেয়ালের পাশে ফাঁকা জায়গা। সেখানেই আপাতত ঠাঁই নিলেন সবাই। পৌষ মাস, ঝড়ি (বৃষ্টি) হবার সম্ভাবনা নেই, কাজেই তারা কাঁথা-বস্তা নামিয়ে চুলো খুঁড়তে মনোযোগ দিলেন।

পরদিন থেকে শুরু হলো ফিতরা আর জাকাতের জন্য বাড়ি বাড়ি যাওয়া। নালবি বেগম শোভা ভিক্ষুক নন, কোনোদিন তিনি ভিক্ষা করেননি, আজ দ্বারে দ্বারে গিয়ে ইনিয়ে-বিনিয়ে ফিতরা চাইতে তার খুবই খারাপ লাগতে লাগলো। কিন্তু কী করা, এসেই যখন পড়েছেন। কিন্তু তার ছেলেদুটোর প্রবল উৎসাহ, তারা দুদিনই ভিক্ষা চাওয়ার সুর ও ভাষা রপ্ত করে ফেললো।

নালবি বেগম শোভার গতর এখনো শক্ত। তিনি ব্লাউজ পরে ভিক্ষায় বের হন, তাকে অভিজ্ঞ সুফিয়া (৩৮) পরামর্শ দিল, নালবি, তুই বেলাউস খুল্যা একটা ছেঁড়া শাড়ি পর্যা ভিক্ষাত যা। জোয়ান মাইয়ালোকরে সবাই বেশি কর্যা শাড়ি দ্যায়। নালবি বেগম শোভা তাদের কাফেলার বিভিন্ন মহিলার দিকে তাকিয়ে দেখলেন ঘটনা ঠিক। জোয়ান মেয়েরা গা খুলে বের হলেই শাড়ি পাচ্ছে বেশি। কিন্তু তিনি ব্লাউজ খুলতে নারাজ, না হয় নাইবা পেলেন জাকাতের শাড়ি।

এদিকে শাড়ি-লুঙি-টাকা-পয়সা একটু আধটু যাও জুটলো, শার্ট জুটলো না একটাও। সবুজ ও তার ভাই কাঁদতে লাগলো। নালবি বেগমেরও মন খারাপ, তার মনে প্রশ্ন : লোকে খালি শাড়ি-লুঙি জাকাত দেয় কেন ? বাচ্চাদের শার্টের জন্য তিনি আল্লাহর দরবারে মোনাজাত করে যেতে লাগলেন।

আল্লাহ মুখ তুলে চাইলেন। ছেলেদুটোর কান্না থেমে গেল। খবর এসেছে, খুশির খবর। আগামীকাল মতিঝিল স্কুলের সামনে জাকাত দেয়া হবে। মাইকিংও নাকি করা হয়েছে। বহু কিছু দেয়া হবে। তাতে বাচ্চাদের শার্টও থাকবে। সবুজের জন্য লাল শার্টও থাকবে নিশ্চয়ই।

সবুজের উৎসাহ সবচেয়ে বেশি। মতিঝিল স্কুলটি কোথায়, কেমন, সে দেখে এসেছে আগেভাগে। ফিরে এসে মা শোভাকে বলেছে, 'এই স্কুল ঘরখান অনেক বড়, হামার জামিরা গ্রামের স্কুলঘরের মতন ছোটো নয়, দোতলা দালান, দেখ্যা আসনু, সকাল সকাল যায় জাকাত তুল্যা আসমো, মা দেরি করিস না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রঙ্গপ্রিয় পাঠক, ফ্যান্টাসি ছেড়ে এবার নিচের খবরটি পাঠ করুন।

'মুই শাড়ি কাপড় চাও না,

মোর ছাওয়াল ফেরত দেও'

বুক চাপড়িয়ে আহাজারি করছে শোভা। কেউ তাকে ধরে রাখতে পারছিল না। প্রবোধ দিতে পারছে না কেউ। রংপুরের আঞ্চলিক ভাষায় বিলাপ করছে শোভা। আর বলছে, 'মুই শাড়ি কাপড় চাও না—মোর ছাওয়াল মোক ফেরত দাও'।...

প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে শোভা তার কোলের শিশুপুত্র সবুজকে নিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। তাদের বুকের উপর পদদলিত করেই অন্যরা চলে যায়। সবুজ চিৎকার দেয়ার সুযোগটুকু পায়নি। ঘটনাস্থলেই তার মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে। (দৈনিক জনকণ্ঠ, ২৮ ফেব্রুয়ারি' ৯৫)'

জাকাতের কাপড় আনতে গিয়ে ছয়জনের মর্মান্তিক মৃত্যু

জাকাতের কাপড় আনতে গিয়ে পায়ের তলায় পিষ্ট হয়ে গতকাল সোমবার ৫ শিশু এবং ১জন মহিলা প্রাণ হারিয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছে ২০ জনেরও বেশি। গতকাল সকালে সাবেক মেয়র এবং জাতীয়তাবাদী যুবদলের সভাপতি মির্জা আব্বাসের পরিবারের পক্ষ থেকে জাকাতের কাপড় দেয়া হবে বলে খবর ছড়িয়ে পড়লে জাকাত-প্রত্যাশী কয়েক হাজার মানুষের হুড়োহুড়ির মধ্যে এ ঘটনা ঘটে।... নজিরনের মতে, তিনদিন যাবৎ মাইকে কাপড় বিতরণের ঘোষণা দেয়ায় সেখানে বিপুলসংখ্যক লোক সমাগত হয়। (বাংলাবাজার পত্রিকা, ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫)

আমাকে মাটি চাপা দেয়ার চেষ্টা হয়েছে।

মির্জা আব্বাস এমপি মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ে জাকাত বিতরণের প্রাক্কালে ভিড়ের চাপে যারা মারা গেছে, তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করেছেন। তিনি বলেন, এই বেদনাদায়ক ঘটনায় আমি দুঃখ প্রকাশ করছি। প্রতিটি পত্রিকায় এই ঘটনায় আমাকে জড়িত করা হয়েছে। পত্রিকাগুলো আমাকে মাটি চাপা দেবার চেষ্টা করেছে। আমি এখনো এমপি আছি। কেউ যদি শুনে থাকে আমি মাইকিং করেছি তাহলে আমার জাতীয় সংসদে থাকার অধিকার নেই।

দিবাস্বপ্ন

বেঁচে আছি স্বপ্ন নিয়ে, স্বপ্নের মধ্যে, স্বপ্ন কেয়ে, স্বপ্ন পরে। দেহ মিশে যায় মাটির সঙ্গে, চোখ অন্ধ, কিন্তু জ্বলজ্বল করতে থাকে স্বপ্ন।

বাংলাদেশ ফুটবল দল কলম্বো গেলো সার্ক টুর্নামেন্টে। এর আগে সার্ক ফুটবল কিংবা সাফ গেমসের ফুটবলে বাংলাদেশ কোনোদিনও সোনা জেতেনি। তবু প্রতিবার আমরা আশায় বুক বাঁধি, এবার জিতবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

স্বপ্ন দেখার সময় আমরা বেশ কঠিন স্বপ্নই দেখি। যদিও কোনোটিই পূরণ হওয়া অসম্ভব নয়। একধরনের সম্ভাব্যতা তো থাকেই। যেমন লটারিতে চল্লিখ লাখ টাকা পাওয়া। সেই প্রথমবার যখন ১০ লাখ টাকার পুরস্কারের ঘোষণা দেওয়া হলো, সেবার থেকে টিকিট কেনা শুরু হয়েছে। প্রথমবার যে পাবো না, সে তো প্রায় জানাই। আচ্ছা, দ্বিতীয়বারও না হয় নাইবা পেলাম। তৃতীয়বার অবশ্যই পাবো। প্রায় ৪০ লাখ লোক টিকিট কেনে একজনের কপাল খোলে। সেই একজনটা কখনো আমি নই।

গোপনে গোপনে প্রায় সবাই টিকিট কাটে। মনে মনে সবারই একটা হিসাব আছে। স্বামীর এক হিসাব, স্ত্রীর আরেক। বসের এক হিসাব, কর্মচারীর আরেক। অন্য কাউকে হিসাব করতে দেখলে গাজ্বালা করে—আরে ওই টাকা তো এবার আমি পাচ্ছি, তুমি বাপু সেটা নিয়ে হিসাবে মাতলে কেন ? কাজের ছেলেকে লটারির একটা টিকিট কিনে দিয়ে গৃহকর্তা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সত্যি সত্যি যদি এই টিকিটটাই পুরস্কার পেয়ে যায় ? কেন যে কিনে দিতে গেলাম, নগদ ১০টা টাকা দিয়ে দিলেই হতো। এমন যদি হয়, লটারির রেজাল্টের পর আমাকে টিকিটটা এগিয়ে দিয়ে বলে, খালু, দেইখাদ্যান। তখন যদি সত্যি সত্যি অঘটনটা ঘটেই যায়, সত্য কথা বলবো তো ? ওই ছেলে ৪০ লাখ টাকা পেলে তো আমার চেয়েও বড়োলোক হয়ে যাবে।

কাজের মেয়ে একটা লটারির টিকিট পেয়ে স্বপ্ন দেখেছে নিজের মতো করে। আম্মা, আমি যদি টাকা পাই, তাহলে তো সাংবাদিকরা আইবো। আপনি আম্মা কিন্তু কইবেন না, আমি কাজের বুয়া। বলবেন আত্মীয়। আর আম্মা, আমার বাবা-মা আইলে কিন্তু ঢুকবার দিয়েন না।

স্বপ্নে পোলাও খেতে খেতে একসময় কিন্তু মনে হয়—নাহ্, বহুদিন পোলাও খাওয়া হয় না। এ জীবনটা কেটে গেলো ঘানি টেনে টেনে। দশটা-পাঁচটা অফিস। ইনক্রিমেন্ট, প্রমোশন। তারপর প্রফিডেন্ট ফান্ড, পেনশন। কিছুই তো হলো না। তা না হোক। ছেলেপুলেরা মানুষ হচ্ছে। ওদের হবে। তিনবেলা চুলো ঠেলতে ঠেলতে গৃহিণীর মনের মধ্যেও ওই এক সান্ত্বনা—এ প্রজন্ম ব্যর্থ হয়েছে, পরের প্রজন্ম হবে না। মেরে কুটে দাঁড়িয়ে যাবে। বাবা-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করবে।

সন্তানদের ঘিরে বাবা-মার স্বপ্নের মধ্যে অনেকটাই থাকে অন্ধত্ব-বাৎসল্যের পক্ষপাত। চেলে একটু আকাশের দিকে তাকালে মনে হয়, ও বড়ো হয়ে কবি হবে, পয়সার দিকে তাকালে মনে হয় হবে ব্যাংকার। উন্মাদ পত্রিকায় একবার একটা ভারি মজার কার্টুন ছাপা হয়েছিল। ছেলেপুলের কাণ্ড দেখে বাবা-মা কী ভাবেন, বড়ো হয়ে ছেলেরা কী হয়। ছোটবেলায় সন্তানকে তবলা বাজাতে দেখে বাবা-মা ভাবেন—সে নিশ্চয়ই জাকির হোসেন হতে যাচ্ছে। বড়ো হলে দেখা যায়, সে হয়েছে মিনিবাসের হেলপার, বাসের গায়ে চড় মেরে চিৎকার করছে—ডাইরেক্ট গুলিস্তান, ডাইরেক্ট গুলিস্তান। গিটার বাজানো সন্তানকে ঘিরে বাবা-মায়ের চোখের সামনে ভেসে ওঠে এরিখ ক্লাপটন, বড়ো হয়ে এই ছেলে হয় ধুনকার, তুলো ধোনে, লেপ-তোষক বানায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ছেলেবেলা যে তুলি দিয়ে ছবি আঁকে, বড়ো হলে রংতুলি নিয়ে ব্যস্ত থাকে বটে, তবে ক্যানভাসের সামনে নয়, রাস্তায়, জেব্রাক্রসিং আঁকে।

উন্মাদঅলাদের এ নিষ্ঠুর রসিকতা সবসময় সত্য হয় না। প্রায় বাবা-মার চেয়ে সন্তানরা এগিয়ে যায়। ছেলেটা বড়ো হয়, নাম হয়, যশ হয়, টাকাপয়সা কামাতে থাকে। মেয়েটার বিয়ে হয়। কপাল ভালো হলে পাড়ি জমায় ইউরোপ-আমেরিকায়। নানান জায়গায় দেখেটেখে ছেলের বিয়ে দেন বাবা-মা। ঘরে শিক্ষিত বৌ আসে। কদিন হেসেখেলে ভালোই যায়। তারপর একদিন আসে স্বপ্নভঙ্গের কাল। মায়ের মনে আফসোস—হায়, না হতে পারলাম সেকালে শাশুড়ি, না হতে পারলাম একালের পুত্রবধূ। বাবা যতোটা স্বপ্ন দেখেছিলেন, ছেলে তারো চেয়ে ডাঙর হয়ে ওঠে। আলাদা ফ্লাটে নাতি-নাতনিকে নিয়ে ছেলে আর বৌ চলে যায় একদিন। শেষ বয়সে শ্যাওলা ধরা বাড়ির বারান্দায় বসে নিঃসঙ্গ বুড়োবুড়ি বারবার চশমার কাচ মোছে। দিন ফুরিয়ে এসেছে, যে-কোনো সময় ওপারে যেতে হবে। এখন আর চাওয়া-পাওয়া কী ?

শুধু কি মানুষের, স্বপ্নভঙ্গ ঘটতে পারে ইতিহাসেরও। যে স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়ে '৪৭-এ এদেশের মানুষ চাঁদতারা পতাকার দিকে তাকিয়েছিল, তা ভাঙতে বেশি সময় লাগেনি। তারপর আবার নতুন করে স্বপ্ন দেখা। বড়ো বেশি দাম দিয়ে অর্জিত হল স্বপ্নের বাংলাদেশ। কিন্তু স্বপ্নের বাংলাদেশ আর বাস্তবের বাংলাদেশ এক হলো কই ? আবার স্বপ্ন দেখা, নতুন স্বপ্নের তাড়নায় নব্বইয়ে গণঅভ্যুত্থান। এখন চলছে স্বপ্নভঙ্গের কাল।

আমি একজন কমিউনিস্টকে জানি। বড়ো নেতা নন। সারাটা জীবন তিনি ব্যয় করেছেন হাতুড়ি-কাস্তের আদর্শের পিছনে। নব্বইয়ের আগেই একবার গিয়েছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নে। সেখানে গিয়ে শুনলেন, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টিকেও সোভিয়েত ইউনিয়ন নিয়মিত অর্থ-সাহায্য দেয়। স্বপ্নের কমিউনিজমের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নে দেখা বাস্তব কমিউনিজমেও নিশ্চয়ই তিনি মিল খুঁজে পাননি। সেটা খুব বড়ো আঘাত হয়ে বেজেছে তার বুকে। এতো বড়ো আঘাত যে, তিনি সহ্য করতে পারেননি।

সেই নেতা এখন ঘোরেন পথে পথে। কাপড়চোপড়ের ঠিক নেই, চুল এলোমেলো, চোখ লাল। ঘুম পেলে শুয়ে পড়েন পথের ধারেই। আর যান কমিউনিস্ট নেতাদের বাড়ি বাড়ি। দরজায় ধাক্কা দিয়ে নেতাদের কাউকে পেলে শুধু একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন—এতো রুবেল এলো, আমার ভাগ কই ? কমরেড, বলুন, আমার ভাগের টাকা কে নিলো ?

কিংবা আজ যদি এই বাংলাদেশে আসে রুমী, পয়লা বোশেখের এই উৎসব-আনন্দের মধ্যে হঠাৎ করে হিসাব চেয়ে বলে, যে বাংলাদেশের স্বপ্ন আমরা দেখেছিলাম, এই কি সেই বাংলাদেশ ? তাহলে এই দেশে আমার মায়ের মুখে হাসি ছিল না কেন? কেন আমাদের মা হাসিমুখে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে পারেননি ? আমরা কী জবাব দেবো ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দর্শনীয় বস্তুগণ

মার্কিন দেশের ফার্স্ট লেডি হিলারি। তিনি এলেন এই পোড়ার দেশে, দেখা করলেন গরিব মহিলাদের সঙ্গে। এসব গরিব মহিলা গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্য। তারা ঋণ নেয়, শোধ দেয়। ২০০০ টাকা ঋণ নিলে প্রতি সপ্তাহ শোধ দেয় ৪০ টাকা। এক বছরে ঋণ শোধ। মার্কিন ফার্স্ট লেডি দেখতে গেলেন সেইসব গরিব-গুর্বোদের। অথচ দেখতে এলেন না আমাদের মতো কৃতি মানুষদের। গ্রামীণ ব্যাংক সারাবছরে সব মিলিয়ে ঋণ দিয়েছে কতো ? ১৬০০ কোটি টাকা। আমাদের একেকজনের ঋণের পরিমাণই এরকম কোটি কোটি টাকা। আমরা রাষ্ট্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়েছি, ঋণ নিয়ে দেশের উন্নতি করছি। কতো কিছু করছি। আমাদের জন্যই তো দেশে ব্যবসাবাণিজ্য হচ্ছে, লোকে কাজ পাচ্ছে, খেতে পাচ্ছে। ফার্স্ট লেডি হিলারি আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন না কেন ? তারা কেন কেবল রোকেয়া, সখিনা, খোরশেদা, মমিনা, বাতাসি, তাপসির সঙ্গে দেখা করবেন ? হেসে হেসে কথা বলবেন ? গ্রুপ ছবি তুলবেন ? বাংলাদেশের অর্থনীতিতে আমাদের ভূমিকা কি কম ?

মি. চৌধুরী সকাল থেকেই এই ভাবনায় বিশেষভাবে তাড়িত হয়ে আছেন। বিদেশী অতিথিরা যদি ব্যাংকের ঋণগ্রহীতাদেরকেই এতো মূল্য দেবেন, তবে গ্রামীণ ব্যাংক কেন ? আমাদের মতো বড়ো বড়ো ঋণীদের কেন তারা পাত্তা দেবেন না ?

আমরাই তো বাঁচিয়ে রেখেছি দেশটাকে। মনে মনে বললেন চৌধুরী। আমরা সরকারকে চাঁদা দিই, সরকারবিরোধীকে চাঁদা দিই। আমাদেরকে গুরুত্ব দেয়া হবে না কেন ?

এই তো আমাদের নেতা রহমান সাহেব। তিনি এখন দেশের সংবাদপত্রকে উদ্ধার করতে লেগেছেন। স্বাধীনতা দিবসে বেরিয়েছে তার ইংরেজি দৈনিক। সেই দৈনিকটির নাম স্বাধীন। মনে হতে পারে স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ধারণ করে আছে পত্রিকাটি। কিন্তু মূলমন্ত্রটি বেরিয়ে গেছে প্রথমদিনের সংবাদ শিরোনামটিতেই। শিরোনামের প্রথম শব্দটি হচ্ছে বিশ্বাস। বিশ্বাস স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বাণী দিয়েছেন—সেটিই হচ্ছে ওই সাংবাদপত্রের উদ্বোধনী দিনের শিরোনামের প্রতিপাদ্য। রেডিও-টিভিও স্বাধীনতা দিবসের খবরের প্রথম শব্দ হিসেবে বিশ্বাসকে বেছে নেয় না। বিশ্বাসদের প্রতি আমাদের এমনি অন্ধবিশ্বাস সত্ত্বেও বিদেশী অতিথিরা আমাদের গুরুত্ব দেবে না কেন ? আমরাই তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ভেরি ইমপর্ট্যান্ট পারসন। আমরা হলাম গিয়ে ঋণখেলাপি। হা-হা-হা। সাইফুর রহমান প্রথম প্রথম এসে আমাদের নামের তালিকা বের করেছিল। আমরা বলেছি, খবরদার, আমাদের লেজে পা দিও না। আমরা ব্যবসাপাতি বন্ধ করে দেবো। দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। ধমকে কাজ হয়েছে। সাইফুর রহমান বেশিদূর এগোননি। ওই ভদ্রলোক আবার মাঝেমধ্যে বেশ বিপ্লবী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কথাবার্তা বলতে ভালোবাসেন। সম্প্রতি লেগেছেন ব্যাংকিং সেক্টরে অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ে। কোনো কোনো বেসরকারি ব্যাংকের ডিরেক্টররা কোটি কোটি টাকা মেরে দিয়েছে। সাইফুর রহমান তাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে চান। বলতে গিয়েই বিপদ। খোদ সচিবালয়ের মধ্যে অর্থমন্ত্রীর অফিস তছনছ। গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র উধাও। অর্থমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সচিবের হার্ট এটাক। পরবর্তীকালে ইন্তেকাল। ইন্নালিল্লাহে....রাজেউন।

চৌধুরীর বাঁ-পাশটা চিনচিন করছে। হার্টের অবস্থা বেশি ভালো নয়। দুনিয়া দুই দিনের। আজ আছি কাল নেই। যতো পারো, দুদিনেই চুষে নাও। সরকারি ব্যাংকে চঞ্চু ডুবিয়ে টান দাও। চোষো। কোটি কোটি টাকা চোষো।

তবে রহমান সাহেবের স্বাধীন পত্রিকাটি হয়েছে বেশ। উই শ্যাল মেক জার্নালিজম ডিফিকাল্ট। তোমরা যারা পত্রিকা বেচে পত্রিকার পয়সায় চলতে চাও তারা বিদেয় হও। আমি এসে গেছি। দি গ্রেট ব্যাংক ডিফল্টার। আমি ১০০ পাতার হোয়াইটপ্রিন্ট পত্রিকা ৪ রঙে ছেপে ৪ টাকায় বেচবো। বিক্রি না হলেও আমার কোনো কিছু যায় আসে না। গৌরিসেনের টাকা আমার আছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকা। জনগণের টাকায় আমি জনগণকে পত্রিকা সরবরাহ করছি। কার কী ? চৌধুরী সাহেব ভাবেন রহমান সাহেবের পদাঙ্ক অনুকরণ করা উচিত। ব্যাংক থেকে তিনি ২৫০ কোটি টাকা লোন নেবেন বলে মনে মনে ঠিক করেন। এই টাকায় তিনি মিডিয়া লিমিটেড খুলবেন। দি চৌধুরী মিডিয়া লিমিটেড। আহা! ৯০ সালে গণঅভ্যুত্থানের পর সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এরশাদের দালালদের কালো তালিকা বের করেছিল। তাতে তার নাম ছিল। রহমান সাহেবদের নামও ছিল। আর আজ ? হা-হা-হা। আপাতত বিদেশী অতিথিদের কাছ থেকে পাত্তা না পাবার যন্ত্রণাটাই তার বুকে বড়ো হয়ে বাজছে। ২০০০ টাকা ঋণ নেয়া ফকিরনীকে দেখতে যাবেন হিলারি-ফিলিপ, আর তার সঙ্গে দেখা করবেন না ?

রাতে অস্থিরতা নিয়ে ঘুমুতে গেলেন চৌধুরী। ঘুম ভালো হলো না। শেষরাতে একটা স্বপ্ন দেখলেন। দুঃস্বপ্নই বলা ভালো। দেখলেন মিরপুর চিড়িয়াখানায় কতোগুলো নতুন খাঁচা বানানো হয়েছে। বিদেশী অতিথিরা এলে তাদের এই খাঁচা দেখতে নিয়ে আসা হচ্ছে। চৌধুরী সাহেবকেও একটা খাঁচায় বন্দি রাখা হয়েছে। তার খাঁচাটা গাধার খাঁচার পাশে। হিলারি তাকে দেখতে এসেছেন।

হিলারি তার দিকে আঙুল তুলে বললেন, এই দর্শনীয় বস্তুটি কী ?

সঙ্গীরা বললো, এই বস্তু অতি সম্মানীয়। ইনি একজন ব্যাংক ডিফল্টার। এরা সরকারি ব্যাংক থেকে ঋণ নেন কিন্তু শোধ দেন না। ইন্ডাস্ট্রির বদলে কমিশন-এজেন্সির ব্যবসা করেন। এসব বড়ো বড়ো ব্যক্তি থাকতে দেশে সবচেয়ে বেশি আয়করদাতা হন রংপুরের নাম না-জানা ব্যক্তি। গ্রামীণ ব্যাংক ১৬০০ কোটি টাকা ঋণ দিয়ে ২ লাখ পরিবারকে নিজের পায়ে দাঁড় করাচ্ছে। আর এরা একেকজন শ শ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে কী করছে তা রহস্যময়। সম্ভবত দে আর মেকিং এভরি সেক্টর ডিফিকাল্ট।

চৌধুরী সাহেবের পাশের খাঁচার গাধাটি চিৎকার করে উঠলো। তার ঘুম ভেঙে গেলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প

বর্ষাকালে আমাদের পাড়াটা থই থই করে পানিতে। পানি ঢুকে যায় ঘরের মধ্যে। বাড়ি থেকে বেরোতে নৌকা লাগে। ঢাকার রাজপথে নৌকা ? আমাদের রাজপথ চলে আঁকেবাঁকে, বৃষ্টির মাসে তাতে হাঁটুজল থাকে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ সম্ভব, তা আমরা কখনো ভাবিনি। কিন্তু দিন সমান যায় না। পাড়ায় একজন নেতা আছেন, তিনি মন্ত্রী হয়ে গেলেন। তার কর্মীরা বললো—লিডার, ইলেকশন করে হাতপা ঝাড়া অবস্থা, কাজকর্ম কিছু দ্যান, না হলে বাঁচবো কী করো ? মন্ত্রী বললেন, তাই তো, তোমাদের জন্য তো প্রোগ্রাম দিতে হয়, উন্নয়ন কর্মসূচি।

মন্ত্রীর বাড়িতে পানি ওঠে, এ বড়ো অসম্ভব ঘটনা, এরকম চলতে পারে না; তেমনি কর্মীরা হাতপা গুটিয়ে বসে থাকবে—তাও হয় না। মন্ত্রীর নিজের উদ্যোগে প্রজেক্ট প্রস্তুত হলো। জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প। বাজেট বরাদ্দের জন্য তিনি নিজে অর্থ মন্ত্রণালয়ে দৌড়াদৌড়ি করলেন। প্রকৌশলীরা মহাখুশি। একটা উন্নয়ন প্রজেক্ট মানেই তো তাদের উন্নয়ন। সুতরাং এই প্রজেক্ট কার্যকর হলে জনগণের কতো লাভ হবে, উপকার হবে, তা বর্ণনা করতে প্রকৌশলীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হলো। কর্মীরা কেউ বনে গেলো কন্ট্রাক্টর, কেউ সাপ্লায়ার। কতো ধরনের কাজ থাকে একটা প্রজেক্টে। প্রাক সম্ভাব্যতা যাচাই, বালি সাপ্লাই, বৃক্ষরোপণ, কনস্ট্রাকশন, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা। সবাই খুশি, সবাই উপকৃত। ইঞ্জিনিয়ার উপকৃত, কন্ট্রাক্টর উপকৃত, কর্তা উপকৃত, কর্মী উপকৃত, আমলা উপকৃত, মন্ত্রী উপকৃত।

খাল খোঁড়া হলো, আন্ডারগ্রাউন্ড স্যুরেজ সিস্টেম হলো। সে কী বিপুল কর্মযজ্ঞ আমাদের পাড়ায়। ৩ বছর লাগলো এ প্রকল্পের কাজ শেষ হতে। এর মধ্যে পাড়ায় লণ্ডভণ্ড অবস্থা, বিশাল বিশাল গর্ত, পথের ধারে মাটির স্তূপ, রাস্তায় কাদা, পথ বন্ধ, যানজট—জীবন দুর্বিষহ হওয়ার যোগাড়। আর বর্ষাকালে অবস্থাটা যে কী পর্যায়ে গেলো, তা বর্ণনার অতীত। পাড়ায় বাড়ি ভাড়া কমে গেলো, ভাড়াটে সব বাসা ছেড়ে চলে যেতে লাগলো অন্য মহল্লায়। ৩ বছরের মাথায় নির্মাণকাজ শেষ হলো। ততোদিন কতোজনের টিনের চালার জায়গায় তেতলা ফ্লাট উঠলো, কতোজনের ছেঁড়া চপ্পলের জায়গায় টয়োটা-মারুতি এলো! পরশ্রীকাতরদের চোখ টাটালো, বাইরের চাঁদাবাজরা এ পাড়ায় এসে চাঁদা চাইতে গিয়ে বাধিয়ে ফেললো ককটেল যুদ্ধ। নির্মাণকাজ শেষ। এবার শুভ উদ্বোধন। বিশাল শামিয়ানা টাঙিয়ে হলো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ফিতে কাটা হলো। টিভি খবরের ১০ মিনিট জুড়ে দেখানো হলো মন্ত্রী সাহেবের বক্তৃতা। চৈত্র গেলো। বৈশাখ গেলো। জ্যৈষ্ঠ গেলো। কিন্তু বৃষ্টি আর হয় না। মন্ত্রী সাহেব হাঁসফাঁস করেন। এতো টাকার নিষ্কাশন প্রকল্প অথচ বৃষ্টিই হয় না। তারপর এলো বৃষ্টির মৌসুম। সেকি বৃষ্টি। কিন্তু একী ? জল গড়িয়ে কোথায় নেমে যাবে, তার বদলে সারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শহরের জল চলে এলো আমাদের পাড়ায়। এমনকি বুড়িগঙ্গার ঘোলা পানি এসে থইথই করতে লাগলো সমস্ত পাড়া। উৎসাহি মৎস্য শিকারিরা রাস্তায় নেমে পড়লো জাল হাতে, মাছ ধরবে বলে। বঙ্গোপসাগরে থেকে ডিম পাড়বে বলে যে ইলিশ উজিয়ে এসেছিল সদরঘাট পর্যন্ত, তা ধরা পড়লো আমাদের পাড়ার রাস্তায়। বিশাল ঘটনা।

আমরা অবশ্য একধরনের স্বস্তিই পেলাম। পাড়ায় আর যানজট নেই। নৌকায় চড়ে তিনটাকা দিলেই পাড়ার বাইরে যাওয়া যায়। ডোর টু ডোর সার্ভিস। এ অবস্থা আমাদের গা-সওয়া হয়েই গিয়েছিল প্রায়। কিন্তু পরিবর্তন ঘটলো রাষ্ট্রক্ষমতার। বদলে গেলো সরকার। পাড়ায় দেখা দিলো নতুন নেতা। তার ঘরের ভেতরে বুড়িগঙ্গার পচা পানি থইথই করবে, ম্যানহোল উপচে ম্যান-মেড-বর্জ্য ঢুকে পড়বে ডাইনিং রুমে—এটা তার সহ্য হলো না। তিনি বললেন, তদন্ত করতে হবে। সাবেক নেতা এসব কী করেছেন?

প্রকৌশলীরা তখন বললেন, আগের প্রজেক্টটি প্রণীত হয়েছিল রাজনৈতিক নির্দেশে। যথেষ্ট সম্ভাব্যতা যাচাই করা হয়নি। সবচেয়ে বড়ো কথা এক বিশাল কারিগরি ত্রুটি আছে সাবেক প্রজেক্টের। ঐ পাড়ায় গ্রাউন্ড লেভেল অনেক নিচু। এমনকি বুড়িগঙ্গার পানির লেভেলের চেয়ে ঐ পাড়ার ভূমিতল নিচুতে। সুতরাং ড্রেইনেজ সিস্টেম গড়তে হলে শুধু ড্রেন খুঁড়লেই চলবে না, স্লুইস গেট বানাতে হবে, পাম্প লাগিয়ে পানি বের করে দিতে হবে। না হলে সারা ঢাকার পানি ঐ পাড়ায় গিয়ে জমবেই। তাহলে আবার প্রকল্প প্রণয়ন করুন, পাড়ার নতুন নেতা বললেন। শুরু হলো ছুটোছুটি, ফাইলের আদান-প্রদান। মন্ত্রী উপকৃত হলো, কন্ট্রাক্টর উপকৃত হলো। হাতে নেওয়া হলো নতুন প্রকল্প, নতুন করে বরাদ্দ হলো টাকা। কর্মীরা আবার কন্ট্রাক্টর হলো, কেউবা সাপ্লায়ার। আবার ফ্লাট উঠতে লাগলো পাড়ায়।

ভালোই আছি আমরা। ওদিকে শুনছি, সমস্ত ঢাকার ড্রেইনেজ সিস্টেম নিয়ে মাস্টার প্রজেক্ট হচ্ছে। তা হোক। আমাদের পাড়ার প্রজেক্ট চলবে আমাদের পাড়ার নেতাদের ইচ্ছায়। আমাদের প্রজেক্টগুলোর তো সত্যিকারের অস্তিত্ব আছে। শুধু হাওয়ায় হাওয়ায় টাকা গায়েব হয় না। সেই কৌতুকটা মনে করলেই বুঝতে পরবেন আমরা কতো ভালো। একবার একটা পুকুর খোঁড়ার জন্য টাকা বরাদ্দ হলো। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার-কন্ট্রাক্টর-কর্তারা মিলে করলেন কী, সব টাকা ভাগ-বাটোয়ারা করে নিলেন, কোনোরকম পুকুর খুঁড়লেনই না। কিন্তু কিছুদিন পর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সেই পুকুর পরিদর্শনে আসতে চেয়ে চিঠি লিখলেন। তখন ইঞ্জিনিয়ার-কন্ট্রাক্টর-কর্তারা মিলে তড়িঘড়ি আরেকটা প্রজেক্ট বানালেন। এই পুকুরের কারণে এলাকায় সমূহ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। পুকুরটি ভরাট না করলেই নয়। আবার টাকা বরাদ্দ হলো। আবার সবাই মিলে টাকা ভাগাভাগি করে নিলেন তারা। একেই বলা হয় পুকুরচুরি। এর সঙ্গে তুলনা করলে আমাদের পাড়ার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প ঢের ঢের ভালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ওলটপালট করে দে মা লুটেপুটে খাই

আসামির বিরুদ্ধে অভিযোগনামা পাঠ করে শোনানো হলো।

লোকটা হালকা-পাতলা, ঝাঁকড়া চুল, পরনে লুঙি, গায়ে একটা হায়োই শার্ট। তার চোখ লাল টকটকে। অভিযোগনামাটা যখন পড়া হচ্ছিল, তখন সে বারবার থুতু ফেলছিল।

তার বিরুদ্ধে অভিযোগটা গুরুতর। সেটা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে অভিযোগনামায়।

সেদিন ছিল শনিবার। ভোরবেলা। সূর্য সবে উঠেছে। ৭নং আপ ট্রেন কাউনিয়া জংশন পার হয়ে ধীরে ধীরে চলতে শুরু করেছে রংপুরের দিকে। আসামি ফরিদ আলী তখন ঘুম থেকে উঠে একটা আমগাছের ডাল ভেঙে দাঁতন বানিয়ে দাঁত মাজছিল। ভোরবেলার নিস্তব্ধতার মধ্যে পাখপাখালির ডাক আর দূরাগত ট্রেনের আওয়াজ।

রেললাইন থেকে তাদের বাড়ি বেশি দূরে নয়। সিকি মাইল হবে।

হঠাৎ বিকট আওয়াজ। রেলগাড়ির ঝমঝমাঝম আওয়াজ গেলো থেমে। তারপর মানব-মানবীর আর্তনাদ।

ফরিদ আলীর বুঝতে বাকি রইলো না যে ট্রেন-একসিডেন্ট হয়েছে। সে কিছু বোঝার আগেই দৌড় ধরলো ঘটনাস্থল অভিমুখে। পরিস্থিতি অবর্ণনীয়। ইঞ্জিনসহ ছটি বগি উল্টে রেললাইনের পাশে খাদের মধ্যে পড়ে আছে। বাকিগুলোর কয়েকটি লাইনচ্যুত হয়েছে, কতোগুলো এখনো দাঁড়িয়ে আছে লাইনের উপর।

ওল্টানো বগির নিচে কতোজন চাপা পড়ে মারা গেছে কে জানে! পুরো এলাকা জুড়ে আহত যাত্রীদের আর্তনাদ। ভয়ার্ত যাত্রীদের বিলাপ। যারা বেঁচে আছে, তারা একসঙ্গে জড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে আর কাঁদছে।

ফরিদ আলী গিয়ে দেখলো এরই মধ্যে লুটতরাজ শুরু হয়ে গেছে। ব্যাগ, সুটকেস ধরে টানাটানি, ট্রাংক মাথায় করে ক্ষেতের মধ্য দিয়ে দৌড়াদৌড়ি।

ফরিদ আলী কী করবে বুঝতে পারলো ন। সে ইন্টারমিডিয়েট পাস, বেকার, দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। একদিকে শিক্ষা থেকে পাওয়া নীতিবোধ, অন্যদিকে দারিদ্র্যের প্ররোচনায় উসকে-ওঠা লোভ—সে দোটানায় পড়লো। দ্বিধান্বিত অবস্থায় কেটে গেলো মিনিট কয়েক। সে হতবিহ্বল।

তার চোখের সামনে এক অল্পবয়সী নারীদেহ পড়ে আছে। মহিলা কাতরাচ্ছে। তার একটি হাত চাপা পড়ে আছে কোথা থেকে উড়ে-আসা রেললাইনের নিচে। মহিলার পুরোটা দেহ অক্ষত, শুধু হাতটা অনড়। লৌহখণ্ডের নিচে আটকে থাকায় তিনি বেরুতে পারছেন না। উপুড় হয়ে পড়ে আছেন। মহিলার গলায় সোনার হার, দুইহাতে সোনার বালা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ফরিদ আলীর চোখের সামনেই একজন এসে মহিলার গলা থেকে হার খুলে নিলো। আরেকজন এসে ডানহাত থেকে টেনেহিঁচড়ে নানান কসরত করে বের করে নিলো সোনার বালাটি।

ফরিদ আলী তখনো কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারপর হঠাৎ লোভ জেগে উঠলো ফরিদ আলীর মনে। ট্রাংক-সুটকেস, ব্যাগ-মানিব্যাগ কিছুই আর এখন অবশিষ্ট নেই। আহত-নিহত মানুষের শরীরে তল্লাশি করে এসব নিয়ে সটকে পড়েছে মতলববাজ লোভি মানুষরা।

আরেক দল মানুষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছে আহতদের উদ্ধারে।

উপুড় হয়ে পড়ে-থাকা মহিলার নীল ব্লাউজ, ঘাড়ের শাদা ত্বক, খুলে-যাওয়া খোপা, খুলে-পড়া দুটো লাল স্যান্ডেলের দিকে তাকিয়ে বড় মায়া হলো ফরিদ আলীর। মনে হলো, কয়েকজন গ্রামবাসীকে ডেকে এই লম্বা ভারি লৌহখণ্ডটা টেনে তুলে মেয়েটাকে উদ্ধার করা দরকার।

কিন্তু অচিরেই ফরিদ আলীর চোখ চলে গেলো মহিলার বামহাতে। যেটির পাঞ্জা চাপা পড়ে আছে লোহার রেললাইনের নিচে, কিন্তু সে বাহুতে জ্বলজ্বল করছে সোনার ভারি বালাখানি।

ফরিদ আলী কর্তব্য স্থির করে ফেললো। আশপাশে তাকিয়ে দেখলো, তাদের পাড়ার সগির মিয়ার হাতে একখানি দা। সগির মিয়া নারকেলগাছি, হয়তো সকাল বেলায় ডাব পাড়তে বেরিয়েছিল দা আর দড়ি হাতে।

ফরিদ আলী ছুটে গেলো সগির মিয়ার কাছে, কেড়ে নিল দা-খানি। দ্রুতপায়ে এলো মহিলাটির কাছে—উবু হয়ে উত্তোলন করলো দা-খানি। একবার তার মনে হলো, তরুণীটির মুখখানি উল্টিয়ে সে দেখে, কিন্তু পরক্ষণেই সে নিবৃত করলো নিজেকে। এখন মায়ার সময় নয়, কোথাও কোনো মায়ার বন্ধনে জড়িয়ে পড়া তার ঠিক হবে না। অতঃপর শরীরের সমস্ত শক্তি একীভূত করে সে চোট বসালো মেয়েটির বাম কব্জিতে। এককোপে হাতখানি বিচ্ছিন্ন হলো চাপা-পড়া পাঞ্জা থেকে। তারপর সে ঠাণ্ডামাথায় খুলে নিলো সোনার কঙ্কনখানি। রক্তমাখা একটা সোনার ভারি চুড়ি হাতে সে দ্রুতপায়ে সটকে পড়লো। অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে রইলো তরুণীর দেহখানি।

অভিযোগনামা পড়ে শোনানো হলো ফরিদ আলীর বিরুদ্ধে। উদ্ধারকৃত সোনার বালাখানি দেখানো হলো প্রমাণ হিসেবে।

ফরিদ আলী তার বক্তব্যে অভিযোগনামার বিবরণকে স্বীকার করে নিলো সত্য বলে। আসামি পক্ষের উকিল দেখলেন অবস্থা খারাপ। তিনি তখন বললেন, ফরিদ আলী আসলে একজন মরণাপন্ন তরুণীর জীবন বাঁচাতে তার হাত কেটে নিয়েছিল। এছাড়া তরুণীটিকে বাঁচানো যেতো না।

ফরিদ আলী মেঝেতে শুকনো থুতু ছিটিয়ে বললো, না, এ-কথা ঠিক নয়। সবাই মিলে ধরলে ওই লোহার পাতটিই সরানো যেতো। হাত কাটার দরকার পড়তো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিচারক বিস্মিত হলেন। ভাবলেন, যুবক ফরিদ আলী সম্ভবত ওই তরুণীর প্রেমে পড়েছে। অপরাধবোধ ও মানব-মানবীর সম্পর্কের চিরকালের রহস্য থেকেই এমনিভাবে অপরাধ স্বীকার করছে ফরিদ আলী।

বিচারক বললেন, ফরিদ আলী, তুমি কি তোমার অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছ?

ফরিদ আলী এই প্রশ্নের জবাবে যা বললো, তা বাস্তব দুনিয়ায় কেউ কখনো বলতে পারে না, কেবল ফ্যান্টাসির জগতের চরিত্রদের মুখেই শোভা পায়।

সে বললো, মাননীয় আদালত, আমি অপরাধ করেছি, আমার বিচার হচ্ছে, সাজা হবে। কিন্তু যদি এমনটা প্রমাণ করা যায়, এই ট্রেন-দুর্ঘটনা নিছক দুর্ঘটনা নয়, এটা একটা স্যাবোটাজ, অন্তর্ঘাত, ডাকাতির উদ্দেশেই এটা করা হয়েছে, তবে? হ্যাঁ, তাহলেও তদন্ত হবে, বিচার হবে। ষড়যন্ত্রকারী, চক্রান্তকারী, ঘটনার সঙ্গে জড়িত সবার বিচার হবে, কঠিন সাজা হবে। হয়তো হবে মৃত্যুদণ্ড কিন্তু ইয়োর অনার, এই যে ওলটপালট করে ফেলে লুটেপুটে খাওয়া, এ নিয়ে এবার আমার একটা বক্তব্য আছে। জানি না ছোটোমুখে এতো বড়ো কথা বলা উচিত হবে কিনা। বিষয়টি সার নিয়ে। দেশে সারের কোনো সঙ্কট থাকার কথা নয়। দেশে পর্যাপ্ত সার উৎপাদিত হয়, পর্যাপ্ত সার মজুত আছে। কিন্তু ১৮০ টাকায় সার কিনে ২০০ টাকায় বিক্রি করলে লাভ কম হয় বলে এক বড়ো লণ্ডভণ্ড অবস্থার সৃষ্টি করা হলো। সার রফতানি করা হলো। শুধু তাই নয়, দলীয়করণ করে সার বিতরণে নৈরাজ্য সৃষ্টি করা হলো। সার স্টক করে সৃষ্টি করা হলো কৃত্রিম সঙ্কট। এরপর সার হয়ে উঠলো আক্রা। ১৮০ টাকার সার বিক্রি হতে লাগলো ৫০০ থেকে ৮০০ টাকায়। তাও পাওয়া যায় না। সারের দাবিতে কৃষকরা নেমে এলো রাজপথে, সড়কে। গুলি চললো তাদের উপরে। দেশের বিভিন্নস্থানে সব মিলিয়ে নিহত হলো ১২ জন কৃষক, আহত হলো শত শত।

আজ আমি একজন মহিলার হাত কেটে চুড়ি খুলে নিয়েছি, এ অপরাধে যদি আমার শাস্তি হয়, তবে যারা ডাকাতির জন্য রেল-দুর্ঘটনা ঘটায় তাদের নিশ্চয়ই বড়ো শাস্তি হবে। আর তাদের যদি বড়ো শাস্তি হয়, যারা মুনাফার জন্য দলপ্রীতি আর স্বজনপ্রীতির জন্য দেশের সার-সঙ্কট তৈরি করে হত্যা করলো কৃষকদের আর অনিশ্চিত করে ফেললো আমাদের আগামী বছরের ফসল উৎপাদনকে, তাদের কী বিচার হবে, কী শাস্তি হবে? একদিকে কৃষকরা সার লুট করছে, মারা পড়ছে, এটাই কি কেবল সত্য, অন্যদিকে অনেক দলীয় ব্যক্তির টিনের চালা দোতলা হচ্ছে, বহু দোতলা বাড়িতে টাকার পাহাড় জমছে, সেটা কি সত্য নয়? আমার চুরি করা চুড়ি সিজ করা হয়েছে, এদের কোটি কোটি টাকা সিজ করবে কে?

থু-থু। ফরিদ আলী বড় এক দলা থুতু ফেললো মেঝেতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এ যুগের হিটলার মুসোলিনি

হিটলারের মন খুব খারাপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তার পরাজয়ের পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হয়ে গেলো। মিত্রবাহিনীর এ বিজয়ের অর্ধশত বার্ষিকীর উৎসব পৃথিবীর এখানে-সেখানে উদযাপিত হচ্ছে। সেসব অনুষ্ঠানে সবাই তার মুণ্ডুপাত করছে। মৃত্যুর এতো বছর পরেও পৃথিবীর মানুষের ঘৃণা বর্ষিত হচ্ছে তার প্রতি। তিনি কি তাই চেয়েছিলেন, লোকে তারে ঘৃণা করুক ? তিনি চেয়েছিলেন ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সম্মান। অথচ পৃথিবীর লোক তাকে এতো ঘৃণা করে ? বিষয়টি নিয়ে গোয়েবলসের সঙ্গে আলাপ করতে পারলে ভালো হতো। কিন্তু এই লোকটিকে বিশ্বাস করা মুশকিল। হয়তো একই মিথ্যা কথা ১০ বার বলে উল্টো হিটলারকেই বিশ্বাস করিয়ে ছাড়বে। না। তিনি আর বোকা বনতে চান না। মুসোলিনির ফ্যাসিবাদ প্রয়োগ করতে গিয়ে তিনি এই দুনিয়ায় অশান্তি কম করেননি। পৃথিবীর পাঁচ কোটি মানুষের মৃত্যু ঘটিয়েছেন। পাঁচ কোটি ? কতোজনে এক কোটি হয় ? ভাবতে বসে কূলকিনারা করতে পারলেন না হিটলার। এতো লোক মারা গেছে শুধু তার কারণেই ? আহা। কী মারাত্মক অহম দ্বারাই না চালিত হয়েছিলেন তিনি। বিশুদ্ধ জার্মান জাতিই সমস্ত বিশ্ব শাসন করবে—এই ছিল তার সহজসরল নীতি। জার্মান জাতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি—এই ছিল তার বিশ্বাস। তিনি বলেছিলেন, জার্মানি হয় হবে বিশ্বশক্তি, নয়তো কিছুই হবে না। বলেছিলেন, যারা জাতিগতভাবে বিশুদ্ধ নয়, তারা আবর্জনা মাত্র। কিন্তু পরাজয়ের পঞ্চাম বছর পরে আজ তিনি নিজের ভুল বুঝতে পারছেন। তার খুবই আক্ষেপ হচ্ছে কৃতকর্মের জন্যে। মনে হয়, আরেকবার যদি জন্ম নিতে পারতেন, যাপন করতেন সাধারণ কৃষকের জীবন।

পরকালের প্রায়শ্চিত্তময় জীবনযাপন করতে করতে যখন তিনি ক্লান্ত, তখন হঠাৎ করে সংবাদপত্রের একটা খবরের দিকে তার চোখ আটকে গেলো খবরের শিরোনামে 'ভারতের ক্ষমতায় একজন হিটলার প্রয়োজন : থ্যাকারে।' খবরটি এরকম : ভারতের উগ্র ডানপন্থী হিন্দু পুনর্জাগরণবাদী 'শিবসেনা' দলের প্রধান বাল থ্যাকারে সে-দেশের প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাওকে 'নিষ্কর্মা' হিসেবে অভিহিত করে বলেছেন যে, তার মতো একজন অকার্যকর লোকের পরিবর্তে ভারতবর্ষের ক্ষমতায় থাকা উচিত হিটলারের মতো কোনো ব্যক্তির। মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী বম্বে নগরীতে বাল সামন্তর লেখা 'হিটলার-এক বিশাল ট্রাজেডি' শীর্ষক পুস্তকের প্রকাশনা উপলক্ষে থ্যাকারে সাংবাদিকদের বলেন, দেশের জন্য এখন একজন 'আগ্রাসী হিটলারের' বড়োই প্রয়োজন। তার ভাষায়, হিটলার জার্মানি থেকে দুর্নীতির মূলোৎপাটন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন এবং সেই আদর্শের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। থ্যাকারে বলেন, আমি বইটির ৫০০ কপি কিনে জনগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করবো যাতে তারা জানতে পারে, হিটলার কেমন মানুষ ছিলেন। এএফপি। (ভোরের কাগজ, ৩০ মে '৯৫)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এই খবর পড়ে হিটলার অস্থির হয়ে উঠলেন। বলে কী বাল থ্যাকারে ? এই লোক কী চায় ? মনে হচ্ছে রক্তই এর একমাত্র পানীয় ?

এই ব্যক্তি কে ? তিনি তাড়াতাড়ি মুসোলিনির সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

মুসোলিনি বললেন, তাই তো ? ফ্যাসিবাদ ও নাৎসীবাদের বীজ তো রয়েই গেছে। ওই বাল থ্যাকারে ইতিমধ্যেই ভারতে যথেষ্ট রক্তপাত ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। ওরা বাবরি মসজিদ ভেঙে এমন হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা করিয়েছে যে মারা গেছে অগণিত মানুষ, বাড়িঘর-উপসনালয় ধ্বংস হয়েছে বিস্তর। আমরা যেমন নিজেদের মনে করতাম সর্বশ্রেষ্ঠ, এরাও তাই ভাবে। ধরো আমার ফ্যাসিবাদের কথা। আমার স্লোগান ছিল—Fasism means war.তো যুদ্ধ লাগিয়ে আমরা কী পেলাম, কেবল দুঃখ-দুর্দশা ছাড়া ? মানবতার দলন ছাড়া ? এরাও তেমনি দেখো না, বাল থ্যাকারে শুধু হিটলার চায় না, চায় 'আগ্রাসী হিটলার'। সর্বনাশ! মুসোলিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

হিটলার বললেন, আচ্ছা, শুধু কি ভারতেই এরকম হিটলারভক্ত সর্বনাশপন্থী লোক আছে, নাকি আশপাশে আরো আছে ? শুনে মুসোলিনি দুঃখের হাসি হেসে বললেন, আছে ভাই, আছে। বাংলাদেশেই আছে। বলেন কি ? হিটলারের গলায় উদ্বেগ।

হ্যাঁ, বাংলাদেশে আছে মওদুদীপন্থী একদল লোক। জামাতে ইসলামী। এদের দার্শনিক গুরু মওদুদী। তারও দর্শন হচ্ছে যুদ্ধ। মওদুদী তার 'হকিকতে জিহাদ' বইয়ে লিখেছেন, 'মুসলিম পার্টি সংস্কার ও আত্মরক্ষা উভয় উদ্দেশে একটি মাত্র দেশের নিয়াম প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত না হয়ে বরং সে নিয়ামকে চারদিকে বিস্তৃত করার চেষ্টা করে। তারা একদিকে তাদের চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করবে এবং বিশ্বের সকল দেশের অধিবাসীকে সে চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণের আহ্বান করবে। অন্যদিকে তাদের শক্তি থাকলে জিহাদ বা যুদ্ধ করেই অমুসলমান রাষ্ট্রগুলোকে নিশ্চিহ্ন করবে এবং সেগুলোতে ইসলামি হুকুমত কায়েম করবে।'

মওদুদীর এই কথা মুসোলিনির কাছ থেকে জানতে পেরে চিন্তিত হয়ে পড়লেন হিটলার।

এতো মুষড়ে পড়ছো কেন বৎস ? আগে পুরোটা শোনো। আজ বাল থ্যাকারে যে কথা বলছেন, প্রায় ৬১ বছর আগে এই মওলানা মওদুদী সে-কথা বলে গেছেন। মওদুদী বলেছিলেন, 'আজ আপনাদের সামনে জার্মানি ও ইটালির দৃষ্টান্ত মজুদ আছে। হিটলার ও মুসোলিনি যে বিরাট শক্তি অর্জন করেছেন তা সমগ্র বিশ্বে স্বীকৃত। কিন্তু তাদের সাফল্যের কারণ আপনাদের জানা আছে কি ? দুটি জিনিস তাদের সাফল্যের কারণ। বিশ্বাস ও নির্দেশের প্রতি আনুগত্য। নাৎসি ও ফ্যাসি দল কখনো এতো শক্তি অর্জন করতে পারতো না, যদি তারা নিজেদের বিশ্বাসের প্রতি অটল বিশ্বাস না রাখতো এবং নিজেদের নেতৃত্বের কঠোর অনুগত না হতো। (তরজামানুল কুরআন, ডিসেম্বর ১৯৩৪)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হায় হায় হায়। হিটলার বিলাপ করে উঠলেন।

মুসোলিনি বললেন, হিটলু শোনো। এই জামাতের কিন্তু ওই দুটি জিনিস প্রচুর পরিমাণে আছে। বুঝতেই পারছো, সামনে আরো কতো রক্তপাতের ঢল নামতে যাচ্ছে।

হিটলার বললেন, শুনেছি একাত্তর সালে নাকি এরা বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারতে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে।

হিটলার ও মুসোলিনি এসব গল্প বলাবলি করছিলেন আর নিজেদের অপকর্মের কথা মনে করে যারপরনাই শরমিন্দা হচ্ছিলেন।

ঠিক তখনই মর্ত্যে বাংলাদেশ থেকে একটা টেলিফোন কল গেলো ভারতে, বম্বে শহরে।

হ্যালো, বাল থ্যাকারে বাবু আছেন।

হ্যালো, কে বলছেন ?

জ্বী। আমি গোলাম আযম, ফ্রম বাংলাদেশ।

ও আচ্ছা। সেলাম নিন। কেমন আছেন ?

ভালো। আপনাকে অভিনন্দন জানাতে রিং করলাম। ওই যে আপনি হিটলারের প্রশংসা করে যে বক্তৃতা দিয়েছেন, ওটা খুব পছন্দ হয়েছে। আসলে হিটলার সাহেবকে আমাদেরও খুব পছন্দ কিনা।

থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ফর ইয়োর কমপ্লিমেন্টস। আপনারাও ওখানে খুব ভালো করেছেন। সব খবরই তো রাখি, চালিয়ে যান ভাই। ও পাশে আপনি, এ পাশে আমি। এ যুগের হিটলার-মুসোলিনি। হা-হা-হা।

এ টেলিফোন ডায়লগ শুনে হিটলার ও মুসোলিনির মুখে আর রা সরে না।

অনেকক্ষণ নীরব থেকে মুসোলিনি বললেন, শোনো হিটলু, যায় দিন ভালো, আসে দিন খারাপ। তুমি মানুষ মেরেছো গ্যাস চেম্বারে। গ্যাস চেম্বারে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই পটল তোলা সারা। আর গোলাম আযমের সমর্থকেরা মানুষ মারে কেমন করে জানো ? হাত কাটে, পা কাটে। তারপর জবাই করে। তারপর যতক্ষণ না পর্যন্ত মরে যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত চেপে ধরে বসে থাকে। যাদের হাতপা কাটা হয় নাই, তাদের হাতপায়ের রগ কেটে দিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করে। রাজশাহীর রতনসহ আরো অনেককে ওরা মেরেছে এভাবেই। চিন্তা করো। একেবারে জবাই।

মুসোলিনি মুখ তুলে তাকালেন হিটলারের দিকে, হিটলার বর্ণনা শুনে অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন। নিজের বর্ণনার ছবি মানসপটে চিত্রিত হয়ে উঠলো মুসোলিনির। তার বুক কাঁপতে লাগলো। ধীরে ধীরে তিনিও জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নজরুল যদি আসতেন

কাজী নজরুল ইসলাম যদি ফিরে আসতেন এই বাংলাদেশে, কেমন হতো ? যে-কথা, সেই কাজ। ঠিক হলো, তার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এই ১৪০২ সালের ১১ জ্যৈষ্ঠ তিনি আসবেন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায়। সাজসাজ রব পড়ে গেলো। চারদিকে তৈরি হতে লাগলো কাজী নজরুল ইসলাম সংবর্ধনা কমিটি। অসংখ্য কমিটি। তাদের অসংখ্য অনুষ্ঠান। নজরুল ইসলামকে সবাই সংবর্ধনা দিতে চায়। নজরুল বললেন, মাত্র একদিন থাকবো ঢাকায়, এতো অনুষ্ঠানে যাই কী করে ? সব অনুষ্ঠানে যেতে পারবো না, আপনারা কয়েকটা গ্রুপ মিলে একটা করে বড় গ্রুপ করেন, এরকম কয়েকটা বড় গ্রুপের কয়েকটা বড় অনুষ্ঠানে যেতে আমি রাজি। তবে খুব ভালোই হতো যদি অনুষ্ঠান হতো একটা, কমিটিও হতো একটা। যেমন সেবার হয়েছিল। ওই যে আমি 'ঢাকাবাসীর সংবর্ধনার উত্তরে' এক দারুণ ভাষণ দিয়েছিলাম। নজরুলের এই ইচ্ছাটা পূর্ণ হলো না। একক কমিটি করা গেলো না।

যাহোক, ১১ জ্যৈষ্ঠ তারিখে নজরুল ঢাকায় এলেন। সকাল থেকে শুরু হলো তার ব্যস্ততার পালা। প্রথমে তিনি যোগ দিলেন কমিউনিস্টদের সংবর্ধনা সভায়। ব্যানারে লেখা, কমরেড কাজী নজরুল ইসলাম, লাল সালাম। গান বাজছে—জাগো অনশন বন্দি ওঠোরে যত জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যাহত, জাগো। নজরুল ইসলাম মঞ্চে বসার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করা হলো। আবৃত্তি হলো—গাহি সাম্যের গান, মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই নহে কেহ মহীয়ান। ধর হাতুড়ি তোল কাঁধে শাবল, ধ্বংস-পথের যাত্রী দল, জোর কদম চলরে চল। এরপর শুরু হলো কমিউনিস্টদের বিভিন্ন উপগ্রুপের বিভিন্ন নেতার বক্তৃতা। বক্তৃতায় কাজী নজরুল ইসলাম যে একজন সাচ্চা কমিউনিস্ট ছিলেন, তিনি কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন, সেসব কথা সবিস্তারে বর্ণনা করা শুরু হলো। এদের বক্তৃতা শেষ হবার আগেই উঠতে হলো কবিকে। তার অন্য প্রোগ্রাম আছে। এবার তাকে নিয়ে যাওয়া হলো নারীবাদীদের আসরে। মহিলা গ্রুপগুলো এই সংবর্ধনা উপলক্ষে ঐক্যবদ্ধ হতে পেরেছে। মাইকে কবিতা আবৃত্তি হচ্ছে—সাম্যের গান গাই, আমার চক্ষে রমণীপুরুষ কোনো ভেদাভেদ নাই। অসতী মাতার সন্তান সে যদি জারজ হয়, অসৎ পিতার সন্তান সেও জারজ সুনিশ্চয়। নজরুল এখানে অনেকক্ষণ থাকলেন। অনেকের বক্তৃতা হলো। তিনি বসে গান লিখে চললেন—মোর প্রিয়া হবে এসো রানি, দেবো খোঁপায় তারার ফুল ইত্যাদি। বক্তৃতা শেষ হবার আগেই তাকে উঠতে হলো। অন্য অনুষ্ঠানের লোকেরা এসে তাকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে গেলো।

এবার তাকে সংবর্ধনা দিচ্ছে ডানপন্থী ইসলামী গ্রুপ। সেখানে গান বাজছে—ধর্মের পথে শহীদ যাহারা আমরা সেই সে জাতি, ...কিংবা ইয়া মুহাম্মদ বেহেশত হতে খোদাই পাওয়ার পথ দেখাও, কিংবা আল্লাতে যার পূর্ণ ঈমান কোথা সে মুসলমান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অবশ্য অনতিদূরে সম্মিলিত সংগ্রাম পরিষদ নামে একদল ফতোয়াবাজ নজরুলকে কাফের ও মুরতাদ ঘোষণা করলো। গানবাজনা হারাম—এই ফতোয়া দিয়ে নজরুলের ফাঁসি দাবিতে তারা স্লোগান ধরলো।

নজরুল ইসলাম খাতায় লিখতে লাগলেন :

মৌলোভী যতো মৌলবী আর মোল্লারা কান হাত নেড়ে,
দেব-দেবী নাম মুখে আনিয়াছে দাও পাজিটার জাত মেরে।
ফতোয়া দিলাম কাফের কাজীও
যদিও শহীদ হইতে রাজি ও.....

নজরুলের সিকিউরিটি গার্ড এ অনুষ্ঠানে তার বেশিক্ষণ থাকাটা এলাউ করলো না। নজরুলকে উঠতে হলো। শোনা গেলো, মোল্লাদের একটা গ্রুপ তার বিরুদ্ধে সিএমএমের কোর্টে মামলাদায়ের করতে গেছে। অভিযোগ হচ্ছে নজরুল তাদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হেনেছে। তারা এ উপলক্ষে বিশেষভাবে উল্লেখ করছে নজরুলের এই পংক্তিগুলো, খোদার আসন আরশ ছেদিয়া উঠিয়াছি আমি চিরবিস্ময় বিশ্ব বিধাত্রীর। আমি করি না কাহারে কুর্নিশ। ভণ্ডেরা শোনো মানুষ এনেছে গ্রন্থ, গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো। এও শোনা গেলো, আদালত তাদের মামলা গ্রহণ করেছে এবং তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছে।

তখনো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পরিষদের সংবর্ধনায় যাওয়া হয়নি। তিনি মাথায় একটা চাদর জড়িয়ে দ্রুতবেগে ও চুপিচুপি সেখানে হাজির হলেন। এখানে আবৃত্তি হচ্ছে, হিন্দু না ওরা মুসলিম ওই জিজ্ঞাসে কোন জন, কাণ্ডারী বলো মরিছে মানুষ, সন্তান মোর মার। মোরা এক বৃন্তে দুটি ফুল, হিন্দু মুসলমান। নজরুল ইসলাম এ অনুষ্ঠানে এসে আবেগাপ্লুত হলেন। তার চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগলো। তিনি বললেন, সারাজীবন আমি হিন্দু-মুসলিমের মিলন দেখতে চেয়েছি, গোলাগুলিকে গলাগলিতে পরিণত করতে চেয়েছি।

এ অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে তাকে যেতে হলো শিশুদের অনুষ্ঠানে। শিশুদের তিনি বড় ভালোবাসেন। শিশুরা আবৃত্তি করলো :

আমি যদি বাবা হতাম,
বাবা হতো খোকা,
না হলে তার নামতা পড়া,
মারতাম মাথায় টোকা।

এ অনুষ্ঠান থেকে তাকে নিয়ে যাবার জন্য যেমন সরকারি কর্মকর্তাগণ তেমনি সিএমএম আদালতের ওয়ারেন্টসহ পুলিশ অপেক্ষা করতে লাগলো। এদিকে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবও তাকে নিতে চায়। মোহামেডান স্পোর্টিং-এর বিজয় উপলক্ষে লেখা নজরুলের কবিতা তারা বারবার মাইকে প্রচার করছে। তাদের প্রতি ঢিল ছুড়ছে আবাহনী সমর্থকরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যাই হোক, কবিকে সরকারি কর্মকর্তারাই ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হলো। এখানে হচ্ছে জাতীয় পর্যায়ে নজরুল জয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের মঞ্চে বসে কর্তাদের বক্তৃতা শুনে নজরুলের হৃৎকম্পন গেলো বেড়ে, মাথা হয়ে গেলো গরম। সারাটা জীবন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে লিখেটিখে শেষ পর্যন্ত এই হলো আমার। সরকারি অনুষ্ঠানে এসে বসতে হলো আমাকে ? তিনি ক্ষেপে গেলেন।

তাকে বোঝানো হলো—এতো ব্রিটিশ সরকার নয়, জাতীয় সরকার। আর আপনি তো আমাদের জাতীয় কবি। আপনি তো প্রথম বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন দেখেন।

কিসের স্বপ্ন দেখি ?

বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের।

সেটা আমি কবে কোথায় কীভাবে দেখলাম ?

সেটা তো এককথায় বলে বোঝানো যাবে না।

বিস্তারিতভাবে বলতে হবে।

নজরুল এই অনুষ্ঠান থেকে উঠে চলে গেলেন। অনুষ্ঠান এলাকা থেকে দুপা বাইরে বেরুতেই শাদা পোশাকের পুলিশ তাকে গ্রেফতার করতে এগিয়ে এলো। কবি গ্রেফতার হতেই গিয়েছিলেন, কিন্তু তার আগে তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেলো একদল প্রাক্তন সৈনিক। তারা বললো, আপনিও একজন প্রাক্তন সৈনিক, আমরাও তাই, আপনিও রাজনীতি করেছেন, আমরাও করছি। আপনিও কবিতা লেখেন, আমাদের মধ্যেও লেখে কেউ কেউ। চলুন, চলুন। এ অনুষ্ঠানে নজরুল ইসলাম গিয়ে দেখেন, 'আমি সৈনিক' প্রবন্ধটি পঠিত হচ্ছে পাশেই একদল ছাত্রদলকর্মী জটলা করছে। তারা নজরুলকে নিতে চায়। তারা স্লোগান দিচ্ছে :

আমরা শক্তি আমরা বল,
আমরা ছাত্রদল
অরুণপাতের তরুণদল,
জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল
খালেদা জিয়ার মনোবল
জোর কদম চলরে চল।

নজরুল দূর থেকে দেখলেন শাদা পোশাকের দুজন পুলিশকে। ভাবলেন গ্রেফতার বরণ করবেন এবং জেলের ভেতরে গিয়ে গাইবেন—শেকল পরা ছল মোদের এই শেকল পরা ছল।

তখন সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্তা তাকে তার গাড়িতে তুলে বললো, কবি, আপনাকে নিয়ে দেশে বড় হৈচৈ হচ্ছে। আপনি এক কাজ করুন, বিদেশে চলে যান। যেমন ধরুন সুইডেন কিংবা জার্মানি।

নজরুল হেসে বললেন, তার আর দরকার হবে না। আমার সময় শেষ। এখন আমি পরকালের বিমানেই উঠবো। আচ্ছা আসি। বিদায় বাংলাদেশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তিনি প্রত্যাবর্তন বিমানে উঠে বসলেন। তার মন ভালো নেই। বারবার মনে হতে লাগলো, আমি কবি হতে আসিনি, প্রেম দিতে এসেছিলুম, প্রেম নিতে এসেছিলুম। তা পেলুম না বলে ব্যথিত হৃদয়ে ফিরে যাচ্ছি।
হঠাৎ তার মনে হলো একটা ছড়া :

কাজী নজরুল তুমি করেছিলে ভুল
দাড়ি না রেখে তুমি রেখেছিলে চুল।

এতো দুঃখের মধ্যেও তিনি হো হো করে হেসে উঠে একটা খিলিপান মুখে পুরলেন।

বিউটি অ্যান্ড দি বিস্ট

আবেদ হোসেন একজন অবসরপ্রাপ্ত সচিব। বেশি বয়সে বিয়ে করেছিলেন, ছেলেমেয়েরা এখনো তাই স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেনি। দু-ছেলেমেয়ে। মেয়ে বড়ো শান্তা, পড়ছে ইউনিভার্সিটিতে। ছেলেটি কেবল ইন্টারমিডিয়েট পাস করেছে।

আবেদ হোসেন ভাবছেন মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেবেন। এই নিয়েই তার স্ত্রীর সঙ্গে শলাপরামর্শ হচ্ছিল। মেয়ের বিয়ে দেবেন কার সঙ্গে ? ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, নাকি কোনো তরুণ সহকারী সচিব? ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ, নাকি মিলিটারি অফিসার ? স্বামী-স্ত্রী দুজনেই একমত হলেন—আর যার সঙ্গেই দেন না কেন, কোনো আমলার সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন না। কিন্তু ছেলে যখন জানতে চাইলো, আব্বা, আমি ভর্তি হবো কিসে, তখন আবেদ হোসেন নির্দ্বিধায় জবাব দিলেন, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে মাস্টার্স কমপ্লিট করে বিসিএস দিয়ে দাও।

আবেদ হোসেন সাহেব আমলা হিসেবে আদর্শ প্রকৃতির নন। তাঁর স্ত্রী শামীমা খাতুনই তার একমাত্র এবং অদ্বিতীয় স্ত্রী অথচ গোটা সত্তর দশকে ঢাকার উঁচুতলার সকালবেলার একমাত্র জিজ্ঞাসা ছিল, আজ কে গেল কার সঙ্গে। অর্থাৎ আজ কোন্ আমলা কার বউ নিয়ে ভেগেছে ? সেদিক থেকে আবেদ হোসেনের কোনো দুর্নাম আজ পর্যন্ত শোনা যায়নি। আবেদ হোসেনের সহকর্মী অফিসারা প্রায় সবাই ছেলেমেয়েদের পড়িয়েছেন বাইরে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্টেটসে। আবেদ হোসেন সেদিক থেকে পিছিয়ে আছেন বললেই চলে। তবে ঢাকায় দুটো বাড়ি করেছেন, ব্যর্থ ধরনের আমলা-জীবনে এ হলো তার প্রধান সার্থকতা। যদিও বাড়িদুটো তার স্ত্রীর নামে, তবুও এ নিয়েও আবেদ হোসেন প্রায়ই দুশ্চিন্তায় ভোগেন। চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন সহকারী সচিব পদে। বহু বছর তাকে থাকতে হয়েছে ওই এক পদে। এরপর ধাপে ধাপে পদোন্নতি। যে বেতন পেয়েছেন পঁচিশ বছরে, তা যোগ করলে দাঁড়ায় সর্বমোট ১৫ লাখ টাকার মতো। সরকারি বেতন-স্কেল সবার জানা। এখন একজন সহকারী সচিব যোগ দেয় সাড়ে চার হাজার টাকায়। তাদের সময়ে বেতন শুরু হয়েছিল এর প্রায় অর্ধেকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অথচ ঢাকায় যে-দুটো বাড়ি তার, সেগুলোর বর্তমান দাম কোটি টাকার উপরে। দুর্নীতি দমন ব্যুরো যদি একবার তদন্তে নামে, কী হবে ? এ নিয়ে ভেতরে ভেতরে আবেদ হোসেন যারপরনাই নার্ভাস। ইদানীং তিনি ধর্মে-কর্মে মন দিয়েছেন। জায়নামাজে পড়ে পড়ে একটা জিনিসই আল্লাহর কাছে চান—হে আল্লাহ, ক্ষমা করে দিও, ছেলেমেয়ে দুটোর ওপরে যেন আমার গুনাহর আছর না পড়ে।

তবে তার ভরসা আছে—দুর্নীতি দমন বিভাগেও আমলাদের ছুঁতে পারবে না। আমলারা হলো ধরাছোঁয়ার বাইরে। এই বাংলাদেশে তারাই হচ্ছে ঈশ্বরের সরাসরি প্রতিনিধি। তার ছেলেকে তিনি যে পুনর্বার আমলা বানাতে চান, এর পেছনে কাজ করছে তার বহু হিসেবনিকেশ।

এখন বাংলাদেশে সবচেয়ে ভালো আছে কোন্ পেশার লোকজন ?

সর্বপ্রথম মনে হতে পারে সেনাবাহিনীর লোকজন। মার্শাল-ল এলে তো কথাই নেই, মার্শাল-ল না থাকলেও তারাই সম্রাট। অবসর নিয়ে ব্যবসাবাণিজ্য। ফরেন সার্ভিসে চাকরি। সব মিলিয়ে তারা আছে ভালোই। কিন্তু খুব কি ভালো ? সেনাবাহিনীর বেশির ভাগ সম্ভাবনাময় অফিসারই তো শেষপর্যন্ত মরেছে অপঘাতে। জিয়া, মঞ্জুর কেউ নেই। এরশাদ কারাগারে। জিয়াকে হত্যা করেছে বলে মুক্তিযোদ্ধা ১৪ অফিসার ঝুলেছে ফাঁসিতে। এবার মঞ্জুরকে মেরেছে বলে কে কে যে যায়। তারপর মুজিব হত্যার বিচার হবে। কইয়ের তেলেই কই ভাজা কমপ্লিট। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলে তুলেই তো সব কাঁটা নিঃশেষিত।

আছে রাজনীতিবিদরা। তাদের বিচার হয়। কে আছে, রাজনীতি করেছে, ক্ষমতার স্বাদ ভোগ করেছে, কিন্তু জেলে যায়নি ? স্ত্রী-পুত্র কান্নাকাটি করেনি ? শেখ মুজিব জেলে ছিলেন এক যুগ। ওই মওদুদ বলো, আর ড. কামাল হোসেন বলো—লালভাত সবারই পাকস্থলীতে ঢুকেছে। এমন যে বেগম জিয়া তাকে পর্যন্ত লাঠির গুঁতো খেতে হয়েছে পুলিশের। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ? ছো ছো! ওদের পোস্টিং প্রোমোশন থেকে শুরু করে প্রজেক্টের বাজেট বরাদ্দ সব ব্যাপারই তো বাঁধা আছে আমলাদের ইচ্ছের সুতোয়। একমাত্র এদেশে ধরাছোঁয়ার বাইরে আছে আমলারা। এরশাদ জেলে পচছে কিন্তু তার সহযোগী ১০ সচিবের সেই কুখ্যাত 'জি টেন'-এর কোনো রোম পর্যন্ত কেউ ছিঁড়তে পেরেছে ?

ছেলেকে এসব তিনি বুঝিয়েছেন। বাবা, যতোই বলো না কেন মার্শাল-ল যুগ কিংবা জনপ্রতিনিধিদের যুগ, যুগ আসলে এখনো আমলাদেরই। তুমি বাবা একজন কৃতি ব্যুরোক্র্যাট হবে—এই আমি চাই। এজন্য সব ধরনের প্রস্তুতি তুমি নাও, মুখে বলেছেন। মনে মনে বলেছেন, সেই প্রস্তুতি হিসেবে তেল দেয়া আর লেজ নাড়াটাও তোমাকে প্র্যাকটিস করতে হবে। অবশ্য সেটা তুমি পরে শিখে নেবে আপনাআপনিই।

আবেদ হোসেন তার স্ত্রীকেও বিষয়টি বোঝাতে পেরেছেন সহজেই। বুঝলে শামীমা, হাতি মরলেও লাখ টাকা, বাঁচলেও লাখ টাকা। আমলাও তেমনি। এই মোকাম্মেল হকের কথাই ভাবো না কেন ? রিটায়ার করেছেন, কিন্তু দাপট কমেছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কোনো ? কাগজে পড়লাম, তার দু-নম্বর স্ত্রী আর তার সঙ্গে ঘর করতে চায় না। রত্না না কী যেন নাম মেয়েটার। সে নোটারি পাবলিকের মাধ্যমে ঘোষণা করেছে, আমি এই বুড়োলোকের সঙ্গে বিয়েতে রাজি ছিলাম না। জোর করে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে। ওই বুড়ো এখন আমার জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। কিন্তু কী হলো তার পরিণাম ? পুলিশ উল্টো এই মেয়েকেই গ্রেফতার করলো। বেটি ভেবেছিল এখন রিটায়ার করেছে, এখন হক সাহেবের শক্তি কমে গেছে। আরে, আমলারা কখনো দুর্বল হয় ? নাকি হয়েছে কখনো ?

শামীমা তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গান্তর ঘটিয়েছেন। এই ধরনের কেলেঙ্কারির গল্প তার শুনতে ভালো লাগে না। কে কার বউকে নিয়ে ভাগলো—এইসব শুনতে শুনতে তার কান পচে গেছে। আল্লাহর অশেষ রহমত, তার স্বামী অমনটা নন। এসব কেলেঙ্কারি তো আবার শেকলের মতো। একজনের সঙ্গে আরেকজনেরটা চলে আসে আপনাআপনিই। মি. হক দ্বিতীয় বিয়ে করেছেন, তাহলে প্রথম স্ত্রী গেল কই ? প্রথম স্ত্রী দেখা গেল অন্যের ঘর ভেঙেছেন। তাহলে সেই ঘরের প্রথম স্ত্রী গেল কার ঘরে ? এদিকে হক সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রী এলো কার ঘর থেকে ? তাহলে সেই শূন্যঘরে ঢুকেছে কে ? সারা শহর জুড়ে এই এক কিসসা। এসব তিনি জীবনে এতো শুনেছেন যে আর মজা পান না।

শামীমা বললেন, হ্যাঁ গো, মেয়ে বড়ো হচ্ছে। তারও তো বিয়ে-শাদির কথা ভাবতে হয়।

আবেদ হোসেন বললেন, কিন্তু মেয়ের বিয়ে আমি কোনো আমলার সঙ্গে দেবো না। আমলার সঙ্গে ঘর করাটা রিস্কি। তার ভবিষ্যৎ ভালো নাও হতে পারে। আমার মেয়ে অন্য কারো সঙ্গে ভেগে গেছে, কিংবা আমার মেয়ের ঘর ভেঙে অন্য কেউ আসছে এ খবর আমি সহ্য করতে পারবো না। একেবারে হার্টফেল হয়ে যাবে, আমি নির্ঘাত সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবো।

স্ত্রী হেসে বললেন, আমিও কিন্তু মনে মনে তাই ভেবে রেখেছি।

সেই রাতে শামীমা বেগম মেয়ের ঘরে ঢুকলেন। মামণি, তোমার সঙ্গে কথা আছে। ইনিয়ে-বিনিয়ে শামীমা মেয়েকে জানিয়ে দিলেন মেয়ের ভবিষ্যৎ-বিষয়ে তাদের ভাবনার কথা। জানিয়ে দিলেন, মেয়ে শিক্ষিত ও প্রতিষ্ঠিত যে-কোনো যুবককে পছন্দ করতে পারে, কেবল কোনো আমলাকে নয়। মেয়ের মুখে কোনো প্রতিক্রিয়া অবশ্য ফুটে উঠলো না।

দিন-দুই পরে মেয়ে রাতে ফিরতে দেরি করছে দেখে শামীমা মেয়ের ঘরে ঢুকলেন। এটা-সেটা খুঁজতে গিয়ে টেবিলের উপর গ্লাস-চাপা একটা কাগজ পেলেন। মেয়ের চিঠি—মা, তোমাদের আজ একটা খুব বড় দুঃখ দিতে হলো। আমি চলে যাচ্ছি। বসুনিয়াকে ছাড়া বাঁচা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা ইতিমধ্যে বিয়ে রেজিস্ট্রি করে ফেলেছি। বাবাকে বলো যেন দুঃখ না পান। তাছাড়া বসুনিয়াকে তো তুমিও পছন্দ করে ফেলেছি। বাবাকে বলো যেন দুঃখ না পান। তাছাড়া বসুনিয়াকে তো তুমিও পছন্দ করো। তোমার বন্ধু। বাবার প্রাক্তন কলিগ। মন্দ কী ? বয়স একটু বেশি, কিন্তু বয়সটাই তো জীবনের সবকিছু নয়। দোয়া করো। ইতি—তোমাদের শান্তা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নিজেও ডুবি, অন্যকেও ডোবাই

এক.

একটা ফ্যান্টাসি প্রায়ই আমার চিত্তলোক জুড়ে থাকে। সকালবেলা খালেদা জিয়া ফোন করলেন শেখ হাসিনাকে। আপনি বাসায় আছেন ? আমি একটু আসতে চাই।

হাসিনা বললেন, সে কী আপা ? আপনি আর কষ্ট করে আসবেন কী ? আমিই আসছি।

না না, আপনি কেন কষ্ট করবেন, আমি আসছি।

আরে রাখুন তো আপা, আমিই রওনা হয়ে গেছি।

এই নিয়ে দুজনে ঝগড়া। বড়োই মধুর সেই কাজিয়া।

যাহোক একটা জায়গায় দেখা করলেন দুজনে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে খালেদা বললেন, একটা কথা বলবো। মন খুলে বলি, কি বলেন ?

জি আপা, মন খুলেই বলুন। হাসিনা নিমকিতে একটা ছোট্ট কামড় দিয়ে বললেন। দাঁতের নিচে পড়লো কালোজিরা। তিনি বিরক্ত হলেন। পৃথিবীতে কতো অখাদ্য মশলার নামে চলছে। মানুষ এই অখাদ্য কেন খায় ? কিন্তু তিনি বিরক্তি গোপন করলেন। আজ তার মনটা ভালো।

খালেদা বললেন, দেখুন, আপনারা বিরোধীদলে আছেন। আপনাদের অনেক সুবিধা। আপনারা যখন ইচ্ছা তখন হরতাল ডাকতে পারেন, অভিমান করতে পারেন। দায়দায়িত্ব কম। কিন্তু আমি যাই ইচ্ছা তাই বলতেও পারি না, করতেও পারি না। দেশের কথা, মানুষের কথা আমাকে ভাবতে হয়।

হাসিনা বললেন, কী বলছেন আপনি ? দেশকে আমরা ভালোবাসি না, মানুষকে আমরা ভালোবাসি না ? দেশপ্রেমের সর্বস্বত্ব কি সরকারি দলের একার ?

না, মানে...

না, মানে মানে কী ? দেশের জন্য আমি সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত। বলুন আমাকে কী করতে হবে ?

খালেদার মনে রসিকতা উঁকি দিল। তিনি ভাবলেন, বলি, আপা, আপনি রাজনীতি করা ছেড়ে দেন, দেবেন ?

কিন্তু রসিকতার জায়গা এটা নয়। আগুন নিয়ে যেমন ছেলেখেলা করতে নেই, রাজনীতি নিয়েও তেমনি রসিকতা করতে নেই।

না, না, আপনাকে কিছু করতে হবে না। যা করার আমিই করবো। কারণ আমি ক্ষমতাসীন।

হাসিনার মনে হলো এক্ষুনি মুখের উপর কষে জবাব দেন। বলেন, সারাক্ষণ ক্ষমতা ক্ষমতা করছেন কেন ? ইউ আর অবসেসড বাই পাওয়ার। ক্ষমতা আপনার চিত্তের দুয়ার বন্ধ করে রেখেছে। এটা ঠিক নয়। কিন্তু তিনি বললেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

খালেদা বললেন, আমরা দুজনেই রাজনীতি করছি। কিন্তু আমরা তো কেবল দুজন নই। এদেশটার এগারো কোটি মানুষের ভালোমন্দ আমাদের কাঁধে।

হাসিনা বললেন, আমি সারারাত ঘুমাতে পারি না দেশটার ভবিষ্যৎ ভেবে। মানুষের কতো দুঃখ-কষ্ট। কতো আশা-ভরসা করে মানুষ দেশটাকে স্বাধীন করার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। অথচ সেই স্বাধীন দেশের গর্বিত নাগরিকেরা আজ দেশত্যাগ করছে। মালয়েশিয়ার মতো দেশে যাওয়ার জন্য থাইল্যান্ডের বনে-জঙ্গলে দুর্বিষহ জীবন কাটাচ্ছে। এর চাইতে বড়ো অবমাননা আর কী হতে পারে!

হাসিনার চোখে জল।

খালেদা বলেন, মুক্তিযুদ্ধের কথা উঠলেই আমার মন দুঃখে ভরে যায়। মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলো আমার জীবনের সবচেয়ে দুঃখের স্মৃতি। এতো কষ্টের মাধ্যমে পাওয়া এ দেশটাকে এভাবে ব্যর্থ হতে দেয়া যায় না। সত্যি সত্যি আমি বিশ্বাস করি ব্যক্তির চেয়ে দল বড়ো, দলের চেয়ে দেশ বড়ো। বিএনপির চেয়ে বাংলাদেশ আমার কাছে অনেক অনেক প্রিয়।

হাসিনা বললেন, আমরা মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তীর দিকে যাচ্ছি। আসুন আমরা সবাই মিলে মুক্তিযুদ্ধের রজতজয়ন্তী পালন করি।

খালেদা বললেন, আমি একটা বিষয় চিন্তা করছি। সংসদীয় গণতন্ত্রে যাওয়ার সময়ই আমাদের সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রভিশন রাখা উচিত ছিল। যা হোক ভুল হয়ে গেছে। আসুন, আমরা সবাই মিলে পৃথিবীতে একটা উজ্জ্বল উদাহরণ সৃষ্টি করি। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন।

হাসিনা বললেন, কী বলছেন আপনি ? আমরা তো ঠিক করেছি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলবো। দুর্বার আন্দোলন।

তাহলে কী লাভ ? আমার সরকার নির্বাচিত সরকার। আন্দোলনের ভয় আমাকে দেখানোর দরকার কী ? আমি ভয় পেয়ে কোনো কিছু করতে যাবোই বা কেন ? আমি যা করবো, তা করবো দেশের ভালোর কথা ভেবে। মানুষের ভালোর কথা ভেবে। আমার লজ্জা হয়, যখন পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব দেশের তালিকায় আমাদের নাম থাকে গোড়াতেই। সমস্ত পৃথিবী উন্নতির জন্য দৌড় শুরু করেছে আর আমরা ভূতের মতো পেছন দিকে হাঁটছি। এ হওয়া উচিত নয়।

হাসিনা গভীর সহানুভূতিতে কেঁদে ফেললেন। বললেন, এদেশটার জন্য আমি আমার বাবা-মা, ভাইবোন সব হারিয়েছি। যে কোনো মূল্যে আমি দেশটার ভালো চাই।

খালেদা বললেন, গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় প্রশ্নে বিএনপি আর আওয়ামী লীগ যদি একমত হয় তবে কারো শক্তি নেই, সেই ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখন সাম্প্রদায়িক শক্তিই বলেন, আর স্বৈরাচারী শক্তিই বলেন—কোনো সুবিধা করতে পারবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হাসিনা ও খালেদার আলাপ-আলোচনা আরো কিছুক্ষণ চললো। পরবর্তীকালে জাতীয় সংসদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিল পাস হলো এবং শান্তিপূর্ণভাবে ৯৬-এর নির্বাচনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো।

দুই.

উপরের ফ্যান্টাসিটা যে পুরোটাই স্বাভাবিক ও অবাস্তব কল্পনা—সেটা কাউকে বলে দেবার দরকার নেই।

প্রথম কথা, খালেদা জিয়া 'নো' ছাড়া আর কোনো ইংরেজি জানেন না। তিনি কোনোদিনই এধরনের সুবালিকাসুলভ আচরণ করবেন না। দ্বিতীয় কথা, শেখ হাসিনাও এখন আপসহীন হয়ে উঠেছেন। এ বিষয়ে অভিজ্ঞ মহলের লেটেস্ট ডায়ালগ, ৮৬ সালে জনগণ চেয়েছিল : হাসিনা হোন আপসহীন, অথচ তিনি করলেন আপস। আর ৯৫ সালে জনগণ যখন চাইছে তিনি আপোষ মীমাংসার দিকে যান, তখন তিনি হয়ে উঠেছেন আপসহীন।

খালেদা ভাবেন, আমি কেয়ারটেকার সরকার না হয় মানলাম, হাসিনা কি তারপর শান্ত হবেন ? তিনি আরো ক্ষেপে গিয়ে আমাকে হেনস্থা করতে শুরু করবেন।

হাসিনা ভাবেন, খালেদাকে রাজপথের আন্দোলনেই হারাতে হবে। যেন আন্দোলনের বিজয়ের জোয়ারে সাধারণ নির্বাচনটা সেরে ফেলা যায়।

খালেদা ভাবেন, কেয়ারটেকার সরকারের দাবি মানবো না। যা হয় হবে। হরতাল হলে আমার কী ক্ষতি, বিরোধীদলেরই তো দুর্নাম। (বিরোধীদলের ক্ষতিটাই দেখলেন তিনি, দেশের ক্ষতিটা দেখলেন না!)

হাসিনা ভাবেন, বিএনপি একা নির্বাচন করবে ? করুক না। খালেদাকে বরণ করতে হবে এরশাদের পরিণতি। (খালেদার পরিণতির কথাই ভাবলেন তিনি, এগারো কোটি মানুষের পরিণতির চিন্তা করলেন না!)

খালেদা ভাবেন, কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে নির্বাচন করলে যদি জিততে না পারি ? এরচেয়ে এভাবেই যতোদিন পারা যায়, ক্ষমতায় থাকি না কেন ?

হাসিনা ভাবেন, কেয়ারটেকার সরকার না হলে নির্বাচন করলে যে হারবো, তাতো শতকরা ১০০ভাগ নিশ্চিত। এরচেয়ে যতোদিন পারা যায়, কেয়ারটেকারের আন্দোলন চালিয়ে যাই না কেন ?

এইভাবে :
হাঁসী বলে হাঁসা
হাঁসা বলে হাঁসী
এই নিয়ে হাঁসা হাঁসী
করে হাসাহাসি।

দু-পক্ষই হাসে, জনগণ কান্দে। পুরো একটা বছর চলে গেলো। দেশ একচুলও এগোয়নি। না এগুনোর অর্থ যে অন্যদের তুলনায় পিছিয়ে পড়া, তা কি এরা জানেন ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার আমেরিকায় গিয়ে লিফটম্যানের চাকরি করে, তবু আমেরিকা ভালো—এই হচ্ছে যুদ্ধবিজয়ী দেশের ২৫ বছরের অর্জন ?

এমনকি এদেশের লোক পালিয়ে যায় পাকিস্তান-ভারতের মতো দেশে—লজ্জায় মাথা কাটা যায়, ঠাণ্ডা মাথায় ভাবলে দু-চোখ জলে ভরে আসে।

একথা সত্য যে, দেশের বেশির ভাগ মানুষ নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে সংসদ নির্বাচনের ধারণাকে সমর্থন করে। যারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বোঝে না, তারাও সাহাবুদ্দিনের সরকারের কথা শুনলেই বলে, হ্যাঁ, ওই রকম হলে খুব ভালো হয়।

শুধু এই কথাটা বিবেচনায় এনে কি বেগম জিয়া পারেন না নিজে থেকে একটা ঘোষণা দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ধারণা বাস্তবায়নে এগিয়ে আসতে ?

এবার আরেকটা ফ্যান্টাসি নির্মাণ করি, আসুন। ফ্যান্টাসি '৯৫।

তিন.

নৌকায় যাচ্ছিল একটা পরিবার। পাশে আরো কিছু নৌকা যাচ্ছে। উদ্দেশ্য—মাজার দর্শন। দীর্ঘপথ। রবীন্দ্রনাথের দেবতার গ্রাস কবিতার মতো—সবাই মিলে যাচ্ছে সাগর সঙ্গমে। আলোচ্য নৌকায় উঠেছে একটা ফুটবল টিম। গৃহকর্তা নিজে, তার দুটো স্ত্রী, আর ৮ জনসন্তান। মোট ১১ জন। বদর বদর বলে নৌকা ছাড়া হয়েছে। গৃহকর্তার বয়স খুবই বেশি। যায় যায় অবস্থা। আসলে তার রোগমুক্তি কামনার জন্যই এই মাজার জিয়ারত। এই পরিবারটি কোনো মাঝিমাল্লা সঙ্গে নেয়নি। ঠিক হয়েছে, ৮ জন ছেলে নৌকার দুইধারে ৪ জন ৪ জন করে বসে দাঁড় বাইবে। তাদের প্রত্যেকের হাতে থাকবে একটা করে বৈঠা। আর নৌকার পেছনে বসে হাল ধরবে স্ত্রীদ্বয়, পালা করে—এ একবার, ও আরেকবার।

নৌকা চলেছে। আকাশ নির্মল। বাতাস মৃদুমন্দ। অন্যান্য নৌকার চেয়ে একটু পিছিয়ে থাকলেও নিতান্ত খারাপ হচ্ছিল না এই নৌকাভ্রমণ।

নদী একটা জায়গায় বড়ো হয়ে এলো। সামনেই সমুদ্র। কঠিন জায়গা।

এমন সময় বেধে গেলো দুই বউয়ের ঝগড়া।

তখন হাল ধরে ছিল বড়োবউ। ছোটবউ নৌকার সামনে বসে চিৎকার করে উঠলো, বড়বউ যেমন করে হাল ধরেছেন, এমন করে চালালে কোনোদিনও আর মাজারে পৌছানো যাবে না। ছাড়েন দেখি। এবার আমি ধরি।

বড়োবউ বললো, সে কী কথা। আমার পালা আছরের ওয়াক্ত পর্যন্ত। এখন তো কেবল জোহরের বেলা।

ছোটবউ বললো, ওয়াক্তের হিসাব করলে তো হবে না। আপনি যেভাবে চালাচ্ছেন, তাতে আমাদেরকে ফেলে সব নৌকা চলে যাচ্ছে। এদিকে নদীর কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কূলকিনারা দেখা যাচ্ছে না। অন্য নৌকাগুলোকে হারালে আমরা বেদিশা হয়ে যাবো। আমাদের সবার ভালোর জন্যই বলছি—আপনি ছাড়ুন। আপনার চেয়ে আমার শরীরও পোক্ত, চোখের জ্যোতিও ভালো। আমি নৌকাটাকে একটু এগিয়ে নেই।

বড়োবউ বললো, অসম্ভব। আছরের আগে আমি কিছুতেই ছাড়বো না।

ছোটবউ নৌকা দোলাতে শুরু করলো। নৌকা আন্দোলিত হতে লাগলো। বড়োবউ বললো, অমন করছো কেন ? নৌকা ডুবলে তুমি মরবে, আমিও মরবো। ছেলেপুলেগুলোও মরবে। তুমি থামো।

ছোটবউ বললো, আমার হাতে হাল ছাড়তে হবে না। তুমি কর্তার হাতে ছাড়ো। এরপর কর্তা ঠিক করবেন—কে হাল ধরবে। ছেলেপুলেরা মিলে সিদ্ধান্ত নিক কে বেশি যোগ্য। ওরা তো দাঁড় বাইছে—ওরা ঢের বলতে পারবে।

বড়োবউ বললো, কক্ষণো না।

বড়োবউ হাল ছাড়লো না। অন্য সব নৌকা তাদের ফেলে রেখে চলে গেলো দৃষ্টিসীমার বাইরে।

চারদিকে বাঁকা জল। কোথাও ডাঙাটির দেখা নেই। আকাশে একখানা চাঁদ। বড়োবউ দিকভ্রান্ত। নৌকা কোন্‌দিকে নেবেন। অথৈ দরিয়ায় যেন কূল নাই।

ছোটবউ নৌকার অন্যপ্রান্তে উঠে বসে আরেকটা হাল ধরলেন। কঠিন হাতে ধরা। (গল্পের স্বার্থে) নৌকায় একটা অতিরিক্ত হাল ছিল।

নৌকা হয়ে পড়লো অনড়।

দুই বউ। একজন বড়ো, আরেকজন ছোট। তারা তীব্র ঝগড়ায় অবতীর্ণ। সময় যায়। নৌকা আর এগোয় না। এক নৌকা, দুটি হাল।

গৃহকর্তা শয্যা ছেড়ে উঠে বসলেন। দু-মহিলা তখন তীব্র বাদানুবাদে মত্ত।

আকাশে মেঘ দেখা দিল। বুঝি ঝড় আসে। উপায়ান্তর না-দেখে একটা ছেলে বললো—তোমরা দুজন কি থামবে, নাকি আমি লাফিয়ে পড়বো জলে ?

দুই মহিলা নির্বিকার।

ছেলেটা জলে নামলো। সে সাঁতরে কূলে উঠবে। ঝড় আসার আগেই সে কূলে উঠতে চায়। এই নৌকায় থাকলে নির্ঘাত মৃত্যু।

সে ছিল এক মায়ের। তাই দেখে অন্যপক্ষের বড়ছেলে বললো, তোমরা থামো। না হলে আমিও ভাইজানের পথে গেলাম।

দুই মহিলা তবু পরস্পরকে শাপান্ত করে চললো।

আরেকজন লাফিয়ে পড়লো।

দুই মহিলা তবু নির্বিকার। সন্তান হারানোর ব্যথাও মায়ের চোখে জল আনতে পারছে না। আসন্ন ঝড় মোকাবেলার জন্য তাদের কোনো প্রস্তুতি নেই, সদিচ্ছা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঝঞ্ঝা-শঙ্কিত দিকচিহ্নহীন দরিয়ার মধ্যে নৌকাখানি যখন টালমাটাল, একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে গন্তব্যহীনভাবে, তখন সঙ্গের সব নৌকা পৌঁছে গেছে মাজারের ঘাটে।

ঝড় এলো। ভীষণ বেগে। সাঁই সাঁই শব্দ বাতাসের। প্রচণ্ড গর্জন তরঙ্গের। চারদিক অন্ধকার।

চার.

আমার এই তিন নম্বর ফ্যান্টাসিটি তেমন মজার নয়। আসলে ফ্যান্টাসি কখনো মজার হয় না। মজার হয় জীবন। মজার হয় বাস্তবতা। একটা সত্য গল্প বলি।

বেবিট্যাক্সি চালকরা তাদের ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিয়েছে। এর আগে বেবিট্যাক্সি চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পাবার জন্য লিখিত, মৌখিক ও প্র্যাকটিকাল পরীক্ষায় অংশ নেয়ার বিধি ছিল। প্রধানত লিখিত পরীক্ষা এড়ানোর জন্যই বেবিট্যাক্সি চালকরা অবৈধভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স সংগ্রহ করতো। এবং এসব লাইসেন্সের বেশির ভাগই ছিল ভুয়া।

এবার বিআরটিএ অঙ্গীকার করেছে—বেবিট্যাক্সি চালকদের লিখিত পরীক্ষা নেয়া হবে না।

একজন বেবিট্যাক্সি চালককে জিজ্ঞাসা করা হলো—কী ভাই, আবার যে ট্যাক্সি বের করেছেন, ব্যাপার কি, আন্দোলনের কতোদূর কী হলো?

বেবিট্যাক্সি চালক রাগীস্বরে বললেন, ওরা বলছে লাইসেন্স দিয়ে দেবে। এইজন্য আন্দোলন এখন বন্ধ।

তাকে পাল্টা জিজ্ঞাসা করা হলো, তা আপনাদের আন্দোলনটা হলো কী নিয়ে?

বেবিট্যাক্সি চালক দার্শনিকের ভঙ্গিতে বললেন, আর কইয়েন না। এই দেশে সরকার এইট পাস আর বেবিট্যাক্সি ড্রাইভারদের হইতে কয় ম্যাট্রিক পাস।

বেবিট্যাক্সি চালক চলে গেলেন তার অনির্ধারিত গন্তব্যে। তাকে বলা দরকার, সুশিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই স্বশিক্ষিত। সার্টিফিকেটের কী মূল্য?

বলা হলো না। সে যদি পাল্টা প্রশ্ন করে, তাহলে আমাদের সার্টিফিকেট দেখতে চান কেন? ট্যাক্সি চালানোটা তো আমরা নিজে নিজেই শিখে নিতে পারি।

সারগর্ভ

'কেমন দিলাম?' নেতা জিজ্ঞাসা করলেন। কী দিলেন এই নেতাটি?

ভাষণ। তিনি দান করেন বক্তৃতা। নেতাদের দানভাণ্ডারে এই একটি জিনিস আছে দেবার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

প্রশ্ন শুনে চামচারা বললো, 'জবর'।

নেতা সবসময় থাকেন চামচা পরিবেষ্টিত হয়ে। তিনি অবশ্য এদের চামচা বলেন না, বলেন 'কর্মী'। কর্মীদের সবসময় পাশেপাশে রাখতে হয়। জনদরদি নেতা ঘুরে বেড়াবেন নিঃসঙ্গভাবে, ব্যাপারটা ভালো দেখায় না। কর্মীরাই হলো আসল শক্তি। কর্মীদের স্বার্থ দেখতে হয়।

গত নির্বাচনে বৈতরণী পার করে দিয়েছে এই কর্মীরা। এখন এদেরকে বঞ্চিত করলে আগামী ইলেকশনে এরাও বঞ্চিত করবে নেতাকে। নেতা আর কর্মী, মেড ফর ইচ আদার।

সবাই বললো 'জবর', কিন্তু একজন বললো 'সারগর্ভ'। 'আপনার বক্তৃতা খুবই সারগর্ভ হয়েছে, লিডার!'

নেতা হাসলেন। কর্মীদের মধ্যে এই হচ্ছে একমাত্র বুদ্ধিজীবী। আমাদের ক্ষমতাধর নেতৃবৃন্দের পাশে এক আমজাদ হোসেন ছাড়া আর কোনো বুদ্ধিজীবী নেই, এই কথা তাহলে ঠিক নয়। এই তো এইমাত্র আমরা আরেকজন বুদ্ধিজীবীকে দেখলাম।

'সারগর্ভ' কথাটা শুনে নেতার খটকা লাগলো। তার ভাষণ 'সারগর্ভ' হয়েছে—এর মানে কী ? গর্ভ শব্দটা শুনলেই তিনি আতঙ্কবোধ করেন। একবার তাদের বাসার পরিচারিকাটির 'গর্ভ' হয়েছিল, সে থেকেই তিনি 'গর্ভ' শব্দটি শুনলেই আঁতকে ওঠেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন বুদ্ধিজীবী চামচাকে, 'সারগর্ভ' মানে কী ?'

'সারগর্ভ মানে হচ্ছে যার গর্ভে অনেক সার থাকে, মানে মানে...।'

বাকি কর্মীদের হট্টগোলে তিনি আর বাকিটা শুনতে পেলেন না এবং তিনি বুঝলেন, তার বক্তৃতায় অনেক সার থাকে। সার ?

আবার নেতাটির মাথার চুল খাড়া হয়ে গেলো। তার বক্তৃতায় কি অনেক সার উৎপাদিত হয়, ঝরে ঝরে পড়ে ? কী সার ? গোবর, নাকি ইউরিয়া, ফসফেট, পটাশ ?

বুদ্ধিজীবী চামচা অবশ্য 'সারগর্ভ' শব্দটির ব্যাখ্যা করলো, সার মনে হচ্ছে যা অসার নয়, যাতে বস্তু আছে, আই মিন 'মাল'। নেতা কী বুঝলেন তিনিই জানেন। তবে তার বক্তৃতায় বেশ সার থাকে, এটাই তার মনের মধ্যে গেঁথে গেলো। তাদের এলাকায় সারের তীব্র সঙ্কট দেখা দিয়েছে। ইরির মৌসুম। ক্ষেতের পর ক্ষেতে সেচ দিয়ে ইরি রোপা হচ্ছে। সেসব ক্ষেতে এখনই সার দিতে হবে। নইলে সব মাটি। ফলন হবে না। তেলের খরচ, হালের খরচ, বীজধানের খরচ জলে চলে যাবে। আগামী বছরটা যাবে অনাহারে। কৃষকের মাথায় আগুন জ্বলছে। তাদের থামানো দরকার। কৃষকরা ক্ষেপে উঠছে। তারা মিছিল করছে, ঘেরাও করছে। নেতা চললেন জনসভার ময়দানে। সারগর্ভ বক্তৃতা দিতে। তার বক্তৃতা থেকে সার ঝরে পড়বে। কৃষকরা ধামা ভরে সেই সার নিয়ে বাড়ি ফিরবে। কোনোই চিন্তা নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নেতা বক্তৃতা মঞ্চে উঠলেন। বললেন, 'দেশে সারের কোনো সঙ্কট নেই। সব ষড়যন্ত্র। বাতিল কমিউনিস্টরা কৃষকদের ক্ষেপাচ্ছে। সারের ট্রাক লুট করাচ্ছে। এদের রুখতে হবে।'

কর্মীরা হাততালি দিলো। কৃষকরা ঘরে ফিরে গেলো ব্যর্থ মনোরথে। বুদ্ধিজীবী চামচাটি নেতাকে বললো, লিডার, আপনি বললেন যে দেশে সারের কোনো সঙ্কট নেই, তাহলে দাম কমছে না কেন?

নেতা মুখে বললেন, পাগল, সারের দাম কম হলে অনেক মুশকিল আছে। বর্ডার ক্রস করবে। সার ইন্ডিয়ায় পাচার হয়ে যাবে। দেশের সার ইন্ডিয়ায় যাক, এটা তুমি চাও? মনে মনে বললেন, ছাগল। যদি সারের দাম বাজারে কম হবে, তাহলে কর্মীরা আমার চারপাশে ঘুরঘুর করবে কেন? বাজারে সারের আক্রা আছে বলেই কর্মীরা সারের বরাদ্দ পেয়ে তা বিক্রি করে দুটো পয়সার মুখ দেখছে। দুশো টাকার সার তুলে দুশো টাকায় বিক্রি করলে কী লাভ? দুশো টাকায় সার তুলে পাঁচশো টাকায় বিক্রি করলে না কর্মীরা অনুগত থাকবে। নেতার পিছনে পিছনে ঘুরবে। সামনের ইলেকশনে নিজের টাকা ব্যয় করে নেতার জন্য ক্যাম্পেইন করবে। দেশে সারের কোনো সঙ্কট নেই। সারের সঙ্কট সব তোমার মতো ছাগল বুদ্ধিজীবীদের মাথায়। তোমাদের ঘিলু ফেলে গোবর ভরিয়ে দিতে হবে। উত্তম সার হবে।

কৃষকরা সার না পেয়ে পেয়ে সত্যি সত্যি ক্ষেপে উঠতে লাগলো। নেতাকে আবার উঠতে হলো। তিনি বক্তৃতা দেবেন, সারগর্ভ বক্তৃতা। কৃষকরা সেই বক্তৃতার গর্ভপ্রসূত সার নিয়ে যাতে বাড়ি ফিরতে পারে।

সংবাদপত্রের পাতা থেকে :

সার সঙ্কট : লুট ঘেরাও বিক্ষোভ

সারাদেশে সারের দাবিতে কৃষকদের বিক্ষোভ চরম আকার নিয়েছে। বিক্ষুব্ধ কৃষকরা সার না পেয়ে নানাস্থানে সড়ক অবরোধ, টিএনও অফিস ঘেরাও ও ভাঙচুর অব্যাহত রেখেছে। তারা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার থেকে টিএনও এমনকি মন্ত্রীদেরও নাজেহাল করতে ছাড়ছে না। (ভোরের কাগজ, ২০ মার্চ ১৯৯৫)

ফার্টিলাইজার সমিতি : রাজনৈতিক উদ্দেশেই ডিসিদের সার বিতরণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ফার্টিলাইজার এসোসিয়েশন নেতৃবৃন্দ ইউরিয়া সার রপ্তানিকে বর্তমান সার সঙ্কটের কারণ হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, সরকার রাজনৈতিক উদ্দেশে সার বিতরণের দায়িত্ব ডিসিদের কাছে দিয়েছেন। ডিসিদের ওপরে সরকারি দলের প্রভাবে সার ব্যবস্থাপনায় এক নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। নেতাটি বক্তৃতা দিতে উঠলেন। তিনি বললেন, 'দেশে সারের কোনো সঙ্কট নেই। আপনারা আমার কথা শুনুন। সার সঙ্কট কেটে যাবে।'

ঢিল নিক্ষিপ্ত হতে শুরু হলো। স্যান্ডেল, জুতা, খড়ম। নেতা কর্মীদের বললেন, বলো জিন্দাবাদ। নেতা সটকে পড়লেন। কর্মীরা সটকে পড়লো। পুলিশ লাঠিচার্জ করলো। কাঁদানে গ্যাস ছুড়লো। ফাঁকা গুলিবর্ষণ করলো। অতঃপর নেতা নিরাপদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

স্নানে ফাঁক পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন চামচা বুদ্ধিজীবীকে, 'আজকের ভাষণ কেমন হলো?'

বুদ্ধিজীবী চামচাটি বললো মনে মনে, 'ষাঁড়গর্ভ'। মুখে আনলো মধুর হাসি—যার অর্থ, দারুণ হয়েছে, চালিয়ে যান।

স্মরণীয় উদ্ধৃতি : 'টিকিয়া থাকাটাই সার্থকতা নহে, অতিকায় হস্তী লোপ পাইয়াছে, তেলাপোকা টিকিয়া আছে।'

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রোকেয়া পদক : দুটি প্রস্তাব

'বেগম রোকেয়া পদক '৯৫ প্রদানের জন্য যে ৫ জন বিশিষ্ট নারীর নাম বাছাই-কমিটি সুপারিশ করেছিল, তাদের মধ্যথেকে দুজনের নাম মন্ত্রিসভা কমিটি চূড়ান্ত করতে পারেনি।

দেশের নারীশিক্ষা, নারী অধিকার ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য দেশে একজন বা দুজন মহিলাকে এ বছর থেকে রোকেয়া পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।'

'প্রস্তাবিত ৫ জন মহিলার মধ্যে রাজনৈতিক ও দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচিত খুলনার বেগম মাজেদা আলী হচ্ছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার শেখ রাজ্জাক আলীর স্ত্রী। ঢাকার ধানমন্ডির ইকবাল মান্দ বানু প্রধানমন্ত্রীর বড়োছেলে তারেক রহমানের শাশুড়ি ও প্রয়াত নৌবাহিনী প্রধান রিয়ার এডমিরার এমএ খানের স্ত্রী।'

বেগম রোকেয়া পদকের জন্য যে ৫ জন বিবেচিত হচ্ছেন, কাগজ প্রতিবেদক, ভোরের কাগজ, ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৫।

উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ তিনটি খবর, সত্যিকারের খবর, বাস্তবিক খবর। এই খবরটি পাঠ করে দুটো প্রস্তাব পেশ করতে বড়ো সাধ হচ্ছে। তার আগে একটি কৌতুক শোনাবো। সোভিয়েতস্কি কৌতুক।

পুশকিনের ভাস্কর্য

সোভিয়েত ইউনিয়ন। স্ট্যালিনের আমল। ঠিক হলো রুশ-সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য পুশকিনকে সম্মানিত করা হবে। এ লক্ষ্যে পুশকিনের একটা ভাস্কর্য নির্মিত হবে। প্রকল্প অনুমোদিত হলে একজন আর্টিস্টকে দায়িত্ব দেওয়া হলো ভাস্কর্যের মডেল বানানোর জন্য। শিল্পী ভাস্কর্যের নমুনা বানালেন। কবি পুশকিন নিজের লেখা একটা বই পড়ছেন। কমিউনিস্ট পার্টির উচ্চপদস্থ কমিটি সেই নমুনা দেখলেন। তারা বললেন, ভাস্কর্য সুন্দর হয়েছে। তবে বড়ো অরাজনৈতিক। পুশকিন বসে পুশকিনের বই পড়ছেন—এতে ঠিক কমিউনিস্ট আদর্শ প্রতিফলিত হয় না। এক কাজ করা যাক, ভাস্কর্যটা এমন হোক—পুশকিন বসে স্ট্যালিনের লেখা বই পড়ছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যে-কথা সেই কাজ। পুশকিন বসে স্ট্যালিনের বই পড়ছেন। কাজটি সম্পন্ন হওয়ার পর উচ্চপদস্থ কমিটির হুঁশ হলো। ঐতিহাসিক ভুল হয়ে গেছে। পুশকিনের আমলে তো স্ট্যালিন কোনো পুস্তক রচনা করেননি।

কমিটি আবার বৈঠকে বসলো। অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক হলো—না, ভাস্কর্যটা সংশোধন করতে হবে। ব্যাপারটা হবে—স্ট্যালিন বসে পুশকিনের বই পড়ছেন। ডিসিশন ফাইনাল। ফাইল গেলো স্ট্যালিনের কাছে। স্ট্যালিন বললেন, আমি পুশকিনের বই পড়ছি, ব্যাপারটা ভাববাদী হয়ে গেলো না ? আরেকটু বস্তুবাদী হওয়া দরকার। অবশেষে ভাস্কর্য নির্মিত হলে দেখা গেলো—ব্যাপারটি দাঁড়িয়েছে স্ট্যালিন বসে স্ট্যালিনের বই পড়ছেন।

প্রস্তাবনা–১

তারেক ও আরাফাত দুইভাই। তারেক রহমানের শাশুড়ি একজন শ্রদ্ধেয়া মহিলা। বিশিষ্ট সমাজকর্মী। তার নাম ইকবাল মান্দ বানু। তিনি ইতিমধ্যেই সমাজকর্মে বিশেষ অবদানের জন্য স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার '৯৫ পেয়েছেন। এবার তার নাম বিবেচিত হচ্ছে বেগম রোকেয়া পদকের জন্য। এই খবরটি পাঠ করে ছোটভাই আরাফাতের মন খারাপ হওয়ার কথা। বড়োভাই তারেক রহমানের শাশুড়ি দু-দুটো রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পাচ্ছেন অথচ ছোটভাই আরাফাত কিছুই পাচ্ছেন না। ভাইয়ে ভাইয়ে এ বৈষম্য ঠিক নয়। সব সম্মান বড়োভাই একা পাবেন, ছোটভাই কিছুই পাবে না তা হওয়া উচিত নয়।

সরকার তাই এক কাজ করতে পারে। দেশের নারীশিক্ষা, নারী অধিকার ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখার জন্য রোকেয়া পদক '৯৫ আরাফাত রহমানের শাশুড়িকে দিতে পারে।

সে কী কথা ? আরাফাত তো ছোট। তিনি তো এখনো বিয়েই করেননি! তার তো কোনো শাশুড়ি নেই!

সেটা কোনো সমস্যাই নয়। আরাফাত তো একদিন না একদিন বিয়ে করবেনই। নিশ্চয়ই তার একজন শাশুড়িও থাকবে। সেই শাশুড়ির নামেই পুরস্কার ঘোষণা হবে। পুরস্কারটি ঘোষণার সময় বলা হবে—এবারের বেগম রোকেয়া পদক পাচ্ছেন আরাফাতের শাশুড়ি (বিবাহোত্তর)। অর্থাৎ আরাফাতের বিবাহ হওয়ার পর যিনি তার শাশুড়ি হবেন তিনিই পাবেন এই পুরস্কার।

প্রস্তাবনা–২

বেগম রোকেয়া পুরস্কার দেওয়া হবে দেশের নারীশিক্ষা, নারী অধিকার ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখার জন্য। পুরাকালে বেগম রোকেয়া নামের এক মহিলা নারীশিক্ষা ও নারী অধিকারে অবদান রেখেছিলেন বলে তার নামে এই পুরস্কার প্রবর্তিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এদেশের নারীশিক্ষার বিস্তারে বেগম রোকেয়ার চেয়েও যার অবদান বেশি, তিনি হলেন বেগম খালেদা জিয়া। সুতরাং এই পদকের নাম বদলে রাখা হোক বেগম খালেদা পদক '৯৫।

এরপর বিবেচ্য হলো সেই পদক কে পাবে ? এটা হতে পারে যে, বেগম খালেদা পদক '৯৫ পেতে পারেন বেগম রোকেয়া (মরণোত্তর)

কিন্তু সরকারি বাছাই কমিটি যদি রাজনৈতিক ও দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিকভাবে বিবেচনা করতে পারেন, তাহলে তারা অচিরেই বুঝতে পারবেন, '৯৫ সালে এদেশের নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো অবদান রেখেছেন বেগম জিয়া নিজে।

সুতরাং বেগম খালেদা পদক '৯৫-এর সবচেয়ে বড়ো দাবিদার বেগম খালেদা জিয়া।

আগামীকাল ৯ ডিসেম্বর এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বেগম খালেদা পদক '৯৫ বেগম জিয়া নিজে নিজের কণ্ঠে ঝুলিয়ে দিতে পারেন। সেটাই হবে সবচেয়ে বাস্তববুদ্ধির পরিচয়।

আশা করি, এই প্রস্তাবটি ৬ মন্ত্রীর সমন্বয়ে গঠিত জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি বিবেচনা করে দেখবেন। ভুলত্রুটি মার্জনীয়। ইতি।

পাদটীকা : সরকার পরে রোকেয়া পদক '৯৫-এর জন্য শামসুন্নাহার মাহমুদকে মনোনীত করেন। সুবুদ্ধির বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্যে সরকারের অবশ্যই ধন্যবাদ প্রাপ্য।

একটি বিশুদ্ধ কল্পকাহিনী

মওলানা মোহাম্মদ সাখাওয়াৎ হোসেন এক ভয়ঙ্কর কাজ করেছেন। তিনি মুরতাদ হয়ে গেছেন। আর ইসলামে মুরতাদের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। সাখাওয়াৎ হোসেন এমপি জামাতে ইসলামী ত্যাগ করে বিএনপিতে যোগ দিয়েছেন—এ খবর শোনার সঙ্গে সঙ্গে জামাতের বহু কর্মী ও নেতার মাথায় খুন চেপে যায়। মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড—এটা নিজহাতে কার্যকর করার রোগ চেপে যায় তাদের মধ্যে। বুকের মধ্যে খুনের পিয়াস তাদের অস্থির করে তোলে। কেউ বা তরবারি হাতে, কেউ বা আগ্নেয়াস্ত্র হাতে সাখাওয়াৎ হোসেনের বাড়ির দিকে ধাবমান হয়। তারা তার বাড়িটি ঘিরে ফেলে। জোরে জোরে ধাক্কা দিতে থাকে কপাটে। দরজা বন্ধ।

সাখাওয়াৎ হোসেন বুঝতে পারেন—আজরাইল তার দুয়ারে এসে কড়া নাড়ছে। তিনি তাড়াতাড়ি তার দোস্ত চৌধুরীকে টেলিফোন করেন। আল্লাহর অসীম করুণা চৌধুরীকে টেলিফোনের ওপারে পাওয়া যায়। সাখাওয়াৎ হোসেন কম্পিত কণ্ঠে বলেন, স্যার, ওরা এসে গেছে স্যার। আমাকে বাঁচান স্যার, না হলে ওরা আমাকে মেরে ফেলবে। আমার লাশও আর খুঁজে পাবেন না স্যার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চৌধুরীর জবাব শোনার আগেই টেলিফোনের তার কেটে দেওয়া হয় বাইরে। তার কেটে দিতে সমর্থ হয় অ্যাকশন বাহিনী। এদিকে বিপুল করাঘাতেও দরজা খোলার কোনো লক্ষণ না-দেখে অ্যাকশন বাহিনী দরজা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয়। দুজনের কাছে চাইনিজ কুড়াল পাওয়া যায়। তাই দিয়েই দরজা ভাঙার কাজটি সারা হয় সহজেই। হুড়মুড় করে জামাতি অ্যাকশন বাহিনী সাখাওয়াৎ হোসেনের বাড়িতে ঢুকে পড়ে।

তাদের দেখে সাখাওয়াৎ হোসেনের হাতপা প্রবল বেগে কাঁপতে শুরু করে। তিনি নিজেকে প্রবোধ দেন, আরে কমজোর হস্তপদ, শান্ত হ। তোদের শরীরেও তো জামাতি রক্ত। হাতপা কাটা অভিযান দেখে তোরা কেন ভয় পাবি ?

এ-কথা মনে মনে উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সাখাওয়াৎ হোসেন শরীরে বল ফিরে পান। তিনি মুখে স্বর্গীয় হাসি এনে বলেন, আসসালামো আলাইকুম বেরাদারানে ইসলাম, আপনাদের দেখে বড়ো শান্তি পেলাম, বড়ো অস্তির ছিলাম, বসুন আপনারা।

অ্যাকশন বাহিনীর নেতা বলে, আমরা বসতে আসিনি। শাস্তি কার্যকর করতে এসেছি। মুরতাদ কি সাজা ইসলাম মে।

সাখাওয়াৎ হোসেন সবকিছু না জানার ভান করে বলেন, চলুন তাহলে, কোথায় আজ আমাদের অ্যাকশন, আমিও যাই।

কোথায় ? নেতা সরোষে বলে, শোন তবে তোর মৃত্যুর পরওয়ানা—আমাদের দার্শনিক গুরু জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মওলানা মওদুদী তার মুরতাদ কি সাজা ইসলাম মে বইয়ের ৫১-৫২ পৃষ্ঠায় বলে গেছেন, 'যারা বহুরূপী এবং মত পরিবর্তনকে ক্রীড়া বিশেষে পরিণত করেছে, আমরা তাদের জন্য জামাতে প্রবেশ-দ্বার বন্ধ করতে চাই।...সুতরাং এ প্রকৃতই বুদ্ধি ও বিবেচনার কথা যে, এ জামাতে প্রবেশ করতে ইচ্ছুক প্রত্যেক ব্যক্তিকে আগে থেকেই জানানো হয় যে, এখান থেকে ফিরে যাওয়ার শাস্তি মৃত্যু, মুরতাদ কি সাজা ইসলাম মে, যাতে সে প্রবেশের পূর্বে শতবার ভেবে নিতে পারে যে, এরূপ জামাতে তার ভর্তি হওয়া উচিত কি অনুচিত।'

নেতাটি এ-কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে নাঙা তরবারি হাতে ছয়জন তাকে ছয়দিক থেকে ঘিরে ফেলে। মৃত্যুর জন্য সাখাওয়াৎ হোসেন মনে মনে প্রস্তুত হন। তবে সময় ক্ষেপণের জন্য তিনি শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করেন।

'আপনাদের কে পাঠিয়েছেন ? এইমাত্র অধ্যাপক বড়ো হুজুরের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। বিএনপি জোর করে আমার স্বাক্ষর নিয়েছে। আমি স্বেচ্ছায় দিইনি। হুজুর আমাকে বলেছেন, স্বাক্ষর যখন দিয়েছো, ভালোই করেছো। তুমি ওখানেই থাকো। আমাদের লোকের বিএনপিতে থাকার দরকার আছে। কারণ, হুজুর ব্যাখ্যা করে বলেছেন, ধরা যাক, আমি রংপুর থেকে চট্টগ্রাম যেতে চাই বলে জামাত নামে একটি ট্রেনে উঠেছি। আমি যদি ঢাকায় এসে ট্রেনের বদলে এসি বাসে উঠি এবং অবশেষে চট্টগ্রামে পৌঁছে মূল দলের সঙ্গে শামিল হই, তবে কি সেটা খুব বড়ো অপরাধ ? আমাদের উভয়ের লক্ষ্যই তো চট্টগ্রাম। আসলে আমি একই লক্ষ্য নিয়ে জামাতের ট্রেন ছেড়ে বিএনপির বাসে উঠেছি মাত্র। এতে লক্ষ্যের কোনো বদল হয়নি। আসলে জামাত আর বিএনপিতে পার্থক্য ট্রেন অর এসি কোচের পার্থক্য মাত্র।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অধ্যাপক বড়ো হুজুর তাই বলেছেন নাকি ? অ্যাকশন বাহিনীর নেতাটি বিভ্রান্ত হয়। তাহলে ঠিক আছে, আপনি এক কাজ করুন, লিখে দিন, আমি জামাত ত্যাগ করিনি এবং বিএনপিতে যোগ দিইনি।

দিন, কাগজ দিন। সাখাওয়াৎ হোসেন তড়িঘড়ি একটি বিবৃতি লিখে তার নিচে স্বাক্ষর দেন।

অ্যাকশন কমিটির নেতা সাখাওয়াৎ হোসেনকে ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে কি হবে না, সেটা নিশ্চিত হওয়ার জন্য বড়ো হুজুর অধ্যাপকের সঙ্গে ওয়ারলেসে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেন।

বড়ো হুজুরকে পাওয়া যায়। হুজুর সব শুনে হেসে ফেলেন। সাখাওয়াৎ তাই বলেছে নাকি ? আমার সঙ্গে ওর এসব বিষয়ে কোনো কথা হয়নি তো। তবে কথা সে ভালো বলেছে। তার কথায় যুক্তি আছে। তোমরা এক কাজ করো, ওকে ধরে আমাদের হেফাজতখানায় নিয়ে এসো। ওকে খানিকটা সবক দেওয়া দরকার। কঠিন সবক।

হুজুরের এ নির্দেশ পেয়ে অ্যাকশন কমিটি সাখাওয়াৎ হোসেনকে ঘর থেকে বের করে গাড়িতে তুলতে যায়। তাদের মধ্যে অনেকেরই মনে পড়ে যায় '৭১ সালের স্মৃতি। এভাবে ধরে নিয়ে যাওয়া হতো কতোজনকে। মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারে, রায়েরবাজারে, মিরপুরে, সেসব বধ্যভূমিতে। আজ সেই কমিউনিস্টদের ও ইন্ডিয়ার দালালদের মতো তাদেরই একজন এতোদিনের সহযোগীকে নিয়ে যেতে হচ্ছে। তারা তাকে বলে, আপনাকে হুজুর যেতে বলেছেন। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন। সাখাওয়াৎ হোসেন স্ত্রী-পুত্রদের কাছ থেকে বিদায় নিতে অন্দরে প্রবেশ করেন। এমন সময় পুলিশ বিপুল বিক্রমে সাখাওয়াৎ হোসেনের ঘরে প্রবেশ করে। পুলিশ সাখাওয়াৎ হোসেনকে উদ্ধার করে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়।

সাখাওয়াৎ হোসেন এখন ভালোই আছেন। কিন্তু মুশকিল হলো, তাকে কিছুতেই এই বাড়ির বাইরে নেওয়া যাচ্ছে না। এই বাড়ির বাইরে যাওয়ার কথা শুনলেই ভয়ে আতঙ্কে সাখাওয়াৎ হোসেনের সর্বাঙ্গ নীল হয়ে আসে।

(রচনাটি নির্ভেজাল কল্পকাহিনী, তবে মওদুদীর উদ্ধৃতিটি কল্পিত নয়)

ঘুষোঘুষি

কমলাকান্ত গঞ্জিকায় টান দিলো। তাহার চক্ষু লাল হইলো। মাথা ঝিমঝিম করিতে লাগিলো। কিন্তু কল্পনার দুয়ার খুলিয়া গেলো। গঞ্জিকা সেবন করিবার আগে সে একটি সংবাদ পাঠ করিয়াছিল। ধোলাইখাল ক্ষুদ্র কারখানা মালিক গ্রুপের সভাপতি বলিয়াছেন, দেশে উৎকোচকে বৈধ করিয়া দেওয়া হউক। সংসদে তাহার এই উক্তি লইয়া আলোচনা হইয়াছে। গঞ্জিকাসেবী কমলাকান্ত ফ্যান্টাসির জগতে চলিয়া গেলো। সে কল্পনায় দেখিতে পাইলো—মেঘরাজ্যে পার্লামেন্ট বসিয়াছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কমলাকান্তের স্বপ্নকথা

জাতীয় সংসদে একটি নতুন বিল পেশ করতে যাচ্ছেন অর্থমন্ত্রী। বিষয়টি আর কিছুই নয়, দেশের ঘুষকে বৈধ ঘোষণা করে তার হার নির্ধারণ করে দেওয়া! মন্ত্রী তার প্রস্তাবটি পড়লেন : 'সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত হইলে এখন হইতে দেশে যে কেহ উৎকোচ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং তাহা আইনের চোখে বৈধ বলিয়া গণ্য হইবে।' মন্ত্রীর এ প্রস্তাব সঙ্গে সঙ্গে বিপুল করতালির মধ্যদিয়ে অভিনন্দিত হলো। সরকারের মন্ত্রীগণ টেবিল চাপড়াতে লাগলেন বিপুল বেগে। মন্ত্রীপ্রধান মৃদু হেসে সহকর্মীদের মদদ দিলেন।

স্পিকার প্রস্তাবটি ভোটে দিলেন। কণ্ঠভোটে সর্বসম্মতভাবে বিলটি পাস হয়ে গেলো। এবার মন্ত্রী তার পূর্ব-প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর একটা সংশোধনী আনলেন। তিনি বললেন, আগামী অর্থবছরে সাধারণভাবে ঘুষের হার নির্ধারণ করা হলো ১৫%। যে-কোনো কাজের মোট বিলের ১৫% সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারীরা ঘুষ হিসেবে খেতে পারবেন। এই ১৫%-এর মধ্যে কোন্ কর্তা/কর্মচারী কতো ভাগ লাভ করবেন তা তারা নিজেরা নিজেরা বণ্টন করে নেবেন। যেমন প্রকল্পের মোট ব্যয় বরাদ্দ যদি এক কোটি টাকা হয়, তবে মোট ১৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঘুষ নেয়া চলবে। তবে গৃহিত উৎকোচের ওপরে ১৫% আবার ভ্যাট হিসেবে উৎকোচ গ্রহিতা সরকারকে দিতে বাধ্য থাকবে।

যে-সমস্ত কাজে মোট ব্যয় বরাদ্দের ব্যাপার নেই সে-সমস্ত ক্ষেত্রে কী হবে ? একজন এমপি দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, যেমন, ধরা যাক, সরকারি কোনো পদে লোক নেওয়া হবে। সেক্ষেত্রে ঘুষের পরিমাণ কতো হবে।

মন্ত্রী একগ্লাস পানি খেয়ে বললেন, সেটিও নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে ওই পদে নিযুক্ত ব্যক্তির প্রথম বছরের মোট বেতন ঘুষ হিসেবে ভক্ষণ করা যাবে।

মন্ত্রীর পায়ে বাতের ব্যথা। এর আগে বাজেট পেশের দিনে তাকে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। সেই ব্যথা এখনো যায়নি। ফলে তিনি এখন বেশিক্ষণ একনাগাড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। তিনি বিশ্রাম নেবার জন্য একটুখানি বসলেন। এরই ফাঁকে আরেকজন এমপি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, যে-সমস্ত ক্ষেত্রে বেতন-ভাতার কোনো ব্যাপার নেই, সেসব ক্ষেত্রে ঘুষের হার কী হবে ?

মন্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন, এসব ক্ষেত্রে প্রতিটি বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী তার এক মাসের বেতনের সমপরিমাণ টাকা পর্যন্ত ঘুষ খেতে পারবেন।

আরেকজন এমপি বললেন, নগদ টাকা ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে ঘুষ খাওয়া যাবে কিনা ? যেমন ধরা যাক, নারী কিংবা...বিপুল হট্টগোলের মধ্যে তার বক্তব্য হারিয়ে গেলো। এই বিষয় নিয়ে বিতর্কে ফ্লোর উত্তপ্ত হয়ে উঠলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মন্ত্রী বললেন, নগদ টাকা ছাড়া অন্য কোনো মাধ্যমে ঘুষ দেয়া-নেয়া হলে আমার ক্ষতি : কারণ আমি তাতে ভ্যাট থেকে বঞ্চিত হবো। সুতরাং এটা বৈধতা দেয়ার দরকার নেই। তবে কেউ যদি মুতা বিয়ে করে এবং তার এক বছরের বেতনের সমান দেনমোহর ধার্য করে এবং তার ১৫% ভ্যাট দেয়, তবে তা একই সঙ্গে অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক দিক থেকে বৈধ হয় বলে আমার ধারণা।

একজন মহিলা এমপির তীব্র প্রতিবাদের মুখে মাননীয় স্পিকার উৎকোচ হিসাবে নারীর ব্যবহার অংশটি জাতীয় সংসদের কার্যবিবরণী থেকে এক্সপাঞ্জ করে দিলেন।

যাই হোক মন্ত্রী বললেন, উৎকোচের ওপরে ভ্যাট যদি ঠিকভাবে আদায় করা যায়, তবে বাজেটের মোট বরাদ্দের শতকরা ১৫ টাকা সরাসরি ফিরে আসবে। কেননা, উৎকোচের মাধ্যমেই তা বরাদ্দ হবে। এর বাইরে যেসব ক্ষেত্রে সরকারি টাকা বরাদ্দের ব্যাপার নেই, যেমন বদলি, প্রমোশন, নিয়োগ, সেসব ক্ষেত্র থেকে আরো মোট বাজেটের ১৫% টাকা ফিরে আসবে বলে আশা করা যায়। এই বিপুলপরিমাণ টাকা দিয়ে আগামী অর্থবছরে পাঁচটি যমুনা সেতু বানানো হবে।

বিপুল তালির মাধ্যমে মন্ত্রীর এ বক্তব্যকে এমপিগণ অভিষিক্ত করলেন।

বাজেট অধিবেশনে ঘুষের ওপরে ভ্যাট ধরা হয়েছে, এ-কথা শোনার পর দেশের সরকারি কর্মকর্তা সমিতি, কর্মচারী সমিতি, ব্যাংকারস এসাসিয়েশন, প্রকৌশলী সমিতি, পুলিশ সমিতি, বিচার সমিতি ইত্যাদি প্রায় তিনশ সমিতি ধর্মঘট ডাকলো।

হরতাল-ধর্মঘট ভাঙার জন্য নেতাদের ডেকে সরকার তাদের হাতে তুলে দিলো কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা।

এই টাকা থেকে আমরা ভ্যাট দিতে পারবো না—নেতৃবৃন্দ বললেন।

সরকারের প্রতিনিধি বললো, ঠিক আছে দেবেন না। তবে ভ্যাট-অফিসারদের একটু খুশি করে যাবেন, না হলে ওরা আবার ঝামেলা করতে পারে। সরকারের প্রতিনিধি শিখিয়ে দিলেন মন্ত্রগুপ্তি।

এরপর সরকারের জনপ্রিয়তা বেড়ে গেলো বহুগুণ। কারণ কতো টাকা ঘুষ দিতে হবে আগাম জানা থাকায় জনগণের ভোগান্তি গেলো কমে, অন্যদিকে ঘুষ বৈধতা পাওয়ায় ঘুষখোররা সমাজে আগের মতোই মাথা উঁচু করে কেবল বেঁচে রইলো, তাই নয়, তারা পরকালে স্বর্গে যাবার স্বপ্নও দেখতে লাগলো নিশ্চিন্তে। সরকার অবশ্য একটি বিষয়ে খুবই গুরুত্ব দিলো, তা হলো সরকার-নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত ঘুষ যেন কেউ না খেতে পারে।

টেলিভিশনে নিয়মিত বিজ্ঞাপন প্রচারিত হতে লাগলো আপনি জানেন কি, সরকার ঘুষের হার ১৫% নির্ধারণ করে দিয়েছেন ?

নির্ধারিত হারের অতিরিক্ত হারে কাউকে ঘুষ খেতে দেখলে নিকটবর্তী থানায় খবর দিন।

টিভিতে এ ঘোষণা প্রচারিত হতে দেখে থানাঅলাদের খুশি দেখে কে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

স্বপ্নভঙ্গ

পুলিশের গুতোয় কমলাকান্তের ঘুম ভাঙিয়া গেলো। সে পার্কের বেঞ্চিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। ঘুম ভাঙিতেই তাহার লজ্জাবোধ হইলো। এই স্বপ্নের বিবরণ যদি কেহ জানিতে পারে, নিশ্চয়ই তাহার ভারি বিপদ হইবে। কমলাকান্ত সিদ্ধান্ত লইলো—এই স্বপ্নের বিবরণ সে কিছুতেই প্রকাশ করিবে না।

বিটিভি অনুষ্ঠান আমাদের কী কী কাজে লাগে

বিটিভি অনুষ্ঠানের মান খুব নিচে নেমে গেছে বলে যারা আহাজারি করছেন, আমি তাদের দলে নই। এ অনুষ্ঠান এখনো আমাদের নানা কাজে লাগে।

যেমন ধরুন ফেউ তাড়ানো। কাল বিকেল বেলা বলা নেই, কওয়া নেই—বাসায় এসে হাজির হলেন সাবেদ আলী সাহেব। তিনি এই শহরে 'ভাইরাস' বলে পরিচিত। ভাইরাস ওষুধ খেলে থাকে ৭ দিন, না খেলে এক সপ্তাহ। সাবেদ আলী তেমনি। যার পেছনে লাগেন, লেগে যান আইকার মতো। একনাগাড়ে বকবক করেন, লোকে যে বিরক্ত হচ্ছে, সেটা পর্যন্ত বুঝতে পারেন না। তাকে দেখলেই লোকে এখন তাই দূরে সরে যায়, ছাতা কিংবা থামের আড়ালে। সাবেদ আলী সাহেব তার গল্প শুরু করলেন। দেখুন এই যে সার সঙ্কট এর পেছনে কিন্তু আছে গবাদিপশু সঙ্কট। গবাদিপশু সঙ্কটের কারণ ঘাস সঙ্কট। ঘাস সঙ্কটের মূলে আছে জমি সঙ্কট, অর্থাৎ কৃষির প্রসার বৃদ্ধি। সুতরাং কৃষির প্রসার বন্ধ করতে হবে। সে-ক্ষেত্রে সার সঙ্কট একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এ ধরনের তত্ত্ব আরো কিছুক্ষণ শুনতে হবে। মুরব্বি মানুষ। মুখ ফুটে বলতে পারছি না, 'চাচা, আপনি এখন যান, আমার কাজ আছে।' কী করি ? কী করি ? তখনই উপায়টা এলো মাথায়। আরে, হাতের কছে ভরা কলস, অথচ তৃষ্ণা মিটছে না, আমি এমনি বোকা! টিভিটা ছাড়ি না কেন ? বিকেল বেলা, টিভি ছাড়লাম। একজন কবি অনুষ্ঠান করছেন। স্টালিনের যুগ সেই কবেই গেছে রাশিয়া থেকে, বিটিভিতে এখনো তার 'আছর' পড়ে আছে। অকথ্য অনুষ্ঠান। আমি চোখ বন্ধ করে দেয়ালঘড়ির টিকটিক শোনার চেষ্টা করতে লাগলাম। খানিক পর চোখ খুলে দেখি সাবেদ আলী সাহেব চলে গেছেন। ১০০% সফল। সত্যিকারের ভাইরাসের ক্ষেত্রেও এই থেরাপি প্রয়োগ করে দেখা যায়। জলবসন্তের রোগীকে বসিয়ে রাখা যায় বিটিভির সামনে। শক ট্রিটমেন্ট। হয়তো দেখা যাবে, ভাইরাস পালিয়ে গেছে, রোগী সেরে উঠেছে। আমার এই পরামর্শ শুনতে পেলে সৈয়দ মুজতবা আলী নিশ্চয়ই হাসতেন, 'কুইনিন জ্বর সারাবে বটে, তবে কুইনিন সরাবে কে ?'

বিটিভি অনুষ্ঠানের আরো অনেক ব্যবহার আছে। শুনলাম, মানসিক হাসপাতালে নাকি রোগীদের বিটিভি অনুষ্ঠান দেখা বাধ্যতামূলক। এটাও শক ট্রিটমেন্ট। জীবনের প্রতি এদের বৈরাগ্য জমেছে। সেই বৈরাগ্য তাড়াতে হবে। বিটিভি দেখলে এরা বুঝবে জীবন আসলে ততোটা বোরিং নয়, এরচেয়েও ভয়াবহ একঘেয়ে জিনিস পৃথিবীতে আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আইনস্টাইনের কল্যাণে আমরা জানি, সময়ও আপেক্ষিক। কোথাও সময় আস্তে যায় কোথাও যায় দ্রুত। সমুদ্রের নিচে সময়ের এক বেগ, পাহাড়ের চূড়ায় আরেক। যমজ দুটো শিশুর একটাকে রেখে আসা হলো পাহাড় চূড়ায়, আরেকটাকে সমুদ্রের ধারে। অনেক বছর পরে দেখা গেলো, একজনের বয়স ৬০, আরেকজনের বয়স ৫৮। আইনস্টাইনের টাইম ডাইলেশনের প্রমাণ আপনি পেতে পারেন ঘরে বসেই। বিটিভি নাটকের সামনে বসুন, সময় যেতে চাইবে না। হায় হায়, সময় কাহারো নয়, বেগে ধায় নাহি রয় স্থির—এসব আপ্তবাক্য নিষ্ফল প্রমাণ করে সময় 'ধীরে চলো' নীতি গ্রহণ করবে। এতো বড় বৈজ্ঞানিক সত্যের এমন সহজ প্রমাণ হাতেনাতে পাওয়ার জন্য বিটিভি অনুষ্ঠানের প্রশংসা আপনাকে করতেই হবে।

বিটিভি মহাপরিচালকের কাছে নাকি চিত্রগুপ্ত চিঠি দিয়েছেন, তার নরকের জন্য মাল সরবরাহের আবেদন জানিয়ে। লিখেছেন—ভায়া, বড়ো জ্বালানি সঙ্কটে আছি। এতো আগুন কোথা থেকে পাই। তোমাদের অনুষ্ঠানের বড়ো খ্যাতি শুনছি আজকাল। কিছু ভিডিও ক্যাসেট পাঠিয়ে দাও। নরকবাসীদের দুবেলা দেখাই। শুনেছি, এই সাপ্লাই-অর্ডারের জন্য বিটিভি উপস্থাপকদের অনেকেই কোটেশন জমা দিয়েছে। সর্বত্র ধরাধরি। এক্ষেত্রেও জাতীয়তাবাদীরাই এগিয়ে। 'কথামালা' অনুষ্ঠানটি নাকি সবচেয়ে বেশিহারে নরকে যাচ্ছে।

বিটিভি অনুষ্ঠানের এই নিম্নমানে সবচেয়ে বেশি খুশি গৃহকর্ত্রীরা। কাজের মেয়েরা ঠিকভাবে কাজ করছে। 'আম্মা আইজকা নাটক দেখুম, কাম রাইখেন না' বলে বেয়াদবি করে না। 'বাসায় টিভি আছে কিনা, না থাকলে কামে জয়েন করুম না'—এধরনের শর্তও ইদানীং আর পরিচারিকারা দিচ্ছে না। এটা একটা অনেক বড় সুসংবাদ। মধ্যবিত্ত জীবনে পরিচারিকারাই শান্তিরক্ষা ও শান্তিবিঘ্নের সবচেয়ে বড়ো উপাদান। বিটিভির কল্যাণে মধ্যবিত্ত জীবনে নেমে এসেছে অপার শান্তি।

বিটিভি অনুষ্ঠানের আরো একটা মস্ত বড়ো উপযোগিতা আছে। দেশের চিকিৎসকরা সেটা কাজে লাগাচ্ছেন। ইনসমনিয়া রোগে বিটিভি অনুষ্ঠান এক বড়ো দাওয়াই। ডাক্তার সাহেব, সারারাত ঘুমুতে পারি না। এক থেকে এক হাজার, এক হাজার থেকে শূন্য পর্যন্ত কয়েক লাখ বার গোনা হয়ে যায়। ভেড়ার পাল গুনতে গুনতে প্রান্তর উজাড়। তবু ঘুম তো আসে না। বড়ো অশান্তি। ডাক্তার বাবু আমাকে বাঁচান। সিডাক্সিনে কাজ হয় না। লুডিওমিলে কাজ হয় না, মোটিভালে না, ডিনাক্রিটে না। শখানেক তেলিয়াম দিন, খেয়ে ঘুম দিই। অনন্ত ঘুম। ডাক্তার সাহেব হাসেন। আপনি পাশের রুমে যান। ওখানে চা-সিগ্রেট খান। গল্পগুজব করেন। রোগী পাশের রুমে যায় খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। নার্স বিটিভি অন করে। যেন এটা কোনো চিকিৎসা নয়। একা একটা ঘরে রোগী আর কী করবে, বিটিভি দেখে। ধারাবাহিক নাটক হচ্ছে। কিংবা মহিলাদের অনুষ্ঠান 'ঘরে-বাইরে'। রোগীর দু-চোখ ভরে কোথা থেকে আসে রাজ্যের ঘুম। রোগী নিজের অজান্তেই ঘুমিয়ে পড়ে।

বলুন, এরচেয়ে উপকারী টিভি-অনুষ্ঠান আর কোনো দেশে হয় ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

৩০ আগস্ট ৯৫-এর বিটিভি সংবাদ দেখার পর

'মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা'—ইঁদুরদের এক পাতিনেতা ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন। বিটিভি মিথ্যা কথা বলছে। বস্তুত মানুষদের সরকার নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকার জন্য, জনগণের দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার জন্যই আমাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে। আমরা এসব তথ্য মানি না।

ইঁদুরদের নেতারা সবাই অধীর আগ্রহে বসেছেন বাংলাদেশ টেলিভিশনের সামনে। ৮টার খবর হচ্ছে। তারিখ ৩০ আগস্ট, ১৯৯৫ বুধবার। এদিন এক মাসব্যাপী জাতীয় ইঁদুর নিধন অভিযানের শুরু। খবরের শুরুতেই মানুষদের প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি শোনানো হলো। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান অঙ্গীকার হলো দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য ডাল-ভাত নিশ্চিত করা। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ বিশেষ করে খরা, বন্যা, পোকামাকড়, রোগবালাইয়ের দরুন আমাদের খাদ্য ঘাটতি থেকেই যাচ্ছে। তদুপরি রয়েছে ইঁদুরের সমস্যা। প্রতিবছর প্রায় ৫ লাখ টন খাদ্যশস্য কেবল ইঁদুরের পেটে যায়।

এ পর্যন্ত শুনেই ইঁদুরের পাতিনেতাটি চিঁচি করতে শুরু করলেন। এঁহ! সবার জন্য ডাল-ভাত। এঁহ্। চালের কেজি ১৮ টাকা, ডালের কেজি ৪৫, আর দোষ আমাদের। আমরা কি লবণ খাই, পেঁয়াজ খাই। তাহলে এ সরকারের আমলে লবণের দাম, পেঁয়াজের দাম রেকর্ড ভঙ্গ করেছিল কেন?

এ ধরনের অপপ্রচারের জবাব দিতে হবে। অন্য এক ইঁদুর নেতা বললেন সরোষে। দেশের মানুষ বিটিভি খবরকে বিশ্বাস করে না। এ টিভি যেদিন হরতাল খুবই সফলভাবে পালিত হয়, সেদিনই হরতাল পালিত হয়নি বলে খবর দেয়। সুতরাং চিন্তার কিছু নাই—বললেন একজন প্রবীণ ইঁদুর।

আমরা এক কাজ করবো, সারাদেশে টিভির এন্টেনার তার কেটে দেবো। লোকে যাতে বিটিভি না দেখে কেবল টিভি দেখে তার ব্যবস্থা করবো। একজন বিপ্লবী ইঁদুর নেতা দাঁত ঘষে বললেন কথাগুলো। ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো—ডাল-ভাত কর্মসূচির মতো এ সরকারের ইঁদুর নিধন কর্মসূচিও সফল হবে না—বললেন একজন প্রাজ্ঞ ইঁদুর।

এতো কথা বলো না। ধমক দিলেন ইঁদুরের শীর্ষ নেতা। সবাই চুপ করে গেলো। তিনি বললেন, টিভি সংবাদের বাকি অংশ সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখো। খুবই মনোযোগ দিয়ে দেখবে।

সবাই আবার তাকালো টিভির দিকে। সংবাদ চলছে।

এবার প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা। প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দিচ্ছেন তার কার্যালয়ে বিপুলসংখ্যক সমাজকর্মী, আইনজীবী ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের বিএনপিতে যোগদান উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে। তিনি বলছেন, যারা দেশকে ভালোবাসে, এর কল্যাণ চায়, তাদের ধ্বংস ও বিশৃঙ্খলার রাজনীতি নয়, বরং গঠনমূলক রাজনীতি করা উচিত। প্রধানমন্ত্রী দুঃখের সঙ্গে উচ্চারণ করছেন, মহল বিশেষ এমন কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ধ্বংসাত্মক কর্মসূচি গ্রহণ করছে, যাতে চলমান আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে এবং দেশকে পেছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

খবর শেষ হলে। শীর্ষ নেতা বললেন, ইঁদুর ভাইসব, আপনারা কী বুঝলেন ?

সবাই নিরুত্তর।

শীর্ষ নেতা বললেন, এই খবর প্রচারের উদ্দেশ্য অতি পরিষ্কার। আমাদেরকে অতি স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে। মানুষের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, শুধুমাত্র আমরাই দেশের ক্ষতি করি না, বিরোধী দলগুলোও করে। আর সেইসব ক্ষতিকর বিরোধীদলের নেতাদেরই আমরা দেখলাম দলে দলে সুগন্ধা কার্যালয়ে সমবেত হয়েছে। বন্ধুরা, এখন আমাদেরও বাঁচার একটাই পথ আছে। চলুন, আমরা সবাই মিলে সুগন্ধা কার্যালয়ে যাই। গঠন করি জাতীয়তাবাদী ইঁদুর দল। তারপর দলে দলে যোগ দেই জাতীয়তাবাদী ইঁদুর দলে। এর ফলে আমরা সরকারের উন্নয়নমূলক রাজনীতিতে শরিক হতে পারবো, দেশের সেবা করতে পারবো ইনশাল্লাহ। এরপর আমাদের আর ধানডাল খেতে হবে না, আমরা হালুয়া-রুটি পাবো। সার পাবো। সেসব খেয়ে আমরা নিজেদের পুরিপুষ্ট করে তুলবো।

উদ্বিগ্ন ইঁদুরদের মুখ থেকে কালো ছায়া সরে গেলো। তারা সবাই গেয়ে উঠলো, একবার যেতে দে না আমার ছোট্ট সুগন্ধায়। দাঁড়াও। বললেন একজন ছিদ্রান্বেষী ইঁদুর নেতা। এই নেতাটি মানুষের বাসগৃহের নিশ্ছিদ্র দরজারও ফুটো খুঁজে পেতে ওস্তাদ।

এরকম সমস্যায় ইঁদুর জাতি আরেকবার পড়েছিল। ইতিহাস থেকে দেখা যায়, সেবার ইঁদুররা বিপদে পড়েছিল বিড়াল নিয়ে। সেবার মিটিঙে ইঁদুররা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবার। ঘণ্টা কেনার পর মনে পড়েছিল আসল সমস্যা—বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে ?

আমরা তো সবাই সুগন্ধায় যাবো কিন্তু সেখানে যাবার পর জাতীয়তাবাদী বিড়াল দলের সদস্যরা আমাদের ওপর আক্রমণ করে বসবে —এর নিশ্চয়তা কোথায় ?

এতো সুন্দর সমাধানের উপায় শেষ পর্যন্ত ভেস্তে যায় যায় অবস্থা। সব বিড়ালই ভবিষ্যৎ চিন্তায় হায় হায় করতে লাগলো।

চিন্তা নাই, চিন্তা নাই—বললেন শীর্ষ নেতা। যদি মাহমুদুল হাসানের মতো বাগদাদি, মাইজভাণ্ডারির মতো আদওয়ালা আর সাখাওয়াৎ হোসেনের মতো জামাতি, স্বৈরাচার, হাইজ্যাকার, রাজাকারের পরম প্রতিমূর্তিরা ওই দলে যেতে পারে—এবং অনাক্রান্ত থাকে, তবে আমরাও নিরাপদেই থাকবো।

শীর্ষ নেতার এ ঘোষণায় আনন্দ ছড়িয়ে পড়লো ঘরে ঘরে, ইঁদুরদের মধ্যে।

তারা স্লোগান ধরলো—আমরা শক্তি আমরা বল, জাতীয়তাবাদী ইঁদুর দল।

কোচিং সেন্টারের তিন কাল

এক.

কাশেম মিয়া প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি-পরীক্ষার রেজাল্টশিটে ছিলেন ওয়েটিং লিস্টে। এতো পেছনে থেকে তিনি যে শেষতক ভর্তি হতে পারবেন বুয়েটে, তা কেউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আশা করেনি। কাশেম মিয়াও না। শেষতক তিনি ভর্তি হয়েছিলেন, প্রথম বর্ষ থেকে দ্বিতীয় বর্ষে উত্তীর্ণও হয়েছিলেন। কিন্তু তৃতীয় বর্ষে তার কোনোদিন ওঠা হয়নি। পরপর তিন বছর সেকেন্ড ইয়ারে ফেইল করায় বিশ্ববিদ্যালয় হল থেকে তাকে বের করে দেয়া হয়, তবে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে তিনি পরীক্ষা দিতে পারতেন। সে চেষ্টা তিনি আর করেননি। কারণ তার অনেক আগে থেকেই একটা কোচিং সেন্টার তিনি খুলে ফেলেছিলেন। সেটার উন্নতি হওয়া ততোদিনে শুরু হয়ে গিয়েছিল।

তার কোচিং সেন্টারের ব্যবসা শুরু করার পেছনেও একটা শানে নুযুল আছে। তিনি ঢাকা শহরের একটা বাড়িতে গিয়ে টিউশনি করতেন। মেয়েটি পড়তো ইন্টারমিডিয়েটে, ইডেন কলেজে। রোজ বিকেলে ছাত্রীর বাসায় গেলে তিনি পেতেন এক কাপ চা ও একটি বিস্কিট। সেই বিস্কিটটা চায়ের কাপের পাশে এক পিরিচে দেয়া হতো। একদিন তিনি ছাত্রীটিকে বললেন, তোমাদের বাসায় কি মাত্র একটা পিরিচ?

ছাত্রীটি বললো স্যার, পিরিচ আছে। তবে মাস্টারদের চা ও বিস্কিটের জন্য একটা পিরিচই বরাদ্দ। কাশেম মিয়া তখনই ঠিক করেন তিনি আর বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিউশনি করবেন না।

তিনি একটা কোচিং সেন্টার খোলেন। এই কোচিং সেন্টার খুলতে তার সর্বমোট খরচ হয় ১২০০ টাকা। এর মধ্যে ১০০০ টাকা দিয়ে তিনি ইত্তেফাকে পরপর ১০ দিন ১ ইঞ্চি ১ কলাম বিজ্ঞাপন দেন। যোগাযোগের ঠিকানা ছিল তার ইউনিভার্সিটির হলের রুমটি। একটা-দুটো করে ছাত্রছাত্রী আসতে শুরু করে। ১২ জন ছাত্রের প্রত্যেকের কাছ থেকে ৮০০ করে টাকা অগ্রিম নিয়ে তিনি ব্যবসা আরম্ভ করেন। বকশিবাজারে এক কিন্ডারগার্টেন স্কুলের একটি রুম বিকেলের জন্য ভাড়া নিয়ে শুরু হয় তার কোচিং ক্লাস। তিনি ছাড়াও তার আরো দুই বন্ধু ক্লাস নিতেন। প্রথম ব্যাচে তার লাভ হয় ৫০০০ টাকা।

তার পরের বছর বুয়েট অ্যাডমিশন কোচিং সেন্টার থেকে তিনি লাভ করেন ৪০,০০০ টাকা। তৃতীয় বছরে তার লাভ সোয়া লাখ। ইতিমধ্যে নিজের পরীক্ষায় ফেইল করার হ্যাটট্রিক তিনি পুরো করে ফেলেন। এরপর আর বুয়েটের পড়াশোনা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করেননি। ফার্মগেটে বাসা ভাড়া নিয়ে পুরোদস্তুর শুরু করেন তার কোচিং সেন্টারের ব্যবসা। '৮৫ থেকে '৯৫। দশ বছরে তিনি ইনশাল্লাহ ব্যবসায় যাকে বলে অভাবনীয় উন্নতি, তা করে ফেলেছেন। কোচিং সেন্টারের চারটি শাখা হয়েছে। ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যাডেট কলেজ, কলেজ ভর্তি—সব মিলিয়ে অসংখ্য দিকে তিনি ব্যবসার বিস্তার ঘটিয়েছেন। এখন টাকাপয়সা-ধনসম্পত্তি তার ভালোই হয়েছে। ৩৫ লাখ টাকা দিয়ে ডুপ্লেক্স ফ্লাট কিনেছেন, বারিধারায় একটা প্লটও ম্যানেজ করেছেন। নিজের গাড়িটা ইনশাল্লাহ নিজেই চালান, সঙ্গে থাকে সেলুলার টেলিফোন। তার সহপাঠীদের মধ্যে যারা নিয়মিত পড়েছে এবং পাস করে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেছে, তাদের দিকে তাকালে এখন তার করুণাই হয়। অধিকাংশই বেকার, এখনো টিউশনি করে, কিংবা মাস্টার্স করছে, যারা চাকরি করে তাদেরও বেতন মাসে ৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

থেকে ৫ হাজার টাকা। আরে, ওই বেতন তো তিনি এখন তার কোচিং সেন্টারের কেরানিকে দিতেও লজ্জা পান।

ব্যবসায় বুদ্ধি লাগে। বুদ্ধি আল্লাহ তাকে কম দেননি। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার রেজাল্টের পর প্রথম ২০ জনকে সংবর্ধনা দেয়া ও তাদের হাতে ২০ হাজার টাকার একটা পিসি তুলে দেয়ার চিন্তা তার মাথা থেকেই প্রথম আসে। পুরস্কারের লোভি কৃতি ছাত্রছাত্রীরা এলে তার ছবি তিনি তুলে রাখেন। তারপর সেসব ছবি কাগজে ছাপিয়ে তিনি বিজ্ঞাপন করেন। চারদিকে সাড়া পড়ে যায়। এতো ভালো কোচিং সেন্টার! তবে মধ্যেখানে তার ব্যবসার সুবিধা করে দেয় সরকার নিজে। প্রশ্ন ব্যাংকের মাধ্যমে পাসের হার বাড়িয়ে দিয়ে। এতো ছাত্রছাত্রী ভর্তি হবে কোথায় ? রাতারাতি কোচিং সেন্টারের ব্যবসা চাঙা হয়ে ওঠে।

হোটেল সোনারগাঁয়ের রেস্তোরাঁয় এক কাপ চা খেতে খেতে এসব কথা মনে পড়ে কাশেম মিয়ার। তার বাবা মহিমাগঞ্জের কৃষক। আর আজ ? হঠাৎ তার সেই ছাত্রীটির কথা মনে পড়ে যায়। যে ছাত্রীটি তাকে বিস্কিটের সঙ্গে একটা অতিরিক্ত পিরিচ দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। তিনি মনে মনে ধন্যবাদ জানান ছাত্রীটিকে, তার জন্যই তিনি কোচিং সেন্টারের ব্যবসায় আসতে পেরেছিলেন। আজ সেই অপমানের শোধ নেবার জন্য তিনি একজন ওয়েটারকে ডাকেন। তাকে বলেন ১০ কাপ চা এই টেবিলে দিতে। ওয়েটার দশটি কাপ, পিরিচ, দুধ, চা কেতলি ভরে এনে টেবিলে রাখে। কাশেম মিয়া একটা করে পিরিচ মেঝেয় আছাড় মারতে থাকেন।

দুই.

কাশেম মিয়ার মাথা হঠাৎ করে ফাঁকা হয়ে যায়। সর্বনাশ! সরকার এটা কী সিদ্ধান্ত নিলো ? কলেজে ভর্তি করা হবে বোর্ডের পরীক্ষার মার্কসের ওপর। তাহলে তার কোচিং সেন্টারের কী হবে ? আজ ইন্টারমিডিয়েট ভর্তির নিয়ম এভাবে পাল্টানো হলো, আগামীকাল ইউনিভার্সিটির ভর্তির নিয়ম এরকম করা হবে। তাহলে ? তার ব্যবসা গোটাতে হবে ? অথচ গত এক মাস দেশের দু-দুটো সংবাদপত্রে প্রতিদিন এক লাখ টাকা করে মোট ৬০ লাখ টাকার বিজ্ঞাপন ছাপা হয়ে গেছে। উপায় কী ? উপায় কী ? কাশেম মিয়া উপায় খুঁজতে থাকেন। তিনদিন-তিনরাত তার ঘুম হয় না। চতুর্থ রাত সোয়া তিনটায় তার মাথায় বুদ্ধি চলে আসে। বুদ্ধিটা আর কিছুই নয়, কোচিং সেন্টারের ডাইভার্সিটি বাড়ানো। এবার তিনি খুলবেন 'নমিনেশন' কোচিং সেন্টার। আগামী পার্লামেন্ট নির্বাচনে যারা বড় বড় দলগুলো থেকে প্রার্থী হতে চায়, তাদের জন্য নমিনেশন কোচিং সেন্টারের বিশেষ ব্যবস্থায় কোচিং দেয়া হবে।

তিন.

যা ভাবা, তাই কাজ। তিনি বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি ও জামাতের এমপিদের জন্য আলাদা আলাদা সংবর্ধনার আয়োজন করেন। সেই সভায় প্রত্যেককে

একটা করে সেলুলার টেলিফোন সেট উপহার দেয়া হয়। পরে সেইসব ছবি লিফলেট ও দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন আকারে ছাপা হয়। বিজ্ঞাপনের টেক্সটে বলা হয়—'এরা সবাই ধন্যবাদ কোচিং সেন্টারে কোচিং করেই '৯০ সালের নির্বাচনে নমিনেশন পেয়েছে'। বিপুলসংখ্যক এমপি পদপ্রার্থী লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে ধন্যবাদ কোচিং সেন্টারে হাজির হয়। এদের মধ্যে ঋণখেলাপিরাও আসে ব্যাংক থেকে মেরে-দেয়া কোটি টাকা নিয়ে। রাতারাতি কাশেম মিয়া কোটি কোটি টাকার মালিক বনে যান। কোচিং সেন্টারের পাঠদান-পদ্ধতি হয় খুবই মজার। যেমন, বিষয় : আওয়ামী লীগ। জিয়াউর রহমান কে ছিলেন ? উত্তর : রাজাকার।

আবার বিষয় : বিএনপি। ভাষা আন্দোলনের ঘোষণা কে দেন ? উত্তর : জিয়াউর রহমান।

চার.

পত্রিকায় এই নমিনেশন কোচিং সেন্টারের বিরুদ্ধে জোরদার লেখালেখি শুরু হয়। অ্যাডমিশন টেস্টের ক্ষেত্রে যেমন এক ছাত্র বুয়েট, মেডিকেল, এগ্রিকালচার, ইউনিভার্সিটি সর্বক্ষেত্রেই ভর্তি পরীক্ষায় একের পর এক অবতীর্ণ হয়, এই কোচিং সেন্টারের প্রার্থীরাও তেমনি বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জাপা, জামাত, গণফোরামের ইতর বিশেষ না করে প্রস্তুতি নিতে থাকে। নির্বাচন কমিশন তখন ঘোষণা করে, ফুটবল লীগে খেলোয়াড়দের দলবদলের মতো টোকেন সিস্টেম প্রবর্তন করা হলো। প্রতিটি সম্ভাব্য প্রার্থী কেবল একটি টোকেন তুলতে পারবেন এবং তার টোকেন কেবল একটিমাত্র দলেই জমা দিতে হবে। নমিনেশন ফাইনাল হবার আগেই এই টোকেন না দেখিয়ে কোনো দল তার প্রার্থীর নমিনেশন পেপার জমা দিতে পারবে না। দলবদলের খেলায় এই নিয়মও দারুণ হৈচৈ ফেলে। তবে ড. কামাল হোসেন এক বিবৃতিতে নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানান। তারপর আরো অনেকেই এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়ে বিবৃতি দিতে শুরু করে।

রবিন র‍্যাফেলের চিকিৎসা বিভ্রাট

রবিন র‍্যাফেলের ভীষণ মাথাব্যথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী পররাষ্ট্র সচিব রবিন র‍্যাফেল। অন্যের বিষয়ে মাথাব্যথা দেখানোটা যুক্তরাষ্ট্রের পুরোনো অসুখ। রবিন র‍্যাফেলের অফিসিয়াল চিকিৎসক তাই ব্যাপারটায় প্রথমদিকে পাত্তাই দিতে চাননি। সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর শেষ করেছেন র‍্যাফেল। বাংলাদেশের বহু বিষয়ে নাক গলাতে হয়েছে তাকে।

গলা নাকের ধকল এখন যাচ্ছে মাথার ওপর দিয়ে। মাথার কী দোষ ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুটো পেইন কিলার ট্যাবলেট প্রেসক্রিপশনে লিখে চিকিৎসক তার দায়িত্ব পালন করলেন। দুটোর জায়গায় ছটা ট্যাবলেট খেয়েও রবিন র‍্যাফেলের মাথাব্যথা কমলো না। বরং বেড়েই যেতে লাগলো। তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। ...তীব্র মাথাব্যথা। সবকিছু যেন জট লেগে যাচ্ছে, যেন এক ভীষণ প্যাঁচ লেগে গেছে মস্তিষ্কের মধ্যবর্তী শিরা-উপশিরা, স্নায়ুতন্ত্রীগুলোয়।

রবিন র‍্যাফেল আর্তনাদ করতে লাগলেন। আর পারি না, আর পারি না।

ডাক্তার বিষয়টা সিরিয়াসলি নিতে বাধ্য হলেন। রবিন র‍্যাফেলের চোখ পরীক্ষা করা হলো। অনেক সময় চোখের অসুখ থেকে মাথা ব্যথা হয়। না, চোখ ঠিক আছে। জ্বর-জারি নেই, কোনো জীবাণুঘটিত সংক্রমণও নয়। রক্তসহ অন্যান্য প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষার পর দেখা গেলো—সবকিছু নরমাল। সবকিছু নরমাল, শুধু মাথায় ব্যথা। মাথার ভেতরে পিলপিল করছে, কিলবিল করছে পেচিয়ে যাচ্ছে—বিলাপ করে চলেছেন রবিন র‍্যাফেল।

ব্যথা শুরু হলো কখন থেকে। র‍্যাফেল কখন থেকে ব্যথার শুরু—মনে করার চেষ্টা করলেন। বাংলাদেশের বিরোধী নেত্রীর সঙ্গে আলোচনার পরও তিনি অসুস্থ বোধ করেননি। বরং বিরোধীদের কথাগুলো তিনি মনোযোগ দিয়েই শুনেছেন। এরপর সেদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক। সরকারি দলের নেতৃবৃন্দের বক্তব্য শোনার পর থেকেই আস্তে আস্তে তার মাথাব্যথা শুরু হয়। সবকিছু শুনে চিকিৎসক কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন না। তিনি সর্বশেষ চেষ্টা হিসেবে রবিন র‍্যাফেলের ব্রেইন স্ক্যান করার পরামর্শ দিলেন।

অত্যাধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে র‍্যাফেলের মস্তিষ্ক স্ক্যানিং করা হলো। স্ক্যানিং রিপোর্ট দেখে চিকিৎসকের রীতিমতো বিস্ময় মানবার পালা। রবিন র‍্যাফেলের ব্রেনের অলিতেগলিতে সার্কিট জ্যাম হয়ে গেছে। সবগুলো সার্কিটে পরস্পরবিরোধী কিছু তথ্য মারামারি করছে। কম্পিউটারে যেমন করে ভাইরাস প্রোগ্রাম ঢুকে সব সার্কিট অচল করে দেয়, অনেকটা তেমনি দুরবস্থা হয়েছে রবিন র‍্যাফেলের মস্তিষ্কের কোষে কোষে।

জট লেগে যাওয়া এসব কথামালা ঢুকেছে তার দু-কান দিয়ে। চিকিৎসক মহাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলেন।

যাহোক রবিনের জীবন বাঁচাতে তার ব্রেইন অপারেশন হলো। সবগুলো ঝগড়াটে ইনফরমেশন ধরে ধরে তুলে একটা গামলায় রাখা হলো। দেখা গেলো, গামলার মধ্যেই ইনফরমেশনগুলো মারামারি করছে। গামলাটা থরথর করে কাঁপছে। রবিন র‍্যাফেলের মস্তিষ্ক অয়েলিং করার পর তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। তার আর মাথাব্যথা নেই।

আমেরিকার চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা মেতে উঠলো নতুন গবেষণায়। এই ইনফরমেশনগুলো আসলে কী, যারা রবিন র‍্যাফেলের মস্তিষ্কে ঢুকে তার ব্রেইনের সার্কিটগুলোকে অচল করে দিয়েছিল ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ব্যাপক গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা এদের পরিচয় জানতে পারলেন। এই ব্রেইন সার্কিট ভাইরাসগুলো আর কিছুই নয়, র‍্যাফেলের কানের ভেতর দিয়ে ব্রেইনে পৌঁছে যাওয়া শেখ হাসিনার ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা, যার মূল বিষয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির ন্যায্যতা আর তার সঙ্গে যুদ্ধরত বেগম খালেদা জিয়ার বক্তব্য, যার মূল বিষয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবির অসাংবিধানিকতা, এই পরস্পরবিরোধী তথ্যগুলো রবিন র‍্যাফেলের মস্তিষ্কের ভেতরে ঢুকে মারামারি শুরু করে দেয়, তারা নানা অমোচনীয় জটের সৃষ্টি করে আর সেইসব জট থেকে আবার প্রস্তুত হয় নতুন জট।

শেখ হাসিনা আর বেগম জিয়ার আপসহীন কথাবার্তা থেকেই রবিন র‍্যাফেলের এই রহস্যময়, প্রায় অচিকিৎস্য মাথাব্যথার উৎপত্তি।

দুই.

রবিন র‍্যাফেলের মাথাব্যাথা এখন আর নেই। বরং মনে তার ফুর্তি-ফুর্তি ভাব। বাংলাদেশের রাজনীতির দুরারোগ্য প্যাঁচ থেকে এখন তিনি মুক্ত। কিন্তু তার মনে যে একটা আলগা স্ফূর্তি দেখা দিয়েছে তার কারণ কী ? রবিন র‍্যাফেল এখন অকারণে হাসেন, অকারণে গেয়ে ওঠেন।

সম্প্রতি তিনি তার অধীনস্থ একজন কর্মচারীর কাছ থেকে ১০ ডলার ধার নিয়ে ঘি আনিয়েছেন এবং সবকিছুই খাচ্ছেন ঘি দিয়ে।

সকাল বেলা রুটির সঙ্গে ঘি।

দুপুর বেলা হট ডগ-এর সঙ্গে ঘি।

বিকেল বেলা চায়ের সঙ্গে ঘি।

রাত্রিবেলা সাপারের সঙ্গে ঘি।

এমনকি চুমুর সঙ্গে কী করে ঘি খাওয়া যায়, এই নিয়ে তিনি গবেষণায় মেতেছেন।

সবাইকে তিনি উপদেশ দিচ্ছেন, বুঝলে হে, ঘি খাও, ঘি খুব ভালো খাবার, ঘৃত অতি উত্তম খাদ্য, ঋণ করে হলেও ঘি খাও।

ডাক্তাররা আবার চিন্তিত হয়ে পড়লো। ব্যাপার কী ? এটা আবার কোন্ রোগ ?

প্যাথলজিকাল টেস্টেই ধরা পড়লো রোগটা। বাংলাদেশের ঋণখেলাপিদের নেতার সঙ্গে তিনি বৈঠক করেছিলেন। সেই সময় ঋণের টাকায় কেনা খাবার খাওয়ানো হয়েছিল তাকে। এই ঋণখেলাপিরা বাংলাদেশের জনগণের হাজার হাজার কোটি টাকা ঋণ নিয়েছে, কিন্তু শোধ দিচ্ছে না। সেই খাবারের মধ্যকার বদগুণ দ্রুত সংক্রমিত হচ্ছে রবিন র‍্যাফেলের শরীরে।

আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হবার ঝোঁক এবং মার্কিন ব্যাংক থেকে ঋণ নেবার ঝোঁক উঠবার আগেই চিকিৎসকরা রবিন র‍্যাফেলের রক্তকণিকা থেকে খেলাপি-খাদ্য বিদূরিত করার ওষুধ দিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কমলাকান্তের এসএসসি চিন্তন

এসএসসি পরীক্ষা : দাউদকান্দিতে মন্ত্রীপুত্রের খাতা কেলেঙ্কারি, ঘেরাও, তদন্ত টিম

চলতি এসএসসি পরীক্ষায় কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে দাউদকান্দি কেন্দ্রে জনৈক মন্ত্রীর ছেলের খাতা কেন্দ্রের বাইরে থেকে লিখে সরবরাহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট পরীক্ষার্থীদের অসন্তোষ, প্রধান শিক্ষককে ঘেরাও এবং অবাধে নকল চলার অভিযোগের ভিত্তিতে কুমিল্লা শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান গতকাল বোর্ডের সচিবের নেতৃত্বে একটি তদন্ত টিম দাউদকান্দি কেন্দ্রে পাঠান।

জানা যায়, মন্ত্রীপুত্র এবার চতুর্থবারের মতো দাউদকান্দি থানার সুন্দুলপুর উচ্চবিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী হিসেবে দাউদকান্দি পাইলট উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা দিচ্ছে। ইতিপূর্বে উক্ত ছাত্র ঢাকায় কয়েকটি স্কুল থেকে তিনবার এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়ে অকৃতকার্য হয়। (ভোরের কাগজ, ২৭ এপ্রিল '৯৫)

কমলাকান্তের দপ্তর :

বালক, তুমি ভুল করিয়াছ।

আসুন, এই ঘটনার বিশ্লেষণ করি। প্রথমত আমাদের বিবেচ্য হউক, মন্ত্রীপুত্র এসএসসি পাস করিতে চাহিল কেন ? কী দরকার ছিল তাহার এসএসসি পাসের ? আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিব, মন্ত্রীপুত্র ভুল করিয়াছে। সে কি আমাদের সমাজের দিকে ভালো করিয়া দৃকপাত করে নাই ? এই সমাজে ননম্যাট্রিকগণই কি সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত নয় ? বিদ্যার মূল্য এখানে কোথায় ? সম্ভবত তাহার পিতা ডক্টরেট ডিগ্রিধারী হওয়ায় সে সবিশেষ শরমিন্দা হইয়াছে। হায়রে বিদ্যাপিপাসু বালক, তুমি বৃথাই আকুল হইয়াছ! শ্রবণ কর, এই দেশের একজন সাবেক রাষ্ট্রপতির গল্প। তাহার পুত্রসন্তান একবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়।

বিদ্যায়তনের প্রধান শিক্ষক তখন এক প্যাকেট মিষ্টান্ন লইয়া রাষ্ট্রপতির বাসভবনে হাজির হন। বলেন, জনাব আমি কি আপনার পুত্রকে উত্তীর্ণ করাইব ? রাষ্ট্রপতি বলেন, আপনি আপনার মিষ্টান্ন-সমেত সত্বর এই বাড়ি ত্যাগ করুন।

মন্ত্রীপুত্র, তুমি ভাবিতেছ কী সুবর্ণ সুযোগই না রাষ্ট্রপতি হেলায় হারাইলেন। তোমার এই ধারণা ভুল। কেননা কর্মজীবনে এই বালক আজ প্রতিষ্ঠিত। অনেকগুলো কোম্পানি ও জাহাজের মালিক। সুতরাং বুঝিতে পারিতেছ, বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় কৃতকার্য হওয়াই আসল কথা নহে। জীবনের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই সর্বাপেক্ষা বড়ো কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সরকার কেন ব্যাপারটি লক্ষ্য করিতেছে না ?

বালক ভুল করিতে পারে, কিন্তু জাতীয়তাবাদী সরকার ভুল করিতেছে কেন ? দলীয়করণের এই যুগে জাতীয়তাবাদীদের জন্য পরীক্ষা পাসের বিশেষ পারমিটের ব্যবস্থা থাকিবে না কেন ? যদি সর্বক্ষেত্রে এইরূপই বিধান হয় যে, সার বরাদ্দ পাইবে জাতীয়তাবাদীরা, এমনকি রেডিও-টেলিভিশনে অনুষ্ঠান করিবে জাতীয়তাবাদীরা, তবে পরীক্ষা পাসের ক্ষেত্রে তাহাদিগকে বিশেষ কোটা সুবিধা কেন দেওয়া হইবে না ? এখন হইতে নিয়ম করিয়া দেওয়া হউক, জাতীয়তাবাদী মন্ত্রী-এমপি-নেতৃবৃন্দের স্ত্রী-পুত্র-সন্তানগণ উপযুক্ত বয়সে বিনা পরীক্ষায় প্রার্থিত পরীক্ষায় পাস বলিয়া গণ্য হইবে এবং সার্টিফিকেট লাভ করিবে।

এবার বিরোধীদলের কর্তব্য

বিরোধীদল নিশ্চয়ই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে না। তাহারা বলিবে, দেখ, দেখ, ইহাদিগের কাণ্ড দেখ, ইহারা পরীক্ষা-পদ্ধতিকে পর্যন্ত দলীয়কৃত করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাদের অধীনে কোনো প্রথা-পদ্ধতি-ব্যবস্থাই আর নিরাপদ নহে। সুতরাং এবার হইতে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষাও নির্দলীয় নিরপেক্ষ কেয়ারটেকার সরকারের অধীনে হইতে হইবে। আর নির্বাচন ? সে তো কেয়ারটেকার সরকার ছাড়া কল্পনাও করা যায় না, শৃগালের নিকটে যে কৃষক মুরগি বর্গা দেয়, সে একটা আহাম্মক ছাড়া আর কী ?

সরকার এখন কী করিবে ?

সরকার ইতিমধ্যেই বলিতে শুরু করিয়াছে, সার-সঙ্কট বিরোধীদলের সৃষ্ট। এইবারও উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়েই ঠেলিতে হইবে। বলিতে হইবে, সব বিরোধীদলের চক্রান্ত। তদন্ত কমিটি তদন্ত করিয়া দেখিয়াছে, সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী আদৌ মন্ত্রীপুত্র নহে। কিংবা বলিতে হইবে, ঐ কেন্দ্রে আদপেই ওই নামে কোনো পরীক্ষার্থী নাই। কিংবা বলিতে হইবে, মন্ত্রীপুত্রের খাতা আদৌ পরীক্ষাগৃহের বাহিরে লইয়া যাওয়া হয় নাই। বিরোধীদলের কতিপয় সমর্থক সম্পূর্ণ বানোয়াট অভিযোগ তুলিয়া মিটিং-মিছিল করিয়া এই কুৎসা রটনা করিয়াছে। ইহা একজন মন্ত্রী, তাহার দল ও তাহার সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করিবার চক্রান্ত মাত্র। এছাড়া সরকারের আরেকটি কর্তব্য রহিয়াছে। মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে এই কীর্তিমান পুত্রের পিতাকে ডাকিয়া বলিতে হইবে, জনাব, ছেলে নকল করুক কিংবা না করুক, ইহা বিবেচ্য নহে, সে ধরা পড়িল কেন ? কেন কলঙ্ক রটিল ? কেন কেলেঙ্কারি হইয়া গেল ? যাহা করিবেন, আটঘাট বাঁধিয়া করিবেন।

উপসংহার

মন্ত্রীগণের উচিত স্কুল-কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রধান অতিথি হইয়া মহামূল্যবান ভাষণ দান এবং তাহাতে অসদুপায় অবলম্বনের অপকারিতা বিশদভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বর্ণনা করা। কেননা এই মন্ত্রীবর্গের হস্তেই তো দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যতের দায়িত্ব জনগণ ভালোবাসিয়া অর্পণ করিয়াছে।

ভবিষ্যদ্বাণী

রবার্ট ক্রসের চাইতেও কীর্তিমান এই বালক ভবিষ্যতে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী হইবে।

প্রতিবাদ

এই লেখা প্রকাশিত হইবার পরে অনিবার্যভাবে প্রতিবাদ আসিবে। কেননা প্রথমোক্ত রিপোর্ট ছাপা হইবার পরও বোর্ড কর্তৃপক্ষ প্রতিবাদ পাঠাইয়াছেন। প্রতিবাদ জানাইয়াছেন বোর্ডের চেয়্যারম্যান, দাউদকান্দি কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, কেন্দ্রসচিব ও দাউদকান্দি প্রেসক্লাব। তাহাদের মতে, উপরের খবরটি সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তাহা হইলে কমলাকান্তের এই এসএসসি ভাবনাও সম্পূর্ণ বানোয়াট ও ভিত্তিহীন এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কমলাকান্ত তাহা স্বীকার করিয়া লইতেছে। কারণ কমলাকান্ত যে অহিফেনসেবী, তাহা কে না জানে।

রহিম সাহেবের প্যাকেজ নাটক

রহিম সাহেব ছোটোখাটো কলাম লেখক। পত্রপত্রিকায় রাজনৈতিক কলাম লেখেন। তিনি সকালবেলা মাছের বাজারে গেছেন। মাছঅলা ডেকে বললো, স্যার, আস্‌সালামো আলায়কুম ওয়া রহমাতুল্লাহ। কেমন আছেন ? তিনি বিস্ময়বোধ করলেন। ঘটনা কী ? এতো দীর্ঘ সালাম! মাছঅলা ছয়টা সরপুঁটি মাছ পলিথিন ব্যাগে পুরে হাতে ধরিয়ে দিল, বললো, মাছগুলো এখনো মারা যায় নাই স্যার, এক্কেবারে তেলে ছাইড়া দিবেন, গরম তেলের মধ্যে সাঁতার কাটতে কাটতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবে।

মাছঅলার ভাবগতিক কিছু বোঝা যাচ্ছে না। বেশ বইয়ের ভাষায় কথা বলছে। রহিম সাহেব দাম দিতে গেলেন। মাছঅলা কিছুতেই দাম নেবে না। বললো, স্যার আপনি লেখক মানুষ, সকাল বেলায় আইছেন আমার দোকানে, আপনার কাছে দাম নিবো কী ? বিকালবেলায় স্যার আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

রহিম সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপারে ?

মাছঅলা একগাল হেসে বললো, ব্যবসার বিষয়ে স্যার। টেলিভিশনে একটা প্যাকেজ নাটক বানাতে চাই।

রহিম সাহেবের স্তম্ভিত হবার যোগাড়। মাছের ব্যবসায়ীরা ইদানীং প্যাকেজ নাটক বানাচ্ছে নাকি। তিনি বললেন, আমি তো টিভিও বুঝি না, নাটকও বুঝি না। আমার কাছে এসে কোনো লাভ নেই। তাড়াতাড়ি একটা ১০০ টাকার নোট ফেলে তিনি বিদায় হলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সেটা কী রকম ? রহিম সাহেব ভুরু কোঁচকালেন। রহিম সাহেবের ডিরেক্টর বন্ধু জনপ্রিয় টিভি নাটকের ভিডিও ক্যাসেট দেখতে বসে গেলো। তিনদিন পরে এসে বললো, তোমাকে কিছু উদাহরণ দিই। ধরো, একজন ডাক্তার। সে খুব নার্ভাস। সে প্রেমিকার বাড়িতে বেড়াতে এলো। দেখলো এক চশমা পরা কাজের বুয়া। ডাক্তার কাজের বুয়ার পায়ে পড়ে সালাম করলো।

রহিম সাহেব বললো, চালিয়ে যাও।

ডিরেক্টর বললো, একটা কাজের মেয়ে। সে সবসময় সেজেগুজে থাকে। সাজতে সাজতে সে বলে, আল্লাহতালা আমাদের রূপ দিয়েছেন সাজার জন্যে, আমাদের সাইজাগুইজা থাকন দরকার।

রহিম সাহেব বললেন, আর কিছু ?

বন্ধুটি বললো, একটা কাজের ছেলে। সে সারাক্ষণ ভিসিআর দেখে। দেখে আর বলে, ট্র্যাজেডি মামা।

রহিম সাহেব বললেন, খুবই রসালো তিনটি দৃশ্যের কথা তুমি বলেছো। লেখকের সেন্স অফ হিউমার খুবই ভালো। তবে, একটা কথা বলি, এই তিনটা দৃশ্যের মধ্যেই মধ্যবিত্তের একটা কমন অহমিকা কাজ করেছে। তা হলো—কাজের মেয়েরা সম্মানের পাত্র নয়, কাজের মেয়েদের সৌন্দর্য থাকতে নেই, কাজের লোকেরা মধ্যবিত্তের বিনোদনে শরিক হতে পারবে না। এমন একটা অমানবিক বিদ্রূপ তুমি আমাকে করতে বলো ? আমাকে যদি বিদ্রূপ করতে হয়, তাহলে আমি বিদ্রূপ করবো ক্ষমতা নিয়ে...।

রহিম সাহেবের কথা শেষ হবার আগেই বন্ধুটি তার মুখ চেপে ধরলো। খবরদার, জানো তো, দেশে বিশেষ ক্ষমতা আইন চালু আছে। ফরহাদ মজহার এখন কোথায়, জানো তো ?

তিন.

বন্ধুটি কদিন পরে আবার এলো। আমি সিদ্ধান্ত পাল্টেছি। হাসির নাটক আর নয়। প্রেমের নাটক করতে হবে। প্যাকেজ নাটক মানেই প্রেমের নাটক। একটা ছেলে আরেকটা মেয়ে। প্যাকেজ নাটকে ছেলেমেয়েদের একটাই কাজ থাকে, তা হলো প্রেম করা। আর বাবা-মায়েদের একমাত্র কাজ, ছেলেমেয়েদের বিয়ে নিয়ে চিন্তিত থাকা, প্রেমে বাধা দেয়া বা প্রেমে সহায়তা করা। তোমাকেও এই নাটকই লিখতে হবে।

রহিম সাহেব বললেন, ঠিক আছে, এসো, কাহিনীর সূত্রপাত করি। রংপুরের এক গ্রাম। কার্তিক মাস। চারদিকে অভাব। মংগা। নায়ক গরুগাড়ির গাড়োয়ান। নায়িকা কিষাণের মেয়ে। গান বাজছে—ওকি গাড়িয়াল ভাই।

বন্ধুটি তাকে থামিয়ে দিল। স্টপ। স্টপ।

সে বললো, প্রথম কথা হলো, বাংলাদেশের কোথাও অভাব নেই। দুই, রংপুরের গ্রামের অভাবীদের নিয়ে নাটক করলে আছে বিশেষ ক্ষমতা আইন। সেটা যদি পার হওয়াও যায়—তবু করা যাবে না। গ্রামের নাটকের স্পন্সর পাওয়া যায় না। গ্রামের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিকালবেলা বাসায় কলিংবেল। মাছঅলা এসে হাজির। স্যার, কিন্তু মনে করবেন না। ৬টা মাছ, ৬০ টাকা। ৪০ টাকা ফেরত পাবেন। স্যার, একটু বসি।

রহিম সাহেব তাকে নিয়ে বারান্দায় বসলেন।

মাছঅলা বললো, মাছের ব্যবসার খুব খারাপ সিজন যাচ্ছে। সিজন ভালো প্যাকেজ নাটকের। তাই স্যার ঠিক করলাম ব্যবসাটা পাল্টানো দরকার।

লেখক বললেন, স্টেডিয়ামে ফুটবল খেলা খুব জমেছে। আপনি এক কাজ করুন, আবাহনী-মোহামেডান খেলার দিনের সবগুলো টিকেট কিনে ফেলুন। তারপর তিনগুণ দামে বেচে দিন।

দুই

মাছঅলার অত্যাচার থেকে বাঁচা যায়। কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গ তো আর ত্যাগ করা যায় না। প্যাকেজ নাটক করলে প্রচুর লাভ এই মন্ত্র এখন অনেককেই এই ব্যবসায় নামাচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ প্রতিভাবান। টাকার গন্ধ পেয়ে রহিম সাহেবেরও মনে হলো—ভালোই তো জিনিসটা, খারাপ কী। একটু চেষ্টা করেই দেখা যাক না।

তিনি বললেন, আমি লিখবো। প্যাকেজ নাটক লিখবো। বিটিভির জন্য প্যাকেজ নাটক লিখবো। তবে শর্ত একটাই। আমি লিখবো আমার মতো। নাটকের নাম হবে ফ্যান্টাসি। এক নগরের নাম উৎকোচনগরী। সে-দেশে উৎকোচ ছাড়া কোনো কাজ হয় না। এক দম্পতি সে নগরে বেড়াতে গেলো। বাথরুমে ট্যাপ ছাড়লো, কিন্তু পানি পড়ে না। পরে বালতিতে একটা ডলার রাখলো। অমনি পানি পড়া শুরু করলো। এমনকি মৃত্যুর সময় আজরাইল এসে বললো, নগদ ছাড়ুন, নইলে জান কবচ করা যাবে না।

খুব জমজমাট ফ্যান্টাসি। নাটকটি লিখে ফেলে নিজের ওপরেই রহিম সাহেবের আস্থা গেলো বেড়ে। দারুণ তো।

পরের দিন এই স্ক্রিপ্ট তিনি দিলেন তার এক ডিরেক্টর বন্ধুর হাতে। পুরো নাটক পড়ে তারও উৎসাহ খুবই বেড়ে গেলো। সে টিভির এক প্রযোজককে ধরলো উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার জন্য। প্রযোজক সাহেব পুরো নাটক পড়ে আঁতকে উঠলেন। বললেন, ভাই, করেছেন কী ? দেশে ঘুষের রীতি আছে, এরকম একটা মিথ্যা কথা লেখক লিখলো কী করে ?

ডিরেক্টর বন্ধু জবাব দিলো, না, মানে, দেশে কোনো ঘুষ-দুর্নীতি নেই, সেটা তো সত্য কথা, কিন্তু এটা তো একটা ফ্যান্টাসি, নাটকের নামই তো ফ্যান্টাসি।

শোনেন, প্রযোজক বললেন, এই নাটক তিন-চার লাখ টাকা লগ্নী করে বানানোর পর প্রচারিত হবে না, আর যদি প্রচারিত হয় টিভির অন্তত সাতজনের চাকরি যাবে। এছাড়া নাট্যকার ও নির্দেশককে বিশেষ ক্ষমতা আইনে আটক করা হবে। ফরহাদ মজহারের মতো।

ডিরেক্টর বন্ধু হতোদ্যম হবার পাত্র নয়। সে রহিম সাহেবকে বললো, দোস্ত, নো পলিটিক্স। একটা নিরীহ ধরনের হাসির নাটক লেখো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

নাটক মানেই গ্রুপ নাটক। গ্রুপ নাটক স্পন্সর করবে কে ? নাটক হতে হবে শহরে। উত্তরার একটা বাড়িতে। প্রতি শিফট স্যুটিং পাঁচ হাজার টাকা ভাড়া। এখন যতো প্যাকেজ নাটক হচ্ছে, সব বাড়ির ডিজাইন এক। এমনকি বাড়ির বারান্দার রেলিঙের ডিজাইনও এক, দাবার ঘুঁটির মতো। গরিব মানুষের নাটক লিখবে না। নাটক লিখবে বড়লোকদের নিয়ে। বিশাল বড়লোক নায়ক-নায়িকা। নায়কের মা নেই, নায়িকা বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান।

রহিম সাহেব বললেন, এই তো কাহিনী হয়ে গেছে। নায়কের মা প্রেম করে নায়িকার বাবার সঙ্গে। নায়ক প্রেম করে নায়িকার সঙ্গে। সারা নাটক জুড়ে ঘুরেফিরে শুধু প্রেমের দৃশ্য। শিশুপার্কে দোলনায় বুড়োবুড়ি আইসক্রিম খাচ্ছে। অন্যদিকে ছোড়াছুড়ি বুড়িগঙ্গা নৌকায়। শুনলাম প্যাকেজ নাটকে হেলিকাপ্টার এসে গেছে। তরুণ-তরুণী হেলিকাপ্টারে প্রেম করছে, বুড়োবুড়ি জাহাজে প্রেম করছে। এরপর বুড়োবুড়ির বিয়ে হয়ে গেলো, তরুণ-তরুণীরও বিয়ে হয়ে গেলো। বিয়ের পরে জানাজানি হলো, ভাইবোনের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেছে। তখন নায়ক-নায়িকার সঙ্গে বাবা-মায়ের সংঘাত। কাদের এখন ডিভোর্স হবে ?

কেমন জমলো ?

বন্ধুটি বললো, কাহিনী ভালোই। তবে...রহিম সাহেব বললেন, তবে কী ? এরপরে মাইন্ড সেক্স জুড়ে দাও। প্যাকেজ নাটকে শুনেছি নায়িকাদের ব্লাউজের গলা বড়ো হতে চলেছে। দুটো বেড-সিন রাখো। বুড়োবুড়ির আর তরুণ-তরুণীর। তারপর উভয় নারীই প্রেগন্যান্ট। ডিভোর্স আর সম্ভব নয়। নাটকের নাম দাও 'কার পাপে'। আর দেখো নাট্যকার হিসেবে কোনো প্রতিষ্ঠিত লেখককে পাওয়া যায় কিনা। যেমন ধরো ইহমি। এই কাহিনীর উপযুক্ত নাট্যকার হবেন। ডিরেক্টর বন্ধুটি বললো, হ্যাঁ, বিটিভিতে কিয়ামত সে কিয়ামত তক বেনামে রিমেক হতে পারলে এটাও খাওয়ানো যাবে। মানি উইল ডু এভরিথিং পসিবল।

ডিরেক্টর বন্ধুটি সম্ভবত ইহমির বাড়ির দিকে ছুটলো।

রহিম সাহেব স্মৃতি আক্রান্ত হয়ে পড়লেন। এই বিটিভিতে একদিন এখানে নোঙর, ভাঙনের শব্দ শুনি, নির্জন সৈকতে, হাজার বছর ধরে, রক্তের আঙুরলতা, মুখরা রমণী বশীকরণ-এর মতো নাটক হয়েছে। সেই টেলিভিশনে পাবলিকে খাবে বলে এসব বটতলার গল্প নাটক হিসেবে দেখানো হচ্ছে, আর দর্শকরাও বিনা প্রতিবাদে সেসব দেখে যাচ্ছে কেন ? ঘটনা কী ?

চার.

শেষ পর্যন্ত রহিম সাহেবের আর প্যাকেজ নাটক লেখা হয় নাই। রহিম সাহেব এ নিয়ে আর চিন্তাভাবনা করেন নাই। মাছের বাজারে তিনি এখনো যান, কিন্তু ওই মাছঅলার সঙ্গে দেখা হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

অনেক দিন পরে হঠাৎ করে রাস্তায় সেই মাছঅলার সঙ্গে দেখা রহিম সাহেবের। মাছঅলা একগাল হেসে এসে হাত বাড়িয়ে দিলো। রহিম সাহেবের ডানহাত নিজের দু-হাতের মধ্যে নিয়ে বললো, ভাইজান (স্যার থেকে ভাইজানে এসেছে সম্বোধন), দোয়া করবেন, নাটক নামাইতেছি। স্ক্রিপ্ট পাইয়া গেছি। নগদ ৫০ হাজার টাকায় কিনলাম। নায়ক-নায়িকার খুব অভাব। ভাবছি নিজেই নায়ক হইয়া যাই। নিজে হিরো হইলে হিরোইন লাগবে ভালো। শমী, বিপাশা, মিমি—তিনজন নায়িকা। আমি নায়ক। দোয়া করবেন। চতুর্ভুজ প্রেমের গল্প। প্রথম সিনেই বিপাশা আমারে গোলাপ ফুল দিবে। জমজমাট অবস্থা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ফাটা ডিমে আর তা দিয়ে কী ফল পাবে

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৯৭
রচনাকাল : ১৯৯৬ সাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাঁর জন্য শোকগাথা

ভোররাতে ঘুম ভেঙে গেলো তাঁর। তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন, আধাগ্লাস পানি খেলেন।

এয়ারকনডিশনড ঘর। বাইরের পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন। ভিতরে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। ভাদ্রমাস শেষ হয়ে যাচ্ছে। শরৎকাল। বাইরে কি এখন শিউলি ফুটছে, ঝরে পড়ছে গাছের গোড়ায় ? চাঁদ উঠছে ?

তিনি ঘর ছেড়ে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়।

কী যে গরম! তালপাকা গরম!

আবহাওয়া কি চেঞ্জ হয়ে গেলো, এই বাংলাদেশে ? এসি ঘর থেকে এসি গাড়ি, এসি গাড়ি থেকে এসি ঘর; বাইরের বাংলাদেশটার আবহাওয়া কী, তাপমাত্রা কী, আর্দ্রতা কী, সেখানে শিউলি ফুল ফোটে কিনা, শিউলি ফুল ঝরে কিনা— তিনি কিছুই জানেন না।

বারান্দায়, মুহূর্ত কয়েক দাঁড়িয়ে থেকে তিনি কুলকুল করে ঘামতে লাগলেন। এতো গরম !

তিনি ঘরে ফিরলেন। নানা ভাবনায় তার আর ঘুম এলো না!

সকালবেলা অফিসে গিয়ে তিনি ডেকে পাঠালেন তার সেক্রেটারিকে। বললেন, 'বাংলাদেশে এখন শরৎকাল। এই ঋতুটা আমার খুব প্রিয়। আমি আর আমার ছোট বোন রোজ ভোরে ফুল কুড়োতে যেতাম। কোছা ভরে ফুল তুলতাম। শিউলি ফুল। ফ্রক ভিজে যেতো। বাসায় ফিরে সেই ফুল দিয়ে মালা গাঁথতে বসতাম। শিউলি ফুলের পাপড়ি, জানেন, খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। শুধু বোঁটাটা ঠিক থাকে। আচ্ছা বলুন তো, শিউলির বোঁটার রং কী ?'

'কমলা, ম্যাডাম'।

'আমাকে ম্যাডাম বলবেন না। আর শিউলির বোঁটার রং কমলা নয়। জাফরান। শুনুন, সারাদেশে প্রকৃতির কী রূপ, এ সম্পর্কে আমি একটা রিপোর্ট চাই। আজই দেবেন।'

দুপুরের পর সেক্রেটারি দেশের আবহাওয়ার রিপোর্ট দিয়ে গেলো। তিনি চশমা এঁটে চোখ বোলালেন।

পুলিশের রিপোর্ট, গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্ট। পরিবেশ অধিদপ্তরের রিপোর্ট। আবহাওয়া বিভাগের রিপোর্টে বলা হচ্ছে— দেশে চমৎকার আবহাওয়া বিরাজ করছে। শরতের কাশফুল নদীকূল ছেয়ে ফেলেছে। গাছে গাছে তাল। আকাশ স্বচ্ছ নীল। ভেসে বেড়াচ্ছে শাদা শাদা মেঘ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তিনি দেশের প্রকৃত রূপের স্বরূপ উপলব্ধি করে তৃপ্ত হলেন। শুধু একটা প্রশ্নের জবাব তিনি খুঁজে পেলেন না। তাহলে ভোরবেলা শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে তিনি ঘামছিলেন কেন ?

তিনি তাড়াতাড়ি দিনের পত্রপত্রিকাগুলোর দিকে তাকালেন। সব কাগজেই একটা রিপোর্ট আছে—প্রচণ্ড গরমে দেশবাসী অতিষ্ঠ। তিনি এই রিপোর্টের সঙ্গে অফিসিয়ালি প্রাপ্ত রিপোর্টের কোনো সঙ্গতি খুঁজে পেলেন না।

মনের মধ্যে একটা প্রশ্ন গলায় আটকে-থাকা মাছের কাঁটার মতো খুঁতখুঁত করতে লাগলো।

সেই রাতে তিনি একটা স্বপ্ন দেখলেন। তার নিহত ছোটভাই তার অফিসকক্ষে এসে বসে আছে।

তিনি তাকে বললেন, 'কী ব্যাপার তুমি ?'

'জি, আপা। তোমাকে দেখতে এলাম।'

'কেমন দেখলি ?'

'আপা, তুমি বদলে গেছো।'

'বলিস কী ?'

'হ্যাঁ, তুমি না রক্ত সহ্য করতে পারতে না ? লাল রঙ দেখলেও ভয় পেতে।'

'হ্যাঁ, এখনো পাই। সেই ভয়াবহ কালরাতের পর'— তিনি কাঁদতে লাগলেন।

'হ্যাঁ, আমি তো তাই জানতাম। তুমি রক্তপাত সহ্য করতে পারতে না। এ কারণে একবার তুমি ছাত্রলীগের রাজনীতি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে বন্ধ করে দিয়েছিলে।'

'হ্যাঁ, একজন ছাত্রলীগ কর্মী নিহত হবার পর।'

'তাহলে এখন দেশে এসব কী হচ্ছে। তুমি সহ্য করছো কী করে ?'

'কী সব ভাই ?'

'এই যে বগুড়ায় এতো কিছু ঘটলো।'

'ওতো ষড়যন্ত্র ভাই, রাজনৈতিক মদদে সংঘটিত ?'

'এই যে পাবর্ত্য এলাকায় ২৮ জন কাঠুরিয়া খুন হলো---'

'ওতো আমি চাইনি। কখনো চাই না।'

'এই যে ইডেন কলেজে ছাত্রী সংঘর্ষ হলো। আর বহিরাগত পুরুষরা গিয়ে হামলা করলো মেয়েদের ওপর। এধরনের দৃশ্য ঘটতে দেখলে, এর আগে, তুমি নিজেই অজ্ঞান হয়ে যেতে।'

'কী বলছিস তুই ? এটা কক্ষনো ঘটতে পারে না। তুই ভুল রিপোর্ট পেয়েছিস ?'

'তা পেয়ে থাকতে পারি, আপা, কারণ দেশের পরিস্থিতি জানার জন্য তোমার নিজস্ব চ্যানেল আছে। অফিসিয়াল পদ্ধতি আছে। আমার তা নেই। কিন্তু এ সত্ত্বেও তোমাকে আমার করুণা হচ্ছে আপা।'

'করুণা ? কেন ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'কারণ, তুমি এখন ক্ষমতার চার দেয়ালে বন্দি। আগে কোথাও কিছু ঘটে গেলে তুমি খবর পেতে বেসরকারি সোর্সে। জনগণের কাছ থেকে সরাসরি আসতো খবর। এখন খবর আসে ডিসি-এসপি, গোয়েন্দা সংস্থার হাত দিয়ে।'

'কিন্তু আমি তো সংবাদপত্রগুলো পড়ি।'

'সংবাদপত্রে সব খবর আসে দু-রঙে, হয় শাদা, নয়তো কালো। তুমি নিশ্চয়ই তোমার চিহ্নিত বিরোধী পত্রিকাগুলোকে বিশ্বাস করো না। আর ক্ষমতা এমনি এক কঠিন পাথরঘর যে, ওখানে থাকলে অপ্রিয় সত্য কথার উচ্চারণকে ষড়যন্ত্র আর চক্রান্ত মনে হয়।'

'তাহলে আমি কী করতে পারি?'

'তোমার কিছুই করার নেই। শুধু আমরা যারা তোমার থেকে দূরে আছি, তোমাকে করুণা করতে পারি। যে তুমি রক্ত দেখলে মূর্ছা যেতে, তাকে এখন প্রতিদিন দেখতে হচ্ছে অসংখ্য মানুষের রক্তক্ষরণের দৃশ্য, তোমার হাতে সেই রক্ত লেগে যাচ্ছে, আপা।'

'না।' তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। তাঁর ঘুম ভেঙে গেলো। এসি রুমে শুয়েও তিনি ঘামছেন। তিনি বাথরুমে গেলেন। সাবান দিয়ে হাত ধুলেন। তার মনে পড়ে গেলো শেক্সপিয়ারের সংলাপ। হাতে রক্তের গন্ধ, আরবের সব সুগন্ধী ঢেলেও তা ঢেকে রাখা যাচ্ছে না।

তিনি বারান্দায় এলেন। আকাশ ভেঙে বৃষ্টি হচ্ছে। বারান্দা জলে ভেসে যাচ্ছে। এসি রুমে শুয়ে তিনি এতক্ষণ সে-সবের কিছুই টের পাননি।

তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়তে গেলো।

প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের জন্ম-জন্মান্তরের আত্মীয়তা। মানুষের কান্না তাই প্রকৃতিই কেঁদে দেয়।

ভোরের কাগজ, সেপ্টেম্বর '১৯৯৬)

গনিমিয়ার দ্বিতীয় মূর্খতা

আমাদের অনুষ্ঠানে, এখন দেখা যাচ্ছে, অতিথি হয়ে গেলো বেশি। প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সব মিলিয়ে ৮ জন। কিছুদিন আগে অতিথির সঙ্কট ছিল। কিন্তু প্রতিমন্ত্রী প্রধান অতিথি হবেন বলে সানুগ্রহ সম্মতি দেবার সঙ্গে সঙ্গে অতিথির আধিক্য শুরু হয়ে গেলো। এখন কাকে রাখি, কাকে বাদ দেই।

আমরা আমাদের রূপনগর জেলা সদরে এক নাট্যোৎসব করছি। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে নাট্যদল আসছে। তারা আমাদের মঞ্চে নাটক করবে। মোট ১৭টি নাট্যদল। অবশ্য ঢাকার কোনো বড়ো নাট্যদলকে আমরা পাইনি। তাতে কিছু যায় আসে না। দেশের পুরাতন ঐতিহ্যবাহী জেলা সদরগুলো থেকে ১৭টি নাটকের গ্রুপ আসছে, সেটাই বা কম কী!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রূপনগর শহরের টাউন হলে উৎসবের আয়োজন। প্রধান অতিথি কাকে করা যায়, এই নিয়ে আমাদের ভাবতে হলো। আমরা ঠিক করলাম নাট্য প্রতিমন্ত্রীকে করবো। তিনি আমাদের পূর্বপরিচিত। নিজেও নাটক করেন। প্রতিমন্ত্রী আবুল কাশেমের সঙ্গে দেখা করলাম। তিনি সম্মতি দিলেন্। উদ্বোধনের দিন-তারিখ, সময়, সব নিজের এপয়েন্টমেন্ট ডায়রিতে লিখে নিলেন।

মিনিস্টার রাজি হবার সঙ্গে সঙ্গে একঝাঁক অতিথিকে প্রথম অনুষ্ঠানেই জায়গা দিতে হলো। সরকারি দলের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ বললেন, মিনিস্টার আসছে, আমাদেরকেও রাখেন। সরকারি দলের জেলা শাখার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, স্থানীয় দু-জন এমপি এবং জেলা প্রশাসক— প্রথম অনুষ্ঠানে সব মিলিয়ে অতিথি দাঁড়ালো ৮ জন। নিমন্ত্রণপত্রে এতোগুলো নাম ধরাই কী করে ? কিন্তু কী আর করা। স্থানীয় নেতাদের তো আর অসম্মান করা যায় না।

আমরা অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে লেগে গেলাম। জেলা প্রশাসনে সাজ সাজ রব পড়ে গেলো— হাজার হোক, মন্ত্রী আসছে।

কিন্তু অনুষ্ঠানের দুদিন আগে, ঢাকায় মন্ত্রী সাহেবের বাসায় গিয়ে আমাদের মাথায় হাত পড়লো। দুপুরবেলা মন্ত্রী মহোদয়ের সাক্ষাৎ মিললো না, কারণ ভাত খাবার পর তার কিছু বিশ্রাম দরকার। সন্ধ্যায় মিললো। তিনি বললেন, সরি ভাই, আপনাদের অনুষ্ঠানে তো যেতে পারছি না। ডিসি-অফিস থেকে ক্লিয়ারেন্স পাওয়া গেলো না। মন্ত্রীর কথা শুনে আমরা থ। মন্ত্রী ডিসি-অফিসকে ক্লিয়ারেন্স দেবে, না কি ডিসি-অফিস মন্ত্রীকে ক্লিয়ারেন্স দেবে ?

আমরা আমাদের জেলা শহরে ছুটে গেলাম। কী ব্যাপার ডিসি সাহেব ? ডিসি বললেন, মন্ত্রী সাহেব আমার কাছে জানতে চেয়েছেন, অনুষ্ঠান বড়ো না ছোট। আমি বলেছি, মফস্বলের নাট্যদলের নাটক, বুঝতেই পারছেন। তেমন বড়ো কিছু নয়।

আমাদের জেলা শহরেই একজন আছেন, সম্পর্কে মন্ত্রীর শ্যালক। আমরা তাকে গিয়ে ধরলাম। শ্যালক বাবু ফোন করলেন ঢাকায়, দুলাভাইয়ের কাছে। মন্ত্রী বললেন, না, রূপনগরে যাচ্ছি না তো, উদ্যোক্তরা তো পরে আর আমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নাই।

এটা কী বললেন মিনিস্টার সাহেব ? আমরা আবার গেলাম তার কাছে। তিনি আর সাক্ষাতের সময় দিতে পারলেন না। আমরা হতোদ্যম হয়ে পড়লাম। তাহলে মিনিস্টার আসছেন না ? ঠিক আছে, স্থানীয় এমপি, নেতৃবৃন্দ আর ডিসি সাহেব— এঁদের নিয়েই হোক উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের নির্ধারিত সময়ে ডিসি সাহেব এলেন, কিন্তু গাড়ি থেকে নামলেন না। বললেন, এমপি সাহেবরা কই ? এরপর তিনি গেলেন পাশের টেনিস ক্লাবে, বললেন, এমপি সাহেব এলে খবর দেবেন। এদিকে একজন এমপি এসে দেখলেন, অন্য কোনো অতিথি নেই। তিনি বললেন, ডিসি সাহেব কই। ডিসি সাহেবকে ডেকে আনা হলো। ততোক্ষণে এমপি সাহেব ঘটনাস্থল ত্যাগ করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ডিসি সাহেব হাত জোড় করলেন। আমি চাকরিজীবী, এতো বড়ো রিস্ক নিতে পারি না। মিনিস্টার স্যার আসেননি, এমপিরা আসেনি। আমাকে মাফ করুন। ডিসি সাহেবও চলে গেলেন।

আমাদের অনুষ্ঠানের মঞ্চ ফাঁকা পড়ে রইলো। কথা ছিল, ৮ জন অতিথি আজ উঠবেন এ মঞ্চে। কী আর করা, আমাদের শহরের প্রবীণ নাট্যকার অভিনেতা নিখিলেশ চক্রবর্তীকে দিয়েই আমরা আমাদের অনুষ্ঠানের উদ্বোধন ঘোষণা করলাম। লোকে তখন বলাবলি করতে লাগলো, গনিমিয়া কেন মূর্খের মতো কাজ করলো। এতো লোক থাকতে নাট্যোৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সে কেন একজন হাফমন্ত্রীকে প্রধান অতিথি করতে গেলো ?

ভোরের কাগজ, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

চার শিশি তেল

২১ বছর আগে বঙ্গবন্ধু নিহত হন। তার নাম রেডিও টিভি পাঠ্যপুস্তক থেকে নির্বাসিত হয়।

২১টি বছর।

এমন বহু লোক আছে যারা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর দল ক্ষমতায় ফিরে না আসা পর্যন্ত জুতা-স্যান্ডেল পরবেন না, ২১ বছর ধরে তারা তাদের সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে এসেছেন। তাদের কথা আমরা ইদানীং পত্রপত্রিকার মাধ্যমে জানতে পারছি, তাদের প্রতি নানারকম শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। আমরা সামান্য মানব, সাধ্য কী এমন কঠোর প্রতিজ্ঞা করি, সুতরাং এইসব সত্যসন্ধ মানুষের ধনুর্ভাঙা পণের প্রতি দূর থেকে শ্রদ্ধা জানাই।

আমাদের এই বিশেষ শ্রদ্ধার বিশেষ তালিকায় আরেকটি নাম যুক্ত করতে হবে। নামটি হলো শেখ হাসিনা।

তিনিও সম্ভবত প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, যতোদিন বঙ্গবন্ধুর দল ক্ষমতায় না আসবে, ততোদিন তিনি দামি শাড়ি পরবেন না। আজ বঙ্গবন্ধুর দল ক্ষমতায়। তিনি প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছেন, দামি শাড়ি পরতে আরম্ভ করেছেন।

শেখ হাসিনা যদি প্রতিদিন একটি করে নতুন শাড়ি পরেন (ধরা যাক), এক বছরে তার দরকার হবে ৩৬৫টি শাড়ি, তিনি যদি ৫ বছর ক্ষমতায় থাকেন (দোয়া করি ১০০ বছর থাকুন) তবে তার দরকার হবে ৩৬৫×৫=১৮২৫টি শাড়ি। অবশ্য দু-হাজার সাল লিপইয়ার হলে তার জন্য দরকার হবে ১৮২৬টি শাড়ি।

দুই.

ইংরেজ বণিকদের তুলাদণ্ড একবার রাজদণ্ডে পরিণত হয়েছিল, এদেশে ; ইতিহাসে লেখা আছে সে-কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাহলে ক্ষমতার একটা দণ্ড আছে, দণ্ড থাকে ?

আমার গৃহশিক্ষকের, ছোটবেলায় দেখেছি, একটা দণ্ড ছিল; আমরা বলতাম বেত। সেটাতে তিনি রোজ সকালে তেল মাখতেন আর সেটা রোদে শুকাতে দিতেন। সেই থেকে আমার ধারণা, দণ্ড মাত্রই খুব তেল পছন্দ করে। ক্ষমতার দণ্ডও করে।

কিন্তু ক্ষমতার দণ্ড কী তেল পছন্দ করে ?

একবার এক লোক তেল দেবে বলে এলো এ-রকম এক দণ্ড সমীপে। এসে দেখে বিশাল লাইন। সবাই তেল মাখছে। কেউ মাখছে খাঁটি ঘি, কেউ ডালডা। একজন এসেছে কলু, তার মাথা ভর্তি সর্ষের তেল, সেও ঠাঁই পেয়েছে লাইনে, অনেকক্ষণ পর সে দণ্ডের গায়ে খাঁটি সরিষার তেলই মাখলো। একজন এসেছে তিব্বতের কদুর তেল নিয়ে।

দণ্ড বললো, বাহ্, কদুর তেল, মাখো, মাখো, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে না পারলে ক্ষমতা চালাবো কী করে।

এই ভিড়ের মধ্যে, সেই লোকটি নিজেকে অবাঞ্ছিত ভেবে মন খারাপ করে ধীরে ধীরে চলে যেতে শুরু করলো। দণ্ড বললো, কী হে, তুমি চলে যাচ্ছো কেন ? তেল দেবে না ?

'শরমের কথা কী করে বলি, আমি যে এনেছি কেরোসিন তেল।'

'তাতে কী ?' দণ্ড জবাব দিলো, 'ক্ষমতার দণ্ড হলে কী তেল, ভালো না খারাপ, সরিষা না সয়াবিন, অতো দেখলে চলে না। তেল তেলই। এসো, এসো, মাখো।' কেরোসিনঅলাও হাত বাড়ালো।

বাকিরা বললো, 'ছি ছি, তাই বলে কেরোসিন। কোনো বাছবিচার নেই। তেল হলেই কি হলো নাকি ?'

দণ্ড বললো, 'এই, কী কথা হচ্ছে, কোনো কথা নয়।'

সবাই বললো, 'না না, বলছিলাম কী, কেরোসিন বড়ো ভালো তেল, বাতের ব্যথায় উপকারী।'

দণ্ড বললো, 'এতো কথার তো কোনো দরকার নেই। তেল দিচ্ছো, দাও। গুড়মুড়ি খাও।'

সবাই বললো, 'আজ্ঞে জি হুজুর, জি হুজুর। তেল দেওয়াতেই তো সুখ। আমার এই তেল দেওয়াতেই আনন্দ।'

তিন.

ভানু বন্দোপাধ্যায়ের কৌতুকে আছে— এক লোক নির্বাচনে দাঁড়াবে। স্বতন্ত্র।

তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, আপনি পার্লামেন্টে গিয়ে কী করবেন। সে উত্তর দিলো, কেন, হাত তুলবো ?

'কোন্‌দিকে হাত তুলবেন ? কখন হাত তুলবেন ?'

'যখন সবাই হাত তুলবে, যেদিকে হাত তুলবে, সেদিকে হাত তুলবো।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এবার উপনির্বাচনে বিএনপির নমিনেশন প্রার্থীদের জিজ্ঞেস করা হলো, পার্লামেন্টে গিয়ে কী করবেন ?

কেউ বললো, বক্তৃতা দেবো।

কেউ বললো, ফাইল চাপড়াবো।

কেউ বললো, প্রাণীদের নাম উচ্চারণ করবো।

এদের কেউই নমিনেশন লাভে সমর্থ হলো না।

একজন প্রশ্নের কী উত্তর দেবে বুঝে উঠলো না। ভয় পেয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরে এলো। তার বুক তখনো কাঁপছে। নার্ভাসনেসের রোগী।

তখন ইন্টারভিউয়ার বোর্ড বললো, ঠিক আছে, ঠিক আছে, যোগ্যপ্রার্থী পাওয়া গেছে। তাকে জোর করে ধরে এনে নমিনেশন দিয়ে দেওয়া হলো।

সে বললো, কী বলছেন, আমাকে ?

'হ্যাঁ, আপনাকেই। একমাত্র আপনিই ঠিক কাজটি করেছেন। আপনি ওয়াক আউট করেছেন। সুতরাং আপনিই বিএনপির এমপি হওয়ার জন্য যোগ্যতম প্রার্থী।'

চার.

এবার এসএসসি পরীক্ষায় একটা অঙ্ক প্রশ্নপত্রে থাকবে বলে শোনা যাচ্ছে। প্রশ্নটি হলো:

ছাত্রদলের ছেলেমেয়েরা রোজ ঢাকা শহরে ১০০টি গাড়ি ভাঙে। ৫ বছরে তারা মোট কতোটি গাড়ি ভাঙবে ?'

অঙ্কের উত্তর হবে, ১০০× ৩৬৫×৫=১,৮২,৫০০০টি। অর্থাৎ এক লাখ বিরাশি হাজার পাঁচশটি গাড়ি। দু-হাজার সাল লিপইয়ার হলে সেটা দাঁড়াবে এক লাখ বিরাশি হাজার ছয়শ'টি।

বাকিরা বলছে ঢাকা শহরে অতো গাড়ি নেই। সুতরাং, এ প্রশ্নের উত্তর হবে— ঢাকা শহরের সব গাড়ি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। ছাত্রদলের ছেলেমেয়েরা অচিরেই ভাঙার জন্য আর কোনো গাড়িই পাবে না।

না পাক। তখন তারা আকাশে বিমান ভাঙবে। নজরুল ইসলাম তো বলেই গেছেন,

'আমরা শক্তি আমরা বল
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান উর্ধ্বে বিমান ঝড় বাদল।'

(এ চার টুকরা লেখার উদ্দেশ্য কিন্তু তৈলমর্দন। তবে সবাই যখন এ-তেল ও-তেল দিচ্ছে, এ অধম লেখক তখন ব্যতিক্রমী হওয়ার আশায় কষ্ট করে শেয়ালের তেল জোগাড় করেছে।)

ভোরের কাগজ, ৬ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তিনটুকরা রঙ

একবার একদল ক্ষুদ্রপ্রাণী উন্মুক্ত আবেদন জানালো, 'আমরা অসহায়, আমাদের বাঁচান।' তখন, যাদের ছিল উদ্ধার করবার ক্ষমতা, তারা বললেন, 'কেন তোমরা অসহায় ?'

'কারণ, আমরা ক্ষুদ্র এবং আমরা জন্মান্ধ।'

'আহা', ক্ষমতাবানরা আফসোস করে উঠলেন, 'তাহলে বলো, তোমাদের জন্য আমরা কী করতে পারি ?'

'আমাদের দৃষ্টি দিন।'

'জন্মান্ধতা চিকিৎসার অযোগ্য।'

'তা ঠিক, কিন্তু জ্ঞান হলো আলো, যা দৃষ্টিহীনকেও দেয় দৃষ্টি, জন্মান্ধকেও দেয় দেখার ক্ষমতা।'

'তা বটে। জ্ঞান আহরণের জন্য তোমরা কী সুবিধা চাও ? কী করলে বিদ্যার আলোয় তোমাদের তৃতীয় নয়ন ফুটে উঠবে ?'

'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার দিন।'

'তথাস্তু।'

'আমাদের অবাধ বিচরণের ক্ষমতা দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরিতে আর ছাত্রছাত্রীদের পড়ার টেবিলে, বইয়ের র‍্যাকে।'

'তথাস্তু।'

দিন যায়। তারপর, যা ঘটবার তাই ঘটলো। দেখা গেলো, সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব বই কেটে ছাতু বানানো হয়েছে। একেবারে তুষ হয়ে গেছে সব বইপত্র।

ব্যাপার কী ?

এই পুস্তকপ্রেমিক ক্ষুদ্রপ্রাণীরা আর কেউ নয়, উঁইপোকা।

তখন চারদিকে রব উঠলো, এই উঁইপোকা ধ্বংস করতে হবে, সমূলে উৎখাত করতে হবে।

এই দাবিতে কোনো কাজ হলো না।

তখন বদলে গেলো ক্ষমতা। এলেন নতুন ক্ষমতাবান।

চারদিকে জন্ম নিলো আশাবাদ, এবার বুঝি উঁইপোকার দংশন থেকে মুক্তি পাবে বই-পুস্তকগুলো।

উঁইপোকারা প্রমাদ গুণলো। তাহলে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি ছেড়ে তাদের যেতে হবে ডাস্টবিনে, কাগজ টুকিয়ে খেতে ?

উঁইপোকাদের নেতারা বললো 'কদ্যপি নয়, আমরা অচিরেই ক্ষমতাসীনদের দলে যোগ দিতে যাচ্ছি। কেবল ক্ষমতার ক্ষমাই পারে আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুই.

একবার হলো কী, এক যুবক আশ্রয় নিলো এক গৃহস্থ বাটিতে অল্প কিছুদিনের জন্য। দিন ফুরিয়ে এলে যুবকটির প্রত্যাবর্তনের সময় এসে গেলো।

যুবকটি বললো গৃহকর্তাকে, জনাব, আমি আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাই।

গৃহকর্তা বললেন, সে কী, তুমি কি আমার মেয়ে সম্পর্কে সব কিছু জানো?

যুবকটি বললো, না।

'আগে সব শোনো। তারপর ভেবেচিন্তে বলো। আমার মেয়ে অন্ধ, আমার মেয়ে বধির আর আমার মেয়ে মূক। তার ওপর সে ভীষণ কুরূপাও বটে। এখন ভেবে বলো, তাকে কি তুমি বিয়ে করতে চাও।'

যুবকটি ভেবেটেবে সাফ জবাব দিলো, চাই। বিয়ের পর বাসর ঘরে গিয়ে যুবক দেখলো এক অপরূপা নারী, মৃদু মৃদু হাসছে।

যুবকটি ঘাবড়ে গেলো।

মেয়েটি মুখ খুললো। 'ঘাবড়িও না। আমার বাবা যা বলেছেন তার শানেনযুল আছে। আমি কোনোদিন চর্মচক্ষে কোনো পুরুষকে দেখিনি, তাই আমি অন্ধ। আমি কোনোদিন কোনো পুরুষের কণ্ঠস্বর শুনিনি, তাই আমি বধির আর আমার কণ্ঠস্বরও কোনোদিন কোনো পুরুষ শুনতে পায়নি, তাই আমি মূক।'

এই গল্প বলার সঙ্গে সঙ্গে একশ নারীবাদী গল্পের কথকের ওপর ক্ষিপ্ত আক্রমণ চালালো। কী, নারীদের গৃহে বন্দি করে রাখার সনাতন পুরুষবাদী মানসিকতা।

'না না। আমাকে খানিকক্ষণ বাঁচিয়ে রাখো আমি গল্পটা শেষ করি', বললো কথক।

'এই গল্পের মরালটা ওখানে নয়। আসলে আমি বলতে চাইছি, আমাদের দরকার একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, যিনি হবেন অন্ধ, বধির ও মূক।'

'তিনি অন্ধ হবেন, কারণ তিনি সন্ত্রাসী কোন্ দলের তা দেখতে যাবেন না; তিনি বধির হবেন কারণ তিনি সন্ত্রাসের পৃষ্ঠপোষকদের তদবির শুনতে যাবেন না এবং তিনি হবেন মূক, তিনি কথায় কথায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ী প্রেসনোট ও বিবৃতি উচ্চারণ করে বলবেন না, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে কিংবা উচ্ছৃঙ্খল জনতা মারমুখী হয়ে পড়লে পুলিশ আত্মরক্ষার্থে গুলি ছুড়েছে।'

তিন.

একবার ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট এরশাদ গেলেন বেগম জিয়ার কাছে। বললেন, বেগম, আপনাকে মাত্র একশ দু-টাকার বিনিময়ে দুটো বিশাল বাড়ি দান করা হয়েছে। এরপর আপনি আপনার ক্যান্টনমেন্টের বাড়ির সামনের দুটো বাড়ি জোর করে দখল করেছেন। এ খবর পেয়ে আমি খুব লজ্জিত হয়েছি। আপনার মতো একজন সম্মানিত মহিলার এরকম করাটা সাজে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বেগম জিয়া হেসে জবাব দিলেন, জনাব হুসেইন, আপনি জোর করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছেন, আমি জোর করে দুটো বাড়ি দখল করতে পারবো না ?

এর অনেকদিন পরের কথা। এরশাদের সঙ্গে আরেকবার কথা হলো বেগম জিয়ার। এরশাদ বললেন, ম্যাডাম আমি খুব শরমিন্দায় আছি, আপনি আপনার জন্মদিন নিয়ে এ কী করলেন, ক্ষমতা নেওয়ার পর বাসস-এর মাধ্যমে সব পত্রপত্রিকায় জানালেন, আপনার জন্মদিন ১৯ আগস্ট আর এখন জন্মদিন পালন করছেন ১৫ আগস্ট, ব্যাপার কী ?

বেগম জিয়া বললেন, দেখুন, আপনি এই সামান্য দিন-তারিখ নিয়ে শরম করছেন কেন, যদি আপনার শরম পেতেই হয়, তাহলে আপনার সন্তানলাভের ঘটনাটি মনে করলেই তো পারেন।

এরশাদ মিষ্টি হেসে ফিরে এলেন যেন কিছুই ঘটেনি।

ভোরের কাগজ, ৩০ আগস্ট ১৯৯৬

জাদুবাস্তবতার গল্প

একদেশে ছিল এক ভাব। আরেক দেশে ছিল এক মূর্তি। একদিন হলো কী, এই দুজন একত্রিত হলো। হয়ে গেলো ভাবমূর্তি।

ভাবমূর্তি সারাক্ষণ ভাব ধরে থাকেন।

লোকে বলে, বেশ, বেশ। আমাদের এদেশে ভাবের বড়ো অভাব। এরকম ভাবঅলা লোকই তো আমাদের চাই।

উৎসাহ পেয়ে তিনি, ভাবমূর্তি, আরো ভাব ধরেন। ভাব বজায় রাখার জন্য তাকে কতো কী করতে হয়। কীভাবে বসতে হবে, কীভাবে তাকাতে হবে, সব করতে হয় মেপে মেপে।

ওদিকে মূর্তিও কম যাবে কিসে। তিনি সারাক্ষণ থাকেন মূর্তির মতো। স্থির অবিচল।

না কোনো কথা নয়। মূর্তিরা কি কথা বলতে পারে ?

চারদিকে তখন ভাবমূর্তির জয়জয়কার।

এ আসে তার কাছে, এ আবেদন নিয়ে, ও নিবেদন নিয়ে।

ভাবমূর্তি ভাব ধরে মূর্তি হয়ে বসে থাকেন। কোনো কথা বলেন না; কোনো চাল চালেন না, কোনো ডাল ভাঙেন না।

ভাব ধরে বসে থাকা তেমন কঠিন কাজ নয়। কিন্তু মূর্তিগিরি সত্যিই কঠিন। নড়া যাবে না, চড়া যাবে না।

গায়ে মশা পড়লেও মারা যাবে না।

আর সবচেয়ে বড়ো কথা, কোনো কথা বলা যাবে না।

দিন যায়।

ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়, চারদিকে লোকে ধন্য ধন্য করতে থাকে। উজ্জ্বলতার ছটায় সবার চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার যোগাড়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লোকেরা উচ্চারণ করতে থাকে কতো প্রশংসাধ্বনি, কতো উচ্ছ্বাসপূর্ণ মন্তব্য।

এ হলো বুর্জোয়া সফিস্টিকেশন—কেউ বলে।

এ হলো হাইসোসাইটির ম্যানারিজম—অন্যরা তারিফ করে।

'খান্দান, খান্দান'—একজন শরিফ ব্যক্তি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

'নীরবতা হিরন্ময়'— একজন যুবক অফ কোটেশন দেখে জানায়।

যায় দিন ভালো, আসে দিন খারাপ।

একদিন কী হয়, ভাবমূর্তি কথা বলে ফেলেন। মাত্র একটি কথা। জীবনে মাত্র একবার মুখ খোলা।

ভাব ক্ষেপে যান। বলেন, ওরে মূর্তি, তুই হলি মূর্তি, তুই থাকবি নির্বাক, তুই কথা বলতে যাবি কেন ? মূর্তি কি কখনো কথা বলে ?

মূর্তি ভাবেন, একবার যখন কথা বলেই ফেলেছি, তখন আর চুপ করে থেকে কী লাভ। তিনি ভাবের গলা টিপে ধরেন, ওরে হতভাগা, কথা বলেছি তো কী হয়েছে ? তোর বাবার কী ?

তখন ভাবে আর মূর্তিতে শুরু হয় ভীষণ দ্বন্দ্ব।

ঘোরতর সংঘাত।

ভাব মারে মূর্তিকে, মূর্তি কিলায় ভাবকে। একই শরীর দুই সত্তা, তাদের কী যে মারামারি।

ভাব আর মূর্তিকে যে-শোকেসের মধ্যে রাখা হয়েছিল, সেটি থরথরিয়ে কাঁপতে থাকে। কী যে আওয়াজ হয়।

তারপর সংঘাত যখন তীব্রতম রূপ পায়, তখন শোকেস ফটাস করে ভেঙে যায়, ভাবমূর্তি ভেঙে পড়ে।

সেই ভাঙা ভাবমূর্তি পড়ে থাকে সদর রাস্তায়। লোকে দেখে আর ছি ছি করে।

বুদ্ধিমানরা বলেন, ভাবমূর্তি তো ভালোই ছিলেন, উনি হঠাৎ কথা বলতে গেলেন কেন ? কথা না বললেই তো আমরা তার মতো উজ্জ্বল নক্ষত্রকে হারাতাম না।

পাদটীকা

এটি একটি ম্যাজিক রিয়েলিস্টিক গল্প। ম্যাজিক রিয়েলিজম এসেছে প্রধানত ল্যাটিন আমেরিকা থেকে। তবে আমাদের দেশের রূপকথা-উপকথাতে যেসব উপাদান আছে, তা ম্যাজিক-রিয়েলিজমের বাপ। যেমন মানুষ পাথরের মূর্তি হয়, আবার প্রাণ ফিরে পায়। উপরের এই গল্প সংবাদপত্রের সাহিত্য পাতায় প্রকাশিত হয়। গল্পটি পড়ে পাঠকের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হয় না। কেবল একজন পাঠক পরামর্শ কলামে লেখেন— জাদুবাস্তবতার গল্প পড়লাম। এ নিয়ে আমার কোনো কথা নেই। আমার সমস্যাটি খুব বাস্তব। ভাবমূর্তি ভাঙে ভাঙুক, বিটিভির 'আজকের সংসদ' অনুষ্ঠানের কারণে আমার ঘরের টেলিভিশনের পরদা যে ভেঙে যায়! ওটা কেমনে বাঁচাই!

পত্রিকার উত্তরদাতা পত্রলেখককে আদব শিক্ষা পরামর্শ দেন।

ভোরের কাগজ, ৮ আগস্ট ১৯৯৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুয়োরানি ধুয়োরানি

এক ছিল রাজা, তার ছিল দুই রানি। দুয়োরানি আর ধুয়োরানি। তাদের ছিল অনেক কটা ছেলেমেয়ে।

রাজার হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া (তখনো ঘোড়াশালে সারকারখানা হয়নি), টাকশালে টাকা, আর ঘরভর্তি ছেলেপুলে।

তবু রাজার মনে শান্তি নেই। কেন নেই ?

কারণ, ওই যে, রানি দুজন। তারা কেউ কারো ভালো দেখতে পারে না। একজনের খারাপি দেখলে আরেকজন খুশি হয়। সারাক্ষণ একে অন্যের বিরুদ্ধে রাজার কানে বলে, রাজার কান রাত্রিবেলা কুটকুট করে, তিনি আর ঘুমুতে পারেন না। অশান্তি, অশান্তি।

শেষে রাজা দেখা করলেন রাজবদ্যির সঙ্গে। বললেন, কানদুটো বড়ো ঝালাপালা, আর মাথার ভিতরে যেন ছোট ছোট লাল পিঁপড়ে কামড়াকামড়ি করছে। কী করি বলো তো ?

রাজবদ্যি অভিজ্ঞ লোক। সব বুঝতে পারলেন। রাজার কানে তুলো ভরে দিলেন। যেন, মারো আর ধরো, পিঠে বেঁধেছি কুলো, আর বকো আর ঝকো, কানে দিয়েছি তুলো।

এরপর রাজার আর কোনো সমস্যা নেই। মাথার ভিতরে কুটকুট কামড় নেই। দারুণ ঘুম, ফি-রাতে।

এদিকে হলো কী, রাজপাচক ছুটিতে গেলো। এখন রাজপরিবারের জন্য রান্নাবাড়া করে কে ? রাজা আবার সবার হাতের রান্না খেতে পারেন না। ঠিক হলো, দুই রানি পালা করে রাঁধবেন। ইনি একদিন, তো উনি একদিন। প্রথমে ভার পড়লো দুয়োরানির ওপরে। রানি সবকিছু জোগাড়যন্ত্র করে রাঁধতে বসলেন। দুপুর হয়ে এলো। তরকারিটা চুলোয় চড়িয়ে যখন সব কাজ শেষ, তিনি গেলেন গোসল করতে। স্নান সেরে তিনি চুল বাঁধলেন। যে রাঁধে, সেই আবার চুল বাঁধে কি না। যাবার আগে, চামচের ডগায় একটুখানি ঝোল তুলে, দুবার ফুঁ দিয়ে ঠাণ্ডা করে তিনি জিভের আগায় ধরলেন। চেখে দেখা। উম্‌ম্‌ম্‌। দারুণ হয়েছে। রাজা আর ছেলেমেয়েরা আজ কতো মজা করেই না খাবে। আর সবাই তার নামে ধন্যধন্য করবে। মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে দুয়োরানি নাইতে গেলেন।

(বাঙলা ছায়াছবি হলে, এই দৃশ্যটা হবে এমন : পদ্মপুকুরে সখী পরিবৃত হয়ে দুয়োরানি জলকেলি করছেন। সখিরা গাইছে, হাঁটুজলে নেমে কন্যা হাঁটু মাজন করে। আর বিদেশী ছায়াছবি হলে, এ দৃশ্যটায় দেখানো হবে বাথটাব। ফেনা, ফেনা, ফেনা, রানির শরীর ফেনায় ডোবানো, শুধু মাথাটা বাইরে। আর আমাদের গল্পে এ ধরনের দৃশ্যের কোনো দরকার নেই।)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

এদিকে ধুয়োরানি করলেন কী, তিনি রান্নাঘরে গেলেন। হাঁড়ির ঢাকনা তুলে এক চামচ ঝোল নিয়ে মুখে পুরলেন। মুখপুড়ি তো সর্বনাশা রান্না করেছে। কী করা যায়, কী করা যায়।

আশেপাশে তাকিয়ে খুঁজলেন লবণের বয়াম। এক মুঠো লবণ তরকারিতে দিলেন ঢেলে। তারপর সবকিছু আগের মতো করে সাজিয়ে রেখে তিনি নিজের ঘরে গেলেন।

দুপুরে রাজা এলেন। ছেলেপুলেরা সব এলো। সবাই মিলে মাদুর বিছিয়ে খেতে বসলো। এক লোকমা ভাত মুখে তুলে রাজা স্থির হয়ে গেলেন। তারপর পাতের মধ্যেই পানি ঢেলে উঠে চলে গেলেন। বাচ্চাকাচ্চারাও কেউ ভাত মুখে দিতে পারলো না। ধুয়োরানির মুখ হাসি হাসি। তিনি বললেন, এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। রাজামশায়ের মুখে ভাত নেই, ছেলেপুলেদের মুখে ভাত নেই—এ কী দুর্যোগের ঘনঘটা। আমি ঘটনার তীব্র নিন্দা করি আর প্রতিবাদ জানাই।

তারপর এলো ধুয়োরানির রান্নার পালা। ধুয়োরানি খুব যত্ন করে রাঁধলেন। তরকারিটা রাঁধার সময় সব আনাজপাতি দিলেন, সব মশলা দিলেন, সবচেয়ে বড়ো কথা—দিলেন স্নেহ-মমতা-আন্তরিকতা।

শুধু লবণ দিলেন না ইচ্ছে করে। যতোটুকু লবণ তরকারির জন্য দরকার হবে, ততোটুকু বয়ামে রেখে বাকি সব লবণ ও অন্যান্য মশলা রাখলেন সরিয়ে। তারপর নাইতে গেলেন নিশ্চিন্ত মনে।

রাজা আর ছেলেমেয়েরা খেতে এলো। মাদুর বিছানো হলো। ভাত বাড়তে বাড়তে ধুয়োরানি বললেন, অতীতে আমরা ছেলেপুলেদের মুখে ভাত দিতে পারিনি। অযোগ্য লোকের হাতে ছিল রান্নার ভার। সে-কারণেই আমাদের অতীত গেছে ব্যর্থতায়। আজ আর কোনো চিন্তা নেই। বহু ঘণ্টা পর উপযুক্ত হাতে পড়েছে রান্নার ভার। ধুয়োরানি মনের আনন্দে সবার পাতে পাতে ভাত তুলে দিলেন। তার মনে ফন্দি, দুয়োরানি যদি হাঁড়ির লবণগুলো ঢেলে দিয়ে থাকে, তাহলে তো কোনো অসুবিধা নেই। তরকারি খুবই সুস্বাদু হয়েছে। আর যদি না-দিয়ে থাকে, সবার সামনেই তিনি হাঁড়িতে পরিমাণমতো লবণ যোগ করবেন। লবণ তো তার কাছে লুকানো আছেই।

তারপর সবার পাতে তরকারি ঢালতে গিয়ে ধুয়োরানির মুখ চুন হয়ে গেলো।

পাতে পাতে ঝোলের সঙ্গে আস্ত বুলেট। তরকারির হাঁড়িতে ঝোলের নিচে মুরগির রানের পাশে বেশ মিলেমিশে আছে বুলেট।

আসলে হয়েছে কী, ধুয়োরানি যখন নাইতে গেলেন, দুয়োরানি রান্নাঘরে ঢুকে প্রথমে ঝোল চেখে দেখেছিলেন। দেখলেন, লবণ দেওয়া হয়নি। বুঝলেন এ তরকারিতে লবণ দিয়ে কোনো লাভ নেই। তখন ভাবলেন, বাড়তি মরিচ দেবেন। কিন্তু ঘরে কোনো মরিচ নেই, হলুদ নেই, আদা নেই, তেল নেই।

দুয়োরানির মাথা গেলো খারাপ হয়ে। তিনি তাড়াতাড়ি করে নিজের ঘরে এলেন। দ্বাররক্ষীকে বললেন, বুলেট দাও। তারপর রেগেমেগে সব বুলেট এনে ঢেলে দিলেন তরকারির হাঁড়িতে। এখন রাজা আর ছেলেপুলেদের পাতে পাতে বুলেট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রাজা পাতের মধ্যেই পানি ঢেলে রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে চলে গেলেন। ছেলেপুলেগুলোও উপোস করে রইলো। খেতে পারলো না।

দুয়োরানির মুখ হাসি হাসি। তিনি বললেন, ভারি অন্যায় ভারি অন্যায়। খাবারের সঙ্গে বুলেট দেওয়া খুব খারাপ। আরে, বন্দুকের মশলা দিয়ে কেউ তরকারি রাঁধে নাকি।

বিশেষ করে, এইসব কোমলমতী ছেলেপুলের পাতে বুলেট তুলে দেয়া খুব অন্যায়, ভারি অন্যায়। আমি প্রতিবাদ করছি, তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছি।

ধুয়োরানি গম্ভীর। তার ভীষণ কান্না আসছে। তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, কাল এর প্রতিশোধ নেবেন। কাল যখন দুয়োরানি রাঁধবে, তিনি তাতে ধুতুরার বিষ মিশিয়ে দেবেন। দু-চারটি ছেলে মরলে তখন রাজার হুঁশ হবে। দুয়োরানির বিরুদ্ধে একটা বিহিত ব্যবস্থা হবে।

ভোরে কাগজ, ২২ আগস্ট ১৯৯৬

ঢাকাই ফ্যান্টাসি

নভোযান স্পুটনিক-১১৯ মেঘের মধ্যদিয়ে ছুটে চলেছে। এই মেঘ পৃথিবীর মেঘ নয়, সৌরজগতের নয়, অন্য এক ছায়াপথের মেঘ। ঘন সবুজ। কলাপাতার মতো।

মোহাম্মদ হানিফ মনে মনে বললেন, আমি ভালোবাসি মেঘ। চলিষ্ণু মেঘ, ঐ উঁচুতে। আমি ভালোবাসি আশ্চর্য মেঘদল।

নভোযানটি একটা অচেনা গ্রহে অবতরণ করলো। রানওয়েটা মোটেও মসৃণ নয়। বড়ো বড়ো খানাখন্দকের উপরে নেমে পড়েছে স্পুটনিক-১১৯। এই পাথরখণ্ডে ধাক্কা তো ঐ অতল গহ্বরে পতনের ঝাক্কি। ঝাঁকি খেতে খেতে মোহাম্মদ হানিফের কোমরের হাড় ভেঙে যাওয়ার যোগাড়। সিটবেল্ট বাঁধা থাকা সত্ত্বেও তিনি একেকবার ছিটকে উঠছেন নভোযানের ছাদ পর্যন্ত। ঘাড় বেঁকে গিয়ে বোধহয় ভিতরে মুড়মুড় শব্দ হচ্ছে।

মোহাম্মদ হানিফ চিৎকার করে উঠলেন, কোথায় আমরা এসে পড়লাম। এই বন্ধুর দুর্গম শিলাপাহাড়-খানাখন্দকময় গ্রহটি কোন্ নক্ষত্রলোকের ?

স্যার, এইটা রামপুরা স্যার।

ড্রাইভারের কথায় হানিফ সাহেবের ঘুম ভেঙে গেলো। এয়ারকন্ডিশনড ফোর-হুইল-ড্রাইভ গাড়িতে উঠে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

রামপুরার রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকে খানিকক্ষণ তিনি বুঝে উঠতে পারছিলেন না, এ সত্যি সত্যি কোনো দুর্গম গ্রহপথ কি না। বিশাল এক গর্তে গাড়ির সামনের চাকা হড়কে পড়ে গেলো। এক বাস্তবিক ঝাঁকি খেয়ে অতঃপর তিনি হুঁশ ফিরে পেলেন। কী অবস্থা হয়েছে ঢাকায় রাস্তার। ঘুম ভেঙে যাওয়ায় তার মেজাজ খানিকটা ক্ষিপ্ত। তিনি বললেন, আবুল কাশেম, এ তুমি কোথায় নিয়ে এলে। রাস্তা ছেড়ে খালবিলে চলে এসেছো কেন ? আমার ঘুমটা ভেঙে দিলে। স্বপ্নটা গুড়িয়ে দিলে !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ঢাকার সবচেয়ে ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত মোহাম্মদ হানিফের এক হাজারটা গুণ, তবে দোষ একটাই—তিনি একটু আয়েশি। ড্রাইভার আবুল কাশেম তাই-ই মনে করে। স্যারের দিবানিদ্রাটা নষ্ট করা তার উচিত হয়নি। কিন্তু সেই বা কী করবে। কোন্ পথে নেবে ? ঢাকায় কোন্ রাস্তাটা আছে, যেখানে গেলে আছাড় খেতে হবে না ? গুলিস্তান থেকে বঙ্গভবনের দিকে গেলে গাড়ির সব স্ক্রু-নাট-বোল্ট খুলে ঝুরঝুর করে পড়ে যাবে। খোদ মতিঝিলের রাস্তাই গর্তে গর্তে একাকার। কাকরাইল, শান্তিনগরে গলা পানি। ওখানে অবশ্য নৌকা চালানো যায়। নৌকা মজার যান, ঝাঁকি লাগবে না। গলা ছেড়ে গান গাওয়া যাবে।

মনমাঝি তোর বৈঠা নে রে
আমি আর বাইতে পারলাম না।

আবুল কাশেম একটু গুনগুন করে গানটা গেয়েই ফেললো।

মোহাম্মদ হানিফ তা শুনে ফেললেন। তার মন উদাস হয়ে পড়লো। বড়ো মারেফতি গান। মনমাঝি তোর বৈঠা নে রে আমি আর বাইতে পারলাম না। আজ কদিন থেকে তার নিজেরও মনে হচ্ছে, তিনি বড়ো ক্লান্ত। এই নৌকার হাল ছেড়ে দিতে পারলেই বাঁচেন। মনে হয় নেত্রীকে গিয়ে বলেন :

আমি সারাজীবন বাইলাম তরী
ঘাটের নাগাল পাইলাম না,
আমি আর বাইতে পারলাম না।

ঘাট মানে কী ?

এক জীবনে একজন মাঝি কতো ঘাটেই না যায়। আর তিনি ?

কথা ছিল, তার দল নির্বাচনে জিতলে এবং ক্ষমতায় যেতে পারলে তিনি হবেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী। কই, সেই ঘাটের দেখা তো মিললো না। বর্তমান এলজিআরডি মিনিস্টার যদি পরে রাষ্ট্রপতি হতেন, তবুও না হয় একটা আশা ছিল। অথচ ঢাকায় আটটা সিটের সাতটাতেই তার দল জিতেছে। এমনকি তিনি দেশের যেসব এলাকায় ভোট চাইতে গিয়েছিলেন, কোথাও তার দল হারেনি।

চিনি চেয়েছিলেন ঢাকা থেকে চারজন মন্ত্রী নেয়া হোক। দরাদরি করে সেটা নামল তিনে। বাস্তবে ঢাকার একজন এমপিও মন্ত্রী হলো না।

আর আছে ঢাকাবাসীকে দেওয়া তার অঙ্গীকারগুলো। ঢাকার সব রাস্তা হয়ে পড়েছে কবরখানা। কোথাও গর্ত, কোথাও উঁচু, কোথাও বা কাঁচা কাদা, কোথাও পাকা ইটসুরকি। পুরোটা রাস্তা কার্পেটিং করা দরকার। সরকার যদি সেটা শুরু করতো, তাও তো লোকে বুঝতো কাজ হচ্ছে। কে যাবে এসব কাজের উদ্যোগ নিতে। আমার কী দায় পড়েছে নেত্রীকে এতো কথা বোঝাবার। তিনি উদাস ভঙ্গিতে জানালা দিয়ে তাকিয়ে রইলেন।

একটা নাট্যদল আয়োজিত 'যেমন খুশি সাজো' অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে যাচ্ছেন তিনি। এমন একটা মহৎ অনুষ্ঠানে যাওয়ার আগে এতো কিছু ভাবা তার পক্ষে সঙ্গত নয়। তার চোখ আবার হয়ে উঠলো ঘুমঘুম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

উত্তরার এক মাঠে অনুষ্ঠান। পৌঁছামাত্রই হৈচৈ পড়ে গেল। একদল ছেলেমেয়ে নাটকের রঙিন সাজে সেজে নৃত্য করছে, মিউজিক হচ্ছে। মন ভালো হয়ে গেলো হানিফ সাহেবের।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শুরুতেই আছে এক দশক পূর্তি উৎসব লেখা ব্যানার আকাশে ওড়ানো। দশটা বেলুন এক জায়গায় করে তার সঙ্গে রঙিন ঝালর যুক্ত ব্যানার বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

মোহাম্মদ হানিফ সেই দশটি বেলুন ছেড়ে দিলেন। সেসব ধীরে ধীরে উঁচুতে উঠতে লাগলো।

মোহাম্মদ হানিফ সেসবের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আকাশে শাদা মেঘ। তার দুচোখ পানিতে ভরে এলো অকারণে।

তার মনে হতে লাগলো, কেন তাকে নতুন জাতীয় সংসদের উদ্বোধনী অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানানো হলো না।

বেলুনগুলো উড়ে যাচ্ছে। রঙিন বেলুন। যেন উড়ে যাচ্ছে একেকটি ফানুস। তার স্বপ্নের ফানুস। ডিএমপি তার অধীনে নেওয়া। এলজিআরডি মন্ত্রণালয়। ঢাকা থেকে মন্ত্রী নিয়োগ। ঢাকার অর্ধশত সার্ভিস-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়। বসবাসের অযোগ্য একটা শহরকে বাসযোগ্য করে তোলা।

ধীরে ধীরে স্বপ্নের ফানুসগুলো আকাশে অদৃশ্য হয়ে গেলো। তার মনে হলো, তিনি নিজেই এখন একটা রঙিন ফানুস মাত্র।

মাথায় রঙিন টুপি চাপিয়ে নাট্যকর্মীদের বর্ণাঢ্য র‍্যালিতে তিনি মিশে গেলেন।

ভোরের কাগজ, ৩ আগস্ট ১৯৯৬

ক্রসকানেক্শন

সেদিন হঠাৎ টেলিফোনে ক্রসকানেক্শন হয়ে গেলো। ভানু বন্দোপাধ্যায় হলে বলতেন, ক্রস হয় নাই, ক্রস হইয়াই আছে।

দুপুরবেলা। বাইরে রিমঝিম বৃষ্টি হচ্ছে। এর মধ্যে টেলিফোনের অপর পারে দুজন কথা বলছে। দুই মানব-মানবী। পুরুষকণ্ঠ বলছে, আহহ। এমন দিন। বড়ো একা লাগছে।

'আমারও', নারী কণ্ঠে দীর্ঘশ্বাস।

'বাসায় কে আছে, ফাঁকা হলে বলুন, চলে আসি।'

'না, ফাঁকা না। ফাঁকা হলেই বা কী ।'

'চারটা দেয়াল আর একটা ছাদ। ফাঁকা। আমরা দুজন। এই তো যথেষ্ট। আর কী-ই বা হবার আছে। দুজনে। নারীতে-পুরুষে।'

'বদমাশ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'কেন, বদমাশ কেন ?'

'কী সব বলছো।

'না কী আর বলবো! আর আমি যে বলছি তা তো নয়, আমাকে দিয়ে বলিয়ে নিচ্ছে প্রকৃতি। এমন বৃষ্টি।'

'তুমি কি কবি নাকি।'

'হ্যাঁ, একটা কবিতার লাইন বলি, শুনবেন ?'

'বলো।'

লোকটি আবৃত্তি করতে লাগলো 'কনকপ্রদীপ জ্বালো'...

টেলিফোনের অপর পারে আমি, নিতান্ত অনুপ্রবেশকারী, অনাহূত, অবাঞ্ছিত শ্রোতা। আমার মনে হলো, এ কবিতা যেন কোথায় শুনেছি।

'খুব ভালো লেখো তুমি।' মহিলার কণ্ঠে উচ্ছ্বাস।

'হ্যাঁ। সৈয়দ আলী আহসানও খুব ভালো লেখেন।'

বলে কী ব্যাটা। আমি মাথা চুলকোই। কিন্তু এরশাদের কণ্ঠের সঙ্গে তো কণ্ঠস্বর মিলছে না।

ভদ্রলোকে নিজেই এবার ঝেড়ে কাশলেন, এরশাদের কবিতা থেকে আবৃত্তি করলাম, ভাবি, এমন প্রেমিক-কবি এ ত্রিভুবনে আর কোথায় পাবেন।

'যাও, একটা লম্পট।'

'লম্পট কাকে বলছেন! প্রেমিক প্রেমিক। সেজন্যই তো বলছিলাম জান, চলে এসো। তোমার বাসা তো কোনোদিনই ফাঁকা হবে না, আমি না হয় একটা রুমটুম জোগাড় করি।'

'চড় খাবে কিন্তু। আবার তুমি তুমি করা হচ্ছে। আপনি বলো।'

'জি ভাবি। নির্জনে নিরালায় আপনার চড় খেতে চাই। উনিও খেতেন।'

'উনিটি কে ?'

'এই যে-প্রেমিক কবির কথা হচ্ছিল। এরশাদের পতনের পর সাপ্তাহিক আনন্দপত্র আর দৈনিক মিল্লাতে এসব মর্ষকামকাহিনীর এক্স রেটেড বর্ণনা ছাপা হতো, পড়েননি।'

'বাজে বকো না। এই কেমন টিটিট শব্দ হচ্ছে। ক্রস হয়নি তো।'

'মনে হয় গোয়েন্দা সংস্থা। টেলিফোনে রেকর্ডার লাগিয়ে রেখেছে।'

'কী বলছো ? রাখি। তুতুলের স্কুল থেকে ফেরার সময়ও হয়ে আসছে।'

'হা-হা-হা। রসিকতা করলাম ভাবি। শুনুন, আজকে একটা স্ট্রেট প্রোপোজাল দেবার জন্য ফোন করেছি। সব দ্বিধা-সংকোচ ঝেড়ে ফেলে তুমি চলে এসো আমার আলিঙ্গনপাশে, দেখবে একদিন না একদিন তুমি এর পুরস্কার পাবে।'

'কী পুরস্কার ?'

'তুমি এমপি হবে। এখন এদেশের সব সংসারত্যাগী প্রেমিক-প্রেমিকার জন্য আছে একটাই মোক্ষ, এমপি পদ। সংরক্ষিত পদগুলোতে।'

'কী বলছো তুমি। ছি ছি ছি। এ যে লাম্পট্য।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'লাম্পট্য বলো না। চারদিকে চলছে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।'

আর চুপচাপ শুনে যাওয়া গেলো না। কথা বলে ফেললাম। বললাম, 'ভাই ও ভাবিগণ, এটা গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ নয়, লাম্পট্যের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ।'

মহিলা ঝপ করে ফোন রেখে দিলেন।

'টেলিফোনে এবার রইলাম দুইজন। আমি আর ভদ্রলোক। তিনি বললেন, 'কী ভাই, আছেন?'

বললাম, 'আছি।'

তিনি বললেন, 'এতো ক্ষেপে আছেন কেন ভাই?'

বললাম, 'ক্ষেপে নেই তো, দুঃখে আছি। আওয়ামী লীগের একশ ছেচল্লিশ এমপির ওপরই তো পড়লো সবিতা ইসলাম, জিনাত মুশাররফ কি হুসেইনের নির্বাচনের দায়।

ওঁরাই তো তাদের নির্বাচিত করলেন। আওয়ামী লীগ কি পারতো না জাতীয় পার্টিকে বলতে, দু-নম্বরি রাখেন, ভালো হয়ে যান, জেনুইন তিনজন মহিলাকে নমিনেশন দেন। আওয়ামী লীগ প্রেশার দিলে জাতীয় পার্টি সেটা শুনতো না?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আপনি তো রাজনীতির কথা বলছেন। রাজনীতি আবার আমি বুঝি না।'

বললাম, 'ঠিক আছে। যা বোঝেন, তা তো কম বোঝেন না। দৈনিক ইত্তেফাকে একজন মাহমুদ সাহেবের বিবৃতি ছাপা হয়েছে, পড়েছেন? তিনি বলেছেন, সবিতা মাহমুদের নামের সঙ্গে মাহমুদ লেখার কোনো কারণ নেই, কারণ তিনি তাকে ইতিমধ্যেই ডিভোর্স দিয়েছেন, ছাড়াছাড়ি অনেক আগেই হয়ে গেছে।'

'তাই নাকি?'

'আর জিনাত হুসেইন নামে একজনের পক্ষে এরশাদের জন্মদিনে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল, জানেন না?'

'জানি কিংবা জানি না। শোনেন,' ভদ্রলোক হাসতে হাসতে বললেন, 'দি ওয়ার্ল্ড লাভস দি লাভার্স। সারা দুনিয়া প্রেমিক-প্রেমিকাদের ভালোবাসে, তাদের সমর্থন করে। আর আওয়ামী লীগ করবে না?'

খুব রাগ হলো কথা শুনে। বললাম, জাতীয় পার্টি যখন সংসদ দখল করেছিল, তখন তো একদিনও বলেনি ইনডেমনিটি বাতিল করে দিচ্ছি বা শেখ মুজিবকে জাতির জনক বলছি। আর কাকে বলছেন প্রেম। ওতো স্রেফ লাম্পট্য।

'আহা। এখন তো জাতীয় ঐকমত্য'—ভদ্রলোক বললেন, শুনুন, তিনি কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'লাম্পট্য বলে কিছু নেই। আমাদের ইতিহাসের দিকে তাকান। এই বঙ্গভূমিতে সবচেয়ে আলোচিত-নন্দিত প্রেমকাহিনী কোন্‌টা? রাধাকৃষ্ণ। রাধাতো কৃষ্ণের সম্পর্কে মামী ছিলেন। কিংবা ধরুন ইউসুফ-জুলেখার কথা। জুলেখাও অন্যের বউ ছিলেন, বাইবেল খুলে দেখাতে পারি। কিংবা সেলিম-আনারকলি। আনারকলি তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ছিলেন স্রেফ বাইজি। অর্থাৎ কিনা পতিতা। লাম্পট্যের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এ বিশ্বে বহু আগেই হয়ে আছে। ওটাকে স্রেফ ভালোবাসা হিসেবে দেখলেই হয়। তাহলে দেখবেন, চারদিকে তাজমহল গড়ে উঠবে।'

'হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। মানিক মিয়া এভিন্যুর পাশে বড়ো একটা তাজমহল বানায়া রাখছে।'

টেলিফোন রেখে দিলাম। ক্রসকানেক্শনের কারণে জরুরি টেলিফোনালাপ সারা হলো না। মনকে সান্ত্বনা দিলাম, তুমি তো একটা ব্যক্তি, তোমার যে ক্ষতি হলো তা ব্যক্তিগত। কিন্তু জতীয় সংসদে যে ক্রসকানেক্শন লেগে গেলো, তার কী হবে।

ভোরের কাগজ, ১২ জুলাই ১৯৯৬

হামেদা বেগমের ভিত্তি

এমএম কলেজ আমাদের এলাকার নামকরা কলেজ। ১৯১০ সালে এই কলেজের প্রতিষ্ঠা। কলেজটি এখনো বেসরকারি। কারণ এর পরিচালনা কমিটি কখনোই চাননি এটি সরকারি হোক। তাদের এক কথা—সরকারি কলেজে কি লেখাপড়া হয় নাকি? শিক্ষকরা সরকারের ইচ্ছেমতো বদলি হয়ে আসবেন, যাবেন—কেমন পড়ান, না পড়ান—কোনো বাছবিচার থাকবে না। সবচেয়ে বড়ো কথা, অতো অল্প বেতনে শিক্ষকরা পড়াবেনই বা কেন? এই কলেজে শিক্ষদের বেতন দেওয়া হয় বেশি, ছাত্রদের যত্ন করা হয় নিজপুত্রের মতো—ফলে প্রতিবছর কলেজের রেজাল্টও হয় খুব ভালো। সব ছাত্র ফার্স্ট ডিভিশন তো পায়ই, বোর্ডের পরীক্ষায় স্ট্যান্ডও করে বহু ছেলে, ফিবছরই।

কলেজের অধ্যক্ষ কাদের সাহেব কলেজ কম্পাউন্ডেই থাকেন। তার স্ত্রী-পুত্র-কন্যারাও তার সঙ্গে থাকেন। কাদের সাহেব জ্ঞানী লোক, গুণী লোক, পরিশ্রমী লোক, ফিজিক্সে ডক্টরেট ডিগ্রিধারী তার স্ত্রী হামেদা বেগম লেখাপড়াটা তেমন করেননি। কেউ বলে মেট্রিক পাস, কেউ বলে নন-মেট্রিক। হামেদা বেগম একান্তই অন্তঃপুরবাসিনী; ঘর-সংসার, রান্নাবান্নার বাইরে তাকে খুব একটা দেখা যায় না।

কলেজে একজন পিয়ন আছে আইএসসি পাস। তার দিকে তাকিয়ে অনেক শিক্ষকই দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্ররা তারচেয়ে বয়সেও ছোট, শিক্ষাগত যোগ্যতাতেও ছোট। তবু পিয়ন বলে তাকে মাথানিচু করেই থাকতে হয়। আবার কলেজে একজন অফিস সহকারি এলেন এমএ পাস। অফিস সহকারি মানে কেরানি। সাকুল্যে দু-হাজার টাকা বেতন। তখনো অনেকেই মাথা চুলকালো। আহা বেচারা! কলেজে আইএসসি পাস ডেমোনেস্ট্রেটর আছে, আর শিক্ষকদের সমান যোগ্যতা নিয়ে লোকটা কিনা এলো কেরানি হয়ে, সবই অদৃষ্ট।

একবার হলো কী—কলেজের মজাদার নাগেশ্বর মারা গেলো। তার বৌটা এলো কাঁদতে কাঁদতে। ছেলেমেয়ে নিয়ে কি উপোস করে মরবে? মেথরের এই পদটিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

যেন তাকেই নিয়োগ দেওয়া হয়। ম্যানেজিং বডি ব্যাপারটা পর্যালোচনা করে দেখলো। ঘর ঝাড় দেওয়া আর বাথরুম পরিষ্কারের কাজ। নাগেশ্বরের বিধবা বৌ শ্যামা তা খুব ভালো করে পারবে। সে চাকরি পেয়ে গেলো। খামে-পোরা অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার গেলো তার কাছে। মাস শেষে টিপসই দিয়ে সে মাহিনা তোলে।

কলেজের পিয়ন শামসু মিয়া মারা গেলো এক্সিডেন্টে। কলেজের কাজেই শহরে গিয়েছিল শামসু, সাইকেল নিয়ে, পিছন দিক থেকে একটা ট্রাক এসে চাপা দিয়ে গেলো। সারা শহরে শোকের ছায়া পড়ে গেলো। ছোট্ট শহরে এসব ঘটনা খুব সাড়া ফেলে। এই ঘটনাও ফেললো। কলেজ ছুটি দেওয়া হলো একদিনের জন্য। শামসুর জন্য শোকসভা বসলো। সামসুর বৌ রোকেয়া বেগম সভায় কাঁদতে কাঁদতে বলল— দুটো নাবালক ছেলেমেয়ে, এদের নিয়ে এখন সে কী করবে ? আত্মহত্যা করা ছাড়া তো কোনো পথ নেই। সভায় গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান তাকে জিজ্ঞেস করলেন সে কী পাস। রোকেয়া বললো, ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়েছে সে। ঠিক আছে, দেখা যাক, তোমার জন্য কী করা যায়—চেয়ারম্যান বললেন।

রোকেয়ারও চাকরি হয়ে গেলো। দপ্তরীর চাকরি। রোকেয়া এখন ভাঁজ করে শাড়ি পরে পায়ে স্যান্ডেল দিয়ে কলেজ-অফিসে আসে।

এসব নিয়োগে কলেজের সুনাম আরো বেড়ে গেলো। কলেজ কমিটির আচার-আচরণে মানবিক দায়িত্বরোধের পরিচয় মিলছে— শহরবাসী তার প্রশংসায়, বলা যায়, পঞ্চমুখ হয়েই উঠলো। অবশ্য কেউ কেউ বললো— যোগ্যতম কাউকে বঞ্চিত রাখা হচ্ছে না তো ? সব বিষয়ে আবেগ দিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কী আছে ?

দিন ভালোই যাচ্ছিল। হঠাৎ সমস্ত কলেজকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে প্রিন্সিপাল ড. কাদের হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন। শুধু কি কলেজ, সারাটা শহর যেন অধিক শোকে পাথর। পৌরসভা শহরে ঘোষণা করলো তিনদিনের শোক।

তারপর এলো নতুন প্রিন্সিপাল নিয়োগের প্রশ্ন। কাদের স্যারের স্ত্রী হামেদা বেগম চোখেমুখে অন্ধকার দেখলেন। নাবালক পুত্রকন্যা নিয়ে তিনি এখন কোথায় যাবেন ? তাদের কোনো বাড়ি নেই। এই কোয়ার্টার ছেড়ে দিতে হলে তাদের পথে বসতে হবে।

কলেজে ম্যানেজিং কমিটির বিশেষ বৈঠক চলছিল। হামেদা বেগম সেই বৈঠকে হাজির হলেন।

তিনি বললেন, আমার পক্ষে এই কোয়ার্টার ছেড়ে দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া আমি নিজে চাকরি না-করলে আমার ছেলেমেয়েরা না খেয়ে মারা যাবে। মানবিক কারণে আমি এই কলেজে চাকরি চাই।

ম্যানেজিং কমিটির সদস্যরা মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। সেক্রেটারি বললেন, তেমন কোনো পদ তো খালি দেখা যাচ্ছে না। আপনি পড়াশুনা করেছেন কতদূর ?

'এসএসসি পাস, সেকেন্ড ডিভিশনে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সবাই আবার পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। চেয়ারম্যান বললেন, আপনি সম্মানিত ব্যক্তি। এখন আমরা আপনাকে কোন্ পদ-ই বা দেই।

হামেদা বেগম মারপ্যাঁচ তেমন বোঝে না। নিতান্তই সহজ-সরল মহিলা। তিনি বললেন, জমাদার মারা গেলো, তার পদে আপনারা নিয়েছেন তার স্ত্রীকে। পিয়ন শামসু মারা গেলেও আপনারা সেই পোস্টে নিয়েছেন তার বৌ রোকেয়াকে। তাহলে প্রিন্সিপাল সাহেব মারা গেলে কেন আপনারা আমাকে প্রিন্সিপাল হিসেবেই নিয়োগ করছেন না ? কামালের আব্বাকে তো আমি জানি। যখন ভাইস প্রিন্সিপাল ছিল, তখনো তো একটা-দুটো ক্লাস নিতো। প্রিন্সিপাল হওয়ার পরে সে কোনো ক্লাস নেয় নাই, শুধু ফাইলে সিগনেচার করতো। ফাইলে সিগনেচারের কাজ আমিও পারব। ভাইস প্রিন্সিপাল সাহেব আছেন, আপনারা আছেন—দেখায়া দেবেন।

চেয়ারম্যান সাহেব দেখলেন সমূহ বিপদ। এখনই কঠোর হওয়া দরকার। তিনি বললেন, কিছু মনে করবেন না, ম্যাট্রিক পাসের যোগ্যতা নিয়ে এই কলেজে আপনি বড়জোর পিয়নের চাকরি পেতে পারেন। আপনি কি তা করতে রাজি আছেন ? যদিও এখন প্রচুর আইএ-বিএ পাস লোকজন আসছে পিয়ন পদে চাকবি করতে। তবে আপনার কেসটা আলাদা বলে আমরা বিবেচনা করে দেখতে পারি।

হামেদা বেগম এ প্রস্তাবে রাজি হলেন না। প্রশ্নই ওঠে না।

দিন যায়। অভাব এসে হামেদা বেগমের সংসারকে তছনছ করে দিলো। ছেলেটার অসুখ। মেয়েটার পরীক্ষার ফি।

হামেদা বেগম ভাবেন, না বলাটা উচিত হয়নি। বলেকয়ে একটা কেরানির চাকরি নিলেও হতো। ম্যাট্রিক পাস যোগ্যতাতে তিনি এরচেয়ে বেশি আশা করেন কিসেরই বা ভিত্তিতে ?

কিসের ভিতিতে ? প্রিয় পাঠক, হামেদা বেগমের এই স্বগত জিজ্ঞাসার জবাব আপনাদের জানা আছে। সবারই জানা আছে। কিন্তু এমন প্রসঙ্গ আমরা কেনই বা উচ্চারণ করবো, যা জাতি হিসেবে আমাদের সবাইকে ছোট করে দেয়।

ভোরের কাগজ, ৪ মে ১৯৯৬

জল না পড়লে পাতা নড়ে না

শুক্রবার সাপ্তাহিক ছুটি, হাশেম আলীর জন্য খুবই মুশকিলের দিন। এদিন তিনি দিবানিদ্রা দেবেন কোথায় ? ফাইলের গন্ধ ছাড়া তার ঘুম আসে না। পুরো একটা যুগ সপ্তাহে ছ'দিন তিনি দিনের বেলা কাটিয়েছেন ঘুমিয়ে। অফিসে যান। চেয়ারে বসেন। টেবিলে মাথা রাখেন। তারপর পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন। তার টেবিলের চারদিকে ফাইলের স্তূপ। মাথা রাখার ঠাঁই নেই। তারই এক ফাঁকে একটু জায়গা বের করে তিনি মাথাটা ঠেকান। ও আমার কাজের টেবিল, তোমার পরে ঠেকাই মাথা। ফাইল থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ভুরভুর করে পুরোনো কাগজের গন্ধ বেরোয়। ঘুনপোকা কুটকুট করে কাগজ চিবোয়, মধুর ধ্বনি বেজে ওঠে কাগজ দংশনের। তিনি পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েন।

অফিস ছুটি থাকলে হাশেম আলীর সত্যি খুবই অসুবিধা হয়। বাসায় বিছানায় তার ঘুম আসে না। রাত্রিবেলায়ও তিনি খুব একটা বিছানায় পিঠ ঠেকান না। তাঁর স্ত্রী মোটাসোটা, তার হাতপা গাট্টাগাট্টা; চিৎ হয়ে হাতপা ছড়িয়ে গুণন চিহ্নের মতো আকার ধারণ করে তিনি গোটা শয্যা দখল করে রাখেন। এক কোণে সরলরেখার মতো শুয়ে থাকতে হয় হাশেম আলীকে, দৈর্ঘ্য আছে, কিন্তু প্রস্থ নেই, উচ্চতা নেই। হাশেম আলীর ভয় হয় এই বুঝি সরতে সরতে বিছানা থেকে পড়ে যান তিনি। (পতন খুবই ভয়াবহ ব্যাপার, কতো ভয়াবহ— বেগম জিয়ার দিকে তাকালে সেটা বোঝা যায়। হায় বেগম, হায় তাঁর অমাত্যবর্গ, পতনের ধকল সামলাতে না পেরে তারা কী হারে প্রলাপ বকে চলেছেন।) পড়ার ভয়ে উৎকণ্ঠিত হাশেম আলীর আর ঘুম আসে না; সারারাত কাটে অঘুমে। দিনের পর দিন না ঘুমিয়ে কাটিয়ে তিনি শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেতে পারতেন; সেক্ষেত্রে সেই কাঠ দিয়ে তার স্ত্রী নিশ্চয়ই কোনো খাট-পালঙ্ক বানাতো না, কেইবা তার ক্রীতপতির গায়ে অন্য স্ত্রীলোকদের বেশন বা উপবেশন করতে দেয়। কাঠে রূপান্তরিত হলে স্ত্রীর নির্দেশে নিশ্চয়ই হাশেম আলীকে ঢেঁকি বানানো হতো। আর কে জানে না, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও রমণীকুলের পদাঘাত ভিন্ন কিছুই আহার করে না।

এ মহাসংকট থেকে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে তার চাকরি, তার অফিস। আহ্, কী বাঁচাটাই না বাঁচা গেছে। রাত্রির ঘুমটা এখন তিনি অনায়াসেই সারতে পারছেন অফিসে। কোনো বিরাম নেই, ব্যাঘাত নেই, কেবল টেবিলে একবার মাথাটা রাখলেই হলো! শান্তি, শান্তি।

শুক্রবারে কী অন্য ছুটির দিনে দুপুরবেলাটা তার কী যে কষ্টে কাটে! ঘুমোবেন কোথায় ? বাসায় টেবিল আছে; কিন্তু টেবিলে ফাইলের পাহাড় নেই। ফাইলের আড়ালে আলো-আঁধারির রহস্যময় রোমন্টিক যে পরিবেশ, তাছাড়া কি ঘুমোনো যায়! ছুটির দিনটা তাই হাশেম আলীকে না ঘুমিয়েই কাটাতে হয়। অবশ্য তার সহকর্মী খোদাবক্স মৃধা বলেছিল বাজার থেকে কিছু ফাইলপত্র কিনে নিয়ে গিয়ে টেবিলটা অফিসের মতো করে সাজিয়ে নিতে। কিন্তু নতুন ফাইলের গন্ধে ঘুম আসবে ? তাছাড়া ফাইলের গায়ে যদি লালকালিতে 'জরুরি' লেখা নাই-ই থাকলো, তাহলে তা কি পারবে নিদ্রাদেবীকে আবাহন করতে। হাশেম আলীর মতে, পৃথিবীতে জগদ্দল বিষয় আছে দুটো। জগদ্দল মানে জগৎকে যা দলন করে, মানে সারাটা পৃথিবী দলে-মুচড়ে ছিঁড়ে-চেপ্টা করে দেয়, এমন ভীষণ ভারি জিনিস। এমন অনড় জিনিস আছে সারা দুনিয়ায় মাত্র দুটো ; এক তাঁর স্ত্রী, দুই সরকারি অফিসের ফাইল। তবে এ দুটোর পার্থক্য হলো, প্রথমটির পাশে শান্তিতে ঘুমোনো যায় না, দ্বিতীয়টির পাশে যায়। মিলের দিকটি হলো, উভয়েরই আছে লাল ফিতের বাঁধন। তবে প্রথমটির ফিতে খোলা যায়, দ্বিতীয়টির খোলা যায় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হাশেম আলীর অফিসটাও খুব উপভোগ্য জায়গা। তার সহকর্মীদের একেকজনের আছে একেকটা স্টাইল। খোদাবক্স মৃধা অফিসে আসেন পত্রিকা পড়ার জন্য। তবে সংবাদের চেয়ে বিজ্ঞাপন পড়ার দিকে তার বেশি মনোযোগ। সবচেয়ে আগ্রহ নিয়ে তিনি পড়েন ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন। পড়াইতে চাই, হারাইয়াছে, বাড়ি ভাড়া। এইসব বিজ্ঞাপন তার মোটেও একঘেয়ে লাগে না। আছেন শমসের মিয়া। তিনি অফিসে আসেন টেলিফোন করার জন্য। তাদের রুমে লোক পাঁচজন, ফোন একটা। এটা আল্লাহর ইচ্ছায় শমসের মিয়া একাই সারাক্ষণ দখল করে রাখেন। দরকারি ফোন না থাকলে তিনি এলোপাতাড়ি ডায়াল ঘোরান। এমনি করে করে তিনি প্রায় পঁচিশটি বান্ধবী জোগাড় করে ফেলেছেন। প্রায় নিঃশব্দ স্বরে তিনি এই রমণীকুলের সঙ্গে শ্বাস মিশিয়ে কথা বলেন। এসব আলাপের কোনো কোনোটা বেশ তাপমাত্রাযুক্ত। যেমন :

এখন কী পরে আছো ?

কী রঙের ?

শুধু ম্যাক্সি ?

ভেতরে ?

কিছু নেই ? একদম কিছু নেই ?

আর তিব্বত মিয়া এসেই কোটটা চেয়ারের পিছনে ঝুলিয়ে রেখে বেরিয়ে যান। তার কাজ হলো পলিটিক্স করা। বিভিন্ন সেকশনে ঘুরে বেড়ানো। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত তাঁর কোটটা চেয়ারের পিছে ঝুলে থাকে। বড়োই নিঃসঙ্গ এই কোটটা তিনি কখনো পরেন না। গ্রীষ্মকালে তো নয়ই, শীতকালেও নয়। হাতে করে নিয়ে আসেন, হাতে করেই ফিরিয়ে নিয়ে যান। কষ্ট করে কোটটা আনা-নেওয়া না করলে কী হয় ? এমন তো করা যায়, ওই কালো রঙের পোশাকটিকে চেয়ারেই ঝুলিয়ে রাখা যায় স্থায়ীভাবে। তিব্বত মিয়া সহকর্মীর মুখে এ প্রস্তাব শুনে মধুর করে হাসেন। বলেন, না ভাই সাহেব, এই কষ্টটা স্বীকার না করলে বেতন নিচ্ছি কিসের বিনিময়ে। চাকরি করি কিছু কষ্ট তো নিজেকেই স্বীকার করতে হবে। যেমন বেতন তুলতে হলে নিজের সইটা নিজেকেই করতে হবে, অন্য কাউকে দিয়ে সই করানো যাবে না। আহা, চাকরি করাটা সত্যিই কতো কষ্টকর। চাকরি করতে হলে কতো নিয়ম জানতে হয়, কতো নিয়ম মানতে হয়!

যেমন ফাইলের নড়াচড়া। বাইরে থেকে কেউ দেখলে ভাববে, এই ফাইলের স্তূপ নড়ে না। আসলে নড়ে, টের পাওয়া যায় না। গাছ যে বড়ো হয়, কে দেখে গাছকে বড়ো হতে ? কেউ দেখে না। তবুও তো গাছ বাড়ে। ফাইলও তেমনি। নড়ে, তবে ধীরে ধীরে। শম্বুকগতি। কিংবা কচ্ছপগতি। হাশেম আলীরা আসলে দেশকে বড়ো ভালোবাসেন, তারা দেশের প্রতিষ্ঠানকে শেষ পর্যন্ত জিতিয়ে দিতে চান। তারা জানেন, স্লো এন্ড স্টেডি উইনস দি রেস। খরগোসের মতো ছুটে লাভ নেই, ছুটতে হবে কচ্ছপের মতো। ফাইলগুলো তাই কচ্ছপের গতিতে চলে। তবে ফাইলের নড়ার পিছনে বিশেষ ইনটেনসিভ থাকতে হয়। কচ্ছপ কেন দৌড় শুরু করেছিল ? পুরস্কারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

লোভে। ফাইলের চলা শুরুও হয় তেমনি উদ্দেশে। জল পড়ে, পাতা নড়ে; মাল পড়ে, ফাইল নড়ে।

হাসেম আলীর জীবনেও একটা শুক্রবার এলো, যেদিন তার সারাটা সময় কাটলো ঘুমিয়ে। বৃহস্পতিবার দুপুর বেলায় বেশ প্রগাঢ় ঘুম এসেছিল হাশেম আলীর দুচোখ ভরে। টেবিলে মাথা ঠেকিয়ে ফাইলের আড়ালের নির্ঝঞ্ঝাট পরিসরে হাশেম আলী বেশ একচোট দিচ্ছিলেন। নাসিকারন্ধ্রে বাতাসের আগমন-নির্গমন একটা সুরলহরীও তুলছিল। যেন বিছমিল্লা খানের সানাই। স্বপ্নে তিনি একরকম বেকায়দাতেই পড়েছিলেন। স্ত্রী বললেন, আজ থেকে আমি আর খাটে ঘুমুবো না। মেঝেতে শোবো। কাল থেকে অফিসে ঘুমোনো বন্ধ। এই বেকায়দা অবস্থা থেকে তিনি বেরুবেন কী করে, কেবল ভাবতে বসেছেন, এমন সময় ঘটলো দুর্ঘটনা। স্বপ্ন ভেঙে গেলো, কিন্তু ঘুম আর ভাঙলো না। মাথার উপরে হুড়মুড় করে পড়লো টেবিলে থাকে থাকে রাখা ফাইলের স্তূপ, ফাইলের সমাধিতে হাশেম আলী সমাহিত হয়ে গেলেন। তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ফুসফুস থেকে বেরিয়ে কোনো একটা জরুরি ফাইলের চিপায় আটকে রইলা।

খোদাবক্স মৃধা তখন পত্রিকায় একটা দারুণ উপভোগ্য বিজ্ঞাপন পড়ছেন। নিঃসন্তান দম্পত্তির পারদবল দ্বারা সন্তান লাভ। সহসা উৎপন্ন শব্দের উৎসের দিকে তিনি একবার মাত্র তাকালেন। তারপর ডুবে গেলেন বিজ্ঞাপনসমুদ্রের গভীর পানিতে। শমসের মিয়া তখন ফোনে শেখাচ্ছেন বক্ষসম্পদ উন্নত রাখার ব্যায়াম। তিনিও হাশেম আলীর টেবিলে ফাইলের বিস্ফোরণ ঠিক খেয়াল করে উঠতে পারলেন না।

আর তিব্বত মিয়া তখন টেবিলেই ছিলেন না। অকস্মাৎ ফাইল স্তূপের সশব্দ পতনের ফলে যে একটা বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি হলো, তাতে তার চেয়ারের পেছনের কোটটি সামান্য দুলে উঠলো মাত্র।

হাশেম আলী বাড়ি ফিরলেন না। রাত্রিবেলা তার স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে তিনবার জ্ঞান হারালেন। 'ওগো, তুমি ফিরে এসো, এবার গোটা বিছানা তোমাকেই ছেড়ে দেবো'— এই অঙ্গীকার মনে মনে তিনি করলেন তেত্রিশবার। হাশেম আলীর বড়ছেলে কলেজে পড়ে। এ থানা ও থানা, এ হাসপাতাল সে হাসপাতাল করে গোটা শুক্রবার সে পুরো শহর মাথায় তুলে ফেললো। বলাই বাহুল্য, বাবার দেখা সে পেলো না।

শনিবার সকাল সকাল হাশেম আলীর ছেলে আয়ুব আলী গেলো বাবার অফিসে। বাবার সহকর্মীদের কাছ থেকে যদি কোনো খোঁজ পাওয়া যায়। অফিস রুমে ঢুকে কাকে প্রশ্ন করা যায়, ভাবতে ভাবতে সে গেলো বাবার টেবিলের দিকে। টেবিলের ফাইলের স্তূপের দিকে তাকিয়ে সে ফেললো দীর্ঘশ্বাস। কতো স্মৃতি রেখে গেছেন বাবা, শুধু তিনিই নেই। আয়ুব আলীর চোখে জল এসে গেলো। কাঁদতে কাঁদতে বাবার টেবিলের খুবই কাছে গেলো সে, তারপর একসময় টেবিলের পাশে গিয়ে দেখতে পেলো চেয়ারের মধ্যে তার বাবার শরীরের একাংশ। সে চটে গেলো, কেঁদে কেঁদে বললো, বাবা আপনি এখানে, বাসায় যান নাই কেন ? কিন্তু তার বাবার শরীর নড়লো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

না। আয়ুব আলী বাবার পেট ধরে, কোমর ধরে ঠেলাঠেলি করলো ; কিন্তু কোনো সাড়া এলো না।

আয়ুব আলী আছাদলম্বিত ফাইলের পাহাড়ের নিচ থেকে বাবার হাত ও মাথা উদ্ধারের চেষ্টায় একটা-দুটো ফাইল সরাতে গেলো। অমনি আরো বেশি করে ফাইল এসে পড়তে লাগলো হাশেম আলীর নিশ্চল দেহের উপর।

আয়ুব আলী তাড়াতাড়ি গেলো পার্শ্ববর্তী টেবিলে। খোদাবক্স মৃধা পত্রিকা পড়ছেন। 'চাচা একটু হেল্প করেন, ওই টেবিলের ফাইলগুলো সরাইতে হবে'—বললো আয়ুব আলী।

ফাইল সরানোর কথায় খোদাবক্স মৃধা আগ্রহ বোধ করলেন। বললেন, 'ফাইল সরাতে চাও, সরাবে, তিনদিন পরে এসো।'

'না চাচা, খুব জরুরি। বাবা মারা যাচ্ছেন।'

'জি, বাবা বুঝেছি। জরুরি। ঠিক আছে। কাল এসো। টাকাপয়সা ঠিকমতো নিয়ে এসো। জানোই তো বাবা, আজকাল টাকাপয়সা ছাড়া ফাইল নড়ে না। তোমার এমার্জেন্সি কাজ। এমার্জেন্সি কাজের রেটও বাবা এমার্জেন্সি।'

খোদাবক্স মৃধা আবার গভীর মনোযোগ দিয়ে পত্রিকার বিজ্ঞাপন পড়তে শুরু করলেন।

ভোরের কাগজ, ২৬ এপ্রিল ১৯৯৬

ঈশপের শেষ গল্প

এক ছিল কৃষক। সে থাকতো তার খামারের পাশে, একটা ছোট্ট বাড়িতে। বাড়িতে তার একটি ছেলে ছিল, আর ছিল বউ। এছাড়াও বাড়িতে ছিল এক সাপ।

সাপটিকে প্রথম দিন দেখে কৃষক-বউ খুব ভয় পেয়েছিল। কী যে চিৎকার দিয়েছিল বউটা। কৃষক এলো দৌড়ে। বললো, কী হয়েছে বউ ?

বউটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আঙুল তুলে দেখালো সাপটিকে। আঙিনায় ঝরাপাতা আর ছড়ানো খড়ের মধ্যে শুয়ে সাপটা রোদ খাচ্ছে।

কৃষক বললো, ভয় পাস্‌নে বউ, এ হলো বাস্তুসাপ। আমাদের ভিটেয় যখন এসেছে, তখন দেখবি, আমাদের মঙ্গল হবে!

সেদিন রাতেই বউটা বমিটমি করে অসুস্থ হয়ে গেলো। হেকিম ডেকে আনলো কৃষক।

হেকিম হেসে বললো, সুসংবাদ, ও পোয়াতি হয়েছে।

কৃষকটি কী যে হাসলো। বললো, হেকিম মশায়, দেখুন, আমাদের কপাল খুললো বলে। নতুন ভিটে আমাদের, কোনো বাস্তুসাপ ছিল না, আজ প্রথম একটি সাপ দেখা গেছে ভিটেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

হেকিম বললো, সত্যি সত্যি এটা সৌভাগ্যের লক্ষণ বটে। বাস্তুসাপ হলো লক্ষ্মী। এখন থেকে তোমাদের সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকবে। সংসার হয়ে উঠবে ধনেজনে পূর্ণ। সাপটাকে যত্নআত্তি করো।

সাপটার জন্য বরাদ্দ হলো দুধকলা। রুপোর বাটিতে দুধ আর কাঁসার থালায় কলা সাজিয়ে রোজ দুবেলা কৃষক-বউ সাপটাকে খেতে দিতো। আর তখনই গাছের ডালে একটা পাখি ডেকে উঠলো, গৃহস্থের খোকা হোক।

দিন যায়, কৃষকের ঘর আলো করে খুব ফুটফুটে একটি ছেলে হলো। কী আনন্দ, কী আনন্দ।

একদিন হলো কী, কৃষকের হালের বলদজোড়া মরে পড়ে রইলো। বাগানে। শাদা বড়ো বড়ো দুটো বলদ। নীল হয়ে পড়ে আছে।

কৃষক বুঝলো, সাপে কামড়েছে। সে গলা ছেড়ে কাঁদতে লাগলো। হালের বলদ গেলে চাষার আর থাকে কী ? সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো—আজই যদি ওই সর্বনাশা সাপটাকে মেরে না ফেলছি।

কৃষক-বউ প্রমাদ গুনলো। হায়, হায়, সে কী কথা। বাস্তুসাপ। মেরো না, মেরো না গো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি। খোকার যদি অমঙ্গল হয়।

খোকা! খোকা! তাই তো বলদ গেছে, কিন্তু খোকা তো আছে। খোকার মুখের দিকে তাকিয়ে কৃষক মাথা ঠাণ্ডা করলো।

সাপটাকে মারার কথা সে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেললো আর মনে মনে বললো, থুক্কু, থুক্কু, ও সাপ, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও।

সাপটার জন্য তখন বরাদ্দ করা হলো দ্বিগুণ খাবার। এখন থেকে সে পায় দু-বাটি দুধ আর দু-হালি পাকা চাঁপা কলা।

সাপটা খুব খুশি। সে লেজে দাঁড়িয়ে মাথা তুলে নাচে, প্রায়ই।

আর সাপটি প্রসন্ন হয়েছে বলেই খোকারও উন্নতি হতে লাগলো সবদিক থেকেই। খোকার স্বাস্থ্য ভালো, কোনো জ্বরজ্বারি নেই। মাথায় ঝাঁকড়া কালো চুল। দু-বছরের ছেলে কী দৌড়ুতে পারে। সারা আঙিনা, সারা বাগান দৌড় দৌড় দৌড়। কোমরে একখানা ঘুঙুর বাঁধা, শব্দ হয় ঝুম ঝুম ঝুম। আর কতো কথা বলে। আর নিজে নিজে ছড়া বানায় :

আতা আতা আতা
সবুজ সবুজ পাতা।

কৃষক তাকিয়ে থাকে ছেলের দিকে, কৃষক-বউ তাকিয়ে থাকে ছেলের দিকে। তাদের চোখ দিয়ে আনন্দে অশ্রু গড়াতে থাকে। তারপর বালাই-ষাট বলে তারা তাকায় পরস্পরের দিকে—নিজের ছেলের দিকে নজর দিতে নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাপ-মার নজর নাকি ছেলের অকল্যাণ করে। যদিও ছেলের কপালে এতো বড়ো কাজলের টিপ পরানো আছে, যাতে কারো নজরে না লাগে, তবুও ঘটনা ঘটলো খুব খারাপ।

একদিন কৃষক আর কৃষক-বউ দেখলো, তাদের সোনার ছেলে পড়ে আছে মাটিতে, আর তাকে পা থেকে মাথা অব্দি পেঁচিয়ে জড়িয়ে আছে সাপটি।

খোকার ঠিক কপালে দংশনের চিহ্ন। সমস্ত শরীর বিষে কালো।

কৃষক আর কৃষক-বউয়ের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। তাদের চোখ হয়ে পড়লো ঘোর অন্ধকার। এমন আঘাত তারা পেয়েছে যে, তারা কাঁদতে পারলো না পর্যন্ত। খেতে ভুলে গেলো, ঘুমুতে ভুলে গেলো। কাপড় পরতে ভুলে গেলো।

পাগল হয়ে গেলো দুজন। তারপর দুজনের কে যে কোথায় চলে গেলো ভিটেমাটি ছেড়ে। তারপর বাড়ি ছেয়ে গেলো জঙ্গলে আর জঙ্গলে। সংস্কারের অভাবে ঘরগুলো পড়লো মুখ থুবড়ে।

পোড়ো ভিটেয় রইলো শুধু সেই কালসাপটা। সন্ধ্যার পর ওই এলাকায় শোনা যায় শুধু হিসহিস শব্দ। আর মাঝেমধ্যে চিকন নারীকণ্ঠ বিনবিনিয়ে কাঁদে, ওরে আমার খোকারে।

চাঁদ তখন খুব করুণ হয়ে ঝরে।

ঈশপের আগমন

গল্পের এইখানটাতে ঈশপের আগমন। তিনি বললেন, শোনো, দুধকলা দিয়ে কেউ রাজাকার আর কালসাপ পুসো না। একবার রাজাকার হলে চিরকালই রাজাকার, আর একবার কালসাপ হয়ে জন্মালে সে চিরকালই কালসাপ। রাজাকার ও কালসাপ কখনো গৃহস্থের বন্ধু হতে পারে না। তারা দুধকলা খায়, আর দাঁতে শান দেয়, আর বিষথলিতে সঞ্চিত করতে থাকে কালবিষ। সময়-সুযোগ বুঝে তারা ঠিকই বিষ উগলে দেয়।

ঈশপ যখন এ-কথা বলেছেন, ঠিক তখনই একটি কালসাপ এলো তার সামনে।

সাপটি তাকে জিজ্ঞেস করলো, ঈশপ, আপনি কি মুক্তিযোদ্ধা ঈশপ, নাকি প্রত্যাগত ঈশপ।

ঈশপ বললেন, ঈশপ একজনই। ঈশপ একটি প্রাচীন ব্যাপার, মুক্তিযোদ্ধা-অমুক্তিযোদ্ধা ভেদাভেদ এখানে হতে পারে না।

সাপটি বললো, কিন্তু আমি আপনার উপদেশ থেকে বুঝেছি আপনার আসল পরিচয়। আপনি প্রত্যাগত নন, আপনি মুক্তিযোদ্ধাদের দলে।

সাপটি ফণা তুললো, ছোবল মারলো। ঈশপ ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে।

সুতরাং এই গল্পটিই ঈশপের শেষ গল্প বলে মেনে নিতে লোকসকল বাধ্য।

ভোরের কাগজ, ২৪ মে ১৯৯৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রবি বাবুর প্রত্যাবর্তন

বাংলাদেশটা আরেকবার ঘুরে দেখা রবি বাবুর বহুদিনের শখ। কিন্তু আসি আসি করেও আসা হচ্ছিল না। সেই শাহজাদপুর, সেই শিলাইদহ এখন কেমন আছে ? খুলনায় শ্বশুরবাড়ির ভিটেমাটির চিহ্নটুকু বিলীন হয়ে যায়নি তো ? সংবর্ধনাবাজ ঢাকাবাসী কেমন আছে ? কেমন আছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ কলেজ, সলিমুল্লাহ হল ? সেই কবে গিয়েছিলেন ঢাকায় আর ময়মনসিংহে।

এবার রবি বাবুর মনে হচ্ছে, হ্যাঁ, বাংলাদেশে এইবারটা যাওয়া যায়। জাতীয় পর্যায়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হচ্ছে— সেটা একটা কথা বটে, কিন্তু বড়ো কথা নয়। সে তো বেশ ক'বছর ধরেই হচ্ছে। এক সামরিক শাসক কাম গণতন্ত্রী কাম স্বৈরতন্ত্রী এটা প্রবর্তন করে গেছে। কী যেন নাম ? এরশাদ। খুব ভালো অভিনয় জানেন ভদ্রলোক। একই সঙ্গে রাষ্ট্রধর্ম, আটরশি, এশীয় কবিতা উৎসব আর নজরুল-রবীন্দ্রজয়ন্তী। এই অভিনেতার প্রতিভার যোগ্য মূল্যায়ন হলো না। আমার সময়ে হলে ওকে শান্তিনিকেতনে আনিয়ে রাখতুম মায়ার খেলা কি বিসর্জন নাটকে— নৃত্যনাট্যে রোল করতো ভালো! কী সুন্দর কাঁদতে পারেন!

এরপরে যিনি এসেছেন, নহ মাতা নহ বধূ নন্দনবাসিনীটি, তিনি অবশ্য নজরুল-রবীন্দ্রজয়ন্তীর রেওয়াজটা আর বাতিল করেননি। করলেই ভালো করতেন। অন্তত ২৫ বৈশাখ পালনের সঙ্গে তার অন্তরের বীণাটি একই সুরে বাজে— এ-কথা তিনি নিজেই সাহস করে বলতে পারবেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া উপজেলা পদ্ধতির মতো রবীন্দ্রজয়ন্তী পদ্ধতি বাতিল করে দিলে তার ভোট বাড়তো বই কমতো না। ভারতে বাবরি মসজিদ ভাঙার পর এ উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে, তার ঢেউ বাংলাদেশেও আছড়ে পড়ে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতারা এসব বিষয়ে বেগমের সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বেগম তাদের পাঁচ মিনিট সময় দেননি। ভোটের রাজনীতিতে সব বিষয়ে মাখনের মতো নরম হলে চলে না, মাঝেমধ্যে পাথরের মতো শক্ত হতে হয়। সম্প্রীতির বদলে ভেদবুদ্ধি যদি ভোট বাড়ায়, তবে ভেদাভেদেরই জয় হোক! কথাটা ভাবতেই রবি বাবুর বুকের বাঁ-পাশটা চিনচিন করে ওঠে। মানুষকে মানুষ হিসেবে না দেখে হিন্দু-মুসলিম, বাহ্ম-সনাতন, উচ্চবর্ণ-হরিজন, জাতি-উপজাতি পরিচয়ে দেখার সেই হীনবুদ্ধি ঘৃণ্যকৌশল আজো গেলো না।

যাহোক, রবি বাবু তাই গণতন্ত্রের স্বর্ণযুগ ও উন্নয়নের জোয়ারের সময়ে বাংলাদেশ সফর করার সময় ও ইচ্ছা করে উঠতে পারেননি।

এবার দেখলেন— এইই সুযোগ। বাংলাদেশে এখন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার। এই সরকারের প্রধান একজন প্রকৃত পণ্ডিত। বহু গ্রন্থের প্রণেতা এবং একজন রবীন্দ্রগবেষকও বটে। ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ সৈনিক, যিনি আন্দোলন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করতে গিয়ে জেল পর্যন্ত খেটেছেন, একই সঙ্গে ইতিহাসবিদ, আইনজ্ঞ, ভাষাবিদ, অভিধান প্রণেতা ও রবীন্দ্রপ্রেমিক। এমন উচ্চ সাংস্কৃতিক মানের ব্যক্তিত্ব বাংলাদেশে তো বটেই, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে সরকার-প্রধান হিসেবে ভবিষ্যতেও কোনোদিন আসবে বলে মনে হয় না। এরই শাসনামলে বোধ করি বাংলাদেশে একবার যাওয়া যায়।

২৫ বৈশাখের প্রাক্কালে দেওয়া বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টার বাণীটিও রবি বাবুর খুবই পছন্দ হলো। বাণীর শব্দগুলোর দিকে তাকিয়ে মনে হলো ভদ্রলোক নিজ হাতে লিখেছেন। একজন নিরপেক্ষ লোক যখন তার জন্মদিনে বাণী দিচ্ছেন, তখন নিশ্চয়ই বাংলাদেশে তার সফরটা উপভোগ্যই হবে। অবশ্য দুশ্চিন্তার একটি বিষয় ছিল। রাষ্ট্রপতি আবদুর রহমান বিশ্বাস বাণী দেওয়ায় সেই দুশ্চিন্তাটাও কেটে গেলো। রবি বাবু ভাবলেন, আর দেরি নয়, এক্ষুনি বঙ্গদেশে একটা দর্শন দেওয়া যাক। যে-দেশে তার লেখা বাউল সুরের গানটি জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পেয়েছে, সে-দেশের মাটিতে একবার মাথা না ঠেকালে চলে?

বাংলাদেশে তিনি পা রাখলেন নীরবে। এসে দেখলেন অবস্থা খারাপ। চারদিকে নির্বাচনের ডামাডোল। কেনাবেচা চলছে। কে যে কার দলে যোগ দিচ্ছে, ঠাওর করা মুশকিল।

তিনি নীরবে বাংলার মাঠ-ঘাট, পথ-প্রান্তর, নগর-জনপদ ভ্রমণ করতে লাগলেন। কিন্তু একটা মহল্লায় তার উপস্থিতি ঢাউর হয়ে গেলো।

ভোটপ্রার্থী একদল লোক এসে বললো, আপনার নাম বলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,— বললেন তিনি।

'ও, তাহলে আর ভোটারতালিকায় আপনার নাম খোঁজার দরকার নাই। শুনেন, আমরা জানি, আপনে আমাদের সাপোর্টার, আমাদের দলের ভোটার। আপনি যদি ভোটকেন্দ্রে না যান, তাহলেই আমরা বুঝবো আপনার ভোট আমরা পেয়ে গেছি।'

কোনো জবাব প্রত্যাশা না করেই তারা হৈচৈ করতে করতে চলে গেলো। তারপর এলো আরেকদল। 'কেমন আছেন, কতোদিন পরে দেখা। ভোটকেন্দ্রে কিন্তু অবশ্যই যাবেন। একটা ভোট যে এবার কতো মূল্যবান। আমরা ছাড়া আপনাদের বাঁচাবে কে? বাঁচাতে হলে অবশ্যই ভোট দিতে যাবেন।'

রবি বাবু বললেন, শোনো ভোটার তালিকায় আমার নাম নেই।

'ও, আগে বলবেন তো। অযথা সময় নষ্ট'— লোকগুলো বিদায় হলো।

কিন্তু নামের সঙ্গে তার দাড়িঅলা চেহারা মিলিয়ে একদল রবীন্দ্রগবেষক বের করে ফেললো— এ যে সাক্ষাৎ বিশ্বকবি। কোন্ ছলনায় ভোলাতে তুমি এমন নীরব নিভৃতে জীবনযাপন করছো ঠাকুর? তারা কেঁদে ফেললো।

তাদের কান্না থেকেই ব্যাপারটা প্রকাশিত হয়ে পড়লো যে, রবি বাবু এখন বাংলাদেশে। বিচারপতি হাবিবুর রহমান তাকে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন মেঘনায় নিয়ে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকায় বিবৃতিযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলো। এক দল বললো, ওকে বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

করে দাও। ও ভারতের দালাল। ওকে দেশে রাখলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন হবে। কারণ উনি নৌকা নিয়ে কবিতা লিখেছেন, 'সোনার তরী' কবিতা।

বিচারপতি হাবিবুর রহমান সাহেব মুশকিলে পড়লেন। সাক্ষাৎ রবি ঠাকুরকে পেয়েও তিনি উপযুক্ত সম্মান দেখাতে পারবেন না ?

তখন একদল লোক বিবৃতি দিলো, রবি বাবু নৌকা নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তার নাম 'সোনার তরী', কেবল এতটুকু জেনেই লম্ফঝম্প করা ঠিক নয়। কারণ কবিতাটিতে আছে—ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট সে তরী— আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি। কাজেই তিনি নৌকাকে সোনার বলেননি, সোনার বলেছেন ধানের শীষকে, এ নিয়ে কাব্য রচনা করে ধানের শীষের জয়ই গেয়ে গেছেন।

আরেক দল রবীন্দ্রগবেষক বললেন, নৌকার উপরে ধানের শীষ বোঝাই করে রবি বাবু আসলে আমাদের মিলনের গানই গেয়ে গেছেন। তিনি আসলে নির্দলীয় নিরপেক্ষতার চূড়ান্ত প্রতীক। সুতরাং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উচিত তাকে উপযুক্ত সম্মান দেখানো।

অন্যদল বললো, রবি বাবু এসেছেন। নৌকা, ধানের শীষ চাই কি লাঙল নিয়েও তিনি কবিতা লিখতে পারেন, এসবই আমরা মেনে নিচ্ছি, কারণ তাতে কিছু যায় আসে না। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে যাতে সত্যি সত্যি এসে যায়, তা হলো এই—রবি বাবু এবং তার স্যাঙাতেরা যাতে ভেটকেন্দ্রের আশেপাশে যেতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করা। আমাদের বিজয়ের একটা বড়ো কৌশল সেখানেই নিহিত এবং কে না জানে, সত্যের জয় অনিবার্য। তাহলে উল্টোভাবে বলা যায়, যারা জয়লাভ করেছে, তারাই অনিবার্যভাবে সত্য।

সেক্ষেত্রে সত্যের প্রশ্নে আমাদেরকে আগের মতোই নিরাপোস থাকতে হবে।

ভোরের কাগজ, ১০ মে ১৯৯৬

মা ভূত, তুমি কবে যাবা মা

একবার আমাদের বাসায় খুব ভূতের উপদ্রব দেখা দিলো। আমাদের বাসাটা ছিল বাংলো টাইপের, একতলা, উপরে ঢেউটিন, সামনে বারান্দা, বারান্দার সামনে ফুলের বাগান। বাসার পিছনে ছিল একটা তরিতরকারির ক্ষেত আর ছিল একটা ঝাকড়া শ্যাওড়া গাছ। ভূতটা ছিল সেই শ্যাওড়া গাছে; কিন্তু কী জানি কী করে ভূতটা তার আদি নিবাস বৃক্ষটি ছেড়ে ঢুকে পড়েছিল আমাদের বাসায়। নানা ধরনের অত্যাচার করতো সে, সারারাত টিনের চালে উঠে তা ধিনধিন করে নাচতো; আমাদের ঘুম যেতো ভেঙে। আমরা খুব ভয় পেতাম, ভয়ে ক' ভাইবোন জড়োসড়ো হয়ে থাকতাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কাঁথার নিচে। শুধু কি রাতের ঘুম! সে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে শুরু করলো এক-এক করে বহু কিছু।

একদিন সকাল বেলা, ঘুম থেকে উঠে আমরা ক'ভাইবোন বারান্দায় মাদুর পেতে পড়ছি। এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলাম আমাদের খাতাগুলো উড়তে শুরু করেছে। বুঝলাম ভূতের কাজ। আমাদের সবার খাতা সে নিয়ে গেলো শূন্যে। খাতার অভাবে আমাদের লেখা বন্ধ হয়ে গেলো। বাসায় যে-কোনো কাগজই আনা হোক না কেন, সঙ্গে সঙ্গে ভূতটা তা শূন্যে মিলিয়ে দিতো। আমার অবশ্য ভালোই লাগতো। আমাদের গৃহশিক্ষক ছিলেন ভীষণ কড়া, রোজ হাতের লেখা আর ১০টা অঙ্ক না করলে তিনি মাথায় গাট্টা মারতেন। এবার তিনি কী করবেন ? কাগজের অভাবে পড়াশুনাই তো বন্ধ। বাবা-মা হায় হায় করতে লাগলেন, লেখাপড়া বন্ধ হলে ছেলেগুলোর ভবিষ্যত কী হবে ?

কাগজ নিয়ে অত্যাচার তবু সহ্য করা যায়। এবার সে উপদ্রব শুরু করলো আমাদের বাসার পিছনের সবজি ক্ষেতটা নিয়ে। ওই ক্ষেতটা ছিল আমাদের পাড়ার গর্ব। শীতকালে বাঁধাকপি, ফুলকপি, টমেটো, মুলা, আলু, পালং শাক কতো কী ফলতো সেখানে। গরমকালে হতো বেগুন, কুমড়া, ঝিঙে, শসা, পুইশাক, ডাঁটা। আমরা সেই সব তরিতরকারি নিজেরা খেতাম, পাড়াপড়শিদের দিতাম আর নগদ-নগদ বেচে দেখতে পেতাম দুটো বাড়তি আয়ের মুখও।

এবার ভূতটা লাগলো ক্ষেতের পিছনে। যে-ই বাগানে যায়, তার পিঠে দুমদাম ঢিল পড়ে। তবু আমরা বাগানে যাওয়া বন্ধ করিনি, গাছের গোড়ায় পানি ঢালা, সার দেওয়া—সবই চলতে লাগলো। ভূতটা তখন করলো কী, লাগলো সারের পিছনে। ক্ষেতের জন্য কেনা ছিল দু-বস্তা ইউরিয়া আর পটাশ, আর গোবর সারও ছিলো এক পালা, সেই সবই ভূতটা ভ্যানিশ করে দিলো রাতারাতি। আমাদের বাগান লাটে উঠলো। সার কই পাই, এখন সার কই পাই বলে মা কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। সবজি বাগানটা যে ছিল মার সন্তানের মতোই।

এরপর শুরু হলো খাঁইখাঁই। এটা দাও, ওটা দাও। ও গেরস্থের বউ, কী রাঁধছো, দাঁও দিকিনি। যখন-তখন ছোবল মেরে খাবার নিয়ে যায়, সে তেলপিঠে হোক আর শোলমাছের মুড়ো হোক। শুধু কি খাবার, ভয় দেখিয়ে বাবার পকেট থেকে কতো যে টাকাপয়সা নিলো ভূতটা, ইয়ত্তা নেই।

আমরা ভাবলাম, যথেষ্ট হয়েছে। এবার ভূতটাকে তো তাড়াতে হয়। আমরা একটা ওঝা ডেকে আনলাম। ওঝা এসে নানা ঝাড়-ফুঁক, তন্তর-মন্তর করলো। ভূতটাকে বললো, তুই যাবি নাকি তোকে বোতলে বন্দি করে রাখবো। ভূতটা বললো, যাবো। তবে যাবার আগে একটা কিছু ভেঙে যাবো।

ওঝা হেসে বললো, সে তো সব ভূতই করে। ঠিক আছে, যা। যাবার আগে কিছু একটা ভেঙেই যা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সাঁই করে বাতাস উঠলো। ওঝা বললো, ওই যাচ্ছে। ঘড়মড় করে আমাদের বাসার পিছনের তিনটা সুপারি গাছ ভেঙে পড়লো। আমরা ভাবলাম, যাক, আপদ বিদায় হয়েছে।

কিন্তু একি, ওঝা যেতে না যেতেই ভূতটা আবার এসে হাজির। নাকি সুরে বললো, বড়ো মায়া লাগলো, যেতে পারলাম না। কলজে ছিঁড়ে যেতে চায়, মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে না।

আবার ডেকে আনতে হলো ওঝাকে।

ওঝা মন্ত্র পড়লো আবার। বললো, কঠিন বাণ মারলাম। লাগাতর বাণ! পরপর পাঁচটা অগ্নিবাণ গিয়ে ভূতটাকে বিদ্ধ করবে। এবার সে পালাবে বাপ বাপ করে।

আবার শব্দ উঠলো সাঁই সাঁই। আমাদের রান্নাঘরটা ভেঙে পড়লো হুড়মুড় করে। ওঝা বললো, ওই গেছে। আমাকে এবার বিদেয় করুন। কিসের যাওয়া ? খানিক পরে আবার এসে হাজির ভূতটা। বাবাকে বললো, এই, বাঁচতে চাসতো পাঁচশ টাকার নোট ছাড়।

ওঝা এসে আমাদের বাইরের ঘরে ঠাঁই গাড়লো স্থায়ীভাবে। ভূতকে জব্দ না করে সে এ বাসা ছাড়ছে না।

ভূতটা বললো, যাবো, যাবো। তবে এবার তোমাদের গোটা বাড়ির ছাদটাই ভাঙবো।

ওঝা বললো, তবে রে। দেখাচ্ছি মজা।

ওঝা এবার ছাড়লো বায়ুবাণ। ভয়ঙ্কর বাণ। ভূতটা পালাই পালাই বলে পড়িমড়ি দৌড় ধরলো। আমাদের বাসার ঢেউটিনের ছাদ উড়ে পড়লো তিনশত হাত দূরে। দুমড়ে-মুচড়ে চালটা একেবারে শেষ।

ঘরের চালা গেছে যাক। তবু আমরা এই ভূতের হাত থেকে রক্ষা পেতে চাই। আমাদের শান্তি আর স্বস্তি, আনন্দ আর নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও অধিকার কেড়ে নিয়েছিলো ওই ভূতটা। ও গেলেই আমরা বাঁচি।

ওঝা বললো, এবার গ্যারান্টি। ও আর আসবে না। কিন্তু ভূতটা আবার এলো। তার মুখে মধুর হাসি। সে বললো, আমি এসেছি। আমি চলে গেলে বাড়িটাকে দেখবে কে ?

আমরা সবাই তখন জড়ো হলাম। ভূতটা বসেছিল আমাদের কুয়োর আড়ে। আমরা সব ভাইবোন তার সামনে গিয়ে হাজির হলাম। হাত জোড় করে বললাম, মা ভূত, তুমি কবে যাবা মা, আর কী কী ভাঙতে পেলে তবে তোমার শান্তি হবে মা।

ভূতটা প্রসন্ন হাসি হেসে বললো, যাবো রে যাবো। শান্তিও আমি পাবো। এই ভিটেয় ঘুঘু চরিয়ে তোদের সবার ঘাড় মটকে ভেঙে তারপর যাবো।

ভোরের কাগজ, ২২ মার্চ ১৯৯৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

ট্রাক

ছেলেবেলায় ট্রাকের প্রতি এক ধরনের আকর্ষণই ছিল। আমাদের বাসা ছিল সরকারি প্রতিষ্ঠান পিটিআইয়ের ভিতরে। সেখানে ভাঁটি থেকে ইট নিয়ে আসতো কতোগুলো ট্রাক। সেই ট্রাকে চড়ার লোভ কিছুতেই সম্বরণ করা যাচ্ছিল না। এক ট্রাক-ডাইভারকে বললাম, আমাকে একটু ট্রাকে তুলুন না। ভাঁটি পর্যন্ত যাবো, আবার ফিরে আসবো আপনার ট্রাকে।

ড্রাইভার বললো, ঠিক আছে, নিয়ে যাবো। বাসায় বলে আসো। আর প্রমাণ হিসেবে একটা খিলিপান বানিয়ে নিয়ে আসো।

আম্মাকে বলে একটা পান নিয়ে এলাম। ড্রাইভার তার ট্রাকে উঠতে দিলো। একেবারে তার সিটের পাশেই। বড়ো ভাইবোনদের দেখিয়ে দেখিয়ে আমি ট্রাকে চড়ে বেশখানিকটা পথ ঘুরে এলাম।

আরেকটা ঘটনা বলি। আমি তখন পড়ি ক্লাস সিক্সে, রংপুর জিলা স্কুলে। প্রথম টেট্রনের ফুলপ্যান্ট বানিয়ে দেওয়া হয়েছে আমাকে। সেটা পরে আমি চলেছি স্কুল অভিমুখে। উদ্দেশ্য, বৃত্তির টাকা তুলবো। স্কুল বন্ধ, তবে অফিস খোলা।

বাসা থেকে স্কুল পর্যন্ত হেঁটে যেতে কুড়ি মিনিটের পথ। মাঝপথে যেতেই একটা ট্রাক রাস্তার নোংরা কাদাপানি ছিটিয়ে দিয়ে গেলো আমার গায়। নতুন টেট্রনের প্যান্ট, শার্ট, গা-মাথা সব নোংরা কাদায় মাখামাখি, কী করবো। আবার ফিরে যেতে হলো বাসায়।

একদিন একটা ট্রাককে দেখেছিলাম কাদায় পড়তে। হাতি যখন কাদায় পড়ে, তখন ব্যাঙও তাকে লাথি মারে— সেই অবস্থা। ট্রাকটা যতবারই স্টার্ট নেয় আর তার পিছনের চাকা ঘুরতে শুরু করে, ততোবারই শুধু ছিটকে ওঠে কাদা। ট্রাকটা আর কিছুতেই উঠতে পারছে না। শেষে জয়নুলের ওই গরুগাড়ি ঠেলার ছবির মতো করে ঠেলে ঠেলে তুলতে হয়েছিল ট্রাকটাকে। দেখে খুব খারাপ লেগেছিল।

আমাদের রংপুরের বাসাটা একেবারে রাস্তার উপরে। বাসার সামনে একটা কাঁঠাল গাছ ছিল। একদিন রাতের বেলা একটা ট্রাক পথ ছেড়ে আমাদের বাসাটির দিকে যাত্রা শুরু করে। খবর হতে পারতো, রাস্তা ছেড়ে বাসগৃহে ট্রাক, তিনজনের মৃত্যু; হয়নি। কারণ ওই কাঁঠাল গাছ। কাঁঠাল গাছটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে ট্রাক ও তার ড্রাইভার সম্বিত ফিরে পায় এবং গোঁ গোঁ করতে করতে দাঁড়িয়ে যায়।

ট্রাক সাহেব আমাকে সবচেয়ে বড়ো বাঁচাটা বাঁচিয়ে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটিতে। বুয়েট ক্যাম্পাসকে সোজা দু-ভাগে ভাগ করে মধ্যদিয়ে চলে গেছে এশিয়ান হাইওয়ে। খুবই ব্যস্ত রাস্তা। সারারাত ওই রাস্তা দিয়ে ট্রাক যায়। দিনের বেলা মিনিবাস চলে পাল্লা দিয়ে। বুয়েটের শহীদ মিনারের সামনে ওই রাস্তার মাঝখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একটা ছোট্ট গোল আইল্যান্ড আছে। ট্রাফিক পুলিশ সেই আইল্যান্ডে দাঁড়িয়ে যানবাহনগুলোকে দিক নির্দেশনা দেবেন, এটাই সম্ভবত ওই আইল্যান্ড বানানোর উদ্দেশ্য ছিল। তবে কোনোদিন কোনো ট্রাফিক পুলিশকে এ কর্মটা করতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। পরদিন দিনে রাত্রিবেলা আমরা প্রায়ই শহীদ মিনারের সিঁড়িতে বসে গল্প করতাম। আমরা মানে আমি, রম্য, তৌকির কিংবা মাহফুজ ভাই। এক রাতের ঘটনা। রাত ১২টা থেকে আড্ডা শুরু হয়েছে। আমরা বসেছি রাস্তার মাঝখানের ওই ট্রাফিক পুলিশের আইল্যান্ডটিতে। ১টা, ২টা, ৩টা বেজে গেলো, চা খাওয়া দরকার। বুয়েটের ক্যান্টিন বন্ধ হয়ে গেছে। এতো রাতে খোলা থাকে কেবল মেডিকেল কলেজের ক্যান্টিন। সবাই মিলে হাঁটতে হাঁটতে গেলাম মেডিকেল। চা-টা খেয়ে ফিরছি আধঘন্টাও হয়নি। এসে দেখলাম, ওই ট্রাফিক আইল্যান্ডটি আর নেই, ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। রাতের বেলা রাস্তা ফাঁকা পেয়ে পথের রাজা ট্রাক ধাক্কা দিয়ে ওই সড়কদ্বীপকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়েছে।

উপরে আল্লাহ আছেন, এসবই তাঁর ইচ্ছা, হায়াত-মউত-রিজক-দৌলত।

রিজকের কথায় বছর খানেক আগের একটা ঘটনা মনে পড়ছে। ১৯৯৪ সাল। অক্টোবর মাস। কার্তিকের মন্দা লেগেছে গ্রামে, উত্তরাঞ্চলে মানুষ মারা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না, এই নিয়ে সরকারপক্ষ ও সংবাদপত্রে তুমুল বাহাস। আমি স্কুটারে চড়ে অফিস যাচ্ছি। সকাল বেলা। শরতের মিষ্টি রোদ চারদিকে। মতিঝিল থানার সামনে একটা অদ্ভুত ঘটনা দেখলাম। একটা ট্রাক। এ ট্রাক থেকে চাল বিক্রি করা হয় ন্যায্যমূল্যে। তার পিছনে প্রায় ২০০/৩০০ নারী-পুরুষ লাইন দিয়ে আছে। জটলা ধরনের লাইন। ট্রাকটা কী কারণে যেন পুরোপুরি দাঁড়ায়নি, ধীরে ধীরে চলছে। সেই চলন্ত ট্রাকের পিছনে হুড়মুড় করে চলছে মানব জটলা। তাদের সবাই লাইনের আগে থাকতে চায় বলে ছুটছে। কিন্তু এতো জোরেও ছুটতে পারছে না যে ট্রাকের তলে ঢুকে যায়। আবার পেছন থেকে ঠেলা আসছে ক্রমাগত। সেই চলন্ত ট্রাকের পেছনে চলন্ত লাইন দেখে মানুষগুলোকে মনে হয়েছিল পোকা। যেন একপাল পিপঁড়ে নিজেদের গায়ে গায়ে জড়াজড়ি করে আছে একটা পাতায়। পাতাটা গাছ থেকে পড়লো, তো পিপঁড়েগুলোও পড়লো। শুধু ন্যায্যমূল্যে চাল কেনার জন্য মানুষের এই কষ্টের কথা ভেবে নিজেকে বড়ো অপরাধী মনে হলো। মানুষকে অসম্মান করে এ সমাজটা কী করে টিকে আছে?

কিংবা বলা যায় গত শনি/রবিবারের ঘটনা। বাংলামোটরে ভোরের কাগজ অফিসের চারতলা থেকে রাস্তা দেখা যায়। সকাল বেলা। দুটো ট্রাক এসে থামলো সামনের রাস্তায়।

ট্রাকে একদল লোক, সশস্ত্র, উর্দি পরা, হাতে আগ্নেয়াস্ত্র। তারা সামনের বাড়িটা থেকে ধরে আনলো একজন তরুণকে। ছেলেটিকে তুললো ট্রাকে। মোটা দড়ি দিয়ে বাঁধলো ছেলেটার কোমর। তারপর ট্রাকের লৌহনির্মিত সিটের সঙ্গে ছেলেটিকে বেঁধে ফেললো সাঁটাঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রৌদ্রালোকিত সকাল। রাস্তায় কৌতূহলী মানুষরা তাকিয়ে আছে। বিভিন্ন ভবনের জানালায় দাঁড়িয়ে মানুষ দেখছে—কী ঘটছে রাস্তায়। একটা টগবগে তরুণকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ধরে রেখেছে একটা জলপাই রঙের ট্রাক।

পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটা বড়ো কষ্টের, বড়ো অপমানের।

ভোরের কাগজ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

খোঁড়া জয়নাল জিন্দাবাদ

আমাদের পাড়াটা ছোট, কিন্তু এতো গলি, তস্যগলি, এতো ঘরবাড়ি যে গিজগিজ করছে লোক আর লোক। এই পাড়াটা এখন আমাদের পার্টির ঘাঁটি।

অথচ ঘাঁটি ছিল না। অন্যসব পার্টিরই কমিটি ছিল। আর ছিল আমজনতা। ভেতো পাবলিক। যারা সব দলের জনসভাতেই যায় আর চিনাবাদাম চিবোয়। এ অবস্থা চলতে দেওয়া যায় না। চলতে দিলে বড়ো দল গড়া যায় না।

পাড়ার বখাটে বলে খ্যাতি ছিল খোঁড়া জয়নালের। পাড়ার বাজারে কসাইদের সঙ্গে গোশতের দরদাম নিয়ে ঝগড়া করার পর শোধ তুলতে সে হামলা করেছিল কসাইদের মহল্লায়। বাড়িতে পুরুষরা ছিল না, বউবেটিদের গায়-গতরে হাত দিয়ে একটা কিছু শোধ জয়নাল ঠিকই নিতো; কিন্তু কসাইদের বউয়েরা যে লম্বা লম্বা দা নিয়ে রুখে দাঁড়াবে, জয়নাল ভাবতে পারেনি। জানে বেঁচে সে-যাত্রা সে ফিরে এসেছিল, কিন্তু পায়ের চোটটা তেরোটা সেলাইয়েও পুরোপুরি সারেনি। জয়নালের নামের আগে খোঁড়া বিশেষণটা স্থায়ী হয়ে গেলো।

খোঁড়া জয়নালকে কেউ স্কুল-কলেজের দিকে যেতে দেখেনি। দরকারই বা কী লেখাপড়ার ? অষ্টম শ্রেণী পাস করে যদি দেশ চালানো যায়, পাড়া চালাতে কি অক্ষর চিনতে হয় নাকি ? ফেনসিডিল কেনার টাকা জুটতো না জয়নালের, কিন্তু বেড়া উঠলে সে কী করবে; দুটো বড়ো ড্যাগার আর তিন সঙ্গী নিয়ে সে দাঁড়িয়ে পড়লো বড়ো রাস্তার মধ্যে; পথচারীদের পকেট হাতড়ে যা পেতো, চলেই যেতো। হাতে ড্যাগার দেখতে পেলে লোকগুলো কেমন বাধ্য হয়ে যায়। জয়নাল খুবই মজা পেতো। আরে অস্ত্র, তুমিই সকল ক্ষমতার উৎস।

ছুরি ধরতে শেখার আগে প্রতারণাই ছিল তার উপার্জনের সোর্স। রিকশায় উঠতো একটা পলিথিনের ব্যাগে ধূলিবালি ইট নিয়ে। রিকশাঅলাকে বলতো খুচরো নেই, বিশটা টাকা দাও। তারপর ব্যাগটা রেখে কোনো গলির মুখে রিকশাটা দাঁড় করিয়ে সে কেটে পড়তো।

ছিনতাই করতে গিয়ে একবার ধরা পড়লো। এক পুলিশ অফিসার শালীকে নিয়ে সিভিল ড্রেসে যাচ্ছিলেন, ঠেক দিয়ে বসলো। ফিরে এসে কেবল ফেনসিডিলের মুখ খুলেছে, পুলিশ এসে হাজির। যা মারটাই না খেয়েছিল জয়নাল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার কেউ ছিল না। পঁচেই মরতো। কিন্তু তার জামিন হয়ে গেলো। এক নেতা এসে বললেন, জয়নাল, তোমাকে আমাদের দরকার। পাড়াটাকে সামলাও।

পাড়া সামলাইবো খোঁড়া জয়নালে— কী যে কন না ভাইজান ?

হ্যাঁ, সামলাবে। পাড়া সামলানো খুব সোজা। পাড়া হলো মেয়েমানুষের মতো— নারী চায়না তখ্‌ত, নারী চায় না তক্ত, নারী চায় পুরুষটা হোক লোহার মতো শক্ত।

খোঁড়া জয়নাল সোজা হয়ে গেলো। চকচকে রিভলবার এলো, কাটা রাইফেল এলো। পাড়ার বাজার থেকে চাঁদা ওঠে। প্রতিদিন চারশ দোকান থেকে চার হাজার টাকা। মাসে এক লাখ বিশ। পাড়ার কন্ট্রাক্টরদের কাছ থেকে পঞ্চাশ। ফেন্সি-হেরোইনের চালান থেকে এক লাখ। থানা পুলিশকে দিতে হয় নিয়মিত। আল্লার নেয়ামত একা একা খেতে নাই।

খোঁড়া জয়নাল নেতা হয়ে গেলো। শুদ্ধ বাংলায় বক্তৃতা দেওয়ার চেষ্টা করে। মাঝেমধ্যে ইউনিভার্সিটিতে খ্যাপ মারতে যায়। লেখাপড়াটা না করায় মনে বড়ো কষ্ট হয়; কারণ ভার্সিটির ডবকা ডবকা মেয়েগুলোকে সে পাবে না। তাতে কী, মিছিল-টিছিলে হামলা করে কচলে দেওয়া চলে।

প্রতিমাসে দুই লাখ টাকা আয়, জয়নালের বাবা হামিদ মিস্ত্রির টিনের ঘরে পাঁচতলা ফ্ল্যাট উঠেছে। কিন্তু শুধু বিল্ডিং দেখলে চলবে না, প্রতিমাসে কতো ঝামেলা গেছে পাড়ার আধিপত্য নিয়ে।

তার পার্টিরই অন্য গ্রুপ এসেছে অস্ত্র হাতে, চাঁদা চাইতে। তার গ্রুপের দুজন খুন হয়েছে। অন্য গ্রুপের তিনজনকে জাহান্নামে পাঠাতে হয়েছে। তবে একটা অসুবিধা দূর হয়ে গেছে, পুলিশের ভয়টা আর নাই। পুলিশ উল্টো তাকে সমঝে চলে, সালাম-আদাব দেয়।

এখন পাড়া তার দখলে। পার্টির মিটিঙে এ পাড়া থেকে দুই হাজার লোকের মিছিল যায়। পার্টির মিটিং থাকলে বাজার বন্ধ। সব দোকান থেকে দুজন লোক দিতে হবে— বাধ্যতামূলক। এলএমজি হাতে নিয়ে জয়নাল বাজারে এক চক্কর দেয়। শালারা সুড়সুড় করে মিছিলে আসে। গুনে গুনে মিছিলে আসে। গুনে মিছিল থেকে ফেরত যায়। আরে কতো বড়ো জনসভা হয়! এক পাড়া থেকে দুই হাজার। একশ' পাড়া থেকে দুই লাখ।

জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। আর জনগণের ক্ষমতার উৎস অস্ত্র। অস্ত্র আমার, জনগণ আমার। অস্ত্র উদ্ধার অভিযান চলছে। জয়নাল হাসে। এই শালার থানায় কম টাকা যায় প্রতিমাসে ? এরা আমার ইয়েটা ছিঁড়বে। কেয়ারটেকার সরকার কয় মাস ? আর দুই মাস। তারপর ব্যাটা পুলিশ কোথায় যাবি ? কে ভোটে জিতবে, তুই জানিস ? আমরা জিতবো না, ওরা জিতবে? তাহলে ওদের অস্ত্র আটকাবি কিসের ভরসায় ? ওদেরটা আটকাবি না ? তাহলে আমারটা আটকাতে আসবি ক্যান ? পয়সা খাস নাই ? বাপ দেখ, তোর মেয়েটা বড়ো হয়েছে, বেশি বাড়িস না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তুই থাক, আমিও থাকি। তোর মেয়েটাও দুধেভাতে ভালো থাক। পাড়ায় মিছিল বেরোয়। তোমার ভাই আমার ভাই জয়নাল ভাই। জয়নাল বড়ো নেতা হয়ে উঠছে—একদিন কমিশনার হবে, মেয়র হবে, মন্ত্রী হবে। ইউনিভার্সিটি দখল করবে। জয়নাল ধমক দেয়—ওই, আমার নামে না, নেত্রীর নামে স্লোগান দে।

পুলিশ অফিসারটা দেখে। এই খোঁড়া জয়নাল আমার শালীর চেইন ছিনতাই করে ধরা পড়েছিল। জয়নাল স্যার কি সেটা ভুলে যাননি ? অফিসার তাকে স্যালুট দেয়। কোমরে হাত দিয়ে নতুন মালটার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে জয়নাল পুলিশ অফিসারকে বলে, ওই মিয়ারা, ভালো হইয়া থাইকো। ইয়েস স্যার, পুলিশ অফিসারটি পা ঠুকে জবাব দেয়। খোঁড়া জয়নালের কোমরে বেরিয়ে থাকা এলএমজির নলটা চকচক করে ওঠে। এক ঝলক আলো মেশিনগানের ধাতব গা থেকে প্রতিফলিত হয়ে পুলিশ কর্তার চোখে পড়ে।

ভোরের কাগজ, ১২ এপ্রিল ১৯৯৬

আধুনিক ঈশপের গল্প

একবার এক বাঁদরকে নিযুক্ত করা হইল রাজপুত্রের পাহারাদার হিসাবে। বাঁদরটি ছিল খুবই পরিশ্রমী আর অনুগত। রাজপরিবারকে সে ভালোবাসিত প্রাণাধিক। কর্তব্যপরায়ণতায় সত্য সত্য তাহার কোনো তুলনা ছিল না।

কিন্তু রাজসভার জ্ঞানী প্রবীণ সদস্য এই নিযুক্তির বিরোধিতা করিলেন। তিনি বলিলেন, মহাশয়, বাঁদর যত ভালোই হউক, সে ইতর প্রাণী, সে মূর্খ; তাহাকে এত বড় দায়িত্ব দেওয়া উচিত হইবে না। জ্ঞানবিদ্যা ছাড়া সে ভালো কাজ করিতে চাহিলেও ব্যর্থ হইবে, লেজে-বিষ্ঠায় করিয়া ছাড়িবে।

রাজা বলিলেন, তাহা হইলে আমি এই বাঁদরকে পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি করাইব, সে সেখানে বিদ্যাশিক্ষা করিবে। তাহাই হইল। বছরাধিককাল রাজপণ্ডিতগণ সর্বান্তকরণে তাহাদের এই শাখামৃগ শিক্ষার্থীকে জ্ঞান দান করিলেন। তাহারা বলিলেন, মহারাজ, ইহা মোটেও কঠিন কাজ নহে। কত গাধা পিটাইয়া মানুষ করিলাম, আর একটি বানরকে মানুষ করিতে পারিব না ? বানর তো নরেরই আদিরূপ। রামায়ণে বাঁদরেরা কত কী করিয়াছে।

শিক্ষার্জন শেষে বাঁদরটিকে রাজপুত্রকে পাহারা দিবার দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে অর্পণ করা হইল। রাজসভার বৃদ্ধ জ্ঞানী সদস্য বলিলেন, বৎসরাধিককাল পাঠশালায় গমন করিলেই কেহ রাজকার্য ও রাজনীতি বুঝিবে তাহা ঠিক নহে। রাজনীতি, রাজতন্ত্র, রাজসভা ইত্যাদি হইল উপলব্ধির ব্যাপার। কোনো বোধহীনের পক্ষে এইসব ধারণা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নহে। নির্বোধেরা ডাণ্ডা মারিয়া সবকিছু ঠাণ্ডা করিয়া দেওয়াকেই রাজনীতি বলিয়া জ্ঞান করে। মানুষ, মানুষের অধিকার, গণতন্ত্র ইত্যাদি শব্দ তাহাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কাছে লাঠিতন্ত্র ছাড়া আর কিছুই নহে। তোমরা এমন স্থূলবোধসম্পন্ন প্রাণীর হাতে এত বড় দায়িত্ব অর্পণ করিও না।

বৃদ্ধ জ্ঞানী সদস্যের এই কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না। বিপুল উৎসব আনন্দের মধ্যে রাজদায়িত্বে বাঁদরের অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইল।

বাঁদরের হাতে একখান তরবারি দেওয়া হইল। তাহা লইয়া সে রাজপুত্রের ঘরের দরজায় বসিয়া রহিল। তাহার দায়িত্ব হইল— যদি কেহ বিনানুমতিতে এই গৃহে প্রবেশ করে, তবে তাহার প্রাণ সংহার করা। এই দায়িত্ব পালনে সে শপথ নিল।

কোনো তস্কর এই ঘরে আসিতে সাহস পাইল না। কোনো দুর্বৃত্ত এই গৃহের আশপাশে পা মাড়াইল না। সকলে ধন্যধন্য করিতে লাগিল। রাজা বৃদ্ধ জ্ঞানী সদস্যকে উপহাস করিয়া বলিলেন, কী হে প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ, দেখিলে তো, বাঁদরটি কী রূপ দক্ষতা, যোগ্যতা ও সুনামের সহিত তাহার কর্তব্য পালন করিতেছে।

বৃদ্ধ হাসিয়া বলিলেন, তাহা যদি শেষ পর্যন্ত ঘটে তবে সর্বাপেক্ষা আনন্দিত হইব আমি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস বাঁদরের হাতে তরবারি তুলিয়া দেওয়ার ফল শেষতক ভালো হইবে না।

রাজা ক্ষিপ্ত হইয়া বৃদ্ধকে নানাভাবে ভর্ৎসনা করিলেন। রাজসভার সকলেই বৃদ্ধকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া নানা কটুক্তি করিতে লাগিল।

দিন যায়।

একদিন রাজপুত্র ঘুমাইয়া আছেন। বাঁদর খোলা তরবারি হাতে তাঁহাকে প্রহরা দিতেছে। এমন সময় একটি মাছি দরজা দিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তরবারি হাতে বাঁদর তাহাকে ধরিবার জন্য ছুটিয়া গেল। কিন্তু কিছুতেই এই ক্ষুদ্র মাছিটির সঙ্গে পারিয়া উঠিল না। শেষে মাছিটি বসিল রাজপুত্রের নাকে। এই সুযোগ। বাঁদর তরবারির এক প্রচণ্ড কোপ বসাইলো রাজপুত্রের নাক বরাবর। রাজপুত্রের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল।

বৃদ্ধ বলিলেন, আমি আগেই বলিয়াছিলাম এই রূপ হইবে। অযোগ্য, অনুপযুক্ত, অবোধের হাতে তরবারি তুলিয়া দিও না। সে সবকিছুকে মারিয়া-কাটিয়া শেষ করিবে। দেখো, দেখো, আমাদের শিশু রাজতন্ত্রকে সে কী রূপে শেষ করিল।

ভোরের কাগজ, মার্চ, ১৯৯৬)

উদ্ধৃতাংশের ফাঁকা অংশটুকু

তারা ছিল পাকিস্তানী সৈনিক। তারা কথা বলতো উর্দুভাষায়। পাহারা দিচ্ছিল রামপুরা টিভি ভবনের সামনের রাস্তা। সেটা ১৯৭১ সালের কথা।

মার্চের ৩ তারিখ। ফাল্গুন মাস। আকাশ নীল। শীত এখনো তেমন করে যায়নি। বসন্তের বাতাসে আরামবোধ হওয়ার কথা। কিন্তু সৈনিকেরা আরামবোধ করছে না। এই বাতাসে ছড়াচ্ছে ষড়যন্ত্র। চারদিকে মিছিল, স্লোগান। পথে পথে ব্যারিকেড। টায়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পোড়া গন্ধ। কাঁদানে গ্যাস। আজ ঢাকায় হরতালের দ্বিতীয় দিন। জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা ছিল। সেটা স্থগিত করা হয়েছে। দেশ ফুঁসছে। ঢাকা এখন মিছিলের নগরী।

ফারুক ইকবাল। আবুজর গিফারি কলেজের নির্বাচিত ছাত্র-সংসদের সাধারণ সম্পাদক। ছাত্রলীগের কর্মী। '৬৯ থেকেই খুবই ব্যস্ত। আসাদের সঙ্গে কাজ করেছেন। আসাদের সঙ্গে পায়ে পা মিলিয়ে করেছেন মিছিল। আসাদ নেই। তাঁর শার্ট হয়ে গেছে বাঙালির প্রাণের পতাকা। '৭০-এ খুবই ব্যস্ততা গেছে ফারুক ইকবালের। নির্বাচন। নির্বাচনের লক্ষ্য এক— বাংলার মুক্তি। সারারাত জেগে জেগে পোস্টার লিখতেন ফারুক। তারপর বেরিয়ে পড়তেন। তাঁর মা উদ্বিগ্নবোধ করতেন। ফারুক বলতেন—খুব বেশিদিন লাগবে না, বাংলা স্বাধীন হবে, সবার মুখে ফুটে উঠবে হাসি। এলো ৩ মার্চ। একাত্তর সালের ৩ মার্চ। বিকেলে পল্টন মোড়ে শেখ মুজিবের জনসভা, মিছিল আসছে চারদিক থেকে।

মগবাজার-মালিবাগ-রামপুরা এলাকার লোকও জড়ো হচ্ছে। মিছিল হবে। মিছিল মিলিত হবে মহামিছিলে। শেখ মুজিবের জনসভায়। বঙ্গবন্ধুর জনসভায়। জয়বাংলার জনসভায়।

সেই মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন শহীদ ফারুক ইকবাল। তার কণ্ঠস্বর ভালো, গগনবিদারী। তার চোয়াল দৃঢ়, চোখদুটো কোমল— তাতে প্রগাঢ় ভালোবাসা।

ফারুক ইকবাল স্লোগানের নেতৃত্ব নিলেন, বললেন, 'জয় বাংলা।' সঙ্গে সঙ্গে জনতা মেলালো কণ্ঠ, 'জয় বাংলা।' এ স্লোগান যেন আগুনের পরশমণি। আগুন ছড়িয়ে গেলো প্রতিটি মিছিলম্যানের রক্তে রক্তে। মিছিল এদিকেই আসছে। সৈন্যরা সতর্ক হলো। ও শালে লোগ প্রসেশন লেকে ইধারই আ রাহা। ও শালে লোগ জয় বাংলা ভি বলতা রাহা। শালারা মিছিল নিয়ে এদিকেই আসছে। শালারা আবার জয় বাংলা বলছে। জয় বাংলা। সৈন্যদের বুক উঠলো কেঁপে। জয় বাংলা স্লোগানটি তেমন সুবিধার নয়, হৃৎকম্প দেখা দেয়।

মিছিল আসছে। ওয়ারলেসে খবর এলো। সামনের ঐ নেতাটিই কালপ্রিট। ফারুক ইকবাল, ছাত্রলীগ করে। আবুজর গিফারি কলেজের নেতা।

সৈন্যদের কমাণ্ডার এগিয়ে গেলো। ইশারায় ডাকলো নেতাটিকে। ফারুক ইকবাল এগিয়ে এলেন। কমান্ডার বললো, এদিকে মিছিল এনো না। অন্যদিকে যাও।

ফারুক ইকবাল জবাবে বললেন, তোমরা তোমাদের কাজ করো। আমরা আমাদের পথেই যাবো। টিভি ভবন আমাদের লক্ষ্য নয়। আমরা পল্টনে যাচ্ছি।

ফারুক ফিরে এলেন মিছিলে। আবার স্লোগান 'জয় বাংলা'।

সৈন্যদের মাথা গরম হয়ে গেলো। 'জয়বাংলা' 'জয়বাংলা' বলতা রাহা। ফায়ার। গুলি চললো। গরম সীসার হিস্‌স্‌ ধ্বনি। বুলেট বিদ্ধ করলো ফারুক ইকবালের বুক। মালিবাগের মোড়ে পথে লুটিয়ে পড়লেন ফারুক ইকবাল।

একবার অস্ফুট স্বরে বললেন 'পানি'। রাস্তার পাশের দোকানে কী কাজে এসেছিলেন এক মহিলা। পাশেই তার বাসা। তিনি দৌড়ে গেলেন বাসার ভিতরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

একটা জগ আর গ্লাস হাতে তাড়াতাড়ি এলেন পথে। এসে দেখলেন ফারুক ইকবাল ঢলে পড়েছেন, নিস্তেজ হয়ে গেছেন একেবারে। পানি ধরলেন মহিলা, সেদিকে তাকানোর সময় নেই ফারুকের। বুক থেকে রক্ত ঝরছে, সেই রক্তে আঙুল ডুবিয়ে তিনি রাস্তায় লিখছেন 'জয় বাংলা।'

মহিলার হাতে-ধরা পানির গ্লাস ধরাই থাকলো। ফারুক ইকবাল মারা গেলেন।

১৯৭১ সালের প্রথম শহীদ, শুয়ে আছেন মৌচাক চৌরাস্তার মোড়ে। মৃত্যুর আগে যিনি নিজের বুকের রক্তে লিখে গেছেন 'জয় বাংলা'। প্রিয় পাঠক, এবারে নিচের খবরটি পড়ুন।

'জগন্নাথ হলে ছাত্রদের উপর স্মরণকালের বর্বরোচিত হামলা ও পৈশাচিক নির্যাতনের পর পুলিশ প্রধানত ছাত্রলীগ কর্মীদের অবস্থানস্থল স্যার সলিমুল্লাহ হলেও হামলা ও নির্যাতন চালায়। রুমে রুমে ঢুকে পুলিশ ছাত্রদের শর্টগান ও লাঠিপেটা করে এবং রুমের বিছানাপত্র তছনছ করে। পুলিশ ছাত্রলীগের কর্মীদের '--জয়বাংলা কও', 'তোমার.....মধ্যে জয় বাংলা ঢুকাব' ইত্যাদি অশ্লীল গালিগালাজ করিয়া মারধর করে।' (জগন্নাথ হলে পুলিশের নগ্ন হামলায় ২ শতাধিক ছাত্র আহত, দৈনিক ইত্তেফাক, ১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬)। প্রিয় পাঠক, উপরের উদ্ধৃতাংশে পুলিশের উক্তির যে অংশটুকু ইত্তেফাক ফাঁকা রেখেছে, তা পূরণ করুন এবং করণীয় সম্পর্কে নিজেই সিদ্ধান্ত নিন। তবে আপনার হাত খুব বেশি লম্বা নয় যে নাগালের মধ্যে পাবেন সবাইকে।

পুনশ্চ : সমাজবিজ্ঞানের ক্লাসে ম্যাডাম বলছেন, ডিকটেটর হবে তার দেশে জনপ্রিয়। আমরা ছিলাম তাঁর ছাত্র, বললাম, 'ম্যাডাম, তাহলে কি এরশাদ ডিকটেটর নন ?'

ম্যাডাম বললেন, তিনি যদি জনপ্রিয় না হন, সংজ্ঞানুযায়ী তিনি ডিকটেটর নন। ডিকটেটররা অন্ধের মতো যা খুশি তাই করতে শুরু করেন, ধরাকে সরা অর্থাৎ পৃথিবীকে পিরিচের সমান ভাবতে শুরু করেন, তার কারণ তাদের উত্থানের পিছনে ছিল জনগণের সমর্থন। সেটাই তাদের ধীরে ধীরে অন্ধ করে ফেলে, দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য করে তোলে। যেমন ছিলেন হিটলার।

আজ অনেকদিন পর সমাজবিজ্ঞান ক্লাসের সেই বিদূষী শিক্ষিকাকে মনে পড়ছে।

ভোরের কাগজ, ২ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

মানুষের খাদ্যতালিকা

বাস চলছে।

আমরা তিনজন।

আমি, তপু আর বাহার। এক সিটে ঠাসাঠাসি করে বসা।

তপু ছেলেটা দেখতে মেয়েদের মতো, হাসলে টোল পড়ে গালে, সেটা ঢাকতে সে গোঁফ রেখেছে। ১৮ বছরের তপুর গোঁফ এখনো পুরো হয়নি; দেখলে মনে হয় সিনেমার ববিতা ছদ্মবেশ নিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বাহার লম্বা আর মোটা। এই বয়সে তাকে দেখায় ৪০ বছরের প্রৌঢ়। বাসের তিনজনের আসনের অর্ধেকটাই সে একা দখল করে রেখেছে। আর তার হাঁটু গিয়ে লাগছে সামনের সিটে।

আমি বললাম, বাহার, হাঁটু সাইডে রাখ, না হলে সামনের সিট খুলে যাবে।

সামনের সিটে একজন বৃদ্ধ আর এক ছোট্ট বালক।

বাহার বললো, বল তো, ছেলেটা ওনার কী হয় ?

তপু বললো, নাতি ছাড়া আবার কে ? দাদু-নাতি যাচ্ছে।

সামনের সিটের বৃদ্ধ ঘুমিয়ে পড়েছেন। নাক ডাকার শব্দ আসছে। চলন্ত বাসের শব্দ ছাড়িয়ে সে শব্দ আমাদের কানে আসছে।

ছেলেটা ডাকলো, আব্বাজান, আব্বাজান, ঘুমাইয়া পড়লেন নাকি ?

তাহলে পিতাপুত্র যাচ্ছে, পিতামহ-পৌত্র নয়।

আমরা তিনজন বাড়ি ফিরছি। সায়েদাবাদে উঠে পড়েছি বাসে। রাত ৯টা বাজে। হাতঘড়ি দেখলাম জানালা দিয়ে আসা রাস্তার ধারের দোকানের আলোয়। বাসটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা।

আমরা তিনবন্ধু। আইএসসি পাস করেছি। ঢাকায় গিয়েছিলাম কোচিং সেন্টারের ধান্দায়। বুয়েটে, মেডিকেলে, অন্তত ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে তো চান্স পেতেই হবে। দেরিটা হলো আমার জন্যই। হঠাৎ করে বড়োভাইয়ের বাসায় তার তিন শ্যালিকা এসে হাজির। ভাবীর নিজের বোন নয়, খালাতো-মামাতো ডালপালার বোন। এর মধ্যে একটা, ঝুমু, বেশ টগবগে। খিলখিল করে হাসে। ভাইজানের বিয়ের দিন গেট ধরা নিয়ে এ মেয়েটির সঙ্গে বেশ ঝগড়াঝাটি হয়েছিল।

আজ ঝুমু বলেছে, মাসুম ভাইজান, সেইদিনের ঝগড়াটা মিটায়া ফেলতে আসলাম।

কথা শুনে আমি বেশ ঘাবড়ে গেলাম। শীতকাল, ডিসেম্বর মাস, তবু ভিতরে ভিতরে ঘেমে গেলাম।

ঝুমুরা ভাইজানের বাসায় থাকছে তিনদিন, আজকের রাতটা অন্তত আমার উচিত ছিল ওখানে থাকা। মেয়েটিকে পাঁচটি মিনিটের জন্য যদি একলা পাওয়া যেতো।

তিনদিন আগে মায়ের চিঠি পেয়েছি। মা লিখেছে, মাসুম, ১০ তারিখের মধ্যেই চলে আয়। বাড়িতে মেহমান এসেছে। বড়ো মোরগদুটো এবার জবাই করবো। পোলাও রাঁধবো।

বেশ কদিন বাড়ি যাওয়া হয় না। এদিকে ঝুমু মেয়েটি ভাইজানের বিয়ের রাতে কথায় আমাদের বেশ নাজেহাল করেছে। মেয়েটির নাক ঘামে। স্বামীসোহাগী মেয়ে হবে। মেয়েটিকে একবার জড়িয়ে ধরে যদি...।

বাহার একদিন আমাকে বলেছিল, জানিস, শামীমা আপাকে আমি চিপছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, চিপছি মানে কী ?

মঈন স্যারের ক্লাস চলছিল। বাহার লজ্জিত ভঙ্গিতে আমার মুখ চেপে ধরলো। চুপ, চুপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমি নিষ্পাপ ভঙ্গিতে ফের জিজ্ঞেস করলাম, চিপছি মানে কী ? টপসি-পেপসি অনেক শুনছি, চিপছি শুনিনি।

বাস চলছে। রাতের অন্ধকারে চলন্ত বাসের শব্দ শুনলে কেমন যেন লাগে।

মাসুম, সিগারেট খাবি ? তপুর হাতে গোল্ডলিফের প্যাকেট।

আমি বললাম, তুই ধরা, কম্পানিতে আগুন লাগলে আমাকে দিস।

বাসটা ফাঁকা ফাঁকা। ড্রাইভার চালাচ্ছে খুব ধীরে। জানালা দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস আসছে। জানালার কপাটে কাঠ নেই।

ঢাকায় আমি থাকি মগবাজারে ভাইজানের বাসায়। তপু থাকে আজিমপুর বোনের ওখানে। আর বাহার থাকে এসএম হলে, ফরিদ ভাইয়ের সিটে ডাবলিং করে।

বাহার বললো, শালার বাস কখন যে পৌছাইবো ? রাজার বাড়ির আগুন নিভানো দরকার।

রাজার বাড়ির আগুন নেভানো দরকার মানে ওর এখন জলবিয়োগের ডাক পড়েছে। আমাদের কোড ল্যাংগুয়েজ এটা। গালিভারস ট্রাভেল পড়ে এটা আবিষ্কার করেছিল লম্বা মিঠু। গালিভার একবার মূত্রসিঞ্চন করে লিলিপুটদের রাজবাড়ির আগুন নিভিয়েছিলেন।

আর পাঁচ মিনিট। এই তো যাত্রাবাড়ী এসেই গেলো। ধীরে ধীরে ঢাকা শহরের ভিড়ভাট্টা কমে আসছে।

বাসটা থামলো। কেন, কে জানে ? এই বাহার, এখানেই আগুন নেভাবি নাকি ? আমি বললাম। তপু বললো, না।

কতগুলো লোক গেটে জটলা করছে। শ্রমিক ধরনের লোক। দু-তিনজন লাঠি হাতে উপরে উঠে এলো।

'ওই, এইডা কার বাস ?'

'নাম। নাম। চিনছি।' হল্লা করতে করতে লোকগুলো নেমে গেলো।

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ হলো। সামনে আগুন আর আগুন। ওই তপু জানালা খোল। তপু জানালা খুলতে পারছে না। আগুনে বাহারের জিনস জ্বলছে। সে প্যান্টে মুতে দিয়েছে। তবু আগুন নিভছে না। আমার সমস্ত গায়ে আগুন।

মা, মাগো। চামড়া পুড়ে যাচ্ছে, চোখ ফুটে যাচ্ছে, চর্বি গলে জ্বলে উঠছে, আগুন, কেয়ামত, দোযখ...

(উপরের কল্পকাহিনীর সঙ্গে নিচের সংবাদের কোনো সম্পর্ক নেই)
অতঃপর সংবাদপত্রের পাতা থেকে :

পরিবহন খাতের চাঁদবাজির কোন্দলে বাসে আগুন, ৯ যাত্রী পুড়ে ছাই, ১৩ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

কাগজ প্রতিবেদক : রাজধানীর যাত্রাবাড়ী মোড়ে সোমবার গভীর রাতে একটি দূরপাল্লার যাত্রীবাহী বাসে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে বাসের ৯ জন যাত্রী পুড়ে মারা গেছে।...ঘটনাস্থলে দগ্ধমৃত ৮ জনের কারো নাম-পরিচয় জানা যায়নি। আগুনে পুড়ে তাদের সমস্ত শরীর কয়লা হয়ে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

স্মরণকালের ভয়াবহতম এ বাস অগ্নিকাণ্ডের কারণ সম্পর্কে বিভিন্ন সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বেসরকারি পরিবহন খাতের হীন স্বার্থবাদী মহলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও প্রভাব বিস্তারকে কেন্দ্র করে বিবাদমান দুই গ্রুপের একটির সন্ত্রাসীরা বাসে উঠে পেট্রোল ঢেলে বাসটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

ভোরের কাগজ, ০৬.১২. ৯৫

ফলো আপ : বাসে আগুন

গত ৪ ডিসেম্বর যাত্রাবাড়ীতে যাত্রীবাহী বাসে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার মামলায় পরপর ৩ জন বাদি হওয়া ও প্রভাবশালী মহলের বিভিন্নমুখী চাপের কারণে মামলাটির তদন্তে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে।...

গোয়েন্দা পুলিশের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তা জানান, 'সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতায় বুঝে নেন। সরকার এতো বড়ো একটি ঘটনায় কোনো তদন্ত কমিটি গঠন করেনি। হতাহতদের কোনো ক্ষতিপূরণ বা চিকিৎসাবাবদ কোনো খরচ দেয়নি' গোয়েন্দা পুলিশের সূত্রটি বলেন, 'উভয়পক্ষই একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। সত্য ঘটনার প্রকাশ আগামী নির্বাচনে প্রভাব ফেলবে। অতএব তদন্ত চলছে। আসামি ধরা পড়ছে। হয়তো চার্জশিটও হবে। আপনাকে কাগজ-কলম না দিয়ে বরং হাত বেঁধে এই প্রতিবেদন তদন্ত করে লেখার হুকুম দেওয়া হলো। লিখুন।' *ভোরের কাগজ, ২১.১২.৯৫*

আবার আমার কথা

আমি এখন কয়লা। মানুষ পুড়ে গেলে থাকে শুধু কয়লা। আমার পাশে শুয়ে আছে আরো ৭টা কয়লা। কালো কুচকুচে। আমাদের আর কোনো পরিচয় নেই। তপুর কোনো পরিচয় নেই। বাহারের কোনো পরিচয় নেই। আমরা কয়লা। আমার মা পোলাও রেঁধেছে। সে তো জানে না, আমি কয়লা। সে কোনোদিন জানবেও না আমি কোথায়। সে অপেক্ষা করবে। আশায় আশায় থাকবে। আশাটা বেঁচে থাকায় সেও বেঁচে থাকবে এবং ভোটও দেবে। এবং যাকে ভোট দিয়েছে, তাকে জিততে দেখে সে খুশি হবে। তাদের জন্য দোয়া করবে।

দক্ষিণ এশিয়ার অমানবিকতা

দক্ষিণ এশিয়ার লোকেরা খুব নিষ্ঠুর। তারা জীবন্ত বাঁদরের মাথা টেবিলের ফাঁকে আটকায়। আগুন জ্বালিয়ে দেয়। বাঁদরের মাথার খুলি উন্মোচন করে। মগজ ফুটতে থাকে। মসলা ছিটিয়ে চামচ দিয়ে তুলে তারা বাঁদরের মগজ খেতে থাকে। গরম গরম খাওয়া।

বাংলাদেশের মানুষ নিষ্ঠুর নয়। তাদের রাজনীতিতে নিষ্ঠুরতা নেই। পিতার রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে বালক পুত্রকে এখানে কেউ হত্যা করে না। অর্থ-ক্ষমতা-রাজনৈতিক স্বার্থে কেউ খুনোখুনি করে না। আমরা খুব ভালো। আমরা আমাদের নেতাদের গলায় তাই ফুলের মালা দেই। সুগন্ধি ফুলের রঙিন মালা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আমরা বেঁচে আছি কেন ?

স্ট্যালিনের ছেলে জ্যাকব কীভাবে মরেছিল ? ১৯৮০ সালে প্রকাশিত সানডে টাইমসের একটা সংখ্যা থেকে ব্যাপারটা জানা যায়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান অধিকৃত এলাকায় জ্যাকবকে রাখা হয় একটা শিবিরে। তার সঙ্গে ছিল কতোগুলো ব্রিটিশ অফিসার। তারা সবাই একই শৌচাগার ব্যবহার করতো। স্ট্যালিনের ছেলে অভ্যাসমতো শৌচাগার নোংরা করে রাখতো। ব্রিটিশ সৈন্যরা এমন নোংরা লেট্রিন ব্যবহার করতে অস্বীকৃতি জানালো। এমনকি পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মানবের পুত্রের পুরীষও তারা সহ্য করতে প্রস্তুত ছিল না। তারা স্ট্যালিনপুত্রকে সাবধান করে দিলো। তাকে বললো বাথরুম পরিষ্কার রাখতে। স্ট্যালিনপুত্র ক্ষেপে গেলো, ঝগড়া করলো, মারামারি করলো। শেষ পর্যন্ত সে গেলো শিবিরের কমান্ডারের কাছে সালিশ নিয়ে। উদ্ধত জার্মান কমান্ডার বললো, দ্যাখো বাপু, আমি একজন জার্মান, আমার পক্ষে গু-টু নিয়ে কোনোকিছু শোনা সম্ভব নয়। স্ট্যালিনের ছেলে এই অপমান সহ্য করতে পারলো না। রুশভাষায় যতো অভিশাপ আছে, দিতে দিতে ছোটাছুটি করতে করতে সে ঝাঁপ দিলো শিবিরের কাঁটাতারের বেড়ায়। সেটা ছিল বিদ্যুতায়িত। তার দেহ ক্ষতবিক্ষত হলো, সেই দেহে আর কোনো দিনে কোনো ব্রিটিশের লেট্রিন নোংরা করতে পারবে না। স্ট্যালিনের ছেলে মারা গেলো।

২.

প্রিয় পাঠক, আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনাদের ছুটির দিনটিকে এভাবে মল-মৃত্যু প্রসঙ্গ দিয়ে নষ্ট করতে আমি চাইনি। বস্তুত উপরের কাহিনীটুকু আমি লিখিনি। এটা মিলান কুন্ডেরার উপন্যাস 'দি আনবিয়ারেবল লাইটনেস অফ বিং' থেকে উদ্ধৃত করলাম মাত্র।

কুন্ডেরা আরো লিখেছেন,' স্ট্যালিনের ছেলে গুয়ের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছে। কিন্তু গুয়ের জন্য মরা কোনো অর্থহীন মৃত্যু নয়। যে জার্মানরা তাদের দেশের সীমানা পূর্বদিকে বাড়ানোর জন্য প্রাণ দিয়েছেন, কিংবা যে রাশানরা পশ্চিমদিকে তাদের দেশের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আত্মোৎসর্গ করেছেন— তারা মরেছেন আহাম্মকের মতো, তাদের মরার কোনো মানে নেই, নেই কোনো উপযোগিতা।

৩.

না, কুন্ডেরা ঠিক বলেননি। কোনো মৃত্যুই অর্থহীন নয়। বিশেষ করে দেশের জন্য মৃত্যু, বিশেষ করে আদর্শের জন্য মৃত্যু। যে হাজার হাজার তরুণ মুক্তিযুদ্ধোত্তর কালে জীবন সঁপেছে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জন্য, আমি তাদের ঈর্ষা করি। যে শত শত মানুষ শহীদ হয়েছে এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আন্দোলনে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাদের প্রতি আমার শ্রদ্ধার শেষ নেই। কারণ তাদের উদ্দেশ্য ছিলো মহৎ। তাদের দু-চোখ ভরা ছিল স্বপ্ন।

এমনকি যে তরুণী মরেছে সালমান শাহের জন্য, সেও তো মরেছে একটা কিছুর জন্য। কিন্তু আমরা যারা বেঁচে আছি, এই বাংলাদেশে, তারা কিসের জন্য বেঁচে আছি? আবদুর রহমান বিশ্বাস যে রুলস অফ বিজনেসে স্বাক্ষর করলেন না, কিসের জন্য করলেন না?

৪.

গণতন্ত্র ও ভোটাধিকারের সংগ্রামের শহীদদের মৃত্যু বৃথা যায়নি, সেটা প্রমাণ করার দায়িত্ব যারা বেঁচে আছেন তাদের।

কিন্তু একদিকে জেহাদ-নূর হোসেন রক্ত দিলো, আরেক দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র কিংবা ইডেন কলেজের একজন ছাত্রী মাত্র পাঁচ বছরে বৈধ আয়ের কোনো উৎস না থাকা সত্ত্বেও ঢাকা শহরে গোটা দুয়েক বাড়ি, অসংখ্য প্লট, গোটা দশেক পাজেরো গাড়ি, ইন্দোসুয়েজ ব্যাংকে নগদ এক কোটি টাকা অর্জন করলো।

একজন ছাত্রনেতা দশ হাজার টন সার তুলে গোটাটাই কালোবাজারে বেচে দিলো এবং সারের দাবিতে ১৮ জন কৃষক মারা গেলো। কে যে কিসের জন্য বেঁচে আছে, আর কে যে কিসের জন্য মারা যাচ্ছে! গোলমাল হয়ে যাচ্ছে বটে।

৫.

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রায় ৪০০ জন সমর্থক, স্তাবক (কিছুসংখ্যক দলীয় লোকও ছিলেন) এবং বিটিভি ক্যামেরার সামনে বলেছেন, 'বিটিভি এখন আগের চেয়ে বেশি স্বায়ত্তশাসন ভোগ করছে।' (তালি...)।

ওদিকে বিএনপি নেতৃবৃন্দ বলেছেন, আমাদের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে হয়রানির মামলা করা হবে, আর আমরা বসে থাকবো তা হয় না। ডাইরেক্ট অ্যাকশন। তারা আরো বলেছেন, কতিপয় সুবিধাপ্রাপ্ত লোক ও সংবাদপত্র ছাড়া সরকারের আর কোনো সমর্থক নেই।

বিএনপি নেতৃবৃন্দের অবশ্য বড়ো রাগ পত্রপত্রিকাগুলোর ওপরে। তবে বিএনপি সমর্থক পত্রিকা আছে এদেশে দুটি। বিএনপিকে সমর্থন করা ছাড়াও আরেকটা ব্যাপারে তাদের মিল আছে। উভয় পত্রিকার নামের মধ্যে 'দিন' শব্দটি রয়েছে।

৬.

এসব দেখেশুনে মনে হচ্ছে, যারা মরেছে, তারা বেঁচে গেছে। এই পৃথিবীর নানা হতাশাব্যঞ্জক বিষয় তাদের আর দেখতে হচ্ছে না।

যারা বেঁচে আছে, এবং কোনো সরকারের নিকটবর্তী হচ্ছে, তেল ডলছে, এবং মাত্র ৫ বছরের মধ্যে ব্যাংকের কেরানি থেকে দশটা পাজেরো, দুটো বাড়ি ও কোটি কোটি টাকার মালিক হচ্ছে এবং অতঃপর যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা হলে শত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শত মানুষ তার প্রতিবাদ করছে, বিক্ষোভ করছে এবং জীবন দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তারাও মহৎ উদ্দেশে বেঁচে আছে।

আর আমরা যারা এসব কথাকার্টুন লিখছি, এসব পড়ছি এবং ভোট দিচ্ছি—আমরা সবাই বেঁচে আছি, কিন্তু কেন ? কিসের জন্য ? কুন্ডেরা কী বলতেন ?

ভোরের কাগজ, ৪ অক্টোবর ১৯৯৬

পুনশ্চ প্রাগৈতিহাসিক

ঢাকায় ইদানীং কাজের লোকের খুবই সঙ্কট। শাহিদা-উন-নবী সেটা এখন হাড়ে হাড়ে বুঝছেন। শাহিদা-উন-নবী বিশিষ্ট উন্নয়ন-সংগঠক, সমাজকর্মী। তিনি নিজে চার-পাঁচটা উন্নয়ন সংস্থার কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিতে আছেন। সুতরাং ভীষণ ব্যস্ত। ঘর-সংসার দেখার সময় তার, সঙ্গত কারণেই, হয়ে ওঠে না। ঘর-সংসার দেখা কি তার একার দায়িত্ব ? তিনি এ প্রশ্ন তুলতে পারতেন। কিন্তু তিনি তুলবেন না। কারণ তার স্বামী রাশেদ-উন-নবী আরো ব্যস্ত। বৃহত্তর গরিব মানুষের দারিদ্র্য দূর করতে তিনি বিশাল কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। বস্তুত মিস্টার নবীর সুবাদেই শাহিদা-উন-নবী বিভিন্ন এনজিওর কর্ণধার হতে পেরেছে। সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য, সাফল্য ও সুখ্যাতি আজ তার করতলে। ফোর-হুইল-ড্রাইভ গাড়ি, বাগানঘেরা বাড়ি, আজ জেনেভা কাল কায়রো—এসব ছেলেখেলা হয়েছে রাশেদের সৃজনশীলতা, বুদ্ধিমত্তা ও কর্মদক্ষতার কারণে।

বহুদিনের পুরোনো পরিচারিকা হালিমা কয়েকদিন থেকে এ গৃহ ত্যাগ করেছে। এ ঘরের ম্যানেজমেন্ট হালিমার হাতেই ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত ছিলেন শাহিদা। এখন সে চলে যাওয়ায় নিজের দু-হাত কাটা মনে হচ্ছে তার। স্যান্ডেল খুঁজে পাচ্ছেন না, সকালের ব্রেকফাস্ট টেবিলে খাবার-দাবার আসছে উল্টাপাল্টা; কোলের বাচ্চাটাকেই বা তিনি কার কাছে রেখে বেরোবেন ? শাহিদা-উন-নবী নিজের চুল ছিঁড়তে লাগলেন। তার কান্না পেতে লাগলো। হালিমা এই নিমক-হারামিটা করতে পারলো ?

তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন হালিমার বস্তিতে যাবেন। তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার ফেরত আনবেন। যে-কথা সেই কাজ। শাহিদার বিশাল নিসান প্যাট্রেল বস্তির সামনে গিয়ে থামলো। একটা চিকন নোংরা গলি। নাকে রুমাল চেপে পেরিয়ে তিনি পৌঁছলেন হালিমার ছাপড়ায়। হালিমা ঘরে ছিল। বললো, আম্মা, ভিতরে আইসেন। বসেন।

শাহিদা গেলেন এবং বসলেন।

ঘরের ভিতরে ঢুকে শাহিদার চক্ষু চড়কগাছ। ভিতরে রঙিন টিভি। ভিসিপিতে হিন্দি ছবি চলছে। আঁখ মারে ও লাড়কা আঁখ মারে।

হালিমা বললো আম্মায় কী খাইবেন ? ঠাণ্ডা খাওয়াই ? ফ্রিজ তো কিনি নাই। দোকান থাক্যা আনতে হইবো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শাহিদা হিসাব মেলাতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। গৃহপরিচারিকার গৃহে এসব কিসের লক্ষণ ?

শাহিদা বললেন, হালিমা, আমি তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। তুমি চলো।

হালিমা বলল, না আম্মা, যাই কেমনে ? ঘরদোর সাজাই, কতো কাম। এই ঘর ফালায়া যাওয়া যায়, কন ?

শাহিদা আর নিজেকে সংবরণ করতে পারলেন না। বললেন, কী ব্যাপার হালিমা। তোমাদের ঘরে এইসব টিভি-ভিসিপি কেন ?

হালিমা বললো, আল্লাহ মুখতুইলা চাইছে আম্মা, সংসারে আর অভাব নাই। আমার ছোডো ভাইটার জানেন তো আম্মা, দুইডা পা নাই। অরে রাস্তার ধারে ফালায়া রাখি। রোজ তিনশ-চারশ টাকা আহে।

শাহিদা বেরিয়ে এলেন। সঙ্গে হালিমা এলো এগিয়ে দিতে। গলি পেরিয়ে গাড়িতে উঠতে যাবেন। পথের ধারে দেখলেন একট সরীসৃপ আকৃতির পঙ্গু শিশু।

হালিমা বললো, এইডাই আমার ভাই।

শাহিদা খুব রেগে গেলেন। রেগেমেগে ফিরে এলেন বাসায়।

রাতে খাবার টেবিলে এই নিয়ে কথা হলো রাশেদের সঙ্গে। সব খুলে বললেন স্বামীকে। বললেন, কী অবিচার বলো, নিজের পঙ্গু ভাইকে রাস্তায় ফেলে রেখে সেই টাকায় ভিসিপি, কালার টিভি ?

রাশেদ-উন-নবী হঠাৎ উঠে পড়লেন ভাতের থালা রেখে। হাত ধুলেন। বারান্দায় গেলেন। শাহিদা বললেন, কী ব্যাপার, কী হলো ? রাশেদ স্ত্রীর প্রশ্নের জবাব দিলেন না। এ প্রশ্নের জবাব তিনি মুখে বলতে পারবেন না। তার মনে নানা জটিল চিন্তা। এই যে উন্নয়নের নামে, সংস্কৃতির নামে, টেকসই লাগসই প্রযুক্তির নামে, পরিবেশের নামে, অধিকারের নামে তার দেশব্যাপী কার্যক্রম, এই যে গাড়ি-বাড়ি, কোটি কোটি টাকায় গড়ে-ওঠা অটল সাম্রাজ্য, এসবই গড়ে উঠেছে বিদেশী সাহায্যে। বিদেশের দাতা সংগঠনগুলো এসব টাকা পায় নিজ নিজ দেশের দাতা-দয়ালু মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের দয়া-দাক্ষিণ্য থেকে। একবার কানাডার স্কুল ছাত্ররা রাস্তায় গাড়ি পরিষ্কার করে টাকা পাঠিয়েছিল বাংলাদেশের দুর্যোগকবলিত মানুষদের জন্য।

হালিমার রঙিন টিভি-ভিসিআর আর তার এই এয়ারকন্ডিশন ও বাগানঘেরা প্রাসাদোপম বাড়ি—দুটোরই ব্যয় নির্বাহ হয়েছে একই টাকা থেকে। গরিব-দুঃখী মানুষদের জন্য দয়ালু দানশীল মানুষের দানের টাকায়। যে টাকার বিনিময়ে দাতাদের দেখাতে হয় মানুষের অসহায়ত্ব ও দারিদ্র্য।

রাশেদ-উন-নবীর মনে হলো তিনি আর বিশিষ্ট উন্নয়ন-সংগঠক নন। তিনি একজন হালিমা, যে নিজ বস্তিঘরে বসে ভিসিপিতে হিন্দি ছবি দেখছে। কিন্তু এই মনে হওয়া ক্ষণিকের। দেশে আর্সেনিক সঙ্কট নিয়ে আয়োজিত একটা সেমিনারে যেতে হবে কাল ভোরে, সুতরাং শুয়ে পড়া দরকার। রাশেদ-দম্পতি ঘুমিয়ে পড়লেন।

ভোরের কাগজ, ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চেয়ারের গল্প

আমার এই গল্পটা নিতান্তই গাঁও-গেরামের গল্প। তাও অনেককাল আগের। আমার ছেলেবেলার। সবটুকু গল্প মনে রাখা যায় ? দুদিন আগের ঘটনাই যেখানে ঠিকভাবে স্মরণ করতে পারি না।

তখন রংপুর ছিল জেলা। গাইবান্ধা ছিল মহকুমা। গোবিন্দগঞ্জ থানার একটা গ্রাম কুঠিবাড়ি। গ্রামে একটা নীলকুঠি ছিল। নীলকরদের বিরুদ্ধে চাষীদের সংগ্রাম শুরু হওয়ার পর এবং নীলচাষ অলাভজনক হয়ে পড়ার পর কুঠিটাই পড়ে থাকে; নীলকররা বিদায় নেয়। ক্রমে সেটা পরিণত হয় সরকারি খাস সম্পত্তিতে। পুরোনো বাড়ি, সুরকির দেয়াল জোড়া বট-অশ্বত্থের গাছ, মেঝের ফাটল দিয়ে ঢেঁকিশাকের বিস্তার আর বাড়িটার উপরে একটা ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছ; সব মিলিয়ে বাড়িটার মধ্যে একটা রহস্য রহস্য গন্ধ ছিল। তবু ছেলেবেলা থেকেই ওই কুঠিবাড়ির আঙিনায় মাসে-দুমাসে একবার করে আমরা সমবেত হতাম। কারণ এজমালি ওই বাড়ির উঠোনে আমাদের গ্রামের সালিশ-বৈঠক বসতো। গ্রামে তখন 'সমাজ' বলে একটা কথা বেশ বদ্ধমূল ছিল এবং সমাজপতিদের প্রভাব-প্রতিপত্তিকে মানুষ তাদের অনিবার্য নিয়তি বলেই মেনে নিতো।

আমাদের গ্রামের মাতব্বর ছিলেন হারু মণ্ডল। তিনি ছিলেন মণ্ডলবাড়ির লোক। আমরা সবাই তাকে মান্য করতাম, গণ্য করতাম; বিবাহ-শাদিতে তার মতামত ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত হতো না। কিন্তু হারু মাতব্বরকে আমি তেমন পছন্দ করতাম না। আসলে আমরা পাড়ার ছোট ছেলেরা, যারা ছিলাম খালি গা, খেলতাম খালি পায়ে, তাদের কেউই হারু মণ্ডলকে পছন্দ করতাম না। এর একটা কারণ ছিল। শেফালী নামে আমাদের একজন সঙ্গী ছিল। এই মেয়েটির দুচোখ ছিল ভাসা ভাসা আর ডাগর। আমাদের ছি-বুড়ি, গোল্লাছুট, এক্কা-দোক্কা, রান্নাবাটি খেলার আসরে এই মেয়েটি ছিল এক বড়ো খেলোয়াড়, তাকে দলে পেতে আমরা মোহামেডান-আবাহনীর চেয়েও বেশি তপস্যা করতাম প্রতিদিন 'রাজা রাজা বেলী, এসো ভাই খেলি' বলে দল ভাগ করার সময়ে।

সেই শেফালীর একদিন বিয়ে হয়ে গেলো। শেফালির খেলার পাট সাঙ্গ হলো। বিয়ের খবরে শেফালীই সবচেয়ে খুশি হয়েছিল, ছেলেমেয়েদের দলটিকে খুব গর্ব করে বলেছিল, আর খেলিতে আসিবো নারে, এখন বড়ো হয়া গেছি, আজ বাদে কাল মোর বিয়া। পুতুল সঙ্গে করে নিয়ে শেফালী গেলো তার শ্বশুরবাড়ি, আর ফিরে এলো দুদিন পরেই। ৮/৯ বছরের একটা শিশুর বিয়ে হয়েছিল ৩২ বছরের একজন খলিফার সঙ্গে। বলা দরকার, দামান্দ সাহেবের এটি ছিল দ্বিতীয় বিবাহ।

বিয়ের দুই দিনের মাথায় শেফালী পালিয়ে এলো তার পতিগৃহ থেকে। আমরা, বালকের দল, এতে খুবই খুশি হলাম। কিন্তু বাধ সাধলেন হারু মাতব্বর, কুঠিবাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আঙিনায় তিনি সালিশ বসালেন— স্বামীগৃহ থেকে পালিয়ে আসার অপরাধে শেফালীর বিচার।

আমার সেই দৃশ্য এখনো চোখে ভাসছে—হারু মাতব্বর, পরনে পাজামা আর হাওয়াই শার্ট, চেয়ারের উপরে পা তুলে, বসে আছেন আর গ্রামবাসী বসে আছে মাটিতে। এই চেয়ারটাও পাওয়া গিয়েছিল নীলকুঠিতেই, বেশ অলঙ্কৃত আধা-দেশী চেয়ার। এটাতে বসতে হারু মণ্ডল খুবই পছন্দ করতেন, এটিই যখন ছিল এ এলাকার একমাত্র চেয়ার, তিনি সেই চেয়ারটিতে বসতেন দুই পা তুলে।

শেফালীও উপস্থিত ছিল সেই সভায়। সে তার কৃতকর্ম সম্পর্কে ছিল বয়সোচিতভাবে উদাসিন, সে হাসছিল আর তার বাবা কাঁদছিল। বিচারে রায় হলো, শেফালীকে ৫০টা দোররা মারা হবে আর পরের দিন তাকে স্বামীগৃহে ফেরত দেওয়া হবে।

সে বড়ো করুণ কাহিনী, দুঃখের আর অপমানের, আমরা গ্রামের বালকদল শেফালীর জন্য খুব কেঁদেছিলাম। এরপর থেকে আমাদের সবারই অন্তরে একটাই ছিল চাওয়া— হে আল্লাহ, হে ভগবান, হারু মণ্ডলকে তুমি শাস্তি দাও, জব্দ করো।

শিশুদের মোনাজাত আল্লাহতায়ালা কখনো ফিরিয়ে দেন না। আমাদের মনস্কামনা একদিন পূর্ণ হলো। আক্কাস মিয়ার ছোটবউ বিয়ের ৭ মাসের মধ্যেই কেন বাচ্চা বিয়ালো— এই নিয়ে হারু মণ্ডল আবার কুঠিবাড়ির আঙিনায় সালিশ বৈঠক বসালেন। ছোটদের এই বৈঠকে উপস্থিত হওয়া ছিল বারণ। কিন্তু একটু দূরে জঙ্গল আর গুল্মলতার আড়ালে আড়ালে আমরা সবাই সেই বৈঠকটি ঘিরে রইলাম। বিচারে কী রায় হয়েছিল ? আজ আর মনে নেই। কিন্তু বৈঠক শেষ হওয়ার পর ঘটলো এক অদ্ভুত ঘটনা।

হারু মিয়া চেয়ার থেকে আর উঠতে পারছেন না, তার শরীর চেয়ারের সঙ্গে লেগে গেছে। কে বা কারা কুঠিবাড়ির বিখ্যাত লোভনীয় চেয়ারটিতে কঠিন আঠা লাগিয়ে রেখেছে, তাতে হারু মণ্ডলের শরীর আটকে গেছে প্রায় চিরস্থায়ীরূপে। হারু মিয়া দুই পা অতিকষ্টে মাটিতে নামিয়ে যেই উঠতে যান, সঙ্গে সঙ্গে শালকাঠের ভারি চেয়ারটা উঠতে চায়। জঙ্গলের আড়াল থেকে সব ছেলেপুলে বৈঠকের কাছাকাছি চলে এলো তামাশা দেখতে।

একজন প্রবীণ লোক এগিয়ে গেলেন মণ্ডলের সাহায্যে। আমরা তাকে ডাকতাম পাগলা বুড়ো বলে। তিনি হারু মণ্ডলকে বললেন, মণ্ডল তুমি তোমার কাপড়ের মায়া ছাড়ো, কাপড় ছিঁড়িয়াই তোমাকে চেয়ার ছাড়িতে হইবে।

হারু মণ্ডল তাকে বললেন, বুড়া শকুন, আমি কি কাপড়ের মায়া করতেছি নাকি, আমি তো করতেছি চামড়ার মায়া।

প্রবীণ ব্যক্তি বললেন, মণ্ডল, তাইলে তুমি সুতার ডাকো, চেয়ারটাকে কাটো।

হারু মণ্ডল বললেন, সর্বনাশ এতো সুন্দর চেয়ারটা...শেষে, বুদ্ধি হারু মণ্ডলই বের করলেন। তার চাকর-বাকরকে বললেন, চেয়ারটা ধরিয়া আমাকে ঘরত নিয়া চলো।

তাই হলো। চারজন বিপুলবপু যুবক চেয়ারের চারপা ধরে ঘাড়ে তুলে তাকে নিয়ে চললো তার দালানবাড়ির দিকে।

সব ছেলেমেয়ে চিৎকার করে উঠলো, মাতব্বর পালকি চড়িয়া শ্বশুরবাড়ি যায়...। উহুম না, উহুম না। হারু মণ্ডলকে দেখার জন্য গৃহস্থের ঘরবাড়ি থেকে লাজুক অন্তঃপুরবাসিনীরাও বেরিয়ে এলো। কেউ কেউ বললো, রাম রাম, হারু মণ্ডল কি শ্মশানে চললো! কেউ কেউ বললো, লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, হারু মণ্ডল খাটিয়ায় উঠে গোরস্থানে চললো নাকি!

হারু মণ্ডল তাদের উদ্দেশে হাত নাড়তে নাড়তে আপন গৃহে যাত্রা সম্পন্ন করলেন। এই ঘটনার পর আমরা, ছেলেমেয়েরা, শেফালী ট্রাজেডির প্রতিশোধ গ্রহণের আরামবোধ করতে লাগলাম। আমরা আঁচ করার চেষ্টা করলাম, আমাদের মধ্যে কে সেই সাহসী বালক, যে হারু মিয়ার চেয়ারে কঠিন আঠা লাগিয়ে দিয়েছিল।

বড়োরা আমাদের উৎসাহে জল ঢেলে বললেন, থামো তো বাহে তোমরা, বোঝো না, সোঝো না, হারু মণ্ডল নিজেই আঠা লাগায়া রাখছেন, য্যান চেয়ারটা নিজের ঘরত তুলিবার পারেন।

আমরা ছুটে গেলাম সেই প্রবীণ ব্যক্তির কাছে। বললাম, বুড়া পাগলা, আপনে বলেন তো এটা কি হইবার পারে, হারু মণ্ডল নিজের চেয়ারত নিজেই আঠা লাগাইছে?

শুনে সেই প্রাজ্ঞ, বৃদ্ধ উদাস হয়ে গেলেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে তিনি মারফতি ভঙ্গিতে বললেন কাঁয় জানে বাহে কাঁয় জানে। তারপর তিনি যা বললেন, তার অর্থ— 'চেয়ার থেকে আপনাআপনি আঠা বেরুতে পারে। বটগাছের যেমন আঠা হয়, আম গাছের যেমন আঠা হয়, তেমন আঠা বেরোয় চেয়ারের গা থেকেও। মানুষ একবার চেয়ারে বসলে তখন আর উঠতে পারে না। এটা হলো জগতের রহস্য। এ জগত বড়ো রহস্যময়।' আকাশের দিকে তর্জনি তুলে তিনি বললেন, 'তাঁর লীলা বোঝা বড়ো ভার।'

গোমর কি আর ফাঁক হয়! আমাদের গ্রামে আর কোনো চেয়ার ছিল না। চেয়ার থেকে আপনাআপনি আঠা বেরোয়—বুড়ো পাগলার এই কথার সত্য-মিথ্যা আমরা পরীক্ষা করতে পারলাম না।

ভোরের কাগজ, ডিসেম্বর ১৯৯৫

যেতে পারি, কিন্তু কেন যাবো

শাহীমহলের দ্বারে এলেন এক দরবেশ। বললেন, এ গৃহের মালিক কে? আমি কি তার সঙ্গে দেখা করতে পারি?

দ্বাররক্ষীরা তাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করেই দিতো, কিন্তু কামেল-বুজর্গ লোক ভেবে তা করতে সাহস পেলো না। ধরে নিয়ে গেলো বাদশাহ সমীপে। বাদশাহ জিজ্ঞেস করলেন, হুজুর, কী চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দরবেশ বললেন, আমি কি এ সরাইখানায় রাত কাটাতে পারি ?

বাদশাহ হেসে বললেন, জি জনাব, আপনি পারেন। তবে একটা কথা, এটা তো সরাইখানা নয়। আমার বাদশাহীতে আমি অনেক পান্থশালা বানিয়েছি বটে। এই তো শ'খানেক হাত দূরেই একটা আছে। এটা হলো শাহীমহল। এখানে আমি থাকি, এর দরবার কক্ষে বাদশাহী তখতে আমি বসি। ক্ষমতার ছড়ি ঘোরাই। ছড়ি ঘোরাতে খুব ভালো লাগে। হেভি মজা পাই।

দরবেশ ততোধিক মধুরভাবে হেসে বললেন, জি জনাব, আমি সবই জানি। সে জন্যই তো বললাম, এটা হলো সরাইখানা। সরাইখানায় মানুষ কিছুদিনের জন্য আসে তারপর চলে যায়। সরাইখানার মায়ায় কেউ জড়িয়ে পড়ে না। আপনার এই গৃহটি দেখুন। এর আগে এখানে ছিলেন আপনার বাবা, তার আগে ছিলেন আপনার দাদা। তার আগে ছিলেন বাবার দাদা।

বাদশাহ গম্ভীর হয়ে বললেন, বাবার দাদা না, দাদার বাবা ?

দরবেশ বললেন, ওই একই কথা। আসল প্রশ্ন হলো, তারা আজ কোথায় ?

কোথায় ?

তারা কেউ আজ নেই। দু-দিনের জন্য এ গৃহে এসেছিলেন, তারপর চলে গেছেন। বলুন এ বিশাল বাটীটি সরাইখানা কিনা ?

বাদশাহ্‌র চোখ অশ্রুতে ভিজে গেলো। তিনি দরদর করে কাঁদতে লাগলেন।

দরবেশ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। বাদশাহ্‌র আর কিছু ভালো লাগে না। কোনো কাজে মন নেই। শাহীকার্য ত্যাগ করে তিনি সারাদিন তসবিহ গোনেন।

একদিন বাড়ির ছাদে গোলযোগ। বাদশাহ্‌র ধ্যানভগ্ন হলো। তিনি ছাদে উঠলেন। দেখলেন এক অপরিচিত ব্যক্তি হন্যে হয়ে কী যেন খুঁজছে।

বাদশাহ বললেন, কী ব্যাপার, তুমি এখানে কেন ?

আমার গাধাটি হারিয়ে গেছে। খুঁজছি। পাচ্ছি না। তাই এলাম। এখানে যদি গাধাটি কোথাও থেকে থাকে। আপনি কি আমার গাধাটিকে এখানে কোথাও দেখেছেন?

বাদশাহ বললেন, আরে গাধা, ছাদে কি কখনো হারিয়ে-যাওয়া গাধা পাওয়া যায়?

লোকটি বললো, কে গাধা ? যে ছাদে গাধাকে খোঁজে সে যদি গাধা হয়, তবে যে শাহীমহলে থেকে আল্লাহকে খোঁজে সে কী ? সে আরো বড় গাধা।

বাদশাহ কাঁদতে কাঁদতে শাহীদরবার ছেড়ে চলে গেলেন।

গল্পটির আদিরূপ এরকমই। এন অ্যান্থলজি অফ ফোক টেলস-এ গল্পটির আরেকটা ভার্সন দেখতে পেলাম।

শাহীমহলকে সরাইখানার সঙ্গে তুলনা করার পর এবং শাহীমহলে ঈশ্বর অন্বেষণকে গাধামি বলার পর বাদশাহ্ গেলেন ব্যারিস্টারের কাছে। বললেন, বড় মায়া লাগে, এই শাহীমহল, এই গদিঅলা তখত ছেড়ে দিতে। তোমরা কোনো ফর্মুলা বের করতে পারো কিনা, যাতে আমি থেকে যেতে পারি। ব্যারিস্টাররা বললো, তুলনা

হিসেবে সরাইখানা ঠিকই আছে। তবে ধরা যাক, এক লোক রাজধানীতে এলো তিনদিনের জন্য। সরাইখানার রুম সে বুক করলো তিনদিনের জন্য। কিন্তু সে কি তিনদিনের জায়গায় একদিনের মাথাতেই চলে যাবে ? যদি তার আরাধ্য কাজ সম্পন্ন না হয়, তবুও ? তা নয়। বাদশাহ্ আপনি আপনার মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত শাহীমহল ছাড়বেন না। আপনার বাবাও ছাড়েননি। দাদাও না।

যুক্তি অকাট্য, বাদশা বললেন। তাহলে গাধামির বিষয়টার ব্যাখ্যা কী ?

ব্যারিস্টাররা বললো, গাধা সেই যে পুরোনো পানিই খায়, শুধু খাওয়ার আগে ঘোলা করে নেয়। আপনি তো আর পানি ঘোলা করে খান না। আপনি নিশ্চিত থাকুন।

ব্যারিস্টারদের যুক্তি শুনে শ্রোতাদের কেউ কেউ মনঃক্ষুণ্ন হলো। কে কবে কোথায় পানি ঘোলা করে খেয়েছে মনে করার চেষ্টা না করা সত্ত্বেও তাদের সেসব মনে পড়ে যেতে লাগলো।

কেউ ভাবলো, তাই তো, এই জিনিসটা আমি এতো প্যাঁচালাম কেন, এটার তো সমাধান এক বছর আগেই করা যেতো। কেউ ভাবলো, তাই তো, এ বিষয়টা যদি আমি গিলতে রাজি হলামই, দু-বছর আগে হলাম না কেন ?

নিজেদের গাধামি নিয়ে লোকসকল নিজেরাই লজ্জিত হতে লাগলো।

তারপর সেই বাদশাহর কী হলো ? তিনি কি চিরকাল তার শাহীমহলের শাহীতখতে আসীন ছিলেন ?

জি না। পৃথিবীর নিয়ম হলো শাহীমহলকে সরাইখানা মনে না করা হলেও এটা বালাখানা নয়, আসলে একটা সরাইখানাই। তবে সেখান থেকে বেরিয়ে কেউ যায় জেলখানায়, কেউ যায় দাওয়াখানায়। এই বাদশাহ কোথায় গিয়েছিলেন, তা জানা যায়নি।

যায়যায়দিন, ১৯ মার্চ ১৯৯৬

পাগলে কী না বলে

আবুল কাসেম লোকটার মাথায় সম্ভবত কোনো গোলযোগ থেকে থাকবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ তিনি বায়তুল মোকাররম মসজিদে এসে হাজির। জুমাতুল বিদা, সেটা একটা উপলক্ষ। কিন্তু তার সঙ্গে আরো একটা পবিত্র দায়িত্ব তিনি পালন করতে চান। গায়েবানা জানাজা পড়াতে চান। তার মনে আছে ১৯৯০ সালের ২৮ নভেম্বরও ছিল এমনি শুক্রবার। বিরোধীদল বায়তুল মোকাররম চত্বরে গায়েবেনা জানাজার ডাক দিয়েছে। দেশে বিক্ষোভ-মিছিল নিষিদ্ধ। কারফিউ। রাস্তায় রাস্তায় সেনাবাহিনীর সাজোয়া বহর। ট্রাকের মুখে মেশিনগান বসিয়ে সৈন্যরা টহল দিচ্ছে। এর মধ্যে শুধু জুম্মার নামাজের সময়টুকুতে কারফিউ তুলে নেয়া হলো। ধীরে ধীরে সবাই জড়ো হলো মসজিদ চত্বরে।

কতিপয় সেনা মসজিদের বাইরের চত্বরে উঁকিঝুঁকি মারছিল। ভেতর থেকে ক্ষিপ্ত প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠলো, মুসল্লিরা বললো, তোমরা মসজিদের বাইরে দাঁড়াও। সৈন্যরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তাই করলো। নামাজ শেষে মসজিদের বাইরে হলো গায়েবানা জানাজা। তারপর শুরু হলো মিছিল। বিশাল মিছিল। বায়তুল মোকাররম থেকে বিজয়নগর মোড় পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা উপচানো মানুষ।

আবুল কাশেম ভাবেন, আজো নিশ্চয়ই একটা গায়েবানা জানাজা হবে। আবুল কাশেম আপন মনেই বিড়বিড় করেন, ওই গায়েবানা জানাজার পরেই তো কবর দেয়া হলো স্বৈরাচারকে।

আমি পাগলা-টাগলা মানুষ, বলেন আবুল কাশেম, দুনিয়াটা যে সোজা হয়ে চলেছে, বুঝি না। ১৫ জন মানুষ যখন দেশে মারা যাচ্ছে, পিএম তখন বললেন কিনা, আমার ভালো লাগছে। হো হো হো। আমি শালা পাগলা, কিস্যু বুঝি না। স্ক্রু ঢিলা। হাজার হাজার কেন্দ্রে ভোট হয় নাই, নির্বাচন কমিশনার বলেন, ভোট শান্তিপূর্ণ হয়েছে। হো-হো-হো। হি-হি-হি।

তিনি নাকি আবার শিক্ষা দেবেন। আল্লাহ জানেন তিনি কী শিক্ষা দেবেন। আমার মেয়েটা এমএ পাস। সে প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার হতে পারলো না। প্রাইমারি স্কুলে পড়াইতেও তো খালি ম্যাট্রিক পাস হলে চলে না, পিটিআই ট্রেনিং লাগে। হো হো হো। তিনি কী শিক্ষা যে দেবেন। তা তিনি শিক্ষা দিতে কম পারেন না। ইয়াসমিন হত্যার প্রতিবাদীদের তিনি শিক্ষা দিতে চেয়েছেন। শহীদের মাতা জাহানারা ইমামকেও বেত খেতে হয়েছে। সার চেয়েছে বলে ১৮ জন কৃষক মরেছে। সাংবাদিকরা তো শিক্ষা পাচ্ছে হরহামেশাই। শিক্ষা তো ইনশাল্লাহ সামনে আরো হবে।

পাগলা কাশেম অকস্মাৎ চিৎকার করে ওঠে, আমি এক কানাই মাস্টার, পড়ো মোর বিড়াল ছানাটি, আমি ওকে মারি না মা বেত, মিছেমিছি বসি নিয়ে কাঠি। মিছামিছি না, এইবার ঢুকায়া দিবো। মিয়াঁও মিয়াঁও।

যাক। আবুল কাশেম নামাজ শেষে গায়েবানা জানাজা পড়ার জন্য মসজিদ চত্বরে দাঁড়ান। আরে কই, গায়েবানা জানাজা তো নাই। না-না, জানাজা হতে হবে। শিশুর মৃত্যু। শুধু কি মৃত্যু। পাশবিক অত্যাচারের মাধ্যমে মৃত্যু। এতো কি শিশু সহ্য করতে পারে। আবুল কাশেম কাঁদতে থাকেন। হু হু করে কান্না। ওই মিয়া, কান্দো ক্যান। একজন জিজ্ঞেস করে। মনের দুঃখে কাঁদিরে ভাই—কাশেম জবাব দেয়। মনে দুঃখ কেন? মনে দুঃখ রাখার তো হুকুম নাই, সবকিছু ভালোভাবে হয়েছে, সবার খুব ভালো লাগছে, ম্যাডাম খুশি, সাদেক ছারে খুশি, তুমি কান্দো কেন মিয়া।

কাঁদিরে ভাই কাঁদি। পাগলা-ছাগলা মানুষ, ক্ষমা ঘেন্না পরে দিয়েন, তা ভাই গায়েবানা জানাজাটা হবে না?

জানাজা। কিসের?

কেন? গণতন্ত্রের। আহারে বাচ্চাটা বড় ধকল সহ্য করে মরেছে। কম অত্যাচার গেছে, বলুন?

ওই মিয়া। কী আবোল-তাবোল কও। গণতন্ত্র কবে মরছে?

ক্যান। গতকাল ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ সাল। আপনি বুঝি খবর পান নাই।

কী কও মিয়া। কাইলকা গণতন্ত্র মরবো কেন ? কাইল তো গণতন্ত্রের সার্জারি হইছে। হে এই যাত্রা বাঁইচা গেছে। সার্জারি হইলে একটু রক্ত-টক্ত তো ঝরবোই। ম্যাডাম আর সাদেক স্যারে মিইলা হেই ডাক্তারিটা করছে।

বেঁচে আছে? বলেন কী ? এরপরেও গণতন্ত্র বেঁচে আছে বলবো ?

কেন বলবো না। কাল ভোট হইছে না ?

ভোট! হা-হা-হা। কে ভোট দিয়েছে ? বাড়ির ছাদে মাদুর সিল মারাকে বুঝি ভোট বলে ?

কী কও মিয়া। ভোট কেডা দিছে মানে!

আরে আমি নিজেই তো দুই বান্ডিল ভোট দিছি। দুই বান্ডিলে ব্যালট আছিলো ২০০ টা। সিল মারো ভাই সিল মারো...।

হ্যাঁ। আপনি যখন সিল মারছিলেন তখনই বেচারা গণতন্ত্রের প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। টের পান নাই?

ধুরো মিয়া। কী অশিক্ষিতের মতো কথা কও। শিক্ষাদীক্ষা নাই। তোমারে উচিত শিক্ষা দিতে হইবো।

আবুল কাশেম পাগলা বেশ রামধোলাই খেয়েছেন। তার শিক্ষা হয়েছে। উচিত শিক্ষা। গণতন্ত্র মারা গেছে—এ-কথা তিনি আর কিছুতেই মুখে আনবেন না।

(যায়যায়দিন, ২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬)

শোচনা ও সম্ভোগের গল্প

'সকাল বেলায় নরম আলোর জাফরিকাটা নকশা এসে পড়লো তুতুলের গালে। গবাক্ষটা তৈরি গুচ্ছ গুচ্ছ ফুলে আদলে, তারই ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে বিছানায়। আলোরও শব্দ আছে, সঙ্গীত আছে, তুতুল শুনতে পেলো আলোর কণ্ঠধ্বনি, অ্যাই তুতুল, ওঠো, সকাল হয়েছে।

তুতুলের ঘুম গেলো ভেঙে। জানালার পরদা সরিয়ে দিলো সে কায়দা করে, শুয়ে শুয়ে। দোতলা অবধি উঠে এসেছে একটা কাঁঠালচাঁপার গাছ, তার কালচে সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে ফুটে আছে ফুল, একটা-দুটো।

এমন গন্ধ। একে সুগন্ধ বললেও কম বলা হয়। একে বলতে হয় সৌরভ। ঘন নীল আলোকিত সকাল বেলাকার আকাশ। গায়ে সবুজ পাতা। পাতার ফাঁকে চাঁপা ফুল। সৌরভ।

এতো সুন্দর! এতো চমৎকার।

দরজায় ধাক্কা। মীরার গলা, আপামণি, জব্বার ভাই ফুল দিয়ে গেছে। দরজাটা খুলবেন।

এই নিয়ম। সকাল বেলা আলো ফুটলে ফুল নিয়ে হাজির হবে জব্বার ভাইয়া, তাদের বাগানের মালী। সেই ফুল জলভর্তি স্বচ্ছ একটা কাচের গেলাসে রাখার মধ্যদিয়ে দিন শুরু হবে তুতুলের।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তুতুল দরজাটা খুলে দিলো। তার পরনে ক্রিম রঙের রাত্রিবাস। তাকে দেখাচ্ছে আকাশ থেকে নেমে-আসা পরীর মতন।

সতেরো বছর বয়সের এক পরী।

চাঁপা ফুলের তোড়াটা গেলাসে রেখে তুতুল তাকিয়ে রইলো ফুলগুলোর দিকে। মোটা চ্যাপটা পাপড়িতে বিন্দু বিন্দু জল। এতো সুন্দর। তুতুলের চোখে পানি এলো। সে বললো, থ্যাংক ইউ মীরা।

বারান্দায় এসে দাঁড়ালো তুতুল। রাতে তার ঘুম হয়েছে চমৎকার। চোখ ফোলা ফোলা। এই সময় তাকে খুব আহলাদী দেখায়। বারান্দা থেকে সে নিচে দেখতে পেলো জব্বার ভাইয়াকে। জব্বার ভাইয়া তাদের মালী। এই লোকটি তার প্রতিটি ভোরকে ফুলেল করে তোলে।

জব্বার ভাইয়া, এক মিনিট দাঁড়ান, আমি আসছি।

তুতুল নিচে চলে গেলো।

জব্বার ভাইয়া, আপনি এতো ভালো কেন?

জব্বার বিস্মিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। এই মেয়েটিকে রোজ দুটি ফুল দিতে তার খুব ভালো লাগে। কেন এতো ভালো লাগে তিনি জানেন না।

জব্বার ভাইয়া, আপনাকে কী বলে থ্যাংকস দেবো। আজকের ভোরটি আপনার জন্যে অন্যরকম সুন্দর হয়ে উঠেছে।

জব্বার ভাইয়ের চোখ জলে ভরে উঠলো, তিনি জামার কোণা দিয়ে চোখ মুছতে লাগলেন।'

এই পর্যন্ত লিখে সাবেত মাহমুদ থামলেন। একটানা লিখেছেন এ পর্যন্ত। লিখতে গেলে তাকে ভাবতে হয় না কখনো, কলম হাতে নিয়ে বসলেই অমনি লেখা চলে আসে। তিনি লিখে চলেন। রূপকথার গল্প। আকাশ থেকে মর্ত্যে নেমে-আসা এইসব পরীর গল্প। লিখতে তার খুব ভালো লাগে, লিখতে তিনি খুবই আনন্দ পান। আনন্দ! কী যে আনন্দ এইসব তুতুলের সাহচর্যে, সান্নিধ্যের উষ্ণতায়। উফ।

তুতুল এখন কী করবে? এই মালীর প্রেমে পড়বে? না, এতোটা কাঁচা লোক নন সাবেত মাহমুদ। তিনি রূপকথা লেখেন বটে, তার হীরের গাছে মোতির ফুলই ফলে, হীরের গাছে কদবেল তিনি ধরান না। তুতুলকে তিনি গড়ে তুলবেন এমন আদর্শ হিসেবে, যেন পাঠকের কল্পনা তৃপ্তি পায়। পাঠক কারা? লোকে তাকে জানে হিসেবি বলে, তারা বলাবলি করে, এদেশে নাইন-টেন-ইলেভেন-টুয়েলভ ক্লাসে পড়া পাঠকের সংখ্যা বেশি, লিখে খেতে গেলে তাই লিখতে হবে এদের জন্যে। শুনে সাবেত মাহমুদ হাসেন। লেখক, ছাগল লেখক আর পাগল লেখক, প্রথম দল লেখে টাকার জন্যে, দ্বিতীয় দল খ্যাতির জন্যে। তিনি আর যাই হোন ছাগল লেখক নন।

টেবিল ল্যাম্প জ্বালিয়ে তিনি লিখছেন। খালি গা, পরনে লুঙি। ক'টা বাজে? দেয়াল ঘড়ির দিকে তাকান, অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না। তিনি মন কেন্দ্রীভূত করেন ঘড়ির ডায়ালে, দেখা যায় না, শুধু শব্দ ভেসে আসে টিকটিক। অগত্যা বেড সাইড

টেবিল থেকে হাতঘড়িটা নিয়ে এসে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় ধরে দেখেন দেড়টা বাজে।

দেড়টা বাজে, কিন্তু লেখা হয়েছে মাত্র ছয় স্লিপ। আরো অন্তত চুয়ান্ন স্লিপ লিখতে হবে। ষাট স্লিপ হলে গল্পটা ঈদ সংখ্যায় ছাপা হয়ে যাবে উপন্যাস হিসেবে। অক্ষরের পয়েন্ট বাড়িয়ে বড় বড় ইলাস্ট্রেশন ব্যবহার করে পাতা ভরানো হবে। এজন্যে তিনি পত্রিকার কাছ থেকে অগ্রিম হিসেবে পেয়েছেন দশ। সেটা তেমন বড় কিছু নয়। কিন্তু দেড় লাখ নিয়ে বসে আছেন প্রকাশকের কাছ থেকে, ঈদ সংখ্যার লেখাটা ওই প্রকাশক পাবে। সেও প্রায় বছর খানেক আগে হওয়া চুক্তি। দেড়টা বাজে। কাল সকালে লেখাটার জন্যে লোক এসে দরজায় দাঁড়াবে যমদূতের মতো। অথচ তার এখন লিখতে ইচ্ছে করছে না। ইচ্ছে করছে ভাবতে।

তুতুল। তুতুল। শব্দটার মধ্যে জাদু আছে। ঠোঁটদুটো গোল করে জিভটা দাঁতে ছোঁয়াতে হয়। নামের মধ্যেই চুমো। আড়চোখে বিছানার দিকে তাকান সাবেত মাহমুদ। রেহেলা কি ঘুমিয়ে পড়েছে?

না। বিছানা শূন্য। রেহেলা বিছানায় নেই। সেকি? ওর তো এতোক্ষণ ঘুমিয়ে পড়ার কথা। সাবেত মাহমুদ টেবিল ছেড়ে উঠে পড়েন, ব্যালকনিতে আসেন। রেলিঙে মাথা দিয়ে বসে আছে রেহেলা।

কী ব্যাপার, তুমি ঘুমোওনি?

কোনো উত্তর নেই। সাবেত মাহমুদ স্ত্রীর মাথায় হাত বুলোন।

শরীর ভালো আছে? দেখি, জ্বর আসেনি তো?

স্ত্রীর কপালে হাত দিতে গিয়ে বোঝেন, কপোল ভাসিয়া গেছে নয়নের জলে।

কী হয়েছে বলো তো, মধ্যরাতে জেগে জেগে তুমি কাঁদছো কেন? কটা বাজে জানো?

কেন জেগে আছি বলবো? কাকে বলবো? তোমাকে? তুমি তো একটা রাইটিং মেশিন হয়ে গেছো?

কী যে বলো না, এসো তো—সাবেত মাহমুদ স্ত্রীকে ঘরে টেনে আনেন। বলেন, ছেলেদুটো বড় হয়েছে, এখনো তুমি যে কী সব করো।

ঘরের ভেতরে ঢোকার পর স্ত্রী তাকে জড়িয়ে ধরেন। কপালে একটা চুমু দিয়ে বলেন, আজ কতো তারিখ?

আজ কতো? কাল লেখা জমা দেবার শেষ তারিখ। ১৩। তার মানে আজ ১২। নাহ্।

ঘড়ির কাঁটা ১২টা পেরিয়ে গেছে। মানে আজই, ১৩। ১৩ এপ্রিল। আজ তাদের ম্যারেজ ডে। উফ, একদম ভুলে গিয়েছিলাম। আলিঙ্গন গাঢ় হয়, চুম্বন উষ্ণতর। এই ঘটনা লেখকের জীবনে না ঘটে তার লেখার মধ্যে ঘটলে কী হতো? সাবেত মাহমুদ লিখতেন, ১২টা ১ মিনিটে দরজায় টোকা। দুইছেলে ফুলের বিশাল তোড়া নিয়ে হাজির হয়ে বলবে— হ্যাপি এনিভার্সারি। জীবনটা লেখার মতো নয়, যদিও লেখা অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সময় জীবনকে ধারণ করতে চায়। কিন্তু সেসব লেখা অচল, লোকে জীবনের কথা শুনতে চায় না, লোকে শুনতে চায় রূপকথা।

লোক ? লোককে শোনানোর জন্যে তিনি কি গল্প লেখেন ? সর্বলোক না হোক, তুতুলদের জন্যে যে লেখেন, সেটা তো ঠিক। তুতুল নামটা কিন্তু সাবেত মাহমুদের বানানো। মেয়েটার আসল নাম তুলি। ভিকারুন্নেসায় পড়ে। দেখা হয়েছিল এক আলোচনা অনুষ্ঠানে। আলোচনা শেষে চায়ের আয়োজন। কিশোরীরা ঘিরে ধরেছিল তাকে।

স্যার, আপনার প্রিয় রঙ কী ?

স্যার, আপনার প্রিয় খাবার কী ?

অ্যাংকল বেলী ফুল কিংবা কাঠালচাঁপা, আপনি কোন্‌টা নেবেন ?

এসবের উত্তর দিতে তিনি কখনো ক্লান্ত বোধ করেন না। প্রিয় খাবার হিসেবে বলেন আইসক্রিম আর চকলেট। মেয়েরা খুশি হয়ে ওঠে। বেলী ফুল না কাঁঠালচাঁপা ? মেয়েটির গায়ের রঙ একটু চাপা, তবে নাক-মুখ-চোখ মিলিয়ে চেহারাটার মধ্যে এক ঘোর আকর্ষণ আছে। সুন্দর মেয়েদের গায়ের রঙ চাপা হলে এটাই হয়ে ওঠে তাদের সবচেয়ে বড় কমপ্লেক্স। মেয়েটির বেলী ফুল ও কাঁঠালচাঁপা-বিষয়ক জিজ্ঞাসার মূলে তাই। তিনি বলেছিলেন, তোমার নাম কী ?

তুলি।

এবার তুলি, তোমার মনের একটা গোপন কথা আমি বলে দিই। তোমার প্রিয় ফুল কাঁঠালচাঁপা। ঠিক কিনা!

হ্যাঁ! কী করে জানলেন ?

জানা যায়। আমারও প্রিয় ফুল কাঁঠালচাঁপা। মনের মিল থাকলে চোখে সেই লেখা ফুটে ওঠে। সেটা পড়তে জানতে হয়।

মেয়েরা অটোগ্রাফ নিয়েছিল, যেমন সচরাচর হয়ে থাকে।

আমি এখন বাসায় ফিরবো। তুলি কি আমাকে একটা লিফট দেবে ?

তুলি লিফট দিয়েছিল। পেছনের সিটে পাশাপাশি বসে টুকিটাকি আলাপ। কিশোরীর সঙ্গে প্রৌঢ় একজন লেখক কী আলাপ করবেন। বুক অফ ইনোসেন্ট জোকসের কৌতুকগুলো এক্ষেত্রে কাজে লাগে। লেগেছিলও।

রেহেলা, তুমি ঘুমোও। লেখাটা আজ যে শেষ না করলেই নয়।

শোনো। আমাদের আগের দিনগুলোই ভালো ছিল। অভাব ছিল। বাসায় একটা কাজের লোক পর্যন্ত ছিল না। প্রথম প্রথম ভাত রাঁধতে গিয়ে কতো কাণ্ড করেছি। কোনোদিন জাউ হয়ে গেছে, কোনোদিন পুড়ে গন্ধ ছড়িয়েছে সারা বাড়ি। তবু কতো ভালো ছিল সেসব দিন। তুমি আমার সঙ্গে কতো গল্প করতে। কতোদিন গল্প করতে করতে আমরা সারারাত কাটিয়ে দিয়েছি। ভোর হয়ে গিয়েছে।

সাবের মাহমুদ বিপন্ন বোধ করেন। দুটো দশ মিনিটে একটা টেলিফোন আসবে। কাকলির। রোজ মেয়েটা তার সঙ্গে দুটো মিনিট কথা বলার জন্যে এতোরাত জেগে থাকে। আজ আর কথা বলা হবে না।

টেলিফোন বাজে। খুব অনুচ্চস্বরে রিং হয়, তার কণ্ঠস্বর রোধ করাই আছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কে আবার এতোরাতে, বেটা এডিটর নাকি ? সাবেত মাহমুদ হাত বাড়ান। তার আগেই রেহেলার হাত চলে যায় রিসিভারে, রেহেলা কোনো কথা না বলে কানে ধরে রাখে।

কোথায় আছো দয়ালু আল্লাহ, আমাকে বাঁচাও, প্রার্থনা করেন সাবেত মাহমুদ। ও পাশ থেকে নিশ্চয়ই তিনবার ফুঁ দেয়া হচ্ছে। এরপর এপার থেকে ফুঁ যাবে তিনবার। শুরু হবে কথা। এ পাশ থেকে রেহেলা সত্যি সত্যি ফুঁ দেয়। মাত্র একবার। ও আল্লাহ, রক্ষা করো। হ্যালো, হ্যালো। হারামজাদা। রেহেলা টেলিফোন রেখে দেয়।

রেহেলার আলিঙ্গন থেকে যাহোক বাঁচিয়ে দিয়েছে টেলিফোনটা। টেবিলে আবার এসে বসেন সাবেত মাহমুদ। মনে মনে আবৃত্তি করেন পূর্ণেন্দু পত্রী থেকে, যে টেলিফোন আসার কথা, সচরাচর আসে না, প্রতীক্ষাতে প্রতীক্ষাতে, সূর্য ডোবে রক্তপাতে, সব নিভিয়ে একলা আকাশ নিজের শূন্য বিছানাতে, একান্তে যার হাসার কথা, হাসে না, যে টেলিফোন আসার কথা আসে না।

কবিদের অনেক সুবিধা, মনে মনে ঈর্ষাবোধ করেন সাবেত মাহমুদ ; কবিরা তাদের প্রেমিকাদের উদ্দেশে কথা বলে ফেলতে পারেন অবলীলায়, সরাসরি। রবিবাবু পর্যন্ত সেসব গান লিখে ফেলেছেন। কেন যামিনী না যেতে জাগালে না, বেলা হলো মরি লাজে। শামসুর রাহমান কতো স্বচ্ছন্দে তার প্রেয়সীর কথা উল্লেখ করেন তার বয়সী কবিতাগুলোতে পর্যন্ত। গদ্য লেখকদের জন্যে সেটা মুশকিল। যেমন তিনি লিখতে চান তুলিকে নিয়ে, কিন্তু তাকে লিখতে হচ্ছে তুতুলকে নিয়ে। অবশ্য চাঁপা ফুলের প্রসঙ্গটা তিনি কায়দা করে ঠিকই লাগিয়ে দিয়েছেন। তুমি চলো ডালে ডালে, আমি চলি পাতায় পাতায়। এই তুমিটা কে ? কে এই তুমি ? যে সারাক্ষণ পাহারা দেয়। এই হচ্ছে প্যানোপটিসিজম। জেলখানার ভেতরে থাকে একটা ওয়াচ টাওয়ার। সেখান থেকে সারাক্ষণ দৃষ্টি রাখা হয় বন্দিদের ওপরে—ওরা কোথায় কী করছে। স্থাপত্য কলার এই মডেলটিকে বলা হয় Panoptic Model. সংসারও তাই। এটা অবশ্য সাবেত মাহমুদের আবিষ্কার নয়, মিশেল ফুকোর আবিষ্কার। অবশ্য ফুকো সেটা সংসারের পরতে পরতে দেখাননি, দেখিয়েছেন ক্ষমতা কাঠামোয়। মিশেল ফুকো। ইউনিভার্সিটির ক্লাসে তাকে পড়াতে হয় মিশেল ফুকো বিষয়ে। গতকাল তার ক্লাস ছিল। পলিটিকাল সায়েন্সের মাস্টার্সের ক্লাস। ক্লাসে গোটা পনেরো মেয়ে আছে। তার ছাত্রীদের মধ্যে একজন আবার তার পাগলপ্রায় ভক্ত। রুবিনা। কাল তিনি গোটা ক্লাসটা সেরেছেন রুবিনার চোখে চোখ রেখে। ফুকো বুঝিয়েছেন তাকে, সবিস্তারে। উদারবাদীরা বলে, মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীন। ব্যক্তিই সার্বভৌম। ব্যক্তি নির্বাচিত করে তার প্রতিনিধি। গণপ্রতিনিধিরা আইন প্রণয়ন করে, কার্যকর করে ব্যক্তির অধিকার রক্ষার জন্যে। এর নাম গণতন্ত্র। মার্কসবাদীরা তাদের টিটকারি দেয়। বলে ওই সাম্য হচ্ছে বুর্জোয়াদের সাম্য, ওই ভ্রাতৃত্ব হচ্ছে বুর্জোয়াদের ভ্রাতৃত্ব। ফুকো মনে করেন, জেলখানার মতোই এই সমাজটা প্যানোপটিক সমাজ। স্তরে স্তরে এখানে ক্ষমতার বলয়ে বাঁধা মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

গণপ্রতিনিধিরা কাদের প্রতিনিধিত্ব করে আসলে, নিজেদের ছাড়া ? এই সমাজ আসলে এক শৃঙ্খলিত সমাজ। কেবল রাষ্ট্রক্ষমতা নয়। স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল সর্বত্রই বিস্তৃত এই ক্ষমতার বলয়। শৃঙ্খলকে এখানে শৃঙ্খলার বেশে দাঁড় করানো হয়েছে। এই ক্ষমতার বলয় থেকে আমরা কোনোদিনই বেরুতে পারবো না। তাহলে আমাদের কর্তব্য কী ? ফুকো বিশ্বাস করেন, যেখানেই প্রভুত্ব সেখানেই মানুষ গড়ে তোলে পাল্টা প্রতিরোধ। এসব বিদ্রোহ যে সবসময় ব্যর্থ হয়, তা নয়। ফুকো তাই পরিণত হন নবীন বিদ্রোহীদের বাইবেলে। ফুকোর দৃষ্টিতে চিরবিদ্রোহী, চির-সমালোচকই হচ্ছেন ইতিহাসের প্রকৃত নায়ক।

ফুকো সবসময়েই প্রশ্ন তুলেছেন ক্ষমতার বৈধতা নিয়ে। এটাই প্রগতিশীলদের কাজ। ক্রমাগত আক্রমণ করে যাও ক্ষমতাকে। ক্লাসের এই পড়া ছাত্রদের ভালো লাগে না। তার মন্ত্রমুগ্ধ ছাত্রী রুবিনাও ফুকো প্রসঙ্গে মনোযোগচ্যুত হয়। সে পাশের মেয়েটির সঙ্গে খাতায় কাটাকুটি খেলতে শুরু করে। তার প্রিয় লেখকের অমূল্য কথা ক্লাসরুমের নিরেট দেয়ালে মাথা খুঁড়ে ফিরে ফিরে আসে। রুবিনার সেদিকে মনোযোগ নেই। কাটাকুটি খেলায় এমনিই বিভোর সে, তার খেয়াল নেই বুকের ওড়না লুটোচ্ছে মেঝেয়। অথচ এই রুবিনা তার কতোটা অনুরাগিনী যে, বর্ণনার বাইরে। এই মেয়ে তার চেম্বারে চলে এসেছিল ভর্তির আগেই। স্যার, অটোগ্রাফ! কাগজ ছিল না, সে তার বাহু বাড়িয়ে দিয়েছিল। জামার হাতা টেনে অনেকটা উপরে তুলে বলেছিল, স্যার, এখানটায় লিখে দিন।

তুমি কোথায় পড়ো ?

স্যার, আমি পলিটিকাল সায়েন্সে পড়বো।

কেন, পলিটিকাল সায়েন্স কেন ?

আপনার জন্য স্যার। আপনাকে কাছে থেকে দেখবো।

ফার্স্ট ইয়ারে আপনার ক্লাস পাবো না স্যার ?

সাবেত মাহমুদ হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন মেয়েটিকে বসাবার জন্য, হাতের সঙ্গে হাতের স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি কেঁপে উঠেছিল, তুমুলভাবে আলোড়িত হয়েছিল বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো।

ডিপার্টমেন্টের এই কক্ষটিকে তিনি তার অনুরাগিনীদের আপ্যায়ন করার কাজে ব্যবহার করতে চান না; কারণ এখানে তার সহকর্মীরা সবাই এমন ঈর্ষান্ধ যে, বাইরে থেকে তালা মেরে দিয়ে কাজী ডেকে আনাটাও বিচিত্র কিছু নয়।

একেক দিন রুবিনা তাকে পাবার জন্য কী পাগলামিই না করতো। লম্বা লম্বা চিঠি লিখতো তাকে, আপনাকে ছাড়া আমি বাঁচবো না, আপনাকে আমি বিয়ে করতে চাই। একদিন তো মওকা মতো পেয়ে ধরে বসেছিল, আমার বুকের ঠিক মধ্যখানে আপনি একটা দাগ এঁকে দিন।

সেই রুবিনা তার ফুকো বিষয়ের লেকচার কিছুই শুনছে না। এরা ফুকো শুনবে না, গ্রামসি শুনবে না। গ্রামসির ট্রেঞ্চ ওয়ারের তত্ত্ব বলার চেয়ে এদের সঙ্গে ট্রেঞ্চ ওয়ারের কৌশল নেয়াই ভালো। সবচেয়ে ভালো রণে ভঙ্গ দেয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

রুবিনার বুকের দিকে তাকিয়ে সাবেত মাহমুদ স্থির হতে পারেন না, এইখানে তিনি কোনোদিন আদৌ কোনো চিহ্ন স্থাপন করতে পেরেছিলেন কিনা। না, এসব বলে কোনো লাভ নেই। ক্ষমতাকে ক্রমাগত প্রশ্ন করে গদ্য-পদ্য লিখে কোনো রুবিনার মন কোনোদিন পাওয়া যাবে না। তাকে লিখে যেতে হবে রূপকথা এবং রূপকথা। ক্লাসে মৃদু গুঞ্জন ওঠে। ফুকো-বিষয়ক বক্তৃতায় বিরক্ত ছাত্রছাত্রীরা ব্যক্তিগত আলাপে তৎপর হয়ে ওঠে। ক্লাস নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাবার আগেই সাবেত মাহমুদ রূপকথায় ফিরে যান। এক দাঁতের ডাক্তার। রোগীর দাঁত তুলে ফেললো। রোগী বললো, ডাক্তার সাহেব, এবার দাঁত তুলেছেন কম ব্যথা দিয়ে। গতবছর মাড়ির দাঁতটা তুলতে যা ব্যথা দিয়েছিলেন! ডাক্তার গম্ভীর হয়ে বললো, সরি, দাঁতের বদলে আপনার আলজিভ তুলে ফেলেছি। কাইন্ডলি আরেকবার হা করুন। ছাত্রছাত্রীরা হাসে। আবার তার জাদুকরী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় রুবিনার ওপরে।

রেহেলা ঘুমিয়ে পড়েছে। দু-ছেলের ঘরের বাতিও নিভে গেছে। সাবেত মাহমুদ গভীর মনোযোগে লিখে চলেন। তুতুলের স্নান ঘরের বর্ণনা। শাওয়ার ছেড়ে দিয়ে তুতুল সাবান ঘসছে। সামনে বেসিনে বড় আয়না। নিজেকে দেখে বড় ভালো লাগে তুতুলের। রঙটাই যা একটু চাপা। তবু চাঁপা ফুলের মতো রঙ। আর তার উঁচু গ্রীবা। বিউটি বোন। বগলের নিচের সবুজ। আর বুক। জোছনাভ। জোছনা ঝরে পড়েছে যেন শরীর থেকে।

বড় মজা লাগে লিখতে। আনন্দ। তুলির চোখমুখ ভেসে ওঠে মনের মধ্যে। গাড়িতে পাশাপাশি বসেছিলেন। উরুর সঙ্গে লেপ্টে ছিল উরু। তখন কিছু মনে হয়নি। নিঃসঙ্গ এই শেষরাতে তুলিকে বড় উষ্ণভাবে অনুভব করেন বাসেত মাহমুদ। তার শ্বাস ঘন, ভারি হয়ে ওঠে। তিনি লিখেই চলেন। ইন্ডিয়ার শোবা দে সেদিন এক টিভি সাক্ষাৎকারে বলেছেন, লেখাটা বড় সম্ভোগ্য উপভোগ্য কাজ। একটা শাদা পৃষ্ঠার শরীরে কলম দিয়ে দাগ দিয়ে চলা। তার ভার্জিনিটি হরণ করা। বড় সেনসেশনাল। আই রিয়ালি এনজয় রাইটিং। আমি লেখাকে সম্ভোগ করি। তুমি কিংবা তুতুলের নরম শরীরটা সৃষ্টি করতে করতে আর তা নিয়ে কলমে-কাগজে খেলতে খেলতে জমে ওঠেন। তৃপ্ত হন। শ্রান্ত হন। টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। রেহেলা এসে তাকে ডাকে। আজ আমাদের ম্যারেজ ডে। লোকজন আসবে। ভাবছি কিছু খাবার নিজহাতে বানাবো। তুমি তো রাইটিং মেশিন। খোঁজখবর কিছু রাখো না। বাজার করবে কে ? দয়া করে দোকানে যাও মাস্টার, বেশন নেই, কিছু বেশন নিয়ে এসো। মাস্টার ও বেশন শব্দদুটো পাশাপাশি শুনে সাবেত মাহমুদ চমকে ওঠেন। তার ঘুম ভেঙে যায়।

ভোর হচ্ছে আরেকটি প্রভাত। প্যানোপটিক ক্ষমতার অধীনে বন্দি তিনি। মিশেল ফুকোর Discipline and Punish : The Birth of the Prison' বইটি তার পড়ার টেবিলে বড় প্রকট হয়ে উঁকি মারে। নিজের দাদ-চুলকানো লেখা বাদ দিয়ে ভিন্ন কিছু না লেখার পীড়ন তাকে আঘাত করে। মনে হয় তার কর্তব্য ছিল, ক্ষমতার বৈধতাকে ক্রমাগত আঘাত করে লিখে যাওয়া। নিজেকে অথৈ সাগরে ভাসতে-থাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

সাঁতার না-জানা মানুষের মতো অসহায় মনে হয় তার। পলিটিকাল সায়েন্সের নামী অধ্যাপক তিনি, এসব কী লিখছেন ?

অবশেষে একটা আস্ত তক্তা হয়ে যুক্তিটা ভেসে আসে তার কাছে। ইংরেজির এতো বড় অধ্যাপক কবি যদি বাজার দখলের জন্য স্রেফ পর্নোগ্রাফি লিখতে পারে, তিনি পারবেন না কেন এইসব কিশোরী-পটানো পদ্য লিখতে ? বিদ্রোহী বলে খ্যাত অধ্যাপকরা তো দিনের পর দিন লিখে চলেছেন এনজিও-তোষক রচনাবলি। এঁদেরই কেউ কেউ তো এমনকি অনুবাদ করেছেন রাষ্ট্রপতি কবির কবিতা। বাংলা বিভাগের কবি-গীতিকার তো শেষ বয়সে বিয়ে করেছেন পরিচারিকাকে। তিনি বিয়ে করতে গেলেন কেন ? ডুবতে ডুবতে ভেসে ওঠেন সাবেত মহমুদ। দাঁড়াও তুতুল। যেও না। কাছে এসো। আলিঙ্গনের মধ্যে এসো। শরীর। শরীর। তোমার মন নেই কুসুম। শরীরকে পেতে হলে শরীর লাগে না মানিক বাড়ুজ্জে। শরীরকে পেতে হয় মন দিয়ে। তোমার মন নেই, মানিক ? মানিক বন্দোপাধ্যায়কে এক আচ্ছা শিক্ষা দিয়ে সাবেত মাহমুদ তুতুলের শরীর অধিকার করেন। শরীর দিয়ে নয়, মন দিয়ে। কাগজ-কলম দিয়ে।

জব্বার ভাইয়া তুতুলকে নিয়ে গেছে চিড়িয়াখানায়, একটা দিন সে কাটাতে চায় তুতুলের সঙ্গে। চিড়িয়াখানা থেকে বোটানিকাল গার্ডেনে ঢুকলো তারা। তুতুলের এক হাতে আমড়া, অন্যহাতে আইসক্রিম। তাকে দেখাচ্ছে পরীর মতো। (পরীরা দেখতে কেমন, সাবেত মাহমুদ হাসেন।) জব্বার ভাইয়া একে একে নাম বলতে শুরু করেছে সবগুলো বৃক্ষের। বিস্মিত তুতুল মনে মনে ভাবছে, তুমি কে গো মালী।

তুতুল ফিরে আসছে। জব্বার ভাইয়ার সঙ্গে আর বেশিক্ষণ থাকাটা তার জন্য উচিত হবে না। মায়া-শিকড় ছড়াচ্ছে মনের মধ্যে। সেই শেকড় পড়ানো পরে সহজ হবে না। তুতুল নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করছে, এসেছিল দুজন, ফিরে যাচ্ছে একা। তার চোখ জলে ভেসে পাচ্ছে।

জব্বার মিয়া তারপর বহুদিন ছিল বোটানিকাল গার্ডেনে। উদভ্রান্তের মতো ঘুরে বেড়াতো। আপন মনে বিড়বিড় করতো প্রতিটি বৃক্ষের সামনে গিয়ে। যে-কোনো অচিন বৃক্ষের নামও সে বলে দিতে পারতো অবলীলায়। কিন্তু এই বন থেকে সে বেরুতে পারতো না। আশায় আশায় থাকতো, কোনোদিন এক কপালকুণ্ডলা এসে বলবে, পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ ?

জীবনটা রূপকথা নয়, এই প্রশ্ন কোনোদিন কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে না।

মাড় দেওয়া পাঞ্জাবি

শামীমা আজ কতোটুকু অ্যালাউ করবে ? ঠোঁট থেকে আরম্ভ করে ঘাড়, ঘাড় নাকি গ্রীবা?

শামীমা একটু মুটিয়ে গেছে, ওই ঘাড় ও তার উপরের অংশকে কি গ্রীবা বলা যায়? মরালিনীর পাশে গ্রীবা শব্দটি মানায়, কিন্তু গাইয়ের কি গ্রীবা হয় ? হরিণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বোধহয় হয়। গ্রীবা বাড়িয়ে দিলো একটি হরিণ, হুঁ চলে। কিন্তু শামীমার ঘাড়ে কিংবা গ্রীবায় দুটো আলতো কামড় দিলে সে কি কেঁপে উঠবে ? ষোলো-সতেরো বয়সের একটা মেয়ে আছে শামীমার, শান্তা। এতোদিনের সঙ্গম-অভ্যস্ত বৈবাহিক শরীরে কি কোনো স্পর্শকাতরতা আর অবশিষ্ট আছে ? হয়তো স্বামীর জন্য নেই, স্বামীর বন্ধুর জন্যে আছে। হবে। আজ হয়ে যাবে। ওর বর উজবুকটা ব্যাংকক গেছে, সারাদিন মেয়ে শান্তা থাকবে না, আজ শান্তাদের ক্লাসের পিকনিক, কাজের মেয়েটাও ছুটিতে গেছে—টেলিফোনে সব ইনফরমেশন পেয়ে গেছেন রফিকুল ইসলাম পাপ্পু।

আজ হয়ে যাবে। বাথরুমে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে গালে ফোম লাগাতে লাগাতে শামীমার একটা ইমেজ কল্পনায় দাঁড় করান রফিকুল ইসলাম পাপ্পু। শামীমা নিজ হাতে শাড়িটা খুলে খাটের মাথায় রাখে, তারপর 'মিউজিকটা ছেড়ে দিয়ে আসি' বলে উঠে যায়। শুধু ব্লাউজ আর শায়া পরা শামীমা। এই পোশাকে তাকে কেমন লাগবে ? শরীর সিরসির করে ওঠে রফিকুল ইসলাম পাপ্পুর।

গাল কেটে যায়। উফ। এতো সুন্দর সকালটায় রক্তারক্তি ঘটে গেলো। ঘটুক।

সকালে খুরের ক্ষোভে কেটে গেলে গাল, ফিনকি দেয় যে রক্ত তুমি তার লাল।

না, গালকাটাটা উচিত হলো না। তার সৌম্যদর্শন চেহারাটা মেইনটেইন করা আজ খুবই দরকার। দুপুরে শামীমার ফ্লাটে যাবার আগে তাকে একটু মতিঝিল যেতে হবে। আজকের অফিস আওয়ারটা তার কাটবে মতিঝিলে মণ্ডল গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের অফিসে। বেশিক্ষণ লাগার কথা নয়, অ্যাপয়েন্টমেন্ট করাই আছে, শুধু দেখা পেলেই হয়।

হুঁ। চন্দ্রাবাজি। চাঁদা। আকাশের চাঁদের পাছায় একটা আ-কার পরিয়ে দেয়া। প্রত্যেক পেশারই একটা ঝক্কি থাকে—প্রফেশনাল হ্যাজারড। নেতাগিরিরও আছে। রফিকুল ইসলাম পাপ্পু দেশের অতি বিখ্যাত, অতি ব্যস্ত বিপ্লবী নেতা; কিন্তু তাকেও তো খেতে হয়, পরতে হয়, গাড়ি চালাতে পেট্রল লাগে, দুটো মেয়ে স্টেটসে পড়ছে, তাদের খাই-খরচ পাঠাতে হয়। সুতরাং এই চন্দ্রা উপাখ্যান। চাঁদ উত্তোলন অভিযান!

শাওয়ারের নিচে নগ্ন দাঁড়িয়ে রফিকুল ইসলাম পাপ্পু ভাবেন, আজ কোন্ কর্তব্যটা বেশি জরুরি। শামীমা অভিযান নাকি মতিঝিল পাড়ায় চাঁদা অভিযান ?

দুটোই, কারণ আমি নহি দায়ী প্রভু। দায়ী আমার শরীরের ভেতরের হরমোন। হরমোন শরীরের মধ্যে নড়েচড়ে, আর তিনি বাইরে লম্পঝম্প করেন। সে মাও সেতুংই হোন, আর বিল ক্লিনটনই হোন। অ্যামেরিকার বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বের করেছেন, একটা হরমোন, টেস্টেস্টেরন, যা কামুকতার জন্যে দায়ী, সেটা নেতাদের দেহে থাকে বেশিপরিমাণে। সে কারণে পৃথিবীর তাবৎ নেতারই একটু-আধটু যৌন কেলেঙ্কারি থাকে। মাও সেতুং একের পর এক মহিলা কমরেডের সঙ্গে শুয়ে পড়েন, বিল ক্লিনটনের পরকীয়া-কাহিনী বেরোয় কাগজে কাগজে। এই হরমোনের চাঞ্চল্যেই হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের এতো বান্ধবী সংসর্গ; জিনাত কিংবা মুমতাজ কাহিনী। মুমতাজ ? আহা! এরশাদ ক্ষমতায় থাকতে থাকতে মুমতাজটা মরলো না কেন ? বাংলাদেশে আমরা একটা তাজমহল পেয়ে যেতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পাঞ্জাবি-পায়জামা পরতে গিয়ে মেজাজটা খাট্টা হয়ে যায় রফিকুল ইসলাম পাপ্পুর। গন্ধ।

গন্ধ কিসের ? গন্ধ কিসের ? তিনি চিৎকার করে ওঠেন।

তার স্ত্রী দৌড়ে আসেন, ভয়ে মুখ আধখানা হয়ে গেছে তার।

পায়জামা-পাঞ্জাবিতে গন্ধ কিসের ?

তার স্ত্রী কাপড়টা নাকের কাছে নেন, মাড়ের গন্ধ।

আপনি বলেছিলেন মাড় দিতে। নতুন কাজের মেয়ে। অ্যারারুট না দিয়ে সত্যি সত্যি ভাতের মাড় দিয়ে দিয়েছে। বাসি মাড় বোধহয়। তাই গন্ধ হয়েছে।

রফিকুল ইসলাম পাপ্পু হতোদ্যম হয়ে বসে পড়েন। আজ তার একটা বিশেষ দিন, তিনি আজ যাবেন চাঁদা তুলতে, তারপর শামীমার কাছে। গত ৯৬ ঘণ্টা ধরে তিনি ভেবে রেখেছেন এই নতুন শাদা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে যাবেন, মাড়ে কড়কড়ে মচমচে কাপড়, তিনি খাঁজ ভেঙে তাতে হাত গলাবেন, পা গলাবেন। কাজের মেয়েটা একটা আস্ত হারামজাদি। ফুলবানুর নধর শরীর ডাঙর নিতম্বে তিনি দুটো ফুলসাইজ থাপ্পর মারেন মনে মনে—তার রাগ কমে অসে।

দাও। অন্য কোনো পাঞ্জাবি দাও। হাতটা গন্ধ হয়ে গেলো। একটু পারফিউম এনো তো।

তার স্ত্রীর কাপড় এগিয়ে দেন। রফিকুল ইসলাম পাপ্পু নিজহাতে শরীরে পারফিউম স্প্রে করেন। এমনকি পারফিউম লাগান গেঞ্জি, আন্ডারওয়ার এবং মোজাতেও। বলা যায় না, আজ এসব খুলতে হতে পারে। আহ্। শামীমা।

ড্রয়িংরুমে বসে আছে তদবির পার্টি। এক ঝাঁক। এদের মধ্যে একটা পার্টি বড়, পাঁচ লাখ টাকার কন্ট্রাক্ট। একটা শত্রুসম্পত্তি, থুক্কু, অর্পিত সম্পত্তির কাগজপত্র ঠিকঠাক করে দিতে হবে। এরাই ভোগদখল করছে। কাজটা তেমন কঠিন কিছু নয়, লাখ খানেক টাকা সেক্রেটারিয়েটে খরচ করলেই হবে, হাতে থাকবে চার লাখ। আজ হবে না, আজ আর সেক্রেটারিয়েটের দিকে নয়, আজ প্রথমে মতিঝিল, তারপর বনানী।

অ্যাবানডন্ড প্রপার্টির লোকদুটোকে গাড়িতে একটা ড্রপ দেওয়া যায়, তাতে আজকের তেলের খরচটা আর পকেট থেকে বেরোয় না।

আজ আমি খুব ব্যস্ত, জানেনই তো কদিন পরে পার্টির কাউন্সিল, কাজ করতে করতে হাড়-হাড্ডি এক হয়ে যাচ্ছে, ফুরসত পাচ্ছি না, আজ পারছি না, আপনারা কালকে আসুন। আবুল কালাম সাহেব, আপনি আমার সঙ্গে চলুন, গাড়িতে দুটো কথা বলি।

একটা পেট্রল পাম্পের কাছে গাড়ি চলে আসে, রফিকুল ইসলাম পাপ্পু ড্রাইভারকে বলেন তেল নিতে।

কয় লিটার ?

দশটা দশটা— ড্রাইভার বলে।

হারামজাদা। রফিকুল ইসলাম পাপ্পু গজরাতে থাকেন মনে মনে, হারামজাদা দশ লিটার কও ক্যান, বেশি কইতে পারো না, তেল তোমার পোঁদের চর্বি গলায়া বানাইবো? পার্টি তোমার পাশের সিটে বইসা আছে, চোখে দ্যাখো না ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

আবার মেজাজটা খারাপ হয়ে যায় তার। লোকদুটোকে মৎস্য-ভবনের সামনে নামিয়ে দিয়ে তিনি ড্রাইভারকে সবক দেন। শোনো, যা ভুল করার এবার করেছো, দ্বিতীয় দিন ভুল করলে চাকরি থাকবে না, আমি এককথার মানুষ, এটাই আমার শেষ কথা, পার্টি গাড়িতে থাকলে তেল ট্যাংকি ভরে নেবে। বুঝেছো ?

আজকের দিনটাই যাচ্ছে কুফা; কুফা নম্বর এক : গাল কেটে যাওয়া, কুফা নম্বর দুই : পাঞ্জাবিতে মাড়ের গন্ধ, কুফা নম্বর তিন : পার্টি ফস্কে গেলো, ট্যাংকি ভরলো না।

রিল্যাক্স। রিল্যাক্স। নো টেনশন। গাড়ির পেছনের সিটে গা ছেড়ে দেন রফিকুল ইসলাম পাপ্পু। টেনশন করলে চেহারাটা ভালো দেখাবে না। ফুরফুরে থাকবে না। সৌম্যকান্তি মনে হবে না। তাতে ফল ভালো হবে না। ভাঁজ ভাঙা মাড় দেওয়া পাঞ্জাবি, যাকে বলে সফেদ আর কী, পায়ে পাম্প-শু, মুখে ননস্টপ হাসি, নিঃশব্দ, অফুরন্ত, যেন মনে হয়, হ্যাঁ, লোকটা কনফিডেন্ট— চাঁদা তোলায় এ হচ্ছে প্রধান রসদ। এভাবে ছোটখাটো বিষয় নিয়ে উত্তেজিত হলে সাফল্যের সম্ভাবনা কমে আসতে বাধ্য।

মণ্ডল গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইমামুল ব্যাটা বিহারি। বাংলাদেশে বাণিজ্য করছে নির্বিবাদে। কোটি কোটি টাকা। শুধু ব্যাংক লোনই তো ষাট কোটি টাকা। ওয়ান অফ দি মোস্ট অনারেবল ব্যাংক ডিফলটারস। কবি হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের কাব্যামলে এরও কাব্যবোধ জেগে উঠেছিল প্রবলভাবে। আজ চাঁদার অঙ্কটা ভালোই হবে।

গ্রাউন্ড ওয়ার্ক সব প্রস্তুত। গত এক মাসে মণ্ডল গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের ফ্যাক্টরি এলাকায় রফিকুল ইসলাম পাপ্পু তিনটা শ্রমিক সমাবেশে বক্তৃতা দিয়েছেন, সেসব বক্তৃতার ছবি দৈনিক ইত্তেফাকে ছাপা হয়েছে এবং তিনি সেসবের কাটিং সঙ্গে রেখেছেন। গতকাল বিরোধীদলের অর্ধ-দিবস হরতাল চলাকালে এই গ্রুপের মতিঝিল অফিসের সামনে দুটো গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে এবং গোটা পাঁচেক ককটেল ফুটেছে। এর পরপরই পাপ্পু সাহেব এমডির সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন এবং তিনি তাকে আজ আসতে বলেছেন। সকাল সাড়ে ১০টায় অ্যাপয়েন্টমেন্ট।

১০টা ২০ বাজে। প্রেসক্লাবের সামনে এসে গাড়ি জ্যামে আটকা পড়েছে। ছিন্নমূল বস্তিবাসী সমিতি প্রেসক্লাবের সামনে অর্ধেকটা রাস্তা জুড়ে প্রতিবাদ সভা করছে। ফলে এই জ্যাম। অসহ্য। রফিকুল ইসলাম পাপ্পু ঘড়ির দিকে তাকান। আরে বাবা, সারাটা ঢাকা শহর তো তোদের জন্য খোলাই পড়ে আছে। নে, দখল কর, ভোগ কর। এসব মিটিং-মিছিল কেন ? নিশ্চয়ই এনজিওদের কাজ। এই শালারা আবার বড় বিপ্লবী সেজেছে। গরিব মানুষদের দিয়ে মিছিল করিয়ে বিদেশ থেকে পাঁচ-দশ ডলার কামানো। ফুঃ। তবে হ্যাঁ, এনজিও পাড়ায় একবার ঢুঁ মারতে হবে। বেটারা খুব বেকায়দায় পড়েছে। মোল্লারা তাদের চিপায় ফেলেছে। চিপা। এবার বিপ্লবীদের কর্তব্য তাদের পাশে এসে দাঁড়ানো।

যানজটটা চিরস্থায়ী হয়ে গেলো মনে হয়। আজ আর এই ফাঁদ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। এই কুত্তাগুলো আর কতোক্ষণ মিটিং করবে। বাবা, বক্তৃতা কী! অনলবর্ষী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিকল্প ব্যবস্থা না করে কল্যাণপুর বস্তি উচ্ছেদ করা হলে সারা ঢাকা শহরে আগুন জ্বলবে। জ্বালাও। জ্বালাও। আগুন না জ্বললে চাঁদা ঠিকভাবে উঠছে না। সামনে কাউন্সিল। মেয়েদুটো আমেরিকায়। আবার টাকা পাঠানোর সময় হলো। এদিকে উত্তরার ফ্ল্যাটটার ছাদের ঢালাই শুরু করতে হয়।

পাশে একটা রিকশা আটকে আছে, হুড তোলা রিকশা। একটা চুলকাটা কিশোরী। স্কার্ট পরা। গাড়ির সিটে গা এলিয়ে রফিকুল ইসলাম পাপ্পুর চোখ চলে গেলো মেয়ের স্কার্টের দিকে। হাঁটুর উপরেও খানিকটা দেখা যাচ্ছে। বসন্তের বাতাসে ফুলে ফুলে উঠছে মিডি স্কার্ট। হলদেটে স্কার্টের আভায় উরুদ্বয় দেখাচ্ছে থাই মেয়েদের মতো। মেয়েটা ঘামছে, তার নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম। মেয়েটাকে কেমন চেনা চেনা লাগছে। ওহ, দেখতে খানিকটা শান্তার মতো।

শামীমার মেয়ে। শামীমা। তার বন্ধুর স্ত্রী। শান্তা তার বন্ধুর কন্যা। আচ্ছা শান্তা তার সঙ্গে ফ্লার্ট করে কেন ? ইন্টারমিডিয়েটে পড়া একটা মেয়ে, তাকে দেখলেই কেন বলে, আংকল, ইউ লুক এ ভেরি হ্যান্ডসাম লুক! তার বার্থডেতে সে একটা মেরুন রঙের টাইও কিনে দিয়েছিল। রফিকুল ইসলাম পাপ্পুর মনে পড়ে।

শান্তাকে নিয়ে কোথাও একদিন লাঞ্চে বা ডিনারে যেতে হবে। বন্ধুর কন্যা, কেউ কিছু মনে করবে না। কিংবা কেমন হয়, যদি শান্তাকে নিয়ে একবার সিঙ্গাপুর কি থাইল্যান্ড ঘুরে আসে, সাতদিনের জন্যে। আবার হরমোনের উসকানি। আবার প্রত্যঙ্গের সঞ্চারণ। উফ্। নেতা হতে হলে এই এক প্রবলেম। গান্ধীজির আত্মজীবনীর মতো রফিকুল ইসলাম পাপ্পু কি একটা আত্মজীবনী লিখে যাবে ? কী নাম দেবে তার—'আমার জীবনে নারী।'

নাহ্, দেরি হয়ে যাচ্ছে। এগারোটার আগে আর মতিঝিল পৌঁছানো যাচ্ছে না। ওখানে ইমামুল কতোক্ষণ বসিয়ে রাখে কে জানে ? তারপর ছাড়া পেয়ে যাবে শামীমার ওখানে। দুপুরে খাবে। খাবারই আমন্ত্রণ, নাকি অন্যকিছুর ? ভাত খেয়ে, ভাতঘুম না দিলে কি চলবে ? পাঞ্জাবি পরে কেউ শোয় নাকি ? শামীমা কি তার শিয়রের কাছে বসবে না, তার পাকা চুল তুলে দেবে না ? আচ্ছা, শামীমা কি কন্ট্রাসেপটিভ নেয় ? বড়ি খায় ? লাইগেশন করিয়ে নিয়েছে ? নাকি অন্যকিছু। নাকি এরা আবার কামসূত্রের বিজ্ঞাপন দেখেছে স্যাটেলাইট টিভিতে ?

মণ্ডল গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজের এমডি ইমামুল আছে। যাক। আছে তাহলে।

আপনি একটু বসুন। কী খাবেন ? চা-কফি নাকি কোল্ড ড্রিংকস।

কফি খাওয়া যায়। এই অফিসে কফিটা বানায় ভালো।

সেক্রেটারিটার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে সময় কাটাতে হচ্ছে। কিন্তু রফিকুল ইসলাম পাপ্পু বিনোদিত হতে পারছেন না। প্রথমত সেক্রেটারির দিকে ছোক ছোক দৃষ্টিতে তাকালে নেতা হিসেবে তার ওজন কমে যায়। দ্বিতীয়ত ইমামুল ব্যাটা তাকে এতোক্ষণ বসিয়ে রাখছে কেন ? সে কি জানে না, কে এসেছে ? কতো বড় গুরুত্বপূর্ণ নেতা ? তার এক মিনিট সময় নষ্ট মানে লাখ লাখ শ্রমজীবী মানুষের মতো লাখ কোটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মিনিট নষ্ট করা। নাহ্, আজ ব্যাটাকে ধরতে হবে ছাই হাতে, কিছুতেই ফসকে যেতে দেয়া যাবে না একে আজ।

এই চাঁদার মিশনটা সাকসেসফুল হলেই তার দ্বিতীয় মিশন। মিশন না অভিসার ?

এমডি ইমামুল নিজে বেরিয়ে আসেন। আরে রফিকুল ইসলাম পাপ্পু সাহেব। ভেরি সরি, আপনাকে বসিয়ে রেখেছি। আসুন, আসুন।

সেক্রেটারিটার দিকে একটা করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে রফিকুল ইসলাম পাপ্পু ভেতরে ঢুকে যান।

তারপর বলুন, দেশের খবর কী ?

দেশের খবর ? দুঃসংবাদ বলুন। দেশে কোনো সরকার নেই। ধরুন আপনি গাড়িতে চলেছেন, গাড়ি ছুটে চলেছে। কিন্তু আপনি জানেন না আপনার ড্রাইভার মারা গেছে বা অজ্ঞান হয়ে পড়েছে বা মদ খেয়ে বেহুঁশ হয়ে গেছে। দেশটা চলছে ঠিক এভাবে।

আরে কী যে বলেন। তাহলে আর আপনারা পলিটিশিয়ানরা আছেন কী করতে ?

চাঁদা তুলতে, মনে মনে বলেন রফিকুল ইসলাম পাপ্পু। শালা বিহারি, দেশপ্রেম তো উছলে পড়ছে দেখি, এদিকে শালা বাংলা উচ্চারণটাও রফত করেছে চোস্ত। মুখে অমায়িক হাসি এনে বলেন, হ্যাঁ, আমরা তো প্রেগ্রাম দিয়েই চলেছি, অ্যাকশান প্রোগ্রাম। এই কাগজগুলো দেখেননি ? নিজের ছবি ছাপা হওয়া সংবাদপত্রের কাটিংগুলো বের করে মেলে ধরেন পাপ্পু।

তারপর আসল কথাটা পাড়েন, সামনে কাউন্সিল। তার ওপর দেশের পলিটিকাল ক্রাইসিস। নানা প্রোগ্রাম করতে হচ্ছে। বড় খরচ। কিছু ডোনেশন না পেলে তো চলছে না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ। আপনি একটু বসুন। আমি একাউন্টেন্টকে বলেই রেখেছি। উনি প্যাকেটটা দিয়ে দেবেন। আমার একটা জরুরি মিটিং আছে। আমাকে একটু যাবার পারমিশন দিন।

ইমামুল ইন্টারকমে একাউন্টেন্টকে নির্দেশ দিয়ে বিদায় হন।

রফিকুল ইসলাম পাপ্পুকে আরো আধঘণ্টা বসে থাকতে হয়। দুবার একটা লোক এসে বলে যায়, আর একটু অপেক্ষা করুন, প্লিজ।

রফিকুল ইসলাম পাপ্পু বিরক্ত হতে শুরু করেন। দেড়টা বেজে গেছে। শামীমা নিশ্চয়ই এতক্ষণ না খেয়ে আছে। বেচারির আবার গ্যাস্ট্রিক আলসার। এমন যদি হয় যে ব্যথায় সে বিছানায় পড়ে যায় ? তাহলে তো সব মাটি। কী করবে সে ? রুগ্ন স্ত্রীর প্রতি কর্তব্যবোধে কোনো স্বামী উদ্বুদ্ধ নয়, কিন্তু বন্ধুস্ত্রীর প্রতি কর্তব্যে ? কঠিন পরীক্ষা। আজ তিনি কোনো পরীক্ষার মুখে অবতীর্ণ হতে চান না। আজ পরীক্ষাহীন সময় যাপন করবেন দুজনে।

শান্তা নেই। কাজের মেয়ে নেই। ড্রাইভারকে বলবেন, ইউনিভার্সিটি এলাকায় যাবো, তোমার গাড়ি নেবার দরকার নেই, তুমি বাসায় যাও। একটা স্কুটার নিয়ে যেতে হবে। সাবধানের মার নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

চিফ একাউন্টেন্ট নিজে উঠে এসেছেন। বুড়ো মতো হিন্দু ভদ্রলোক। বিহারি মালিক, কিন্তু প্রধান হিসাব-রক্ষক রেখেছে হিন্দু। বিশ্বস্ত হবে ভেবে। শালা! একটা প্যাকেট ধরিয়ে দিলেন বুড়ো বাবু। খুবই পাতলা প্যাকেট। পাঁচশো টাকার নোট হলেও এই প্যাকেটে কতো আর ধরবে ?

কতো আছে ?

পাঁচ।

পাঁচ ? পাঁচ মানে কী ? পাঁচ হাজার?

জি।

আমি কি ভিক্ষে করতে এসেছি ?

জি। স্যার যা বলেছেন।

স্যার বলেছেন ? পাঁচ দিতে স্যার বলেছেন ? বিপ্লবী নেতা রফিকুল ইসলাম পাপ্পুর বিপ্লব স্পন্দিত রক্ত মাথায় উঠে আসে। মনে হয় টাকার প্যাকেট ছুড়ে দেন এই লোকটির মুখে।

কিন্তু তিনি তা করবেন না। টাকাটা না নেয়াই ভালো, কিন্তু আজকের বাজারে টাকা দরকার। থাক একদিনের বাজার তো হবে।

আপনার স্যারকে বলবেন, আমি আবার আসবো।

জি, আচ্ছা, বলবো।

রফিকুল ইসলাম পাপ্পু উঠে পড়েন। তার সৌম্য মুখমণ্ডলে রক্ত উঠে এসেছে, তার কান গরম হয়ে আছে। হারামজাদা। ফাজলামি করার লোক পাও না। রফিকুল ইসলাম পাপ্পুকে পাঁচ হাজার টাকার চাঁদা সাধো।

ড্রাইভারকে বিদায় দিয়ে তিনি বনানীর উদ্দেশে রওনা হন, স্কুটারে।

শামীমা। শামীমার পিঠে একটা তিল আছে। তার টেলিভিশন পরদার মতো পিঠে তিলটা বড় আকর্ষণ করে।

ইমামুল। ৬০ কোটি টাকার ঋণখেলাপী। বিহারি। হারামজাদা তাকে এভাবে ছ্যাঁকা খাওয়ালো ? শুধু ব্লাউজ আর পেটিকোট পরা শামীমাকে দেখতে কেমন লাগবে ? পেটিকোটের ফিতে বাঁধার ত্রিভুজ জানালা কোথায় থাকবে ? নাভির নিচে নাকি কোমরের এক পাশে।

ওহ! মণ্ডল গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রিজ। দেশপ্রেমিক সেজেছো ? হরতাল-আন্দোলন দেশের অর্থনীতির জন্যে ক্ষতিকর বলে লেকচার দাও।

ভাই, স্কুটার ঘোরাও। বনানী যাবো না। চলো পার্টি অফিসে।

দুপুর বেলা, চারিদিকে খাঁ খাঁ করছে রোদ, পেটে খিদা, শরীরে যৌন-প্রবৃত্তির অবশেষ নিয়ে বিপ্লবী নেতা পাপ্পু পার্টি অফিসে এসে ঢোকেন। দারোয়ান-কাম-পিয়ন অবাক হয় স্যারকে এই অসময়ে দেখে। নিজের কক্ষে এসে প্রথমে ফ্যান ছেড়ে দেন রফিকুল ইসলাম পাপ্পু। তারপর বাথরুমে যান, মূত্রত্যাগ করতে। মূত্রত্যাগেও যৌনানন্দ আছে, ফ্রয়েডের মতবাদ ফলিয়ে নিজের উত্তেজনা কিছুটা লাঘব করেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তিনি। চোখেমুখে পানি দিয়ে ফ্যানের নিচে এসে বসেন পার্টির রাইটিং প্যাড নিয়ে। গরম গরম লিখে ফেলতে হবে।

অতঃপর রফিকুল ইসলাম পাপ্পু, বিপ্লবী নেতা, নিজহাতে নিচের বিবৃতিটি মুসাবিদা করেন এবং সন্ধ্যায় পত্রিকা অফিসে নিজে গিয়ে সেটা পৌঁছে দেন।

পরদিন বেশকয়েকটি দৈনিকে তার এই বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়।

'সম্প্রতি কিছুসংখ্যক বর্ণচোরা ঋণখেলাপী লুটেরা ধনিক দেশের স্বার্থবিরোধী নানা তৎপরতায় মত্ত হয়ে উঠেছেন এবং সরকারের পক্ষে গুণগান গাইতে শুরু করেছেন। এই অদেশপ্রেমিক বণিকেরা ইতিমধ্যেই ব্যাংক থেকে শিল্পায়নের নামে কোটি কোটি টাকা ঋণ নিয়েছেন এবং শিল্পায়ন না করে সেসব ব্যয় করেছেন ভোগ-বিলাসে, যাপন করছেন মত্তবিলাসী ব্যয়বহুল জীবন। এরা দেশের গরিব মানুষের ঘামে-ভেজা টাকার অপব্যবহার করে ভোগ-বিলাসে লিপ্ত হয়েছেন ও সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলেছেন। শুধু তাই নয়, চোরাচালান, মাদক ব্যবসার মতো জঘন্য অপরাধের সঙ্গেও এরা জড়িত। এই বর্ণচোরারা বিগত স্বৈরাচারের আমলেও একই রকমভাবে স্বৈরশাসকের পক্ষাবলম্বন করেছিল এবং গনআন্দোলনের বিপক্ষে সম্মিলিতভাবে অবস্থান নিয়েছিল। এদের সবার নাম তৎকালীন সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য প্রণীত কালো তালিকায় ঘৃণার অক্ষরে লিখিত রয়েছে। কোটি কোটি টাকার ট্যাক্স ফাঁকি, লক্ষ কোটি টাকার ঘুস-দুর্নীতি, শিল্প কারখানার বদলে দালালি-ফড়িয়াগিরির মাধ্যমে জাতীয় সম্পদের অপচয়, শ্রমিক দলন ও নির্যাতন, শ্রমিকদের বেতন মজুরি থেকে বঞ্চিত করা হতে শুরু করে সবধরনের অপকর্মে এদের পাপের পেয়ালা কানায় কানায় পূর্ণ। আমি এবং আমার পার্টি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলতে চাই, দিন আর বেশি নেই, এদেশের সংগ্রামী মানুষ ও লড়াকু মজদুর শ্রেণী অচিরেই এই লুটেরা ধনিকদের দীর্ঘদিনের শোষণ-শাসন-অপকর্মের দাঁত-ভাঙা জবাব দেবে।'

গুলশানের শান

এই যে বিজন মাঠ, চোরকাঁটায় ছাওয়া, আর ওই যে ওখানে এককোণে একটা বিবর্ণ প্রস্তরফলক দেখা যাচ্ছে, এসবের একটা ইতিহাস আছে। প্রস্তরফলকটি এই জনপদে পরিচিত গুলশানের শান নামে। গুলশানের শানের নামটি এসেছে গুলশান আরা থেকে। গুলশান আরা ছিলেন একজন জাঁদরেল মহিলা। তিনি ছিলেন একজন পৃথিবী বিখ্যাত উদ্বোধনকারিণী। উদ্বোধন করাটা পরিণত হয়েছিল তাঁর নেশায়। তিনি ছিলেন ক্ষমতাসীনের স্ত্রী, তার স্বামী শাসন করতো রাজ্য, আর তিনি শাসন করতেন সেই মহাপরাক্রমশালীকে; তার পরাক্রান্ত পতিপ্রবর তার কাছে এমন হয়ে থাকতো যেন বীর্য ঝরে যাওয়া নিস্তেজ প্রত্যঙ্গ বিশেষ। প্রতিদিন উদ্বোধন করতে ইচ্ছে করতে ইচ্ছে হতো তার, আঙুল নিশপিশ করতো ফিতে কাটার জন্য; হাত সুড়সুড় করতো দ্বারোদঘাটনের জন্য, সদাসর্বদাই মনে মনে তিনি স্থাপন করে যেতেন ভিত্তিপ্রস্তর। ভাবতেন তিনি : এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

কারণেই পুরুষরা নারীসঙ্গ এতো পছন্দ করে ; সেই যে এক হাজার এক রাতের গল্পে বাদশা প্রতিরাতে চাইতেন একজন করে কুমারী, সে তো দ্বারোদঘাটনের জন্যই; আর পুরুষমাত্রই নারীকে এতো কাছে পেতে চায়; সেও ফিতে কাটার জন্যই। তিনি পুরুষ নন; কিন্তু তার রিরংসা এখন আকার নিয়েছে উদ্বোধন-উন্মাদনার।

একদিনের ঘটনা।

আজ কিসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবো আমি ? গুলশান জানতে চান তার প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছে।

ইয়েস ম্যাডাম, একটা ক্রীড়া কমপ্লেক্স ম্যাডাম, সুদর্শন সেক্রেটারি উত্তর দেয় ত্রস্ত ভঙ্গিতে। 'গাভীনাইয়া গুলশান আরা ক্রীড়া কমপ্লেক্স। তিন কোটি টাকার প্রজেক্ট ম্যাডাম।'

'হু। আমি আজ কী শাড়ি পরবো ?'

'আজ আপনি ম্যাডাম পরবেন জামদানি শাড়ি।'

'বক্তৃতা কি রেডি হয়েছে ?'

'ইয়েস ম্যাডাম।'

'ছোট বক্তৃতা না বড়ো বক্তৃতা।'

'মাঝারি বক্তৃতা ম্যাডাম।'

'আমাকে পড়ে শোনান।'

সেক্রেটারি গুলশান আরাকে বক্তৃতার স্ক্রিপ্ট পড়ে শোনায়।

অতঃপর গুলশান আরা সেটি পাঠ করে, আর সেক্রেটারিটি শোনে।

'আমি গুলশান আরা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে নির্মাণ কাজের শুভ 'উদদোধন' ঘোষণা করছি।

'এক্সকিউজ মি ম্যাডাম, উদ্বোধন ঘোষণা করছি।'

'উদভোদন' ঘোষণা করছি।'

'উদবোদন' হচ্ছে বেশি শুদ্ধ। আপনি বরং উদ্দোধনই বলুন।'

'উদবোদন' বলছি।'

'আচ্ছা ঠিক আছ। শেষদিকে হাততালি পড়লেই ঠিক হয়ে যাবে।'

আমাদের গাভীনাইয়া জায়গাটা বেশি বিখ্যাত নয়। কিন্তু সেটা বিখ্যাত হয়ে যায় রাতারাতি। গাভীনাইয়া সদরের পাশে ছেলেদের ফুটবল খেলার মাঠটিতে হেলিকপ্টার নামে, এবং এই ফড়িং আকৃতির যন্ত্রটির ভটভট আওয়াজ ও বায়ুতাড়নায় সমাগত হয় বিপুলসংখ্যক পাবলিক। রাত্রিবেলা টেলিভিশন সংবাদের এই উদ্বোধনী দৃশ্যটি প্রচারিত হয় গুলশান আরার মাথায় আঁচল, পরনে জামাদানি শাড়ি, চোখে চশমা; তিনি গাভীনাইয়া গুলশান আরা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের নির্মাণকাজের শুভ 'উদবোদন' ঘোষণা করেন (বিপুল তালি)। তিনি একটি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, অতঃপর মোনাজাত হয় এবং একটি রেইনট্রির চারা রোপিত হয়। মোনাজাত পড়ানোর জন্য মৌলবি সাহেবকে দুইশো টাকা দেওয়া হয়, কিন্তু সই করিয়ে নেওয়া হয় এক হাজার টাকার ভাউচারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

মৌলবী সাহেব এ সত্ত্বেও খুবই খুশমেজাজ হন, কারণ টেলিভিশন পরদায় গুলশান আরার পাশে তাকে দেখানোর ফলে পুরো এলাকায় তার কদর এবং রেট বেড়ে যায় কয়েকগুণ। আলহামদুলিল্লাহ।

পৌষ মাস চিরকাল থাকে না। গাভীনাইয়ায় বালকদের খেলার মাঠের চারপাশের ধানক্ষেতগুলো আবার ভরে ওঠে ফসলে ফসলে। এখানে যে একটা ক্রীড়া কমপ্লেক্সের নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার কথা, তার টেন্ডার আহ্বান নিয়ে গাভীনাইয়ায় দেখা দেয় প্রচুর উত্তেজনা। কিন্তু অর্থবরাদ্দের কোনো পাকা খবর রাজধানী থেকে আর আসে না।

দিন যায়, মাস যায়; ওই মাঠখানির একপাশে পড়ে থাকে ভিত্তিপ্রস্তরখানি; সেখানে শ্বেতপাথরের পাতে কালোপাথরে খোদাই করা থাকে—শুভ উদ্বোধন গুলশান আর...ইত্যাদি। ভিত্তিপ্রস্তরের চারপাশে জঙ্গল গজায়।

মাঠের পাশেই দু-ঘর দিনমজুর থাকে, বৌ-বাচ্চাসহ। দুই কামলা-বউয়ের মধ্যে একদিন ঝগড়া লাগে গুলশানের শান নিয়ে। আগের দিন জমিরের বউ শানের গায়ে ঘুঁটা শুকাতে দিয়েছিল; রাত্রিবেলা মাখনের বউ সেই ঘুঁটা সরিয়ে ফেলেছে; তার বদলে সেখানে জ্বলজ্বল করছে সিঁদুর। শিবলিঙ্গ পূজা আর কী! সেই ঝগড়া প্রচণ্ড আকার ধারণ করে, গালিগালাজ রীতিমতো অশ্রাব্য পর্যায়ে চলে যায়।

গুলশানের শানের প্রকৃত মালিক কে, কে এই শান ভোগ করবে তাই নিয়ে ঝগড়া।

নারীদের ঝগড়া ক্রমে পুরুষের লড়াইয়ের দিকে মোড় নিতে থাকে।

লাঠি-কুড়াল নিয়ে উভয়পক্ষ পরস্পরের দিকে তেড়ে আসে, সম্ভাবনা দেখা দেয় রক্তপাতের। ঠিক তখনই আকাশ ভেঙে হঠাৎ করে বৃষ্টি আসে, সঙ্গে প্রচণ্ড বাতাস; বাতাসে কামলা-বিষাণের কুঁড়েঘরগুলো ভেঙে পড়ে, উড়ে যায়; ফলে গুলশানের শান নিয়ে ঝগড়াটি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় রূপ নিতে ব্যর্থ হয় শোচনীয়ভাবে।

দিন যায়, মাস যায়।

মাঠের মধ্যে দিয়ে পায়েচলা পথ। সমস্তটা মাঠ চোরকাঁটায় ছেয়ে গেছে; ছেলেরা আর ফুটবল খেলে না, সম্ভবত তারা এখন ব্যস্ত ভিসিআরে বিভিন্ন রঙের ক্যাসেট দেখায়।

বিজন মাঠের মধ্যদিয়ে পায়ে চলার সরু পথটুকুন কেবল চোরকাঁটামুক্ত। সেই পথ দিয়ে মানুষ যায়, গরু যায়, কুকুরও যায়।

কিন্তু কুকুরগুলো শুধু যায় না, যেতে যেতে হঠাৎ করে পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়; সোজা দৌড় ধরে গুলশানের শানের দিকে এবং সশ্রদ্ধ চিত্তে তুলে ধরে পেছনের একটা ঠ্যাং। এ অবস্থায় তারা বেশকিছুক্ষণ সময় কাটায় ওই গুলশানের শানের পাশে।

সেই দৃশ্য দেখে যে-কোনো কারো মনে পড়ে যায় সামরিক কায়দায় অভিবাদন দেওয়ার কায়দাটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

বিজ্ঞাপনপর্ব

আবেদ আলী মোহাম্মদ দেশে ফিরলেন বাইশ বছর পর। চব্বিশ বছর বয়সে দেশ ছেড়েছিলেন, ছেচল্লিশ বছর বয়সে প্রত্যাবর্তন ঘটলো। ফিরে এসে দেখতে পেলেন, অবস্থা রমরমা। ডেনভার থেকে নিতান্তই ডাকযোগে যে লেখাগুলো পাঠিয়েছিলেন, সেসব পত্রপত্রিকায় মুদ্রিত, পুর্ণমূদ্রিত হয়েছে। কয়েকটা আবার তাঁর অনুমতি না নিয়েই বই হয়ে বেরিয়ে গেছে। নিজের অজান্তেই তিনি এখন দেশের অন্যতম বেস্ট সেলার।

যুক্তরাষ্ট্রের ডেনভারে তিনি নিয়োজিত ছিলেন পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং গবেষণায়, এদেশে এসে যোগ দিয়েছেন একটা গ্যাস ফিল্ড প্রজেক্টে। কুমিল্লার নিতান্ত গণ্ডগ্রাম তাঁর প্রকল্প এলাকা। স্ত্রী, তিনটি পুত্রসন্তান নিয়ে তিনি সরাসরি প্রজেক্ট এরিয়ার কোয়ার্টারে গিয়ে উঠেছেন।

দ্বিতীয় দিনই একটা ঘটনা ঘটলো। একটা মেয়ে, বয়স বারো হতে পারে, বাইশও হতে পারে, দুপুরবেলা অফিসে এসে হাজির। তিনি তখন লাঞ্চ করার জন্য বাসায় ফিরবেন; একটু আগে রুখসানা, তাঁর স্ত্রী, ফোন করে বলেছেন চিংড়ি মাছ, কচুর লতি রান্না হয়েছে। আগন্তুক মেয়েটি রুমে ঢুকে পড়লো, বললো, আপনিই আবেদ আলী মোহাম্মদ, ইশ ইচ্ছে হচ্ছে আপনাকে ছুঁয়ে দেখি, আপনি কি মানুষ না দেবতা।

আবেদ আলী কৌতূহলভরে বললেন, কী ব্যাপার, কী চাই।

মেয়েটি আহলাদী জিভটা নানা কসরতে ঠোঁটে তালুতে লেপ্টে ঘষে বললো, আমি আপনার ফ্যান। ফ্যান মানে কী বলবো, আপনি আমার জান। আপনি আমাকে একটা অটোগ্রাফ দেবেন ?

আবেদ আলীর মজাই লাগলো। তিনি বললেন, ফ্যান নিয়ে আমি কী করবো, আমার ঘরে এয়ারকুলার আছে।

মেয়েটি হি হি করে হেসে উঠলো। বললো, এমন মজার কথা বলেন বলেই তো আপনাকে জানের চেয়ে বেশি লাগে। দিন না একটা অটোগ্রাফ।

কোথায় দেবো ? কাগজপত্র কিছু এনেছো ?

মেয়েটি সটান তার চেয়ারের কাছে এসে বললো, আমার হাতে দিন। প্লিজ। মেয়েটি কাঁপতে লাগলো। কেলেঙ্কারি ব্যাপার। তারপর ভুসভুস করে কাঁদতে কাঁদতে বললো, আপনি আমার আব্বুর মতো, কী ভালো, আমাকে কোলে নিন। দিন না একটা অটোগ্রাফ, আমার বুকে দিন প্লিজ, ঠিক মাঝখানে।

তৃতীয় দিন তাঁর বাসায় প্রকাশকদের লাইন পড়ে গেলো। একজন প্রকাশক বললো, স্যার, শুনলাম আপনি তেল নিয়া রিসার্চ করেছেন, আপনার উন্নতি স্যার কেউ ঠেকায়া রাখতে পারবে না, ইনশাল্লাহ। আপনি স্যার এভারেস্টের মতো উন্নতি করবেন স্যার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

'এভারেস্টের মতো উন্নতি ? ২৯ হাজার ১৪১ ফুট ? আর ইউ শুয়োর ? আপনি শুয়োর তো ?'

Sure-এর উচ্চারণটা তিনি করলেন অক্সফোর্ড ডিকশনারি অনুসারে। প্রকাশক হঠাৎ তার পায়ে হাত দিয়ে বললো, আমি শুয়োর হই আর গাধা হই, বই কিন্তু স্যার আমাকে একটা দিতেই হবে। না হলে ছেলেমেয়ে না খেয়ে মরবে। আবেদ আলী মোহাম্মদ খুবই আবেগপ্রবণ মানুষ। ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা লোক স্রেফ তাঁর স্ক্রিপ্টের অভাবে না খেয়ে মারা যাবে, এটা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না।

তিনি বললেন, দেবো। এটাই আমার ফাইনাল কথা। তার আগে একটা সেমিফাইনাল কথা আছে। আমার উন্নতি যে এভারেস্টের মতো অনিবার্য, এটা আপনি বুঝলেন কী করে ?

খুবই সহজ স্যার। আপনি স্যার অমেরিকায় তৈল নিয়া গবেষণা করেছেন। এই জ্ঞানটা এই দেশে খুব কাজে লাগবে। দেশটা তো স্যার চলছে তৈলের ওপরে। খালি স্যার জায়গা মতো তৈল লাগাতে পারলেই হয়। ওই ব্রেনটা তো স্যার আপনি নিয়া এসেছেন। আপনার উন্নতি কেউ ঠেকাতে পারবে না।

আবেদ আলী প্রকাশকের কথার বুজরুগিটা ঠাওর করতে পারলেন না। তিনি ভাবলেন, এরা হলো সুফিবাদের দেশের লোক। কথা বলে মারুফতি লাইনে। এদের কথার মর্ম বুঝতে পারে আলেম ব্যক্তি। তিনি আলেম নন। তার পক্ষে এ-কথার মানে বোঝা সম্ভব নয়। বিনয়বশত তিনি বললেন, 'কী যে বলেন না আপনারা, আমি কম বিদ্যার মানুষ, এসব কথার অর্থ বুঝতে পারি না।'

প্রকাশক ঝাঁপিয়ে পড়লো তার পায়ে, দু-হাতে জড়িয়ে ধরলো তাঁর দুই পা, স্যার, যা বলেছেন স্যার আমার সামনে বলেছেন স্যার, আর কাউকে বলবেন না, আপনার বই পেলে দুটো টাকার মুখ দেখবো, এই আশার আলোয় পানি ঢেলে দিবেন না।

আবেদ আলী মোহাম্মদ মহাবিব্রত। এই ভদ্রলোক তার পা জড়িয়ে ধরছে কেন ? তিনি তাকে তুলে বসালেন। শান্তস্বরে জিজ্ঞেস করলেন, আরে সাহেব, আপনার কাণ্ডকারখানা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আপনি এমন করছেন কেন ?

প্রকাশক বললো, স্যার, আপনি বিদেশে ছিলেন। দেশের আচার-আচরণ এখনো রপ্ত করতে পারেন নাই। এই যে অপনি বললেন কম বিদ্যার মানুষ, এধরনের কথা ভুলেও উচ্চারণ করবেন না। একবারে মাঠে মারা যাবেন। লোকে ছিছি করতে শুরু করবে। সবাই বলবে, 'আবেদ আলী ? ওতো একটা মূর্খ। ও নিজে বলেছে ও মূর্খ। মূর্খের কতো আস্পর্ধা, বই লেখে!' কেউ তখন আর আপনার বই কিনবে না স্যার, বই পড়বে না স্যার। তাতে আপনার কোনো ক্ষতি হয়তো হবে না। কিন্তু আমরা প্রকাশকরা পেটেভাতে মারা যাবো।

আবেদ আলী চিন্তিত বোধ করলেন। বলে কী লোকটা! ব্যাপারটা তো খতিয়ে দেখা দরকার। তিনি ইঞ্জিনিয়ার মানুষ। সায়েন্সের লোক। জীবনযাপনেও বড়ো গোছানো। এই প্রকাশক সাহেব কি মিথ্যা বলছে ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তিনি কুমিল্লায় লোক পাঠালেন। পুরোনো পত্রপত্রিকা কিনে আনলেন সের দরে। লেখক-কবি-শিল্পীদের সাক্ষাৎকারগুলো তিনি কেটে কেটে আলাদা করলেন। এবার সমস্ত সাক্ষাৎকারের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো তিনি একটা বড়ো বাঁধাই করা খাতায় তুলে রাখলেন।

সাবিনা ইয়াসমিন বলেছেন, 'শিল্পীদের কখনো অহঙ্কারী হতে নেই। এই যে আমি এতো বড়ো শিল্পী তা নিয়ে আমি কখনো অহঙ্কার করি না।' আবেদ আলী সাবিনা ইয়াসমিনের উক্তির প্রথম পংক্তিটা হলুদ মার্কার দিয়ে আর দ্বিতীয় উক্তিটা লাল মার্কার দিয়ে চিহ্নিত করলেন। পাশে মন্তব্য লিখলেন, 'সাবিনা ইয়াসমিনের স্বাস্থ্য ভালো, বলা যায় তিনি পৃথুলা। স্বাস্থ্য ভালো মহিলারা সরল প্রকৃতির হয়। তাদের মন হয় খুব ভালো। সম্ভবত এই উক্তিটা তাঁর সারল্যের পরিচায়ক। কিংবা তিনি আদৌ এ-কথা বলেননি। সাংবাদিকরা লিখতে ভুল করেছে।'

আল মাহমুদ বলেছেন, 'এদেশে আমিই একমাত্র মুক্তিযোদ্ধা—লেখক।' আবেদ আলী এ উক্তির পাশে মন্তব্য লিখলেন, 'সম্ভবত এটি একটা প্রিন্টিং মিসটেক। 'ক্র'-র বদলে পড়তে হবে ষ্টি'। কারণ আল মাহমুদের মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এক নম্বর তো নয়ই। তিনি এখন একজন রাজাকার। সম্ভবত ছেলেবেলায় তিনি কিছুদিন বক্সিং করেছেন। এজন্য নিজেকে মুষ্টিযোদ্ধা লেখক বলেছেন।'

আবেদ আলী সাহেব যতোই পত্রিকা ওল্টাচ্ছেন, ততোই বিস্ময়কর বিস্ময়কর সাক্ষাৎকার তিনি দেখতে পাচ্ছেন। তার মাথা গরম হয়ে যেতে লাগলো। তিনি বিভ্রান্ত বোধ করতে লাগলেন। তিনি কি বাস্তবিকই এসব সাক্ষাৎকার পড়ছেন, নাকি সবই হ্যালুসিনেশন?

তসলিমা বলেছেন, এদেশে একমাত্র আমিই নারীবাদী লেখিকা। বেগম রোকেয়া তেমন কিছু লিখেছেন বলে আমার মনে হয় না।

হুমায়ুন আজাদ বলেছেন বাংলাভাষায় একমাত্র বিশ্বমানের উপন্যাস লিখেছেন তিনি। একমাত্র! বিশ্বমান! আবেদ আলী বাথরুমে গেলেন! বেসিনের ট্যাপ ছেড়ে মাথা নামিয়ে পানি ঢেলে মাথা ঠাণ্ডা করলেন।

এদেশ থেকে বিনয় কি একেবারেই উঠে যাচ্ছে?

তিনি ঠিক করলেন কোনো কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীর সাক্ষাৎকার আর পড়বেন না।

আবেদ আলী রবীন্দ্রসঙ্গীতের মধ্যে মনোনিবেশ করেন। সকাল-বিকাল ক্যাসেট ছেড়ে দিয়ে তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনেন। কী মনে হলো, একদিন তিনি কিনে আনলেন সঙ্গীতের ওপর লেখা এই বই। বইয়ের নাম সঙ্গীতবিদ্যা। বইটি বের করেছে বাংলা একাডেমী, লেখক আবুল হেনা সাদউদ্দীন। বইটি তিনি পড়বেন বলে ঠিক করে রাখলেও পড়া তার আর হয়ে উঠছিল না। তাঁর স্ত্রী রুখসানা স্বামীর খারাপ অবস্থা দেখে একদিন এই বইটা নিয়ে এগিয়ে এলেন। বললেন, দ্যাখো, একজন লেখক অন্তত আছেন যিনি অহঙ্কারী নন। দ্যাখো, এই কী লিখেছে?

রুখসানা তাঁকে লেখকের ভূমিকা থেকে একটা লাইন পড়ে শোনালেন। 'গ্রন্থখানি রচনা করার সময় কষ্টসহকারে এবং সজ্ঞানভাবেই আত্মঅহমিকাপূর্ণ পাণ্ডিত্য না

দেখাবারই চেষ্টা করেছি।' আবেদ আলী উৎসাহভরে বইটি হাতে নিলেন। লেখকের এই বিনয়ী পঙ্‌ক্তির উপরের প্যারাগ্রাফে তাঁর নজর আটকে গেলো। লেখক লিখেছেন, 'বিগত কুড়ি বছরে সঙ্গীত সম্পর্কে ও সাঙ্গীতিক ব্যাপারে বিস্তৃত জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ কম মেলেনি। পৃথিবীর কিছুসংখ্যক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ্বানও সঙ্গীতজ্ঞের সঙ্গে পরিচিত হবার ও তাঁদের অনেকের সঙ্গে সাঙ্গীতিক ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করার সৌভাগ্য লাভ করেছি। উপরন্তু আমেরিকার (যুক্তরাষ্ট্র) বিশ্ববিদ্যালয়ের আশ্চর্য সমৃদ্ধ লাইব্রেরিগুলোতে সঙ্গীত সম্পর্কিত বহু মূল্যবান পুস্তক (যা বাংলাদেশের অধিকাংশ পাঠকের নাগালের বাইরে ও তাদের অধিকার বহির্ভূত) আমার পড়ার সুযোগ ঘটেছে। এর ফলে আমার সাঙ্গীতিক চেতনা ও চিন্তাধারায় এবং সাঙ্গীতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যে খানিকটা ব্যাপ্তি ঘটেছে তা অস্বীকার করবো না।' আবেদ আলী সাহেবের হাতপা কাঁপতে লাগলো। ঘটনা কী ? প্রতিভাবান ও বিদ্বানরা বিনয়ী হন—এই ধারণা কি তাহলে সত্য নয় ?

আবেদ আলীর মনে হলো সক্রেটিসের কথা। এই গ্রিক দার্শনিক অ্যাথেন্সের পথে দাঁড়িয়ে বলতেন, আমি তো কিছুই জানি না। অন্যরা বলতো, আমরা অনেক কিছু জানি। সক্রেটিস বলতেন, সত্যি জানেন ? আহা, আমাকে জানাবেন, ভালোবাসা কী ? অন্যেরা বলতো, হ্যাঁ, জানি। সক্রেটিস প্রশ্ন করতে শুরু করতেন। আবেদ আলী মনে মনে সেই দৃশ্যটা কল্পনা করলেন।

: বলুন তো ভালোবাসা কী ?

: ভালোবাসা হলো প্রেম।

: প্রেম কী ?

: প্রেম হলো প্রীতি।

: প্রীতি কী ?

: প্রীতি হলো পেয়ার।

: পেয়ার কী ?

: পেয়ার হলো মহব্বত।

: মহব্বত কী ?

: একজনের প্রতি আরেকজনের আবেগপূর্ণ টান।

: আবেগ কী ? টান কী ?

আত্মবিজ্ঞাপিত আত্মপ্রচারিত জ্ঞানীরা পালাতে শুরু করেছে, এই দৃশ্যটা আবেদ আলী মানসচক্ষে দেখতে পেলেন।

কিংবা নিউটন। তিনি বলেছেন, কিছুই শিখতে পারলাম না। জ্ঞানসমুদ্র পার হওয়া তো দূরের কথা, তার তীরে বসে নুড়ি কুড়ালাম মাত্র।

আবেদ আলী তার বড়োছেলেকে ডাকলেন। বললেন, তোমরা কি নিউটন সক্রেটিসের নাম শুনেছো ? তাদের সম্পর্কে পড়েছো ? তুমি বলো, নিউটনের থার্ড ল কী ? তার ছেলে, লিটন, বাবার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে বললো, আমার বন্ধুরা বলেছে নিউটন পড়তে হবে না। নিউটন একটা মূর্খ ছিল। সে জ্ঞানসমুদ্রে পা-ও দিতে পারে নাই। নুড়ি কুড়ালে তো চলবে না বাবা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দরজার চৌকাঠ ধরে দাঁড়ানো মেজোছেলে উৎসাহভরে বললো, আমার বন্ধুরা বলে গাছ থেকে আপেল মাটিতে পড়েছিল, কারণ মাথায় পড়লে নিউটন আহত হতেন।

আবেদ আলীর বড়োবোন থাকে চট্টগ্রামে। তিনি ফোন করলেন, আবেদ, সুখবর আছে। আমার নাতি হয়েছে। মৌসুমীর ছেলে। হ্যাঁ। এই তো গত পরশু রাতে। হ্যাঁ সিজারিয়ান। শোন। তুই তো অনেক বড়ো সাহিত্যিক। নাতির নাম কিন্তু তুই দিবি।

আবেদ আলী বললেন, আমার দেওয়া নাম তোমাদের পছন্দ হবে না আপা।

'না, না, হবে। তুই দিয়েছিস এটাই বড়ো কথা।'

কয়েকদিন পরপর ফোন আসতে লাগলো বড়ো আপার কাছ থেকে। শেষে আবেদ আলী বললেন, আচ্ছা, ছেলের বাপের নাম কী ?

'কায়সুল হক।'

'ঠিক আছে, তোমার নাতির নাম রাখো সুবিনয় হক। দেশে বিনয়ের বড়ো অভাব দেখতে পাই। একজন অন্তত বিনয় নিয়ে বড়ো হোক।'

'থ্যাংক ইউ আবেদ।' বড়ো আপা খুশিতে ডগমগ হয়ে ফোন রেখে দিলেন।

আবেদ আলী শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিয়ে গবেষণা পরিত্যাগ করলেন।

এবার তিনি গবেষণার বিষয় বদলে নিলেন। রাজনীতিকদের বক্তৃতা-বিবৃতি বিশ্লেষণ করতে লেগে গেলেন পরম আগ্রহে।

তিনি দেখলেন, এখানে অবস্থা আরো ভয়াবহ। সবাই নিজেকে শ্রেষ্ঠ, নিজের শাসনামলকে শ্রেষ্ঠ বলে নিজেরাই দাবি করছে। আওয়ামী লীগ দাবি করছে, তাদের আমলে চালের দাম ছিল কম, মুদ্রাস্ফীতি ছিল কম। জাতীয় পার্টি দাবি করছে তাদের যুগ হলো স্বর্ণযুগ। আর বিএনপির মতে দেশের যতো উন্নতি সব হয়েছে '৯১ থেকে '৯৬ পর্যন্ত। বিএনপির মন্ত্রীরা তো আরো এক কাঠি সরেস। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মতিন চৌধুরী পার্লামেন্টে বলেছেন, আমি এশিয়ার শ্রেষ্ঠ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। একটা লোক নিজেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলছে! লজ্জা করলো না ?

তিনি যখন এই গবেষণা নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত, এমন সময় তার কোয়ার্টারে বেড়াতে এলেন এক অধ্যাপক। এই লোক শেখ হাসিনার বন্ধু বলে পরিচিত। আবেদ আলী অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করলেন, 'শেখ হাসিনা কেন বললেন না, '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত যা ঘটেছে, তাতে ভালো-মন্দ সবই আছে। ভুল আছে। ভ্রান্তি আছে। সেসবের জন্য আমরা ক্ষমা চাই। সেই সঙ্গে বলি, সামনের দিনগুলো যাতে ভালো হয় সেজন্য আমরা শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে চেষ্টা করে যাবো। আপনারা আমাদের দোয়া করবেন, আমাদের সঙ্গে থাকবেন।'

অধ্যাপক বললেন, আমি আপাকে এ-কথা বলেছি। আপা বলেছেন, 'আমি বলতে পারি এসব কথা। কিন্তু তার পরিণতি আমাদের জন্য হবে খুব ভয়াবহ। সহ প্রচারমাধ্যমে, সব বিরোধীপক্ষ একযোগে বলবে, হাসিনা নিজে বলেছে, অনেক ভুলত্রুটি ওরা করেছে। ওদেরকে আর সুযোগ দিলে ওরা আবার ভুল করবে। পক্ষান্তরে আমাদের দেখো। আমরা কোনোদিন ভুল করি নাই। ভবিষ্যতেও করবো না।

আবেদ আলী সব বাদ দিয়ে টিভি প্রোগ্রাম দেখতে লাগলেন। তাদের কোয়ার্টারে ডিশ এন্টেনা আছে। স্যাটেলাইট চ্যানেল দেখা যায়। হঠাৎ করে একদিন এক হিন্দি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

শিল্পীর ইন্টারভিউ তার চোখে পড়লো। শিল্পী বলছে, আমি তো কোনো স্কুলে এসব শিখিনি। আই অ্যাম এ ন্যাচারাল ট্যালেন্ট। আমি হলাম প্রকৃতি-দত্ত প্রতিভা। আবেদ আলী দুঃখে কাতর হয়ে পড়লেন। তার হাত থেকে রিমোট কন্ট্রোল পড়ে গেলো।

কাছ থেকে তিনি বোধহয় বেশি বেশি আশা করছেন।

আবেদ আলী ঢাকায় যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। ঢাকায় তার মেজোবোন থাকে। বোনের বাসাতেই উঠলেন তিনি। ঢাকায় এসে আবেদ আলী বেরুলেন কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে দেখা করতে।

তিনি গেলেন শামসুর রাহমানের বাসায়। শামসুর রাহমান বললেন, আপনি কে? আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না। কিছু মনে করবেন না। চোখে গ্লকোমা।

আবেদ আলী নিজের নাম বললেন। শামসুর রাহমান বললেন, কী আশ্চর্য। আগে নাম বলবেন না। আপনি তো বড়ো লেখক।

আবেদ আলী সঙ্কুচিত বোধ করলেন। বললেন, কী যে বলেন স্যার। আমি একজন ক্ষুদ্র লোক। একটু-আধটু লেখালেখি করি। সেসব তো কিছু হয় না।

শামসুর রাহমান বললেন, খবরদার, এভাবে কথা বলবেন না। লোকে কিন্তু খারাপটাই বিশ্বাস করে ফেলবে।

সৈয়দ শামসুল হক একই উপদেশ দিলেন আবেদ আলীকে। আবেদ আলী ভাবলেন, এ হচ্ছে বড়ো লেখকদের বিনয়। তাকে ক্ষুদ্র লেখক না বলে বিনয় দেখাচ্ছেন তারা।

সুতরাং তিনি তাদের উপদেশে মোটেই কান দিলেন না।

এতো বড়ো লেখককে হাতের কাছে পেয়ে পত্রপত্রিকার সাংবাদিকরা ঘিরে ধরলো। তাঁরা সাক্ষাৎকার চায়। তিনি সবাইকে সাক্ষাৎকার দিতে লাগলেন।

একটা পত্রিকার সাংবাদিক প্রশ্ন করলো, গ্রামসির কাউন্টর হেজিমনি তত্ত্বের সঙ্গে আপনার লেখার সম্পর্ক কী?

আবেদ আলী বললেন, ভাই, আমি মূর্খ মানুষ, ইঞ্জিনিয়ারিঙের ছাত্র। আমাকে এ ধরনের প্রশ্ন করছেন কেন। আমি তো বড়ো লেখকদের লেখা পড়িনি।

সেই পত্রিকায় হেডিং বেরুলো—আমি মূর্খ মানুষ— আবেদ আলী।

যায় যায় যৌবন পত্রিকা থেকে একজন সাংবাদিক এলেন সাক্ষাৎকার নিতে। তিনি প্রশ্ন করলেন, বিশ্বসাহিত্যের বিচারে আপনার স্থান কোথায়? আবেদ আলী জবাব দিলেন, আমার লেখা যে সাহিত্য, সেটাই তো আমি নিশ্চিত নই। বিশ্বসাহিত্যের প্রসঙ্গ এখানে আসে কোথা থেকে?

এই সাক্ষাৎকারের হেডিং হলো—আবেদ আলীর লেখা সাহিত্য নয়।

দিনরাত্রি পত্রিকাঅলারা তাকে বললো, আমেরিকায় ইংরেজি ভাষা বিকৃত হচ্ছে—এ সম্পর্কে আপনার ভাবনা কী? আবেদ আলী বললেন, ভাই, বাংলাভাষাটাই ঠিকভাবে জানি না, আর ইংরেজি! কী যে বলেন।

এইসব সাক্ষাৎকারের প্রতিক্রিয়া হলো খুবই ভয়াবহ। তাঁর বইয়ের বিক্রি কমে গেলো। প্রকাশকরা তাগাদা দেওয়া বন্ধ করে দিলো। তার কাছে টেলিফোন ও চিঠিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

পাঠকের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া আসতে লাগলো। একজন বললো, ছি ছি আবেদ সাহেব, আপনাকে আমরা ভাবতাম কতো জ্ঞানী। অথচ আপনি ইংরেজি জানেন না। আর আমরা আপনার বই পড়েছি আপনাকে কতো কী ভেবে।

একজন চিঠি লিখলো, বড়ো বড়ো লেখকদের লেখা না পড়েই আপনি লেখালেখি করতে শুরু করেছেন, আপনার তো ফাঁসি হওয়া উচিত।

একজন পাঠিকা পরামর্শ দিলো, আপনার লেখা যখন সাহিত্য নয়ই, তখন আপনি এক কাজ করুন, দলিল-লেখক সমিতির সদস্য হোন।

আবেদ আলী ফিরে এলেন কুমিল্লায় তাঁর কর্মস্থলে। কয়েকদিন পরে আরেকজন সাংবাদিক তার সেই গণ্ডগ্রামের প্রকল্প এলাকায় চলে এলো।

স্যার, একটা সাক্ষাৎকার।

: মাথা খারাপ, আমি আর সাক্ষাৎকার দেবো না।

: কী যে বলেন স্যার। আপনি হলেন পৃথিবীর শেষতম বিনয়ী লোক। আপনি কি আমাকে ফিরিয়ে দিতে পারেন ? আমি শুধু স্যার আপনার সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য এতোদূর এসেছি।

আবেদ আলী তাকে ঘরে বসালেন। কুমিল্লার রসমালাই খাওয়ালেন।

সাংবাদিকটি প্রশ্ন করলো, স্যার, আপনি যে-সে পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেন কেন ? আবেদ আলী হেসে বললেন, ভাইরে, আমি কাউকে মুখের ওপরে না করতে পারি না। জানেন না সেই মাদুরঅলি মেয়ের গল্প। এক মেয়ে সবসময় হাতে মাদুর নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। লোকে জিজ্ঞেস করলে সে বলে, আমি যে ভাই কাউকে 'না' বলতে পারি না। বলা তো যায় না, কে কখন কী চায়। তাই বলে শরীরে নোংরা তো আর লাগাতে পারি না। সেইজন্য হাতে মাদুর রাখি।

যথারীতি কয়েকদিন পর এই সাক্ষাৎকার পত্রিকায় বেরিয়ে গেলো।

একদিন দুটো ষণ্ডামার্কা লোক আবেদ আলীর বাসায় হাজির।

কী চাই ? আবেদ আলী প্রশ্ন করলেন। আমরা পত্রিকায় পড়েছি আপনি না করতে পারেন না। সেইজন্য আপনার কাছে এসেছি।

কী বিষয়। সাক্ষাৎকার দিতে হবে ?

'না। সাক্ষাৎকার না। আমরা একটা গে-রাইট সমিতি করেছি। আমরা আপাতত দুজনই এই গে-রাইট সমিতির মেম্বার। মুশকিল হলো আমরা দুজনই অ্যাকটিভ। আমরা চাই আপনি আমাদের মেম্বার হোন। আপনি হবেন আমাদের সমিতির প্রথম প্যাসিভ মেম্বার।'

আবেদ আলী ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। বেটারা বলে কী ? তিনি মাথা ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করলেন। গেটে ইন্টারকমে ফোন করে দারোয়ান ডাকলেন। দারোয়ানকে বললেন, এই দুটো বদমাশকে পাছায় লাথি মেরে বের করে দাও। বেশি ত্যাঁদরামি করলে পুলিশে দেবে।

আবেদ আলী মোহাম্মদ এখন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত। বিনয় ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত তাকেও বিসর্জন দিতে হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

তিনি ঠিক করলেন— এই দেশে আর নয়। এরচেয়ে তার ডেনভারই ভালো। প্রায় বাতিকগ্রস্ত মানুষের মতো স্ত্রী ও তিনপুত্র নিয়ে তিনি ফের দেশ ত্যাগ করলেন। অ্যামেরিকায় প্রথম প্রথম তার খুব কষ্ট হতে লাগলো। কাজ পেতে দেরি হলো। পরে জব তিনি পেয়ে গেলেন।

কিছুদিন পরে তার মনে হলো, তার বড়ো আপার নাতির নাম সুবিনয় হক রাখা তার ঠিক হয়নি। এই নামটা বদলানো দরকার।

তিনি দেশে, চট্টগ্রামে, বড়ো আপার নাম্বারে ডায়াল করলেন। বড়ো আপাকে পাওয়া গেলো।

বড়ো আপা, তোমাকে একটা জরুরি কাজে ফোন করেছি। তোমার নাতির নামটা বদলে রাখো। সুবিনয় হক নামে কেউ ও-দেশে টিকতে পারবে না।

বড়ো আপা কাঁদতে লাগলেন। আবেদ, আমার নাতি তো আর নেই। তোকে কেউ জানায়নি ? সুবিনয় হক তার তিনমাস বয়সে মারা গেছে। সেও তো মাস দুয়েক আগেকার কথা। কী দোষ আমি করেছিলাম আবেদ, বল, যে আল্লাহ আমার মেয়েটাকে এতো বড়ো শাস্তি দিলো।

আবেদ আলী মোহাম্মদ ডুকরে উঠলেন। অঝোরে কান্না। তিনি নিশ্চিত দোষ বড়ো আপার নয়, দোষ তার নিজের। একটা শিশুর মৃত্যুর জন্য তিনিই দায়ী। তার উচিত ছিল আগেই ছেলেটির নাম বদলে রাখা। মানুষের জীবনে তার নামের প্রভাব পড়ে, জ্ঞানী লোকেরা বলেন। তার তো আগেই বোঝা উচিত ছিল সুবিনয় নামে কেউ ও-দেশে বাঁচবে না, বাঁচতে পারে না। হায় হায়, তিনি এ কী করলেন ?

আবেদ আলী মোহাম্মদ লেখালেখি ছেড়ে দিয়েছেন। দেশের মানুষও তার নাম একেবারেই ভুলে গেছে। নিজেকে বড়ো লেখক দাবি না করলে দেশের মানুষ তাঁকে লেখক বলে ভাবে না। মনে রাখা তো দূরের কথা। এসব নিয়ে অবশ্য আবেদ আলী চিন্তিত নন। ইঞ্জিনিয়ারিং চাকরিতে তাঁর এখন আর মন নেই। তিনি সব ছেড়েছুড়ে একটা লিফটম্যানের কাজ নিয়েছেন। ৩৫ তলা থেকে ৬৫ তলা পর্যন্ত এখন তার ডিউটি। লিফটে বসে তিনি ভাবেন, জীবনে তার প্রতিদিন কতো উত্থান-পতন, ৩৫ তলা থেকে ৬৫ তলা।

সন্ধ্যার পর হাঁটতে থাকেন পাহাড়ি রাস্তায়। নগর কর্তৃপক্ষের বানানো পার্কের ভিতর দিয়ে হেঁটে হেঁটে যান ঝরনার ধারে। দেখেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে যাচ্ছে। ফিরে যাচ্ছে ঘরে। আবেদ আলীর ভিতরে দেখা যায় গৃহটান। মাথাটা ঝিমঝিম করে ওঠে। তিনি সহসা চিৎকার করে ওঠেন— আমিই দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ লেখক। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক। আমিই সবচেয়ে বড়ো জ্ঞানী। হা-হা-হা-হা।

তার সেই হাসিতে ভয় পেয়ে মাথা উঁচু করে তাকায় কয়েকটা কাঠবিড়ালি। তিনি তাদের দিকে তাকিয়ে বলেন, আয়রে আমার সুবিনয়...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! আমারবই.কম